মুক্তিযুদ্ধ

সত্যের মুখোমুখি

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

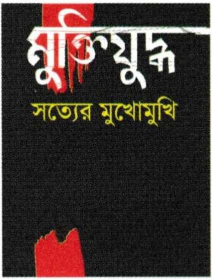

আমাদের জাতীয় জীবনের মহত্তম অর্জন স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা এসেছে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আর মুক্তিযুদ্ধের যে-সব ঘটনাবলি ও তথ্যাদি এর আগে আলোচনা হয়নি বা হলেও তা ভিন্নমাত্রিকতায় উঠে এসেছে *মুক্তিযুদ্ধ : সত্যের মুখোমুখি* বইটিতে ।

এই বই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নতুন ভাবনার জন্ম দেবে এবং জ্ঞানপাপী ও ইতিহাস বিকৃতিকারীদের সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

এ-বইয়ে মুক্তিসংগ্রামের পূর্বাপর ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত অতিক্রম করার ঘটনাবলি স্পর্শ করা হয়েছে। একথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল দীর্ঘ সংগ্রাম ও লড়াইয়ের ফলশ্রুতি। সেই লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস-নির্ধারিত পথে নেতৃত্বের শীর্ষে কীভাবে চলে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তারও বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ তথ্যচিত্র বর্ণিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের ভূমিকা এবং একই সঙ্গে তাদের উপেক্ষিত হওয়ার দিকটিও বইটিতে প্রথমবার সংযোজন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ কীভাবে সকল নিয়ম, শর্তাদি ভঙ্গ করে গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড নিজেদের গলায় ঝুলিয়েছেন তার মুখোশও উন্মোচিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

বলা বেশি, একইসঙ্গে সবাইকে 'সন্তুষ্ট' আর 'খুশি' করার নয় এই বই।

সূচীপত্র

ISBN 978-984-8558-83-6

অধ্যাপক ড. আবু সাইয়িদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন শিক্ষক ও রাকসু'র ভিপি। সত্তরের নির্বাচনে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের সাত নং সেক্টরের উপদেষ্টা ও ক্যাম্প ইনচার্জ। গণপরিষদে বাহাত্তরের খসড়া সংবিধান সংরচন কমিটির অন্যতম সদস্য। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক পাবনা জেলা গভর্ণর ডেজিগনেট। সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী। এছাড়া জাতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অভিজ্ঞতাঋদ্ধ। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: *ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস: বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, মেঘের আড়ালে সূর্য, ছোটদের বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব, অঘোষিত যুদ্ধের ব্লু-প্রিন্ট, ব্রুট্যাল ক্রাইমস্, বাংলাদেশের স্বাধীনতা: যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ: সিক্রেট ডিপ্লোম্যাসি, মুক্তিযুদ্ধ: উপেক্ষিত গেরিলা, জেনারেল জিয়ার রাজত্ব, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ঐতিহাসিক রায়, বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ থ্রেট অব ওয়ার, একাত্তরে বন্দী মুজিব: পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা, সমাজ বদলে বঙ্গবন্ধুর ব্লু-প্রিন্ট, মুক্তিযুদ্ধের দলিল লণ্ডভণ্ড এবং অতঃপর, বাংলাদেশের স্বাধীনতা: কূটনৈতিক যুদ্ধ* ইত্যাদি।

প্রচ্ছদ

নিয়াজ চৌধুরী তুলি

মুক্তিযুদ্ধ
সত্যের মুখোমুখি

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

সূচীপত্র
ঢাকা-বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধ
সত্যের মুখোমুখি

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

সূচীপত্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্র কা শ না য় দু ই যু গ পে রি য়ে...

প্রকাশক ❑ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ০১৭৬৬-১০৯৫০২

মুক্তিযুদ্ধ সত্যের মুখোমুখি
অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

গ্রন্থস্বত্ব ❑ গ্রন্থকার

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রচ্ছদ ❑ নিয়াজ চৌধুরী তুলি
বর্ণবিন্যাস ❑ শাওন কম্পিউটারস্
মুদ্রণ ❑ সাদাত প্রিন্টিং প্রেস, ১৪ কবিরাজ গলি লেন, ঢাকা ১১০০

ভারতে পরিবেশক ❑ রাজু বুক স্টোর স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ), সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক ❑ মুক্তধারা জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক, www.muktadhara.com, যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, কানাডায় পরিবেশক ❑ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফ্টস ২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো অনলাইন বুকশপ ❑ www.rokomari.com/sucheepatra

Muktijuddhwa : Satyaer Mukhomukhi by Prof. Abu Saeed
Published by Saeed Bari, *Chief Chief Executive*, Sucheepatra,
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100, Bangladesh.
Ph (+88) 01766-109502, e-mail saeedbari07@gmail.com
www.facebook.com/sucheepatra
Price : BDT.750.00 Only. US $ 50.00 £ 30.00

মূল্য : ৳ ৭৫০.০০ মাত্র

ISBN 978-984-8558-83-6

এই বইয়ের বিষয়বস্তু ও মতামত গ্রন্থকারের নিজস্ব -প্রকাশক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

বাবা-মা

মরহুম নজির উদ্দিন সরকার

মরহুমা আলহাজ্ব সাইদাতুন নেছা

যাঁরা আমার

আমৃত্যু অহংকার ও প্রেরণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক বিশাল ক্যানভাস । সেই ক্যানভাসে নানা ধরনের চিত্র-বিচিত্র ঘটনাবলি বিধৃত । কখনো কুটিল । জটিল । কখনো বা প্রতারণার জালে আবদ্ধ । একসঙ্গে পুরো ক্যানভাসটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় । এই ক্যানভাসের মূল চিত্রপট শতাব্দির সময়কে অতিক্রম করেছে । *মুক্তিযুদ্ধ : সত্যের মুখোমুখি* বক্ষমান বইতে অতীতকে নিয়ে আসা হয়েছে প্রাসঙ্গিকভাবে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু । সেই কালিক বিচারে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে, পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া থেকে যে ঘটনাবলি মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে তা উড়িয়ে দেয়া যায় না । সেই বিচারে *মুক্তিযুদ্ধ : সত্যের মুখোমুখি* বইতে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও এর সঙ্গে সামগ্রিক পরিস্থিতির যে জটিলতা তাকে কেউই উপেক্ষা করতে পারে না ।

লক্ষ্য করছি সাম্প্রতিককালে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে দেশে এবং বিদেশে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ।বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনেক গ্রন্থের রচয়িতা যারা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সামরিক ও বেসামরিকভাবে যুক্ত ছিলেন, তাদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ পুস্তক ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলো কিংবা তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করছে । অনেক সময় মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন লেখক ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন । হতে পারে তা পরস্পর বিরোধী তথ্য ও চিন্তাধারা । এ ধরনের বিতর্কমূলক লেখার মধ্যে অনেক সময় সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় কখনো বা সত্য আড়াল করে ইতিহাসের প্রবাহমানতাকে বিভ্রান্তির আবর্তে নিয়ে যায় । এই সামগ্রিক অবস্থাকে সামনে রেখে *মুক্তিযুদ্ধ : সত্যের মুখোমুখি* বইটি লিখিত । প্রকাশিত-অপ্রকাশিত তথ্য ও সততা নিয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় *মুক্তিযুদ্ধ : সত্যের মুখোমুখি* বইটি ।

আমি জানি এই বই প্রকাশের পর বিতর্ক উত্থাপিত হবে এবং বিতর্কগুলোর এমনও হতে পারে যা শত্রু-মিত্র সৃষ্টি করবে । একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে যতটুকু আমার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সেক্ষেত্রে আমি বিবেককে জাগ্রত রেখেই ঘটনাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি । তারপরও ভুলত্রুটি থাকবে । জানালে বাধিত হব । বইটির প্রতিটি অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে, যেভাবে বলা হয়েছে তার মৌলিক দিক ও প্রশ্নগুলো চতুর্মুখী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার, দেখবার প্রয়াস নেয়া হয়েছে ।

প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধের বিভ্রান্তমূলক তথ্য ও বক্তব্য যে কোনও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক সচেতন জনগণকে বেদনাক্লিষ্ট করছে । কিন্তু এর বিপরীতে প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে মিথ্যা ও অসত্যের মুখোমুখি হতে অনেকেই, বিশেষ করে দিলরুবা আঙ্গুরী এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহিত করেছে তার জন্য কৃতজ্ঞ । এছাড়া আহ্বতা, অনিন্দ্য, অনিম সর্বদা আমার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে । একইসঙ্গে অবশ্যই সূচীপত্র প্রকাশক সাঈদ বারীকে ধন্যবাদ না জানালে অকৃতজ্ঞ থাকব । শব্দ বিন্যাসে সহায়তা করেছেন সালমান চৌধুরী । শুভকামনায় ।

আবু সাইয়িদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ ▫ প্রতারণার মধ্যে সৃষ্ট যে দেশ ১১

অধ্যায় ২ ▫ সাপের দাঁত থেকে মধু আশা করতে পারি না
পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ২৫

অধ্যায় ৩ ▫ নানাবিধ চক্রান্ত: বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর ৪৪

অধ্যায় ৪ ▫ রাজনীতির অঙ্গনে কালো থাবা ৭৩

অধ্যায় ৫ ▫ কাউকে না কাউকে ফাঁসির ঝুঁকি নিতে হবে ১০৬

অধ্যায় ৬ ▫ গণঅভ্যুত্থান ও সশস্ত্র পরিকল্পনা ১২৫

অধ্যায় ৭ ▫ অসযোগিতার নেপথ্যে রাজনৈতিক দাবাখেলা ১৪৪

অধ্যায় ৮ ▫ শেখ মুজিব প্রথম থেকেই স্বাধীনতা চেয়েছেন ১৭৫

অধ্যায় ৯ ▫ স্বাধীনতা ঘোষণা ১৯০

অধ্যায় ১০ ▫ জন্মেই জটিলতা ২০৪

অধ্যায় ১১ ▫ জনযুদ্ধই মূল ভিত্তি ২২০

অধ্যায় ১২ ▫ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখলেন: কুরমাইল দি বেস্ট ক্যাম্প ২৩৬

অধ্যায় ১৩ ▫ ত্রিভুজ ষড়যন্ত্র: মার্কিন- মোশতাক-মওদুদ ২৪৭

অধ্যায় ১৪ ▫ মুক্তিযুদ্ধে জনপ্রতিনিধিরা অবহেলিত ২৫৮

অধ্যায় ১৫ ▫ বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব ২৬৮

অধ্যায় ১৬ ▫ রাষ্ট্রদ্রোহিতা কাকে বলে? ২৮০

অধ্যায় ১৭ ▫ শুধু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা কেন- বীরউত্তম নিয়েও প্রশ্ন ২৯৯

পরিশিষ্ট

- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণপরিষদের সদস্যপদ থেকে বাতিলের বিল উত্থাপিত হলে তিনি ১৯৪৯ সালে যে বক্তব্য পেশ করেন তার অংশবিশেষ
- এম. কে. গান্ধী প্রথম দিকে অখণ্ড বাংলার পক্ষে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাংলা বিভাগের পক্ষে মত দেন
- ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ কর্তৃক লিখিত লিপি
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রেরিত গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট
- ২৬ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ
- প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন বরাবর ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের লিখিত পত্র। সূত্র : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তারিখ ১২ নভেম্বর ১৯৭১
- লে. জে. টিক্কা খান সামরিক আইনে অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, অফিসারবৃন্দ ও বিচারপ্রতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- বীরত্ব খেতাব প্রদান স্কীম অনুমোদন সংক্রান্ত একটি চিঠি। সূত্র- বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন, তারিখ- ২৮ আগস্ট ১৯৭১
- মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের একটি চিঠি। ৩০ জুলাই, ১৯৭১
- মুক্তিযোদ্ধাদের পদকপ্রাপ্তির জন্য সুপারিশনামা ফরম। ৩০ জুলাই ১৯৭১
- ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে যে ৪৩ জনকে গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়েছিল তাদের নাম তালিকা
- মুক্তিযোদ্ধাদের পদক প্রাপ্তির জন্য সুপারিশনামা ফরম। ৩০ জুলাই ১৯৭১
- বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সনের ২৬ মার্চ প্রদত্ত খেতাব প্রাপ্তদের তালিকা আই, এস, পি, আর,-এর কর্তৃক চূড়ান্ত নয় বলে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়
- বীর-উত্তম খেতাব যারা পেয়েছিলেন
- প্রধান সেনাপতি কর্তৃক ডি,ও লেটার নং- ০০১৪জি অফ ২৩ মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমোদনের জন্য পত্র
- সংবাদপত্রে খেতাব প্রকাশের নমুনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : এক

প্রতারণার মধ্যে সৃষ্ট যে দেশ

[প্রথম অধ্যায়ে প্রতারণার মধ্যে সৃষ্ট যে দেশ-এর প্রাথমিক চাতুর্যপূর্ণ দিকটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করা আমার কাছে আবশ্যকীয় মনে হয়েছে। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি কীভাবে বাঙালি নেতৃত্বকে যারা ত্যাগ, মেধা, মনন ও জ্ঞান-ভান্ডারে ছিলেন ভারতীয় প্রথম সারির নেতৃত্বের যোগ্য এবং রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকান্ডে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষ, তাদেরকে কূটকৌশলের মাধ্যমে পাকিস্তানের কায়েমি শাসকবৃন্দ মূল কেন্দ্র থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করেছেন। ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশের নেতা হওয়ার কারণে জিন্নাহসহ কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ শেরে বাংলাকে দিয়েই লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তারপর এমন অযৌক্তিক ও অপমানজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় যার ফলে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক বাধ্য হন নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করতে।

অনুরূপভাবে পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন দেখলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাবে দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তখন মতলব আঁটলেন এই দুই স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রকে একীভূত করে 'একটি পাকিস্তান' করতে হবে। তাই প্রয়োজন পড়ল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। তখন বঙ্গীয় পরিষদে তাঁর নেতৃত্বে ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৩টি আসনেই মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়। সোহরাওয়ার্দী মুখ্যমন্ত্রী হন। সে জন্য তাকে দিয়েই জিন্নাহ দিল্লী কনভেনশনে 'এক পাকিস্তানের' প্রস্তাব পাশ করান।

এ সময় ভারতে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল। ঐ সরকারে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কিংবা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেউই ঠাঁই পাননি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতবাসী তথা বিশ্বকে দেখাতে চাইলেন পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র হলেও সেখানে সব ধর্মের লোক নিরাপদে বসবাস করতে পারবে সম-অধিকার নিয়ে। সেজন্য যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সুযোগ দেয়া হয়। এসবই ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের চতুরতা ও ভাওতাবাজি। পাকিস্তানী নেতারা বলতেন, বিশ্বে পাকিস্তান হবে 'ইসলামিক রাষ্ট্রের মডেল।' পাকিস্তানের জাতির পিতা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক বলেছেন, 'মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নামাজ, রোজা ও ধর্মের ধার ধারতেন না। জীবনের শেষ ৩ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, ইচ্ছাশক্তি, হুইস্কি, সিগারেট এবং কখনো কখনো শূকরের মাংসও তিনি ভক্ষণ করতেন।' এমনই ছিল নবসৃষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের ভন্ডামি।]

করাচী, ৪ মার্চ। ১৯৪৯।

সামনে কবর খোঁড়া হচ্ছে।

যাকে কবরস্থ করা হবে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন কবরের সামনে।

কবরে শায়িত করার পূর্বে জীবন্মৃত মানুষটি কথা বলতে দাঁড়িয়ে গেলেন। উপস্থিত সবাই বিমূঢ়! বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখছেন মানুষটির শান্ত, সমাহিত চেহারা। কোনো হতাশা নেই। ক্রোধ নেই। সৌম্যকান্তি।

গণপরিষদের স্পিকার তাকিয়ে আছেন। তিনি বিস্মিত। যেন বিমূঢ়!

তাকে বিনীত সম্বোধন করে সেই ব্যক্তিটি বলেন, "স্যার, এই জীবনে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কেউ উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেয়ার এবং শেষকৃত্যে অংশ নেয়ার সুযোগ পায় না। আমার জীবনে এ এক অপূর্ব সুযোগ এসেছে যেখানে আমি এই পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সেই শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করছি। একটু পরেই যাকে এই পার্লামেন্টে কবরস্থ করা হবে। এরকম দাঁড়িয়ে কিছু বলার সৌভাগ্য আজও কারো হয়নি। সম্ভবত এই পার্লামেন্টে এটাই আমার শেষ কথা হবে।

মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আজ যে আইন সংশোধন হতে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ সহজেই তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার যে সংশোধনটি করতে যাচ্ছে তার মাধ্যমে প্রমাণ হয় তাদের শিক্ষা ও ইতিহাস-জ্ঞানের কত বড় অভাব রয়েছে এবং এটা করা হচ্ছে একজন মাত্র ব্যক্তিকে সামনে রেখে। তাঁকে যেভাবেই হোক এই পার্লামেন্ট থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য। আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে এই ব্যক্তিটিকে জ্যান্ত সমাহিত করার জন্য।

গণপরিষদের সদস্য হিসেবে বিনীতভাবে আমি তা উপলব্ধি করছি, একজন ব্যক্তিকে পার্লামেন্ট থেকে অপসারিত করার যে আইনটি পেশ করা হয়েছে তা অর্থহীন। কেননা এখনো ভারত বিভাগের পরে বহু নেতাই তাদের স্থায়ী অবস্থান নির্ধারণ করেননি। তবুও আইন হচ্ছে যে, গণপরিষদ সদস্যের পাকিস্তানে স্থায়ী নিবাস থাকবে না তিনি গণপরিষদ সদস্য থাকবেন না বা যার ঘর নেই, বাড়ি নেই, আবাস নেই।

কিন্তু সেই ব্যক্তিই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এনেছিল, পার্লামেন্টারি পার্টির দিল্লীর কাউন্সিলে পাকিস্তান নামক একটিমাত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। সেদিন মুসলিম লীগ বঙ্গীয় পরিষদে ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৩টি আসনে বিজয়ী হয়। এই বিজয়ের পেছনে যে মানুষটি অগ্রণী ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন তিনি হলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৪৬ সালের ২২ এপ্রিল এই মানুষটি প্রাদেশিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। সেদিন তার নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা ও দক্ষতা সারাভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তার নেতৃত্বের দক্ষতায় বিমুগ্ধ নিখিল পাকিস্তানের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাকে দিয়ে দিল্লীতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তার মাধ্যমে ভারত খণ্ডিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিধানিক ভিত্তি তৈরি হয়।

সেই ব্যক্তি যিনি পাকিস্তান প্রস্তাব মুসলিম লীগ পার্লামেন্টের পার্টিতে উপস্থাপন করেন তাকেই আজ এ পার্লমেন্টে অন্যায়ভাবে শিরশ্ছেদ করা হচ্ছে। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন, এখন পর্যন্ত এদেশে স্থায়ী নাগরিকত্বের বিধান তৈরি হয়নি। এখন পর্যন্ত জাতীয়তার আইন পাস হয়নি। এখন পর্যন্ত কে কোন্ রাষ্ট্রে ভারত বা পাকিস্তানে থাকবে বা যাবে তা নির্ধারিত হয়নি। অনেকে হয়তো পাকিস্তানে এসে থাকবেন ব্যবসা বাণিজ্য বা শরণার্থী হয়ে, যারা চমৎকার রুটি ও মাছ মাংস পাওয়ার লোভে। বলা হয়ে থাকে পাকিস্তান মুসলমানদের জন্য মাতৃভূমি। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার কারণে বলা হয় সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান হয়েছে। তাহলে এই উপমহাদেশের যে কোন মুসলমানই পাকিস্তানে স্থায়ী অধিবাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে পারেন। পাকিস্তানের প্রতি যার আনুগত্য আছে তিনি এদেশের নাগরিক হতে পারেন। এ বিষয়ে আমি দুটো উদাহরণ তুলে ধরি, আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ভারত ইউনিয়নের প্রতি এখন পর্যন্ত আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে তিনি আবার পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টও।[১] আমি যদি ভুল না করি জনাব ইসহাক সাইত যিনি ভারত ইউনিয়নে পার্লামেন্ট সদস্য। তিনি আবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হয়ে বিদেশে আছেন। প্রথম থেকেই আইনের নামে বেআইনি। কোন একক ব্যক্তির জন্য আইন তৈরি করা হয় না। কিংবা তাকে তিরস্কার বা পুরস্কার করার জন্য আইন তৈরি অর্থহীন।

হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের যৌথ নেতৃত্বে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এর ফলে মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ক্ষিপ্ত হন। ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। তিনি পূর্ববঙ্গের কোটায় গণপরিষদ সদস্য হয়েছিলেন। লাহোর পার্লামেন্টারি পার্টিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাগ্মিতায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দৃষ্টে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মন্তব্য করেছিলেন, সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে যথাযোগ্য ব্যক্তি। একসময় উত্তর প্রদেশ থেকে আগত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সোহরাওয়ার্দীর পেছনে লাগেন। অন্যদিকে লিয়াকত আলী খান কায়েদে আযমকে পূর্বের মতো সম্মান করতেন না।[২] কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর কবর জিয়ারত পর্যন্ত করতে যাননি। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৪৭ সালে ৫ আগস্ট পূর্ব বঙ্গ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক জিন্নাহর সমর্থনে খাজা নাজিমুদ্দীন ৭৫-৩৯ ভোটে সোহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করে পার্লামেন্টারি পার্টির দলনেতা হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি হলেন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব গণপরিষদে বলেন, স্বেচ্ছাচারিতা একনায়কতন্ত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইসলামের নাম ব্যবহৃত হবে কিন্তু ইসলামের মর্মবাণী প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলভিত্তি সুদৃঢ় হতে পারে না। একদিন শিকড়মূল উপড়ে পড়বে। আমার দোষ হলো বাংলার যে দাঙ্গা চলছিল তা প্রতিরোধ করা। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা। শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এটা যদি আমার অপরাধ হয় তাহলে আমি বলব এই গণপরিষদে থাকার কোন ইচ্ছে আমার নেই। এর জন্য আইন করার প্রয়োজন ছিল না এক ব্যক্তিকে জবাই করার জন্য।

সম্মানিত পীরজাদা আব্দুস সাত্তার এমন একটি জটিল বিষয়ে বলেছেন, গণপরিষদ একটি সার্বভৌম সংস্থা সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু মাননীয় স্পিকার, আমি বলতে চাই আইনের বাইরে তা যেতে পারে না যা তাকে বেঁধে রেখেছে। প্রেসিডেন্ট ইচ্ছামতো আইনের বাইরে কিছু করতে পারে না একথা আমি গণপরিষদ সদস্যদের মনে করিয়ে দিতে চাই।[৩]

১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতীয় রাজনীতিতে দলটি তেমন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনকি ১৯১৩ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লীগে যোগদান করলেও এই পার্টি নিয়ে তার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি কংগ্রেসের নেতা এবং উভয় দলের ভেতরে সমঝোতার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি ১৯২৮ সালে এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি গঠিত হয়। পার্টির লক্ষ্য ছিল ছোট বড় জমিদার ভূস্বামী সংঘের বিরুদ্ধে। কৃষক প্রজাদের পক্ষে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার গঠন করতে না পারে সেজন্য মুসলিম লীগ শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদানে সম্মত হন। নির্বাচন উপলক্ষে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখন ঢাকায় এলেও তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল খুবই কম সংখ্যক লোক। সেই তুলনায় শেরেবাংলার জনপ্রিয়তা ছিল উত্তুঙ্গ।

মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান যে, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হককে যেভাবে হোক মুসলিম লীগে যোগদান করাতে হবে। ১৯৩৭ সালে অক্টোবরে শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক যুক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি পদে যোগদান করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেক্রেটারি হন।

এর পূর্বে যে ঘটনা তা যেমন ঐতিহাসিক তেমনি পূর্বাপর তাৎপর্যপূর্ণ। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ কাউন্সিল সভা আহ্বান করেন। লাহোর সম্মেলনে ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তির প্রশ্নে আলিগড় আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রমুখের তাত্ত্বিক বিরোধ দেখা দেয়। আলিগড় আন্দোলন প্রভাবিত নেতারা বিশেষভাবে মুসলিম-সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোর মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ধর্মীয় নিরাপত্তা নিয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বা শেরে বাংলা ফজলুল হক আলিগড়ে লেখাপড়া করেননি বা তাঁদের নেতৃত্বের পেছনে ব্রিটিশ রাজ্যের আনুকূল্য ছিল না। তাঁরা বলেছিলেন, সর্বভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে হিন্দুরা শাসনকার্য পরিচালনায় প্রাধান্য লাভ করবে। সেজন্য প্রয়োজন মুসলমানদের স্বাধীন স্ব-শাসিত অঞ্চল। স্ব-শাসন না পেলে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি সম্ভব নয়।

মুসলিম লীগ সভাপতির আহ্বানে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ২২ মার্চ লাহোর সম্মেলনে উপস্থিত হন এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিশেষ অনুরোধে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে উক্ত সম্মেলনে আগত কাউন্সিলবৃন্দ তাঁকে 'শেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করেন। লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "Of course and I am better than Mr. Jinnah!" তিনি হাজার হাজার জনতার মাঝে মিন্টু পার্কে ভাষণে বলেন, "১৯০৬ সালে যে বেঙ্গল থেকে মুসলিম লীগের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল আমি সেই পতাকা নিয়ে আমাদের নিজস্ব আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ পেয়েছি।"[৪]

লাহোর রেজুলেশনের মর্মকথা ছিল, ভারতবর্ষ বিভক্ত করে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এলাকাগুলোতে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হবে। উপর্যুক্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত ইউনিট বা প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসিত হবে।[৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালির নেতৃত্ব শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যোগ্যতা ও জনসমর্থনের বিচারে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খানের সমতুল্য দক্ষ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ও পরে দু'জনকেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করা হয় অথচ ১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ লাহোরে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ২৭তম বার্ষিক সভায় শেরে বাংলা ফজলুল হক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব যা পরবর্তীকালে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে অভিহিত হয়েছিল। যা কাউন্সিলদের সামনে উত্থাপিত হয় গৃহীত হয়েছিল যা ছিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মৌলিক নীতি। সেখানে বলা হয়েছিল, মুসলমানদের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা। বঙ্গপ্রদেশের অবিসংবাদিত নেতাকে দিয়ে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে। কাউন্সিল মিটিংয়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণের পর মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী দেখলেন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে এবং তাদের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে ধাবিত হবে। ক্যাবিনেট মিশনের বিরোধিতার সুযোগে পাকিস্তান মুসলিম লীগের সেক্রেটারি লিয়াকত আলী খান ১৯৪১ সালে ৮ সেপ্টেম্বর বঙ্গপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলা ফজলুল হক ভাইসরয়ের অধীনে ডিফেন্স কাউন্সিলের পদ থেকে পদত্যাগ না করার অজুহাতে পার্টির শৃঙ্খলাবিরোধী কাজে যুক্ত হিসেবে তাকে পত্র লেখেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক উক্ত অভিযোগের বিপক্ষে আটটি যুক্তি উত্থাপন করে বলেন, আমাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে, এখনই দলের মধ্যে যে অবস্থা তৈরি করা হচ্ছে তা ভবিষ্যতে একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেবে যা পরবর্তীকালে বিবেককে তাড়িত করে বিদ্রোহের দিকে নিয়ে যাবে।[৬] বঙ্গপ্রদেশের ওয়ার্কিং কমিটিকে না জানিয়ে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে শেরে বাংলা ফজলুল হক সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সদস্য পদ হতে পদত্যাগ করেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলার জনগণ জানতেন ফজলুল হক একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাংলার দুরবস্থা থেকে তাদের নিস্কৃতি দিতে পারেন এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম কেননা যেখানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ড. খান সাহেব এবং তার ভাই কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হয়। পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখ-মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ মিলে গঠিত ইউনিয়নিস্ট পার্টি মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। ১৯৩৭ সালে শেরে বাংলা ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে সরকার গঠন করেন। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রচেষ্টা ছিল প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের ও নেতৃত্বের প্রভাব ক্ষুণ্ন করে মুসলিম লীগকে কেন্দ্রীয়ভাবে শক্তিশালী করা। সেজন্য শেরে বাংলা ফজলুল হকের সঙ্গে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সংঘর্ষ তৈরি হয়। লিয়াকত আলী খান ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাকে ভাইসরয়ের নির্বাহী কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করতে বললে ফজলুল হক তা মানতে অস্বীকার করেন যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ফজলুল হক এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, জিন্নাহ্ স্টাইলের ডিক্টেটরশিপ তিনি মানবেন না।[৭] শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক জিন্নাহর স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে ১৯৪১ সালে ১০ সেপ্টেম্বর মুসলিম লীগ হতে পদত্যাগ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের ধুরন্ধর নেতৃত্বের সামনে বাংলার আর এক বিশাল ব্যক্তিত্ব যিনি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের বঙ্গপ্রদেশে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন তাঁকে দিয়ে অখণ্ড পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যে কাজটি 'অসমাপ্ত' ছিল সেটি পূর্ণাঙ্গ করার জন্য মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব প্রদান করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। তিনি যেহেতু সমগ্র পাকিস্তানের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন তাঁকে দিয়েই সেই 'কর্মটি' সম্পন্ন করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল পাকিস্তানের রাজধানী হবে কলকাতা। পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপিত হলে শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানীর মান মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। এই সমস্ত কারণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিম উদ্দিন, নূরুল আমিন, মওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতা বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করতে এবং কলকাতার উপর থেকে কংগ্রেসের দাবি প্রত্যাহার করতে জোরালো ভূমিকা নেয়নি। বরং তাঁরা খুশিই হয়েছিলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান কলকাতার বিনিময়ে লাহোরকে পশ্চিম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বৃটিশ শাসক ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে দর কষাকষি শুরু করেন। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বোস, হাশিমুদ্দীন প্রমুখ যুক্ত বাংলার পক্ষে জনমত গঠন করেন। কারণ যুক্ত বাংলায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারপরও শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীসহ হিন্দু মহাসভা ও উগ্রবাদী হিন্দুরা যুক্তবাংলাকে বিভক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব এ সম্পর্কে ১৯৪৭ সালে ২৭ এপ্রিল একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন, হিন্দু এবং মুসলমান যুগ যুগ ধরে এ এলাকায় শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম ১৯৪৭ সালের ২৯ এপ্রিল এক দীর্ঘ বিবৃতিতে বলেন, আমি তাদের কাছে আবেদন জানাই বাংলা ভাগ করানোর "I beg to them not to destroy Bengal." এ সঙ্গে সুভাষ বসুর ভাই শরৎ বসু ও আবুল হাশেম ১৯৪৭ সালের ২০ মে উভয়ে একত্রে এক যৌথ চুক্তিতে স্বাধীন যুক্তবাংলার পক্ষে একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। সেখানে সরকারি প্রতিনিধিত্ব ভোট প্রদানের অনুপাত এবং মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন একজন মুসলমান ও হিন্দু। গণপরিষদ গঠিত হবে ৩০ সদস্যের, তার মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু প্রতিনিধি থাকবে। মহাত্মা গান্ধী ৮ জুন ১৯৪৭ সালে এক পত্রে বলেন, মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যদি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যুক্তবাংলার পক্ষে লিখিত অনুমোদন দেয় তাহলে আমার পক্ষ থেকে কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু উগ্র হিন্দুবাদীর পক্ষে বল্লভ ভাই প্যাটেল এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অবশেষে বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হয় এবং কলকাতা পূর্ব বাংলার হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু কলকাতার বিনিময়ে লাহোর পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লীর অ্যাংলো-এ্যারাবিক কলেজে নির্বাচিত পার্লামেন্টারি পার্টিতে দিল্লীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে রেজুলেশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলকে নিয়ে একটিমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।[৮] মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সর্বভারতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে বাঙালি মুসলমানগণ লাহোর প্রস্তাবের পক্ষে যে নিরঙ্কুশ সমর্থন ও রায় প্রদান করেছিল এটা ছিল সেই গণরায়ের প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। এই সংশোধনীর বিরোধিতা করেছিলেন যুক্তবাংলার মুসলিম লীগের সদস্য ও কাউন্সিলরা। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন কাউন্সিলার। তিনি তার নেতার এই অপরিণামদর্শী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। আবুল হাশিম সম্মেলনের সভাপতি জিন্নাহর সামনে দাঁড়িয়ে জোরালোভাবে বলেন, এই প্রস্তাব আমরা মানি না। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জিন্নাহর নির্দেশে তাকে চ্যাঙদোলা করে কাউন্সিল প্যান্ডেলের বাইরে ঠেলে দেয়া হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ভেবেছিলেন যুক্তবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাবেন। কেননা লিয়াকত আলী খান ছিলেন পাকিস্তান ভূখণ্ডের বাইরের লোক, তার বাড়ি উত্তর প্রদেশে। যিনি নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ছিলেন না। বাংলার কোটা হতে তাকে নির্বাচিত করা হয়। সেজন্য তিনি হৃষ্টচিত্তে এই সংশোধনী সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেননি।

মুসলিম ছাত্রলীগের দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল অংশের জনাব নূরউদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল ওয়াসেক, শামসুর রহমান, জহুর আহমদ চৌধুরী, এম এ আজিজ, শামসুল হক, আনোয়ার হোসেন, আবদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ নেতা ও কর্মীরা মারাত্মকভাবে ক্ষুব্ধ হন। কারণ লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের যে গ্যারান্টি ছিল তা অবলুপ্ত হয়। বলতে গেলে তখন থেকেই বাঙালি জাতির উপর পশ্চিম পাকিস্তান নেতৃত্ব চেপে বসার সুযোগ লাভ করে।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব যা ছিল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত সেই প্রস্তাব পার্লামেন্টারি পার্টির দ্বারা সংশোধন করা কোনক্রমেই সাংবিধানিক, গঠনতান্ত্রিক ও নীতিগতভাবে বৈধ হতে পারে না। এই অবৈধ পথেই দিল্লী প্রস্তাব মোতাবেক ভারত খণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিন্নাহ-লিয়াকত আলী খানের ষড়যন্ত্র শুরু হয় কীভাবে দক্ষ, জনপ্রিয়, অভিজ্ঞ ও মেধাবী জননন্দিত নেতৃত্ব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে যুক্তবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে সরিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পাঞ্জাব প্রদেশ বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াত খানকে পরিবর্তন করে কোন নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু হতেই পূর্ববঙ্গের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাঙালি জাতিকে শাসন শোষণ ও দমন করার নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করা হয়।

১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলা আসাম ভ্রমণে আসেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সে সময় আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসামের মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেন। ঐ সময় ইস্পাহানি জিন্নাহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, মওলানার আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং তার মর্মস্পর্শী বক্তব্যে তার চোখে অশ্রু দেখা দিয়েছিল। সন্ধ্যার সময় জিন্নাহ ইস্পাহানিকে বলেন যে, ভাসানীর মতো লোক নেতৃত্বের যোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন, "সেন্টিমেন্টাল, ননসেন্স, ইমোশন রাজনীতিতে কাজ করবে না। অশ্রু দ্বারা দুশমনদের পরাজিত করা যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন কঠোর কর্মনিষ্ঠা, সাহস ও প্রত্যয়। জিন্নাহ বলেন, মওলানা ভাসানী ভালো বক্তা হতে পারেন, শ্রোতাদের আবেগাপ্লুত করতে পারেন কিন্তু তিনি ভালো নেতা হতে পারবেন না। এই সংকটকালে প্রয়োজন ঠাণ্ডা মাথার লোক যার চোখ থাকবে শুষ্ক, যে স্পষ্ট সবকিছু দেখতে পারবেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। জিন্নাহ মওলানা ভাসানী সম্পর্কে কুৎসিৎ মন্তব্য করেন।[৯] কিন্তু মওলানা ভাসানী সম্পর্কে জিন্নাহর এই মন্তব্য ব্যর্থ প্রমাণিত হয় যখন সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা সেই গণভোটে ভাসানীর শক্ত ও সাহসী ভূমিকার জন্য যা সম্ভব হয়েছিল।

এভাবে যিনি 'লাহোর প্রস্তাব' উপস্থাপন করেছিলেন সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যিনি অখণ্ড 'পাকিস্তানের প্রস্তাব' দিল্লীর পার্লামেন্টারি পার্টিতে সর্বসম্মত সমর্থন গ্রহণে সমর্থন হন এবং মজলুম জননেতা পাকিস্তান সৃষ্টিতে যার অসামান্য অবদান রয়েছে বাংলার এই তিন জনপ্রিয় জননেতাকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, দলীয় শাসকচক্র অত্যন্ত কৌশলে দল ও সরকার থেকে বিতাড়িত করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির এই অন্যতম নায়কদের একমাত্র অপরাধ ছিল তারা বাংলা ও বাঙালির পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। পাকিস্তানে প্রথম থেকে যে প্রতারণা-সেই প্রতারণার মধ্যে তার ভাঙনের বীজ রোপিত হয়েছিল।

আর একজনের নাম অবশ্য উল্লেখ করার ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। যিনি পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যাকে অত্যধিক বিশ্বাস করতেন। একই সাথে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু তফশিলী সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে ভারত বিভাগের অন্তর্বর্তীকালীন ও পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আইন ও শ্রমমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলীর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে ভারতের সঙ্গে গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগে তাকে হুমকি দেন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ১৯৫০ সালে তাকে কলকাতায় পালিয়ে যেতে হয়। কলকাতা থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বরাবর এক দীর্ঘ পত্র লেখেন, সেখানে তিনি উল্লেখ করেন,[১০] সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করার নীতি এবং হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের হাত থেকে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তারা যেন প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সেই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অথচ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৬ সালে পহেলা নভেম্বর ভারতে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয়েছিল সেই মন্ত্রিসভায় তিনি মন্ত্রী ছিলেন। এমনকি তিনি একথা বিশ্বাস করতেন, উপরতলার হিন্দু সম্প্রদায়ের কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যথার্থ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল বলেই তিনি মুসলিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগকে সমর্থন দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবে না। কিন্তু ১৯৫০ সালে দাঙ্গা বেধে যায়। পূর্ববঙ্গে শতকরা ৭৫ ভাগ জমিদার হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু তিনি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তারপরও পাকিস্তানকে ইসলামীকরণ করার লক্ষ্যে যখন সার্বিক দিক দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো তখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, পাকিস্তানের জন্য তিনি উঁচুতলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেননি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করেছেন। সেই পাকিস্তান ছেড়ে জীবন নিয়ে তাকে ভারতে পালিয়ে যেতে হয়।'[১১]

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা লীগের মূলমন্ত্র ও একমাত্র কর্মসূচিতে পরিণত হয়। ১৯৪৬ সালের আগে মুসলিম লীগ হাইকমান্ড কর্তৃক পাকিস্তান পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণীত না হওয়ার কারণে ১৯৪০ সাল থেকেই বাংলার নেতৃস্থানীয় মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তান পরিকল্পনাকে ভারতের দুটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে দেখে আসছিলেন।

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার তত্ত্বটির পশ্চাতে প্রধানত তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, আবুল হাশিমের মতো কেউ কেউ এবং পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রবক্তারা বিশ্বাস করতেন, বাঙালি মুসলমানরা শুধু হিন্দুদের থেকে ভিন্ন নয়, বরং অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের থেকেও ভিন্ন, অতএব তারা একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী। সেজন্য ভিন্ন রাষ্ট্র তাদের কাছে প্রথম দাবি। দ্বিতীয়ত, কারও কারও (যেমন আহসান মনজিল খাজা গ্রুপ) মনে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃত্বের প্রতি প্রীতি বা অন্ধ আনুগত্য প্রবল ছিল। তৃতীয়ত, লাহোর প্রস্তাবের 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' কথাটি সোহরাওয়ার্দীর মতো অনেকের মনে বাংলায় পৃথক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার চেতনা জাগ্রত করেছিল।

বস্তুত পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ গঠন ও পাকিস্তান আন্দোলনের গোটা সময়ব্যাপী বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন জাতিসত্তার দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ছিল। বিশিষ্ট বাঙালি নেতা ও লাহোর প্রস্তাবের প্রস্তাবক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের মূলে ছিল পারস্পরিক স্বার্থ ও আনুগত্যের সংঘাত। তিনি দৃঢ়ভাবে অনুভব করতেন যে, অবাঙালি মুসলমান নেতারা বাংলার মুসলমানদের বিশেষ সমস্যার প্রতি কখনও প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করতেন না। বহু বিষয় ও ঘটনা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, আবুল হাশিম ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাদের মনে এ ধারণাই সৃষ্টি করে যে, জিন্নাহর 'প্রস্তাবিত' পাকিস্তান বাংলার জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, একটি অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে বাঙালি মুসলমানদের উপর চলবে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য।

এসব বাঙালি নেতৃত্বের কাছে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের অর্থ ছিল ভিন্নতর। তাঁদের বিবেচনায় এটা অখণ্ড পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি পর্যায়ের কোন বিশ্বাসবোধ ছিল না, বরং এটা ছিল ভারতের সাধারণ মুসলমানদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা সংক্ষেপে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের একটি কৌশলগত দিক। এর প্রমাণস্বরূপ পাকিস্তান গণপরিষদ ১৯৪৭ সালে ১১ আগস্ট করাচীর অধিবেশনে একজন তফশিলী সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে সভাপতি নিযুক্ত করে গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমাণ করতে চাইলেন পাকিস্তান শুধু মুসলমানদের দেশ হবে না, হবে সব সম্প্রদায়ের দেশ।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ইসলামিক শ্লোগান' বা 'প্যান ইসলামিজম' এই কথিত তত্ত্ব পাকিস্তানি নেতৃত্বের দর্শন বা তাত্ত্বিক বুনিয়াদ নয় বরং পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য এটি ছিল একটি স্লোগান মাত্র। পাকিস্তান সম্পর্কে জিন্নাহর ধারণা থেকে তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। শেরে বাংলা ফজলুল হকের বিপরীতে আবুল হাশিম ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উপযুক্ত সময় ও সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার আগে এ সম্পর্কিত তাদের স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে ঐ সময় পর্যন্ত মুসলিম লীগের আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখাকেই শ্রেয় মনে করেন। কেননা এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করলে এ পর্যায়ে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে অনৈক্যের সৃষ্টি হবে তা খোদ পাকিস্তান পরিকল্পনার মূলে কুঠারাঘাত হানতে পারে বলে তাঁরা একে আত্মঘাতী বিবেচনা করতেন।

স্বাধীন ইস্টার্ন পাকিস্তান বা এক ধরনের 'বৃহত্তর বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের ধারণা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে ওয়াকিবহাল যেকোন ব্যক্তির কাছে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক গৃহীত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পেছনে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য কী ছিল তা সাধারণ জনগণের কাছে ছিল 'অস্পষ্ট'। সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতার লক্ষ্য সামনে রেখে দাবিকৃত পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে তাদের যুক্তবাংলার তত্ত্ব যে সাংঘর্ষিক নয় বরং সঙ্গতিপূর্ণ তা উঠতি মধ্যবিত্তের মধ্যে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করলেও পাকিস্তান সৃষ্টিতে তখন ধর্মের বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক প্রভাব প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল। কার্যত দিল্লী সম্মেলনের পর থেকে অখণ্ড স্বাধীন বাংলার জন্য আন্দোলন শুরু করার ঘোষণাদানকালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন: "আমি বাংলাকে বরাবর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভেবে আসছি, ভারতের কোন ইউনিয়নের অংশ হিসেবে নয়।"[১২]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক উত্থাপিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের প্রতি জিন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল এ সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত সমাজ, রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং নেতৃবর্গের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও সম্প্রতি এ প্রস্তাব সম্পর্কে জিন্নাহর প্রকৃত অবস্থানটি অজানা নেই।

১৯৪৭ সালের ২৬ এপ্রিল এক সাক্ষাৎকারে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভাইসরয়কে জানান যে, 'পর্যাপ্ত সময় পেলে তিনি বাংলার অখণ্ডতা বজায় রাখতে সক্ষম হবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। তিনি এ মর্মে জিন্নাহর সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হবেন যে, যদি বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখা হয় তাহলে এর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবশ্যকতা নেই।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলার কমনওয়েলথের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদস্য হিসেবে থাকার সর্বপ্রকার ইচ্ছা রয়েছে।" একই দিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে ভাইসরয় তাঁকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের বাইরে রেখে এর অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্পর্কে তাঁর মতামত সরাসরি জানতে চান। কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই জিন্নাহ জবাব দেন: আমার আনন্দিত হওয়ার কথা। কিন্তু কলকাতা ছাড়া বাংলার মূল্য কোথায়? তারা বরং অবিভক্ত ও স্বাধীন থাক, আমি নিশ্চিত যে তারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্পর্কে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তার প্রতি জিন্নাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, "অবশ্যই আমিও যেমনটি আপনাকে ইঙ্গিত দিয়েছি যে পাকিস্তান কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চাইবে।" মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী খান পরে বিভিন্ন সময়ে বাংলার অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে একই অভিমত ভাইসরয় এবং তাঁর স্টাফদের কাছে ব্যক্ত করেন।[১৩] তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বাংলার মুসলমান জনসাধারণের মাঝে এ প্রস্তাব আপাতত গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা এখন অখণ্ড পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর। আর সেই স্বপ্নের গোড়াপত্তন করেছিল বাংলার তিন জনপ্রিয় নেতা। তাদের পরিশ্রম ও দক্ষতা দ্বারা। জিন্নাহ-লিয়াকত তাদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়ার পর দল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। বিপরীতে সেই স্বপ্নকে দীর্ঘায়িত করার জন্য খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখের মতো নেতা সক্রিয় রয়েছেন। অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন অখণ্ড বাংলা হবে প্রকৃত অর্থেই একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ।[১৪]

মুসলমানদের রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের উভয় গ্রুপকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ পর্যায়ে 'খাজা গ্রুপ' বা অখণ্ড পাকিস্তানপন্থীরা এ ধারণা পোষণ করতে থাকে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধনহীন অবস্থায় বাংলার মুসলমানরা 'ঐক্যবদ্ধ হিন্দুস্থানের শক্তি মোকাবেলা করতে' সমর্থ হবে না এবং কালক্রমে বাংলা 'ভারতের একটি অংশে' পরিণত হবে বলে তারা আশঙ্কা করেন।[১৫]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান সর্বদা চেয়েছেন কলকাতার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানে লাহোর যেন অন্তর্ভুক্ত থাকে।

তখনকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ছিলেন জনপ্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় বাঙালি নেতা। বাঙালির জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নে তাদের আগ্রহ ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা তাঁদের চিন্তাকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দূরদর্শিতা ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। এ ব্যর্থতার নানা কারণ থাকতে পারে, তবে তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল থাকায় তাঁরা ঐতিহাসিক পর্যায়ে বাঙালির জাতি রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনীয় ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হননি। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও বাঙালি নেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সম্পর্ককে পাকিস্তানি নেতারা পরিকল্পিত 'একীভূত পাকিস্তান রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগিয়েছে।[১৬]

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ কিংবা পাকিস্তান সরকার বাঙালি নেতৃত্বকে প্রতারণার আবর্তে ঠেলে দিয়েছে। ক্ষমতার লোভ ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে তারা সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর জনশক্তিকে দাঙ্গা, ধর্মীয় উন্মাদনায়, সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের আদর্শগত কোন দৃঢ় অবস্থান ছিল না। ডাল-ভাতের স্লোগান দিয়ে সাধারণ-কৃষক-প্রজাদের কাছে বিশেষ করে মহাজনী সুদ প্রথা বাতিল করার প্রতিশ্রুতি শেরে বাংলা ফজলুল হককে জনপ্রিয় করলেও স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অবদান ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয় হয়ে থাকবে। যদিও তার স্বপ্নরাজ্য ছিল বৃহত্তর বাংলা।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বংশগত আভিজাত্য, তার সমগোত্রীয় বলয় ভেদ করে প্রথম থেকেই তিনি উচ্চ মহলে প্রভাব বিস্তার করলেও প্রথম দিকে জনগণের কাছে জনপ্রিয়তা ১৯৪৬ সালের পূর্বে তেমনটি ছিল না। এই দুই নেতৃত্বের দূরদৃষ্টির অভিজ্ঞতা ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ছিল না। এই দ্বন্দ্বের বিভিন্ন রূপ পর্যবেক্ষণ করব আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের হাতে তারা জিম্মি হয়ে পড়েন। বাংলার জনগণ ধর্মান্ধতার কবলে বন্দি। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রীয় কাঠামো, শাসন ব্যবস্থা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও দখল, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, কেন্দ্রীভূত শাসন ও কর্তৃত্ব সর্বদাই জনগণকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করেছে– যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পরিদৃষ্ট হবে।

AMARBOI.COM

টীকা

১. চৌধুরী খালেকুজ্জামান, তিনি ঐসময় মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

২. Anwar Dil and Afia Dil, *Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh*. (page-79)
"People generally blamed Liaquat as the source of such rumors and political power-games to build himself up as the national leader. The Quaid-e-Azam's sister, Miss Fatima Jinnah, later confirmed that after Liaquat became Prime Minister he Changed his erstwhile respectful relations with the Quaid-e-Azam and was more busy in consolidating his position at the helm of affairs in Pakistan. (Hamadani, 1978:153-155)"

৩. "Sir, I again do humbly entreat the Honorable members of this house to pause and consider before they invest their president with such dictatorial powers, because there is no doubt that you are investing him with autocratic powers, beyond the law, which I do not think it will be wise for this house to do, it will betray a tendency upon the part of the majority of the members of the House which is consider the constitution of Pakistan, to establish a dictatorship beyond the law", Huseyn Shaheed Suhrawardy's speech in the Constituent Assembly of Pakistan after being unseated, March 1949.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. Resoulution (commonly known as "Pakistan Resoluation") moved by A.K. Fazlul Huq and adopted the all-India Muslim League at the twenty-seventh Annual Session at Lahore on March 23, 1940.
১৯০৬ ডিসেম্বর ৩০ মুসলিম লীগ গঠন। ঢাকায় মোহামেডান এ্যাডুকেশনাল কনফারেন্সের সমাপনী সভায় নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে এবং হাকিম আজমল খান কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি, নওয়াব মনসুরুলমূলক। দল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন আগা খান, সলিমুল্লাহ ও ভিকারুলমুলক।

৫. "that the areas in which the muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute 'Independent States' in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."

৬. The genius of Bengali race revolts against the autocracy of a single individual. Anwar Dil and Afia Dil, Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh, page-281.

৭. "Fazlul Haque made statements to the effect that he could not tolerate the dictatorship style of Jinnah." Anwar Dil and Afia Dil, Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh, page-281.

৮. "That the Zones comprising Bengal and Assam in the North-East, and the Punjab, the NWFP, Sindh and Baluchistan in the North-West of India, namely the Pakistan Zones, where the Muslims are a dominant majority, are constituted into one sovereign independent state and that an unequivocal undertaking is given to implement the establishment of Pakistan without delay." "Delhi Resolution" moved by Huseyn Shaheed Suhrawardy and adopted by the Legislators' Convention at Anglo-Arabic College, Dellhi, and April 9, 1946.

৯. Jinnah, in Ispahani's words "did not consider the Maulana fit to be president of a political organization like then Muslim League and the sooner the League freed it self of his leadership and of men of his temperament, the better would it be." Jinnah was quite firm in his estimation of Bhashani: "This man may be a good preacher and may draw tears from his audience but he is not a good leader, particularly in times of crisis when the head has to be kept cool and the eyes dry to see clearly and to arrive at decisions. But in spite of his shortcomings, Bhashani played a strong role in the referendum which resulted in parts of Assam Joining Pakistan at the time of independence in 1947. Anwar Dil and Afia Dil, Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh, page-308-309.

১০. "The well-planned policy of squeezing Hindus out of the Province" and "to get rid of the Hindu intelligentsia so that the political economic and social life of Pakistan may not in any way be influenced by them," Anwar Dil and Afia Dil, Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh, page-264.

১১. Anwar Dil and Afia Dil, Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh, page-264.

১২. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ-৩০৩-৩০৪, ১ম খণ্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ-৩০৬, ১ম খণ্ড।

১৪. Let us pause for a moment to consider what Bengal can be if it remains united. It will be a great country, indeed the richest and the most prosperous in India capable of giving to its people a high standard of living, where a great people will be able to rise to the fullest height of their stature, a land that will truly be plentiful. It will be rich in agriculture, rich in industry and commerce and in course of time it will be one of the most powerful and progressive states of the world. If Bengal remains united this will be no dream, no fantasy. Anwar Dil and Afia Dil, Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh, page-594.

১৫. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ-৩০৮, ১ম খণ্ড।

১৬. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ-৩১২, ১ম খণ্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দুই

সাপের দাঁত থেকে মধু আশা করতে পারি না

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো

[দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামো কীভাবে গড়ে উঠেছিল এবং সেই কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার কীভাবে বিপন্ন করা হয়েছে তার নানা ঘটনাবলি। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিল পূর্ববঙ্গের। রাজধানী হওয়ার কথা ছিল কোলকাতা। এ লক্ষ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসু, আবুল হাশিম প্রকাশ্যে অখন্ড স্বাধীন যুক্তবাংলার পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী খান দেখলেন কোলকাতা নিয়ে যদি অখন্ড স্বাধীন যুক্তবাংলা হয় তাহলে তাদের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে, বলতে গেলে তা চলে যাবে বাঙালিদের হাতে। সেজন্য তারা ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোলকাতার বদলে লাহোরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দরকষাকষি করেন। কোলকাতাকে ছাঁটাই করেন, লাহোর পেয়ে যান। ঢাকার বদলে করাচীকে করা হয় রাজধানী। সেই থেকে শোষণ শুরু। শোষণের মূল অজুহাত ছিল কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ। যুদ্ধের মাসুল জোগাতে দু'হাতে লুট করা হতো পূর্ব বাংলাকে। কোরিয়ার যুদ্ধে পাটের দাম অসম্ভব বেড়ে যায়। প্রায় সমুদয় অর্থ রাজধানী গঠনে এবং সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা জন্য ব্যয় করা হয়। পাকিস্তানের বাজেটের শতকরা ১০ ভাগও প্রতিরক্ষা খাতে পূর্ব বাংলায় ব্যয় করা হয়নি। এমনকি গভর্নর জেনারেলের অনন্ত অসীম ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করা হয় এবং তাদের দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। জনগণকে থোড়াই কেয়ার করা হয়। প্রথম থেকেই আঘাত হেনেছে ভাষার ওপর, সংস্কৃতির ওপর, এবং আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। জনগণ হয়ে পড়েছে বিপন্ন।
১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর যে গণপরিষদ গঠিত হয় সেখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের ভাষা নিয়ে, আর্থিক বৈষম্য নিয়ে, প্রশাসনিক অসমতা নিয়ে, সামরিক বাহিনীর অনুপাত নিয়ে এবং সর্বোপরি একনায়কতন্ত্র শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের পক্ষে কতিপয় গণপরিষদ সদস্য সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। তাদের দাবি ছিল স্বায়ত্তশাসনের, এক ইউনিট বিরোধী প্রথা বাতিলের পক্ষে এবং সংখ্যাসাম্যের নীতির বিরুদ্ধে। ১৯৫৭ সালে গণপরিষদে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তনের জনগণ গণতন্ত্র চায়। নির্বাচন চায়। নির্বাচন হবে কিনা জানি না। কারণ সাপের দাঁত থেকে আমরা মধু আশা করতে পারি না।]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালিত হয়। এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়ক মেজর জেনারেল আকবর খান, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এবং অন্যরা তারা লিয়াকত আলী খান সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদ

সদস্যপদ বাতিলের পর তিনি আইনজীবী হিসেবে দু'বছর ধরে তাদের জন্য আইনী লড়াই করেন। সেজন্য সহজেই ধরে নেয়া যায় প্রথম থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশ শাসনে অংশগ্রহণের দৃশ্যমান ইচ্ছা ব্যক্ত হয়। কারণ পাকিস্তানের সেনা কাঠামো পাঞ্জাবের সেনাসদস্য ও কর্মকর্তাদের প্রাধান্য ছিল ব্যাপক।

তাছাড়া 'শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তান'-এর নিরাপত্তার জন্য বার্ষিক বাজেটের প্রায় শতকরা ৭৫% ব্যয় হয়। তরতর করে সেনাবাহিনী গড়ে উঠছিল। পাকিস্তান আর্মি হেডকোয়ার্টার ৪ জুন ১৯৯২ সালে এক রিপোর্টে এর উল্লেখ আছে।[১]

পাকিস্তানের আর্মির রেগুলার কমিশন কোর্সে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৯৬৬-৬৯ পর্যন্ত প্রার্থী ছিল ৪০৭২, আর পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল ৪৭৩ জন। এর মধ্যে চাকরিতে নেয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে ৯৯৬ জন ও পূর্ব পাকিস্তানের ১৫২ জনকে সুপারিশ করা হয়, এর মধ্যে সফলকাম হয় পূর্ব পাকিস্তানে ১২২ জন পশ্চিম পাকিস্তানে ৮২৭ জন। বলা হয়ে থাকে, বাঙালিরা সেনাবাহিনীতে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মূল কারণ হিসেবে বলা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলসমূহ ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। ভাষা ভিন্ন। আচার-আচরণ ভিন্ন। আবহাওয়া বিপরীতমুখী। লে. জেনারেল মোঃ আতিকুর রহমান যিনি স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ছিলেন, তিনি বলেন, ১৯৫২ ও ৫৪ সালে ১০০ জনের মধ্যে বাংলাদেশের ক্যাডার ছিল মাত্র ছয় জন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে তেমন সামরিক শক্তি ছিল না। তখন নিউ ইয়র্ক টাইমসে রিপোর্ট হয়েছিল যে, চীনের কারণে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি। কাশ্মীরের যুদ্ধকে সামনে রেখে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যাপক টাকা বরাদ্দ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা খাতে এবং সামরিক সরঞ্জামের উৎপাদনের কারখানায় যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিকভাবেই তার ১০ শতাংশ টাকা বরাদ্দ করা হয়নি।

পাকিস্তান জন্মের মাত্র সতের দিনের মাথায় পহেলা সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদের আলোচনা, অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত বহির্ভূতভাবে 'পুঁজি ও প্রযুক্তি' এবং পাকিস্তান সরকারের প্রশাসনিক বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ব্যয়ভার বহনের জন্য মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদের একান্ত উদ্যোগ ও সক্রিয়তাকে অনুমোদন দিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতিবিদ, মন্ত্রিপরিষদ ও শাসনতান্ত্রিক আওতার বাইরে আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতির বাইরে এবং মন্ত্রিপরিষদকে এড়িয়ে গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সরাসরি আমলাচক্রের শীর্ষস্থানীয়দের গোপন সম্পর্কে আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। জাঁদরেল আমলা গোলাম মোহাম্মদ প্রণীত আমেরিকার ওপর নির্বিচার নির্ভরতার 'কনসেপ্টটি' গভর্নর জেনারেল অত্যন্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে লুফে নেন। ব্যাপক সাহায্য ও নির্ভরতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে বিশেষ দূত হিসেবে মীর লায়েক আলীকে ওয়াশিংটনে পাঠাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেননি। মীর লায়েক আলী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক প্রণীত ও গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক অনুমোদিত ডকুমেন্ট পেশ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থ হন। ইতোমধ্যেই রাজধানী করাচী হতে মার্কিন চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স মি. লুইস পাকিস্তানের ব্যাপক সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি সেক্রেটারি অব স্টেট জর্জ মার্শালকে জ্ঞাত করিয়ে রেখেছিলেন। মীর লায়েক আলীর তৎপরতা অব্যাহত থাকা অবস্থাতেই ১৯৪৭ সালের ৮ অক্টোবর পাকিস্তানের অ্যামব্যাসাডার মি. ইস্পাহানীর পরিচয়পত্র গ্রহণকালে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলেন যে, পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে সাহায্য দেয়া হবে এবং এতে দুটি দেশই উপকৃত হবে।[২] নতুন রাষ্ট্রটির জন্মলাভের পরপরই এমনিভাবে জাতীয় ক্ষেত্রে তাকে লালন-পালনের দায়িত্ব আমলাচক্রের উপর অর্পিত হলো যাদের রাষ্ট্রটির জন্ম-সংগ্রামে কোন অবদান ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ তোষণ, নতজানু ও পরনির্ভরতার দাসখত তার ললাট লিখন হয়ে দাঁড়াল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তির সমন্বয় সাধক নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়করূপে আমলাতন্ত্র অত্যন্ত নগ্নভাবেই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির পরিচালনায় মুখ্য নিয়ামক শক্তি হয়ে ওঠে। একনায়ক উন্নাসিক এবং গণবিচ্ছিন্ন গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অসীম ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের চকচকে ফোলিওর মধ্য থেকে বিকিরণ হতে থাকে। এর পাশাপাশি একথাও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কন্টকপীড়িত রোগগ্রস্ত জীবদ্দশাতেই আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজনীতিতে সমান্তরাল শক্তির ভূমিকা পালনে আবির্ভূত হয়েছে।

AMARBOI.COM

অসীম ক্ষমতা

কথা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর অন্তর্গত এলাকাসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের এই মূল ঘোষণা বাস্তবায়ন তো দূরের কথা–১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' ধর্মীয় আবেগের নিদারুণ বৈরী জোয়ারে ভেসে গেল। পাকিস্তান জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জীবদ্দশাতেই পূর্ব পাকিস্তান শক্তিশালী আমলা শাসক গোষ্ঠীর এক উপনিবেশে পরিণত হলো আর এতে সাহায্য করল এদেশেরই বুর্জোয়া ও ভূস্বামী শ্রেণীর অশক্ত দুর্বল প্রতিনিধি পূর্ববঙ্গের দালাল শ্রেণী। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র, প্রশাসন, পুলিশ, সামরিক বাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক-শোষক চক্রের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান হওয়ার পর দেশটির 'জনক' ও শাসকদল মুসলিম লীগের প্রধান কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহর ভূমিকায় রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার বাইরে অবস্থিত বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে তাঁর একনায়কত্বসুলভ ব্যক্তিত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতায় প্রতীয়মান হয়েছে তাঁর আদেশ নির্দেশেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল এর বিপরীত। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে মি, জিন্নাহ খুবই অসুস্থ ছিলেন। এই অসুস্থ অবস্থায় চারদিকে প্রকটিত সংকট ও অসংখ্য সমস্যার সমাধান তাঁর পক্ষে ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। মাঝে মাঝে তাঁর কিছু কিছু কার্যক্রমে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি হয়ত দৃঢ়হস্তে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু নেপথ্য বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন একান্ত উপায়হীন অসহায়। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে প্রথম থেকেই যে সব আমলা অফিসারদের উপর নির্ভর করতে হয়েছে তারা প্রায় স্বাধীনভাবেই কাজ করা অধিকার অর্জন করেছিলেন।

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট (১৯৪৭) অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল জিন্নাহর হাতে আইনগত ও সাংবিধানিক সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল যা ছিল 'অনন্ত অসীম' তা প্রকারান্তরে আমলাদের হাতকেই শক্তিশালী করেছে। বলা যায়, একমাত্র লিয়াকত আলী খানসহ জিন্নাহ তাঁর চারপাশে যে সমস্ত লোক জোগাড় করেছিলেন তারা ছিলেন মূলত মেরুদণ্ডহীন।[৩] সেজন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অনিচ্ছাকৃতভাকে খাটো করে রাষ্ট্রপ্রশাসনে আমলাদের কর্তৃত্ব শক্তিশালী করা ব্যতীত জিন্নাহর করণীয় বিকল্প ছিল না। তিনি সমস্ত আমলার উপরে সেক্রেটারি জেনারেল পদ সৃষ্টি করেন। এই পদ সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল মন্ত্রিসভাকে উপেক্ষা করে আমলাতন্ত্রের পর্যায়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন করা। ব্রিটিশ ফ্রেমওয়ার্কে প্রশিক্ষিত ঝানু ব্যুরোক্র্যাট চৌধুরী মোহাম্মদ আলী অত্যন্ত কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসনের এই সর্বোচ্চ পদে বসে আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী ও সংহত করতে নিরলস প্রয়াস চালিয়েছেন। এমন দেখা গেছে যে, মন্ত্রী ও সচিবের মধ্যে মতদ্বৈততার ক্ষেত্রে সেক্রেটারি জেনারেল সরাসরি গভর্নর জেনারেলের কাছে হতে আদেশ গ্রহণ করে এনেছেন–রাজনীতিবিদদের পাশ কাটানো এবং অশ্রদ্ধা জানিয়ে চলার একটা রীতি যেন রীতিমতো চালু হয়ে যাচ্ছে।

জিন্নাহর জীবিত অবস্থাতেই পাকিস্তান গণপরিষদের কতিপয় সদস্য রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকরী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির প্রয়োগ ও আমলাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রবাহকে খর্ব করার দাবি উত্থাপন করলে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধমকের সুরে গণপরিষদকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, "বর্তমানে সংবিধানে সকল ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের হাতে ন্যস্ত। তিনি যা চাইবেন তাই করতে পারেন"।[৪] এই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার স্বৈরতান্ত্রিক নমুনা।

আমলাতন্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়

জিন্নাহর মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দিন গভর্নর জেনারেল হলেন। সংবিধান উদ্ভূত এই পদটি রাষ্ট্র পরিচালনায় সকল শক্তি কাঠামোর উৎস হলেও নাজিমুদ্দিন ছিলেন দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি। জনগণের চোখে তখন জিন্নাহর উত্তরাধিকারী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, আমলাতন্ত্রের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তিনিও গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রবর্তন ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। অত্যন্ত দুর্বল দৃষ্টিশক্তির কারণে ফাইল পত্রের খুঁটিনাটি দিক পরীক্ষা ও 'নোট' নির্দেশ প্রদান তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমলাদের হাতে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন এবং ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম লীগকে পুনর্গঠিত করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাননি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল জাঁদরেল এই প্রধানমন্ত্রী পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার মতলবে তখন ব্যস্ত, ভাষা বিরোধকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের দাবি দাওয়া উত্থাপনকারীদের 'ইসলাম' 'পাকিস্তান জাতির শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত[৫] করার 'মহান' উদ্যোগে অত্যন্ত উৎসাহী ভূমিকায় অবতীর্ণ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৮ নভেম্বর তেজগাঁও বিমান বন্দরে অবতরণ করলে 'আমলাতন্ত্রী স্বৈরাচারের' হাতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকগণ অপমানিত ও উপেক্ষিত হন।[৬] এই সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদটির সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে সংযুক্ত আমলাতন্ত্রের এই চক্র কাঠামোর প্রতিরক্ষা সচিব এবং অর্থমন্ত্রী, যিনি সিনিয়র ব্যুরোক্র্যাট, যথাযথ অর্থেই শক্তিধর ব্যক্তি হিসেবে অচিরেই পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রে আবির্ভূত হন। প্রতিরক্ষা সচিব জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা যার পেছনে ছিল সামরিক বাহিনী আর অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদের পেছনে ছিল আমলা ও পাঞ্জাবি চক্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ রাজনৈতিক মহলের সমর্থন। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবর্তমানে এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কোন্দল ও গণবিচ্ছিন্নতার কারণে এবং তদানীন্তন গণপরিষদের অধিষ্ঠিত সদস্যদের অধিকাংশ সামন্ত শ্রেণী চরিত্রের অধিকারী হওয়ার ফলে তাদেরই সম্মিলিত মানসিক ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া হয়। কেননা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এই আমলাতন্ত্রের হাত থেকে ক্ষমতা সামরিকতন্ত্রের কর্তৃত্বে আনয়নের এক চক্রান্তে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হন।[৭] এর কিছুদিনের মধ্যে নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেলের এই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন পদটি দখল করতে সক্ষম হলেন।[৮] গভর্নর জেনারেল হিসেব ব্রিটিশ ভারতের অডিট ও একাউন্টস সার্ভিসের একজন সিনিয়র অফিসার গোলাম মোহম্মদের নিয়োগে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে আমলাতান্ত্রিক শাসনের দ্বিতীয় পর্যায় দৃঢ়তার সঙ্গে শুরু হয়। পাকিস্তানে বহিরাগত 'এলিট নেতৃত্ব'-এর আকস্মিক অন্তর্ধান পাকিস্তান আমলাচক্র বিশেষ করে পাঞ্জাবি চক্রের কুক্ষিগত ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলের পথকে অবারিত করে। পাকিস্তানের পরবর্তী রাজনৈতিক অঙ্গন এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্রমূলক পথ ধরেই আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিন পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল।

গণতন্ত্রের দাবি যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত

১৯৫১ সালে ইরানে তেল জাতীয়করণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি নতুন সম্পর্ক গড়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৯] মার্কিন সামরিক প্রভাব বলয়ে পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্লু প্রিন্টকে সামনে রেখে মার্কিনী মিত্র গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ও সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে চক্রান্ত করে গণপরিষদে মেজরিটি সদস্যের আস্থাভাজন, নতজানু ও দুর্বলচিত্ত প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে হটিয়ে দেয়া হলো। চরম অসাংবিধানিকভাবে গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে দেন। নাজিমুদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রমণের বড় তৃণটি ছিল আসন্ন খাদ্য সংকট। ১৯৫৩ সালে ফসল ভালো হয়নি–মার্কিন সি, আই, এর-র বিশেষজ্ঞ দ্বারা একটানা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবার ফলে খাদ্য সংকটের আশংকায় ব্যাপকভাবে মজুতদারি বেড়ে যায়। খাদ্যসহ জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন অত্যন্ত মরিয়া হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করে। যুক্তরাষ্ট্র এক সপ্তাহের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেও খাজা নাজিমুদ্দিনের অপসারণ এবং মার্কিনী বশংবদ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল না করা পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার খাদ্য পাঠাতে বিলম্ব করেছিলেন। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেবা করার ঝুঁকিপূর্ণ[১০] প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার মতো মানসিক শক্তি দুর্বলচিত্ত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ছিল না।

খাজা নাজিমুদ্দিনের বিদায় গ্রহণের পরপরই ১৯৫৩ সালের মে মাসে জন ফস্টার ডালেস পাকিস্তান সফরে আসন এবং এর পরপরই প্রতিরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান ন্যাটোর ঘাঁটি তুরস্ক এবং তুরস্ক থেকে সামরিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক সমঝোতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠল যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, গণতান্ত্রিক বিধি বিধান ও প্রথাসমূহকে আমলাচক্র থোড়াই পরোয়া করে। অত্যন্ত অন্যায় অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিসভার কে কে সদস্য হবেন, তাদের কী কী দায়িত্ব দেয়া হবে তাও গভর্নর জেনারেল ঠিক করে দেন। এভাবে পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র অপ্রতিরোধ্য এক রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করে। গণতন্ত্রহীনতা, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, উঠতি ধনিক, বণিক, ভূস্বামী ও সামরিকতন্ত্রের নগ্ন চক্রান্ত ও খেলায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠায় দাবি-দাওয়া রাষ্ট্রীয় চক্রান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে থাকল। গণপরিষদে পূর্ববাংলার প্রতিনিধি শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন, গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য হ্রাস, এক ইউনিট প্যারেটি বিষয়ে তীব্রভাবে শাসক চক্রকে আক্রমণ করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এ অঞ্চলের মানুষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। কারণ গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের নীতিমালা বাঙালি মুসলমানদের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্ষা কবজ হিসেবে কার্যকর থাকবে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় প্রবহমানতায় বাঙালির মনন ও চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন ছিল বলেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপরিচালনায় শাসকগোষ্ঠীর চতুর ও চক্রান্তমূলক পদক্ষেপগুলো বাঙালির মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে ধরা পড়েনি। ধর্মীয় উন্মাদনা ও চেতনা বাঙালির আত্মপরিচয় ও সত্তাকে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে ঠেলে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালিরাই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বাঙালি তার বাঙালিত্ব বিস্মৃত হয়ে মনেপ্রাণে কেবলমাত্র একজন 'পাকিস্তানি' হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই মনোভাব থেকে সে তার নিজস্ব বাঙালি স্বার্থও একে একে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। কারণ বাঙালি ভেবেছিল সবাই যখন পাকিস্তানি, মুসলিম এবং ভাই ভাই তখন সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানি ও পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। সেজন্য ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষার দাবিতে ঢাকায় ছাত্রদের প্রথম শোভাযাত্রা স্থানীয় অধিবাসীদের 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ও 'ইসলাম রক্ষার' ধ্বনি তুলে সশস্ত্র আক্রমণ লক্ষণীয়।[১১] ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর উস্কানিতে দাঙ্গা সংঘটিত করতেও তাদের উৎসাহের অভাব ছিল না।[১২]

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জি ও সি) স্মরণ করেন, "স্বাধীনতার অল্পকাল পরেই সেখানে কেবল দুই ব্যাটিলিয়ন পদাতিক বাহিনী ছিল। এদের একটিতে ছিল তিনটি কোম্পানি, যাদের সৈনিক হওয়ার মতো যোগ্যতার যথেষ্ট অভাব ছিল। সদর দফতরে কোনো টেবিল, চেয়ার, সাজসরঞ্জামাদি, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র কোন কিছুই ছিল না। কর্মকর্তারা চালাঘরে বাস করত, মুষলধারে বৃষ্টি হলে তাতে ক্রমাগত পানি পড়ত, কখনও ত্রিপলঢাকা ছাদ উড়ে যেত। ১৯৪৭-এর আগস্টে ঢাকায় চাকরিরত একজন সামরিক কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী: "১৯৪৭ সালের আগষ্টে মনে হচ্ছিল, প্রদেশটি অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার কবলে পড়েছে।" তিনি আরও মন্তব্য করেন: "সে অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ সাফল্যের জন্য যা পাওয়া গিয়েছিল, তাও ছিল তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল, এক কথায় একেবারেই অপর্যাপ্ত।"

পুলিশ বাহিনী তাদের নিজেদের মূল্যায়নে অত্যন্ত হীন অবস্থায় ছিল। আইনের প্রয়োগ এবং শৃঙ্খলা রক্ষা উভয় দায়িত্বই ব্রিটিশ আমলের মতো তখনও পুলিশ বাহিনী পালন করত। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ প্রশাসনের প্রতিবেদনে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল স্বাধীনতার প্রথম বছর সম্পর্কে বলেন, "এটি নজিরবিহীন প্রবল চাপ ও সংকটের বছর।" মজার ব্যাপার এই যে, প্রারম্ভিক অনিশ্চয়তার এ সময়ে সরকারি প্রতিবেদনসমূহ সদয়ভাবে নতুন দেশকে অভিহিত করেছে 'শিশুরাষ্ট্র' বলে অথচ শিশুরাষ্ট্রের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র চক্র ছিল কৌশলী এবং দক্ষ।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য অবধারিতভাবে এক অনিশ্চয়তার জন্ম দিল। তার মধ্যেও এ পরিস্থিতিতে কখনও কখনও জনগণের আবেগ ও উদ্যম ছিল অত্যন্ত প্রবল। কর্মকর্তাদের বিবেচনায় রাষ্ট্র ছিল জনগণের উপর চেপে বসা ভারি যন্ত্র। পক্ষান্তরে সরকার সম্পর্কে জনগণের ধ্যানধারণা ও প্রত্যাশা প্রায়শ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ধাঁধায় ফেলে দিত। একদিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং কাম্য ছিল জনগণের আনুগত্য, নতুন রাষ্ট্রের কাছে যাদের প্রত্যাশা মাঝে মাঝে ছিল একেবারে অবাস্তব। অন্যদিকে রাষ্টের প্রশাসনযন্ত্রকে সুসংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল; কেননা রাষ্ট্রে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলো ছিল অগণতান্ত্রিক, দমনপীড়ক এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকৃষ্টতম শক্তির ধারক।[১৩] রাষ্ট্রের ও সরকারের এই নিপীড়কমূলক ভূমিকা থেকে পবিত্রতার ভূমিকায় যারা অবতীর্ণ হতে পারতেন তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও দল থেকে তাড়িত। পাকিস্তানের আমলাচক্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা ফজলুল হকের প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানে রাষ্ট্র প্রশাসনে তারা ছিল অবাঞ্ছিত ও অবহেলিত।

অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের সংসদীয় দল থেকে নেতৃত্বচ্যুত হয়ে উদ্যোগী হলেন অবনতিশীল বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্ককে উন্নত করার কার্যক্রমে। যখন দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা শহরকে স্বাধীনতা-পরবর্তী বিজয়োৎসবের আনন্দ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তখন তিনি এক দরিদ্র মুসলমানের জীর্ণগৃহে অনশনরত গান্ধীজীর অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করেছিলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক, যিনি যুগ যুগ ধরে বাঙালি মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন, তিনি জিন্নাহর কূটকৌশলের ম্যারপ্যাঁচে বাংলার মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্রস্তাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে কলকাতায় নিজের বাসভবনে নিরাসক্ত মর্মবেদনা নিয়ে কালাতিপাত করছিলেন। মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম, যিনি মৃতপ্রায় সংগঠনটিকে একটি কর্মপরিকল্পনা ও প্রাদেশিক কর্মসূচির ঘোষণাপত্র দিয়ে এর উদ্যমী তরুণ ছাত্র-সদস্যদের উজ্জীবিত করেছিলেন, তিনিও দেশবিভাগের সময়কার গোলযোগ ও প্রান্তিক সময়ে যে তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হন তা জনগণের নিকট পৌঁছে দেবার মত সময় ছিলনা। তিনি তখন সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাঁর সমস্ত কর্মোদ্যোগ নিয়োগ করেন। অবশ্য এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে তিনি অবশেষে বর্ধমানে তাঁর গ্রামের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। আসামের মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানী, যিনি পূর্ববঙ্গ থেকে আসামে এসে বসবাসকারী মুসলমান কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসেবে আসামের জেলা সিলেটকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, তিনিও দেখতে পেলেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে নতুন মুসলিম লীগের দলীয় বিন্যাসে তাঁর কোনো স্থান নেই এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আসাম সরকারের কারাগারে বন্দি হলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ও আবুল মনসুর আহমদ বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর কিছুদিন কলকাতায় থেকে যান। আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক প্রমুখ ঢাকাভিত্তিক বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা তখন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের নতুন কেন্দ্র ঢাকার নবাববাড়ী 'আহসান মঞ্জিল' থেকে তাঁদের দূরত্ব পরিমাপ করে চলেছেন। কিন্তু একথা বলা যায়, তাদের প্রত্যেকেই স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিরোধীদলীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

খাজা নাজিমউদ্দীন এবং মওলানা আকরাম খাঁ যথাক্রমে প্রাদেশিক সরকার ও মুসলিম লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন স্বাধীন পূর্ববঙ্গের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন। মূলত পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ তিনটি হাত কেন্দ্রের কাছে বাঁধা পড়ে। এগুলো হচ্ছে নেতৃত্বের জন্য আহসান মঞ্জিল, প্রচারের জন্য দৈনিক আজাদ, অর্থের জন্য ইস্পাহানির বাণিজ্যিক সংস্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংক্ষেপে এই ছিল তদানীন্তন মুসলিম লীগের ভিত্তি। ভারতের মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে মুসলিম লীগকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্রিটিশ রাজ মুসলিম লীগের কাছেই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে।[১৪] যেখানে বাঙালিদের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। যারা ছিল তারা দালাল ও উর্দু প্রেমিক।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগুরু। ভোটারসংখ্যার দিক থেকেও তাদের ছিল সংখ্যাধিক্য। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুপস্থিতি ছিল সবচেয়ে ক্ষতিকর। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণভার বাঙালিদের কেউ কোন পর্যায়ে পায়নি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে তিনজন বাঙালি প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন সাক্ষীগোপাল এবং একজন ছিলেন একটি কোয়ালিশনের সংখ্যালঘু অংশীদাররূপে ক্ষমতাসীন। কিন্তু সংসদীয় আইনের কোনো তোয়াক্কা না করে মাত্র ১৩ মাসের মধ্যে শেষোক্ত জনকে অপসারিত করা হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান দুজন সৈনিক প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসীন হন। তাঁরা কেন্দ্রে অবিসংবাদী ও সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ এবং প্রয়োগ করেন। বিশেষ করে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ ও চক্রান্ত করেন।

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতার দরুন এবং জাতীয় আইনসভাসমূহের গুরুত্ব না থাকার কারণে পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র, সশস্ত্রবাহিনী এবং শেষদিকে ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী সমন্বয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়। ঐ ব্যবসায়ীরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ফেডারেল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকার কেবল অভ্যন্তরীণ রাজস্বের মূল উৎসগুলো এবং বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানি আয় বরাদ্দের ক্ষমতাই হাতে রাখেনি, অর্থনীতি সংক্রান্ত সকল প্রধান নীতিনির্ধারক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক সরকারগুলো ছিল কেন্দ্রের সৃষ্ট পুতুল। স্বায়ত্তশাসন ছিল ভূলুণ্ঠিত।

কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে আমলাতন্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনীগুলোর কর্তৃত্বাধীন ছিল এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষত তাদের উচ্চতর স্তরে প্রাধান্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের। কেন্দ্রের ক্ষমতাকাঠামোর গঠন কী রকম ছিল তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে। ক্ষমতার উচ্চতর স্তরগুলো বাঙালিদের কোটার পরিমাণ বাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তান ছিল মূলত অতিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার। জেনারেল আইয়ুব খান ও পরে ইয়াহিয়া খানের মতো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট থাকার মানে হচ্ছে বাঙালিদেরকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে রাখা। পাকিস্তানের ইতিহাসে কোন বাঙালি অর্থমন্ত্রী হননি কিংবা বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা নিয়ন্ত্রণকারীর পদে কোনো বাঙালি কখনও নিযুক্ত হননি।

১৯৭১ সালে পরিকল্পনা কমিশন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সে অবধি কোন বাঙালি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়াম্যান হননি। শুধু ১৯৬৯ সালে একজন বাঙালি প্রথমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কোন বাঙালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর হননি। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে কোন বাঙালি যুগ্ম-সচিবের পদ পর্যন্ত উঠতে পারেননি। আর সশস্ত্রবাহিনীগুলো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদেরই একচেটিয়া।

এ কথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বাঙালিদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের উচ্চতর এবং এমনকি মাঝারি পদ থেকে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রগুলো থেকে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে রাখা হয়েছিল।[১৫] জনগনের বা জনমতের কোন তোয়াক্কা করার কোনো মানসিক বা ইচ্ছা পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ছিল না।

১৯৫০-এর দশকে কেন্দ্রের প্রাথমিক অপকর্মগুলো পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকার নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করে। এই সচেতন নিষ্ক্রিয়তা আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেছিল। প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা ও মর্যাদা না থাকায় কেন্দ্রের মোকাবেলা করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

১৯৫৪-৫৮ সালে যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ শাসনেরকালে কেন্দ্রের কাছ থেকে সম্পদ ও স্বায়ত্তশাসন দাবি প্রদেশের ক্ষমতা রক্ষার জন্য গণপরিষদে বিভিন্ন বিষয়ে তুমুল বিতণ্ডা করতে হয়। এর বিশ্লেষণে তিক্ত-বিরক্ত শেখ মুজিব পার্লামেন্টে বিতর্কে আবেদন জানিয়ে বলেন "জুলুম মাৎ করো ভাই" যদি তোমরা জোর খাটাও তাহলে আমরা অসংবিধানিক পন্থা বেছে নেব। তোমাদের অবশ্যই সাংবিধানিক পথে এগোতে হবে। যদি জনগণকে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে না দেও, তাহলে তারা বাধ্য হয়ে অসংবিধানিক পথ বেছে নেবে। আমি দেখেছি দুনিয়ার ইতিহাসে এরূপই হয়েছে এবং এরকম ঘটনাই ঘটেছে। সুতরাং আমি আর একবার আবেদন করি, যদি তোমরা পাকিস্তানকে ভালোবাস, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই তোমরা ক্ষমতায় আছ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সবকিছুর শীর্ষে আছো তারপরেও এ কথা পরিষ্কার যে সকল জনগণ সংগ্রাম করে এদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা তোমাদের সাথে নাই।"

১৯৫৫ সালে ২১ সেপ্টেম্বর। করাচী। বুধবার বেলা ১০টা। শেখ মুজিব বলেন, আমরা একুশ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছি। প্রকৃত সত্য হলো এই আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, একুশ দফায় শুধু দেশরক্ষা, বিদেশনীতি ও মুদ্রা ব্যতীত কেন্দ্রের হাতে আর কিছু থাকবে না, সবকিছু চলে যাবে প্রদেশের হাতে। এক ইউনিট বিল পাশ করার সময় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি বিবেচনা করা হবে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু তার কোন কিছুই হয়নি। তিনি ঐ অধিবেশনে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের মতো আত্মত্যাগ করেনি।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের যে চক্র বর্তমানে শাসন করছে তাদের আমরা চিনি। তারা ধারালো ছুরি হাতে পূর্ব বাংলাকে মাছের মতো কাটছে। তিনি বলেন, দিল্লী কনভেনশনে বলা হয়েছিল, কোন ইস্যু বিচারের ক্ষেত্রে যখন ন্যায়বিচার ব্যর্থ হবে, সমতা থাকবে না এবং সমঅধিকার থাকবে না তখন শুধু ভালো কথায় কাজ হবে না। জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না এবং আগুন নিয়ে খেলবেন না। আপনারা যদি করাচী থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যেতে চান যেখানে পূর্ব পাকিস্তান বেশি টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে, শতকরা ৬০ ভাগ টাকা ব্যয় করেছে, সেখানে আমিও সরাসরি বলতে চাই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। কেন্দ্রের হাতে মাত্র তিনটি বিষয় রাখতে হবে। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমতা আনতে হবে। যুক্ত নির্বাচন দিতে হবে। এ সম্পর্কে বিল নিয়ে আনুন। ঐ দিনই তিনি বলেন যদি এক ইউনিট পাস করতে চান তাহলে আমাদের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাস করতে হবে। ঐ তিনটি বিষয় ছাড়া কেন্দ্রের হাতে আর বেশি কিছু দেয়া যাবে না।"

বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের বাংলায় কথা বলতে দিতে হবে। আমরা ইংরেজি জানলেও বাংলায় কথা বলতে চাই, যদি তা অনুমতি না দেয়া হয় তাহলে আমরা অধিবেশন বয়কট করব। এটাই হলো আমাদের স্ট্যান্ড।

২২ সেপ্টেম্বর। করাচী। ১৯৫৫। ২.৩০ মিনিট। শেখ মুজিব বলেন, গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের হাতে যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে তাতে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। যিনি জনগণের প্রতিনিধি নন তিনি হতে পারেন রাষ্ট্রপ্রতি। তার হাতে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা সঠিক হবে না।

৩০ সেপ্টেম্বর। করাচী। গণপরিষদে শেখ মুজিব বলেন, পাকিস্তানের একজন নাগরিক হিসেবে আমি এ অভিমত প্রকাশ করছি যে, এক ইউনিট প্রবর্তিত হলে পাকিস্তান ভাঙনের দিকে চলে যাবে। ঐদিনই তিনি বলেন সর্বক্ষেত্রে আমরা সমতা চাই। সংখ্যাসাম্য চাই, দেশ রক্ষার প্রতিটি বিভাগে এবং প্রতিটি বিষয়ে। এ সময় হামিদুল হক চৌধুরী যিনি যুক্তফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা একুশ দফা ভুলে গিয়ে শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য এক ইউনিটের সমর্থন করছেন। এখন পর্যন্ত বাংলায় রিপোর্টিংয়ের ব্যবস্থা হয়নি। দেশের গরিব মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু তাদের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

১ অক্টোবর। ১৯৫৫। পাকিস্তানে চক্রান্ত করে ষড়যন্ত্র করে এবং দুর্নীতি-পন্থায় গভর্নর জেনারেল করা হচ্ছে। যাদের গণতন্ত্রের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা নেই। বর্তমান শাসকেরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়। সেজন্য জনগণের পক্ষে তারা কাজ করছে না। "তিনি বলেন অবশ্য আমি সাপের দাঁত থেকে মধু আশা করতে পারি না।" গভর্নর জেনারেলকে যেভাবে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাতে পাকিস্তান কোথায় যাবে আমি জানি না এবং কী করবে তাও জানি না। তার একচ্ছত্র ক্ষমতা এক নোটিসে গণপরিষদের ক্ষমতা খর্ব করতে পারে। গণপরিষদ ভেঙে দিতে পারে। এভাবে চললে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কী হবে, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী হবে? আমরা জেল-জুলুম মোকাবেলা করেই এখানে এসেছি। কিছুদিনের জন্য জনগণকে বোকা বানাতে পারে কিন্তু সর্বসময়ের জন্য সবলোককে ব্লাফ দেয়া যায় না। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে দু'মাসের মধ্যে ৯২-কে (ক) ধারা জারি করে কেন্দ্রের কুচক্রী মহল জনগণের কল্যাণে নয়, তাদের ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য ৯২ (ক) ধারা জারি করেছিল। আমলাতন্ত্র ও নেপথ্যে সামরিক চক্রের কারসাজি এগুলো।

৯ নভেম্বর। ১৯৫৫। করাচী। শেখ মুজিব বলেন, আমার কতিপয় বন্ধু বলে থাকেন, কেন্দ্রের হাতে দেশ রক্ষা, বিদেশনীতি ও মুদ্রা থাকলে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে। তারা শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে। দীর্ঘ আট বছর ধরে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করছে। আমি দেখাতে পারি কীভাবে তাদের শোষণ করা হচ্ছে। এখন যারা দেশ শাসন করছে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দুই আনা সদস্য ছিলেন না। তারা 'ইসলামের' নামে পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। যদি একুশ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় তাহলে আমরা তার সমর্থন করব, না হলে পূর্ব বাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব।

"১৯৪০-১৯৫০-এর দশকে কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর অধীন প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের উঁচু পদগুলোতে বসেছিলেন অবাঙালিরা। ভাষা, সংস্কৃতি ও চাকরিসূত্রে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকায় এসব অবাঙালি অফিসার কেন্দ্রের বাঙালি মন্ত্রীদেরকে খুব কমই সমর্থন দিতেন। আওয়ামী লীগ সরকার আমলাতন্ত্রের বাইরে গিয়ে কেন্দ্রের সমর্থনে প্রবীণ বাঙালি অর্থনীতিবিদদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা বোর্ড গঠনের প্রয়াস নেয়। কিন্তু তাঁদের এসব প্রচেষ্টা প্রাদেশিক প্রশাসনকে অবাঙালি আমলাদের কবলমুক্ত করতে অথবা কেন্দ্রের সাথে তাদের অমলাতান্ত্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সফল হয়নি। ফলে, পরিকল্পনা বোর্ড প্রাদেশিক প্রশাসনের মধ্যে একটি নতুন কর্তৃত্বের উৎসরূপে কাজ করতে না পেরে কেন্দ্রের সাথে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে বাঙালিদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বৈঠক আলোচনার একটি সংস্থায় পরিণত হয়।

১৯৬০-এর দিকে বাঙালিরা প্রাদেশিক সচিবের পদ লাভ করতে শুরু করার পর কেন্দ্রের সাথে সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিতর্কে বাঙালিদের দাবি উত্থাপনের অধিকতর সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সামরিক আইন প্রবর্তন এবং জাতীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে এক পশ্চিম পাকিস্তানি প্রধান নির্বাহীর কুক্ষিগত হওয়ার পর কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় স্তরে বাঙালি মন্ত্রী ও প্রাদেশিক গভর্নরদের চাকরি প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা বা খেয়ালখুশির অধীন হয়ে পড়ে। তাঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক মর্যাদা কিংবা রাজনৈতিক সমর্থন না থাকায় অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার উপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর প্রাধান্যের বলয়ে বাঙালি আমলাদেরকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে কাজ চালাতে হয়, যেখানে বাঙালি মন্ত্রীরা কেন্দ্রের সাথে যেকোন পরিস্থিতির মোকাবেলায় তাঁদেরকে রক্ষা করতে পারতেন না। প্রাদেশিক প্রশাসনের ক্ষমতাহীন ও সম্পদহীন অবস্থার দরুন শক্ত ভূমিকার সুযোগ এমনিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রদেশে ও কেন্দ্রে কর্মরত বাঙালি আমলারা এভাবে প্রায় ক্ষেত্রেই গোপন তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করতে পেরেছেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে সমর্থনকারী অর্থনীতিবিদদের পরামর্শদাতায় পরিণত করা হয়েছে, যে পরামর্শ শেষ পর্যন্ত প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছে।[১৬]

জনগণকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনার কর্মসূচি ও কৌশল গ্রহণ না করলে পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী পেশা মানিয়ে কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা দিয়ে আন্দোলন দমিত করা সম্ভব হতো। ১৯৬০-এর দশকে এবং বেশি করে ১৯৬৯-এর মার্চের পরে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, একটি বাঙালি বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে তোলা, পাবলিক ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামের ধনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষকদের দিকে সম্পদ প্রবাহিত করা ও কেন্দ্রীয় সরকারের পদগুলোতে বাঙালি সিভিল সার্ভেন্টদেরকে উন্নীত করার একটি প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এ কৌশল পূর্ণ অংশীদারিত্ব পেত না, কিংবা ছয় দফার স্বায়ত্তশাসন দাবি মেনে নেয়া পর্যন্ত এগুতো না, তবে এটা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর জন্য সুযোগের ছিটেফোঁটা সুযোগ খুলে দিতে পারত। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রণী বাহিনী মধ্যবিত্তকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে স্বশাসনের সংগ্রামকে বানচাল করার সম্ভাবনাটি শেখ মুজিবুর রহমানের নজরে পড়েছিল। তিনি যে আন্দোলনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ও জনগণকে ভাষা আন্দোলনের আপোসহীন লড়াই সংগ্রামের মধ্যে বাঙালির আত্মজাগরণের যে বিষয় সূচিত হলো, তার মাধ্যমে বাঙালি জাতি আবিষ্কার করল স্বদেশ চেতনার নব ধারা আত্মবিস্মৃত জাতি নতুন জাগরণে সাহসী হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি শাসন চক্র অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রাসাদ চক্রান্তের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে ভাঙনের প্রচেষ্টা নেয়। যুক্তফ্রন্টের নেতা ও জনগণের মধ্যে যে বৃহৎ পরিসরে যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে উঠেছিল পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী সে ঐক্য ভাঙন ধরাতে সক্ষম হয়। তাদের সামনে ক্ষমতার প্রলোভিত দরজা খুলে দেয়া হয়। বাঙালি নেতৃত্ববৃন্দ বিভক্ত করে পাকিস্তানি শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। এই অপচেষ্টার এক পর্যায়ে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় শেখ মুজিবকে ফাঁসি দিতে চেয়েছে। কিন্তু ততদিনে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ উপলব্ধি করেছে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বাঙালির পৃথক জাতিসত্তার প্রয়োজন। আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে মিছিল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এই নব উত্থিত শক্তিকে তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। শেখ মুজিবসহ কতিপয় নেতা পাকিস্তানি শাসকদের এসব চাতুর্য ও কৌশল থেকে বাঙালি জাতিকে অগ্রসর করে নেয়ার প্রশ্নে আপোসহীনভাবে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ধারায়, নানা ঘটনা প্রবাহে জাতিকে তাদের খপ্পর থেকে মুক্তির পথ-অন্বেষায় জেল-জুলুম কারাগারকে বেছে নিতে দ্বিধা করেনি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র বুঝতে পারে যে, এ নেতৃত্বকে কিনে ফেলা যাবে না। হয় স্ব-শাসনের বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে নতুবা বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বকে ধ্বংস করে দিতে হবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রকেই ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রে যে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাবিগুলোকে জায়গা করে দিতে পারেনি।[১৭]

পাকিস্তানের শিল্প-পুঁজি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হলেও তাকে আমলাতন্ত্রের নানা রকম বাধা পেরিয়েই বিকশিত হতে হয়েছে। এ সব আমলাতান্ত্রিক বাধা-নিষেধের অনেকগুলোরই উৎস ব্রিটিশ আমল থেকেই, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সঙ্গত কারণেই ভারতবর্ষের দেশীয় শিল্প পুঁজির বিকাশকে 'নিয়ন্ত্রণ' করতে চাইত। কিন্তু স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানে এসব বিধি-নিষেধের তেমন কোনো প্রয়োজন না থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় যে এ সব বিধি নিষেধকে বহাল রাখা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে। আইন-কানুনের নিয়ন্ত্রণ এতই ব্যাপক ও জটিল হয়ে উঠল যে সে ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের তথ্য প্রদান ও পারমিট লাইসেন্স গ্রহণের নানা রকম বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থেকে তাদের বের হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ দেখাতে সরকারকে "ইনভেস্টমেন্ট ইনফরমেশন ব্যুরো" স্থাপন করতে হয়। এর ফলে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর আমলাতন্ত্র তার নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করে। এই সত্যটা থেকেই যায় যে রাষ্ট্রকে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের নিয়ম-নীতি মেনেই চলতে হতো। যারা শ্রেণী ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে খুব সহজ করে দেখেন তারা রাষ্ট্র ও কর্তৃত্বশালী শ্রেণীর সম্পর্কের মধ্যেও যে মাঝে মাঝে আপাত স্ববিরোধিতা দেখা যায়, সেই প্রকৃত দ্বান্দ্বিক সত্যটা বুঝে উঠতে পারেন না। রাষ্ট্রের শক্ত নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তানের পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও বুর্জোয়ার মধ্যেকার স্ববিরোধিতা ও দ্বন্দ্বকে বুঝতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজনীয়।

আমলাতন্ত্রের ওপর পুঁজিবাদীদের এই নির্ভরশীলতার কারণে আমলাতন্ত্র ব্যাপক পরিমাণে ঘুষ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে যা উদ্বৃত্ত অর্থ সৃষ্টি করে। আমলাতান্ত্রিক শুধু জমি বা সম্পত্তি কেনে না, কোন ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিলিতভাবে ব্যবসাতেও খাটায়। আমলাতন্ত্র বা সামরিক বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ থাকার কারণে কিছু পরিবার দেশের বৃহত্তম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে পড়ে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তা রাষ্ট্রের উপরে আমলাতন্ত্রের প্রভাব খর্ব করার মতো যথেষ্ট ছিল না। জেনারেল আইয়ুব খানের সময়ে এ ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়, কিন্তু তার নিজের পরিবারও দেশের অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক বনে বসেছিল।

রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ধনী হওয়ার নতুন দিক শুরু হয়। অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যবসায়ীরাই আমলাতন্ত্রের উপর মহলে প্রবেশ ও তা থেকে সুযোগ আদায় করে নিতে পারে। এর ফলে ধনী ও পুরোদস্তুর বিবেকবোধ বর্জিত ব্যবসায়ীরাই অপেক্ষাকৃত কম ধনী ও 'সৎ' ব্যবসায়ীদের থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়, স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীরা ক্রমশ প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে থাকে এবং সম্পদ ধনী ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হয়। ধনী পুঁজিপতিরা শুধু তাদের অধিক ধন-সম্পদের কারণেই নয়; রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সেখানে তাদের ভূমিকার কারণেও অপেক্ষাকৃত কম ধনী ব্যবসায়ীদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। পাকিস্তানে যে পর্বতপ্রমাণ ধনবৈষম্য, যার কথা পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, এটা তার অন্যতম কারণ। ১৯৬৮ সালের মাঝে আমরা দেখি যে দেশের মোট শিল্প পুঁজির শতকরা ৬৬ ভাগ মাত্র ২২টি পরিবারের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।[১৮]

প্রথমত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকার কাঠামোটি সবসময় এমন একটি প্রশাসনিক চক্রে আটকে ছিল যার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক একনায়কসুলভ প্রাধান্য। পাকিস্তান নামের দেশটি এরূপ একটি প্রশাসনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তুঙ্গে পৌঁছেছিল আইয়ুব খানের আমলে। এর সবটার দায়দায়িত্ব এককভাবে আইয়ুব খানের নয়, ধারাবাহিকতায় স্ফীত হয়েছে কেবল। আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আমলেই। এঁরা দুজনেই অতি মাত্রায় আমলানির্ভর ছিলেন। এর কারণ ছিল সম্ভবত

এই যে, জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী দু'জনেরই প্রশাসনিক কাজের বাস্তব কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে উভয়কেই আমলাদের উপর বেশি নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। এ আমলাদের কয়েকজন প্রবাসী ব্রিটিশ আইসিএস অফিসার।

জিন্নাহর তার প্রকৃতি জেদী, একরোখা এবং নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মধ্যেও কিছুটা আমলাতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করত। যেমন ১৯৩৫ সালে অভিযোজিত ভারত শাসন আইন অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রথম সরকার-প্রধান হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রী না হয়ে গভর্নর জেনারেলের পদটি বেছে নিয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের পর ক্রিপসকে একটি চিঠিতে লিখলেন, "আমার কাছে গোপন খবর হলো যে, মি. জিন্না যে পথ নিচ্ছেন, তাতে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচররা আর পরামর্শদাতারা ভীত হয়ে উঠেছেন। এটা প্রায় অবিশ্বাস্য যে, একজন মানুষের অহং এত দুরারোগ্য হতে পারে, যাতে সে এক্ষুণি 'হিজ এক্সেলেন্সি' হয়ে ওঠার জন্য তার নিজের ভবিষ্যৎ ডোমিনিয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তাব সুবিধাগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে, আট মাস পরে যখন এমনিতেই সে এই শিরোপটি পেত। জওহরলাল নেহরু এই মতটি মানেন, কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল জিন্নার উদ্দেশ্যকে আরও অশুভ হিসেবে দেখেন, আর ভাবেন যে তিনি ভারতীয় ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত দুরভিসন্ধি নিয়ে এক ধরনের ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব তৈরি করতে চান"[১৯] অথচ উল্লিখিত আইনটিতে স্বাধীন পাকিস্তানের জন্যে একটি সংসদীয় সরকার পদ্ধতির বিধানই সংযোজিত ছিল। জিন্নাহর অধীনে চারটি প্রদেশের মধ্যে তিনটির গভর্নরই ছিলেন আইসিএস অফিসার। তিনি সচিব পর্যায়ে তাঁর নিজস্ব পছন্দের কিছু কর্মকর্তাসহ এসব গভর্নরের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং এভাবেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান তাঁর সময় থেকেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

ফেডারেল পাকিস্তান সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রীরই একই রকম প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল অথবা তাদের উত্তরসূরি মন্ত্রী এবং আইন প্রণেতারা পরবর্তী বছরগুলোতে (১৯৪৭-১৯৫৮) নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভালো কিছু প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন। বরং জিন্নাহর মৃত্যু এবং লিয়াকত আলীর হত্যাকাণ্ডের পর পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগে ভাঙন দেখা দিতে শুরু করল এবং দলটিতে গোষ্ঠীরাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে সাথে যখন তখন প্রদেশগুলোতে গভর্নরের এবং কেন্দ্রে গভর্নর জেনারেল কিংবা প্রেসিডেন্ট শাসন জারির ঘটনায় এ অবস্থাটির আরও সঙ্গীন আকার ধারণা করেছিল। এ ধরনের শাসনকালীন সময়গুলিতে সাধারণ প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বাতিল থাকত এবং দেশ কার্যত শাসিত হতো আমলাদের দ্বারা। ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু হওয়া আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এ অবস্থাটিকে কেবল একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল এবং সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আমলাদের ছিল বাড়তি বা অপরিমেয় স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা।

গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের একক নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের অধীনে গড়ে ওঠা প্রধান দুটি নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস (সিএসপি ও পিএসপি) পাকিস্তানের লোকজন প্রশাসনটিকে অতিমাত্রায় একটি এককেন্দ্রিক চরিত্র প্রদান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল, যা অন্য কোন ফেডারেল পদ্ধতির সরকারে দেখা যায় না। বিভিন্ন শক্তির কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতাকে মোকাবিলা করার সামর্থ্য এবং দ্রুততার সাথে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে 'চেইন অব কমান্ড' প্রক্রিয়াটি গুরুত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে এ পদ্ধতিটির প্রাসঙ্গিকতা অপরিহার্য ছিল।

পাকিস্তানের সংবিধান একটি জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে চেয়েছিল এবং তা নিখিল পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় সার্ভিসসমূহ ও আনুষঙ্গিক কিছু বিধি-বিধান চালু করেছিল। বিশেষত আইয়ুব খানের আমলে ঘোষিত ১৯৬২ সালের সংবিধান পাকিস্তানকে একটি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন-ব্যবস্থায় নিয়ে যায়, যেখানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এছাড়া প্রাদেশিক গভর্নর এবং প্রদেশ মন্ত্রিসভার সদস্যরাও নিয়োজিত হতেন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলীর পরোক্ষ ভোটে দেশের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হতো। যাদের অধিকাংশই তাদের স্রষ্টা আইয়ুব খানের বশংবদ।

এভাবেই পাকিস্তানের প্রশাসন ব্যবস্থাটি অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত চরিত্র অর্জন করেছে। কিন্তু ক্ষমতা প্রায় সবটাই ফেডারেল সরকারের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটি বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমান্বয়েই খুব বেশি বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হতে লাগল এবং দেশটি বিখণ্ডিত হয়ে পড়ার গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলো ক্রমাগতভাবে দৃশ্যমান হচ্ছিল।[২০] এ অবস্থায় বিশেষ করে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থার যেক্ষেত্রে গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা জনগণের ন্যায্য দাবি দাওয়ার বিষয়ে সোচ্চার কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে এ ধরনের নিপীড়ক ও কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তরুণ সমাজ বিশেষ করে ছাত্রসমাজ যেখানে এগিয়ে আসে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনো কখনো সবেগে চলে আসে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর ও জাতির আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক কর্মসূচি ও পদক্ষেপ। সেই ক্ষেত্রে উপরিকাঠামোর এসব শাসকচক্র নির্দয়ভাবে তাদের দমন করে অথবা শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের বৃত্তে বন্দি ও অসহায় হয়ে পড়ে। এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয় জনগণই। কিন্তু তার জন্য বড্ড বেশি মূল্য দিতে হয় জাতিকে। যেমনটি, দিতে হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও।

টীকা

১. Tragedy of Errors, East Pakistan Crisis, Lt. Gen. (retd) Kamal Matinuddin page-69.
২. আমেরিকায় পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রদূত এম, এ, এইচ ইস্পাহানীর পরিচয়পত্র গ্রহণের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মন্তব্য ছিল: 'We stand ready to assist Pakistan in all appropriate ways which might naturally benefit our two countries and the world.' New York Times, 9 Octobar 1947.
৩. অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এ, কে ফজলুল হক এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার জন্য এই দুই বাঙালির নেতৃত্ব সমগ্র ভারতবর্ষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য সরকারের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এ, কে ফজলুল হক ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আইনানুগ ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের ৭ এপ্রিল দিল্লিতে উপস্থিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আইন সভায় মুসলিম লীগের টিকেটে নির্বাচিত সদস্যদের অধিবেশন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করলে তা গৃহীত হয়। লাহোর প্রস্তাব ও দিল্লী প্রস্তাবের উত্থাপক দুই বাঙালি নেতা তাদের সর্বপ্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনায় পাকিস্তান আন্দোলনের দুই বাঙালি সিপাহসালারকে অত্যন্ত কৌশলে জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান দূরে সরিয়ে রেখে দু'জনে দেশটির গভর্নর ও প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করে বসেন। এবং তাদের চারপাশে মেরুদণ্ডহীন নেতৃত্বের সমাহার ঘটান। শুধু তাই নয় ২২ সদস্যবিশিষ্ট যে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় তার মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিলেন বাঙালি, যদিও ৬৯ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদে বাঙালির সংখ্যা ছিল ৪৪ জন।

৪. উদ্ধৃত- কে সাইদ, পাকিস্তান- দি ফর্মেটিভ ফেজ, পৃষ্ঠা-২৬১।

৫. গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রবর্তনের মৌলিক ধারণার বিরোধী লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী হয়ে গণপরিষদে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা খর্ব করার চক্রান্তে মেতে ওঠেন। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের ৬৯টি আসনের মধ্যে পূর্ববাংলার ভাগে ৪৪টি আসন ধার্য হয়। লিয়াকত আলী খানের ধমকের সুরে অনুরোধের মুখে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ববঙ্গের ধার্যকৃত ছয়টি আসন পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে দেন। পূর্ববঙ্গের জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া তেমন তীব্র হয়নি কারণ সদ্য গঠিত পাকিস্তানের জন্য পূর্ববঙ্গের জনগণের মধ্যে ছিল এক ধর্মান্ধ আবেগ। ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসেন। ১৯ জুলাই পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশে তিনি বলেন: আজকাল নানা প্রকার ধ্বনি শোনা যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে উগ্র প্রাদেশিকতার মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে। আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত মুসলমান কখনও তাহার চিন্তাধারাকে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে না। এছলামে ভেদাভেদের স্থান নাই। আমরা পাঞ্জাবি, বিহারী, সিন্ধি, বাঙালি কিংবা পেশোয়ারি যাই হই না কেন, আমদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরা পাকিস্তানি। দৈনিক আজাদ, ২১/১১/৪৮।

৬. প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনাজ্ঞাপনের উদ্দেশে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটি সরকারি দল মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হলেও তাদের সঙ্গে সরকারি আমলাদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অপমানকর। 'আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের' প্রতিবাদ জানাতে অভ্যর্থনা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সাহেব আলম এক বিবৃতিত বলেন: কমিটির অজ্ঞাতসারেই মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগকে বিশেষ প্রবেশপত্র দেয়া হয়। সরকারি ব্যবস্থা এমন অদ্ভুত হয় যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি, অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান, সম্পাদক এবং সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণকে সশস্ত্র বাহিনীর রক্ষীরা একস্থান হইতে অন্যস্থানে তাড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। দৈনিক আজাদ, ১৯/১১/৪৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. Md. Abdul Wadud Khan, The Emergence of Bangladesh and the Role of awami League, page-181.

৮. পাকিস্তান জাতির জনক মুহম্মদ আলী জিন্নাহ যিনি কায়েদে আযম নামে অভিহিত হতেন তার জন্ম নিবাস পাকিস্তান ভূখণ্ডের বাইরে ভারতের বোম্বাইতে। অনুরূপভাবে কায়েদে মিল্লাত বলে পরিচিত লিয়াকত আলী খান ছিলেন উত্তর প্রদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের লোক। মুসলিম লীগ সংগঠনে এ সমস্ত বহিরাগত নেতৃত্ব 'এলিট নেতৃত্ব' বলে পরিচিত। এরা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান ভূখণ্ডে চলে আসেন এবং মুহম্মদ আলী জিন্নাহ গভর্নর জেনারেলের পদ এবং গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করতে সমর্থ হন। কায়েদে আযম ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে প্রাণত্যাগ করেন। অন্যদিকে পাঞ্জাবি চক্রান্তে ১৯৫১ সালের অক্টোবরে আততায়ীর গুলিতে লিয়াকত আলী খান প্রাণ হারান।

৯. ইরানের প্রধানমন্ত্রী ড. মোসাদ্দেক তেল সম্পদ জাতীয়করণ করলে ব্রিটিশ ও মার্কিন তেল কোম্পানি ও ওই দুটি দেশের স্বার্থে তা প্রচণ্ড আঘাত হানে। বস্তুত আমেরিকা বেপরোয়া হয়ে মোসাদ্দেককে হটানোর জন্য সিআইএর মাধ্যমে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইরানে ড. মোসাদ্দেকের কার্যক্রম যা ইরানের জাতীয় স্বার্থে গৃহীত হয়েছিল তাতে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে মার্কিনীদের মার্শাল প্ল্যান চরম হুমকির সম্মুখীন হয় ও ডালেসের গ্লোবাল পরিকল্পনায় আঘাত হানতে উদ্যত হয়। এর প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে কার্যকর ও অর্থবহ সামরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১০. পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পরপরই গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মার্কিন অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের জন্য মেমোরেন্ডাম প্রেরণ করেন। এই মেমোরেন্ডাম প্রণয়নের পেছনে লিয়াকত আলী খানের হত্যা– পরবর্তী নাটকীয়তার ক্ষমতা দখলকারী গোলাম মোহাম্মদের হাত ছিল সর্বাপেক্ষা কার্যকর। গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অর্থমন্ত্রী ও পাক-মার্কিন সম্পর্ক স্থাপনের বিশ্বস্ত ও অক্লান্ত ব্যক্তিত্ব গোলাম মোহাম্মদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মীর লায়েক ওয়াশিংটনে প্রেরণ করেন। মোমোরেন্ডামে বলা হয়– 'primarily defence and secondly, economic development are the two vitally essential features of Pakistan's life and for both of these he has to look firstly to the U.S. and then to Great Britain for assistance. American Role in Pakistan. Ibid.

১১. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, পৃ- ৬০-৬১।

১২. ১৯৫০ সালে ১০ জানুয়ারি কলকাতার 'মুসলিম নিধন'-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানোর জন্য প্রতিবাদ দিবসে আহুত জনসভাটিতে মুসলিম লীগ ঘোর সাম্প্রদায়িক বক্তৃতার মাধ্যমে কাফেরদের উপর আক্রমণ ও ধন-প্রাণ-সম্পত্তি ধ্বংসের উসকানি দেয়। এর ফলে ঢাকাসহ বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি এলাকা দাঙ্গায় আক্রান্ত হলো। সারাপূর্ববঙ্গের দাঙ্গা লাগানোর অশুভ তৎপরতা চলে। এই দাঙ্গায় প্রায় ১৪ লাখ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেন। (টিকা–বাঙালির মানস চেতনার এই পশ্চাদপদতা ও ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিকে অপসারণ ব্যতীত গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিকার দাবি শত্রুচক্র পক্ষের কাজ বলে পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর নিকট ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হয়েছে। (টিকা–জনগণের একটি মোটা অংশের সমর্থন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে মুসলিম লীগ নেতারা বলেন যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার অর্থ হলো দেশের শত্রুদের ভোট দেয়া। পাকিস্তানের সংহতি, ইসলাম, কাশ্মীর ইত্যাদি মিঠাবুলি ও সাম্প্রদায়িক স্লোগান তুলে লীগ নেতারা জনগণের একাংশকে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই।

১৩. আহমেদ কামাল, স্বাধীনতার সময় পূর্ব বাংলা, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, সম্পাদক- সিরাজুল ইসলাম, পৃ-৩২১।

১৪. আহমেদ কামাল, স্বাধীনতার সময় পূর্ব বাংলা, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, সম্পাদক- সিরাজুল ইসলাম, পৃ-৩২৩।

১৫. রেহমান সোবহান, বাঙালির জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি, বাংলাদেশের ইতিহাস, সম্পাদক-সিরাজুল ইসলাম, পৃ-৫৭০।

১৬. পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রের আঞ্চলিক উৎপত্তিস্থল শতকরা কতজন বাঙালি :

বিষয়	সেনাবাহিনী	বিমানবাহিনী	নৌবাহিনী
১. সামরিক সংস্থাপনা (১৯৬৩)			
(ক) কমিশন্ড অফিসার	৫	১৭	১
(খ) জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসার	৭.৪	১৩.২	
(গ) ওয়ারেন্ট অফিসার	৭.৪	২৮.০	
(ঘ) অন্যান্য র‍্যাঙ্ক			
(ঙ) শাখা অফিসার			৫
(চ) চিফ পেটি অফিসার			১০.৪
(ছ) পেটি অফিসার			১৭.৩
(জ) লিডিং সীম্যান ও তার নিচে			২৮.৮
২. আমলাতান্ত্রিক সংস্থাপনা (১৯৬৬)		পূর্ব	পশ্চিম
কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট			
প্রথম শ্রেণীর অফিসার		১৭০	৬৩১
পশ্চিম-পূর্ব বৈষম্য ($\frac{WP-EP}{EP} \times 100$)			২৭১
৩. ব্যবসায়ী শিল্পপতি (১৯৫৯) ১১% (স্থির পরিসম্পতের শতকরা হিসেবে। বাঙালি মুসলিম ও বাঙালি হিন্দু মিলিয়ে)			

উৎস: (১ ও ২) জাহান, ১৮৭২

পাপানকে, ১৯৬৭।

রেহমান সোবহান, বাঙালির জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, সম্পাদক-সিরাজুল ইসলাম, পৃ-৫৭১।

১৭. রেহমান সোবহান, বাঙালির জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি, বাংলাদেশের ইতিহাস, সম্পাদক-সিরাজুল ইসলাম, পৃ-৫৮২।

১৮. সম্পাদনা-হাসান গারদেজি জামিল রশিদ, পাকিস্তান একনায়কতন্ত্র ও সংকটের স্বরূপ, পৃ-১২-১৩।

১৯. যশোবন্ত সিংহ, জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা, পৃ-৪০৩, ৪০৪।

২০. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ-২৯৪-২৯৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : তিন

নানাবিধ চক্রান্ত : বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর

[তৃতীয় অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকগণ কীভাবে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করেছে তার সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখনই বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি উঠেছে তখনই তারা বলেছে, ওরা হিন্দুস্তানের এজেন্ট। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য হিস্যার প্রশ্ন যখন উঠানো হয়েছে তখনও তারা চিৎকার করে বলেছে, 'ইসলাম গেল, ধর্ম গেল'। গণতন্ত্রের কথা যখন বলা হয়েছে তখনই শাসক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম মনসুর আলী, মোহাম্মদ তোয়াহা, ওলি আহাদ, আবুল মনসুর আহমদ প্রমূখ নেতৃবৃন্দ যখনই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছেন তখনই তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাঙালি নেতৃত্ব ও জনগণকে বিভক্ত করার জন্য তারা কখনও সেনাবাহিনী নামিয়েছে কখনও বা ৯২(ক) ধারা জারি করে নির্বাচিত মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দেয়া হয়েছে। মন্ত্রিদের জেলে আটকানো হয়েছে অথবা চক্রান্তমূলক মামলা দেয়া হয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, বাঙালি নেতৃত্ব একুশ দফার ভিত্তিতে যে ঐক্যবদ্ধ গণম্যান্ডেট পেয়েছিল তার সঙ্গে ক্ষমতার লোভে তাদের একাংশ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।
এই অধ্যায়ে লক্ষ্য করা যাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণ চক্রান্ত প্রতিরোধে ছাত্র, যুবক এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠন গড়ে ওঠে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের গণবিরোধী কর্মকান্ডকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী ও আন্দোলন গড়ে তোলে। যদিও আগে থেকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হচ্ছিল কিন্তু এই সময় থেকেই তরুণ সমাজের মধ্যে তা ক্রমান্বয়ে দানা বাধতে থাকে। সংগ্রামী ছাত্র যুবসমাজ এবং রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ আন্দোলন শুরু করে।]

কীভাবে কোন প্রেক্ষিতে এবং ঐতিহাসিক গতিধারায় বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে এর ধারাবাহিক ঘটনাবলী উল্লেখ না করেই অনেকেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে কেবল নয় মাসের স্বাধীনতার যুদ্ধের মধ্যে আটকে রাখতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের শব্দগুলো জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেবল নয় মাসের যুদ্ধে অর্জিত হয়নি। দীর্ঘ ২৩ বছর লড়াই সংগ্রাম ও জেল-জুলুম, গ্রেফতার, রক্তের এক ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাস। এই মূলসূত্র ধরেই পাঠককে অগ্রসর হতে হবে।

পাকিস্তানের কাঠামোগত কৌশল ও শাসক চক্রের ষড়যন্ত্র চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার তরুণ নেতৃবৃন্দের মনে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের স্পৃহা জাগ্রত হয়। আমরা

দেখতে পাব এ সময় ছাত্র-তরুণদের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রথমেই তারা উপলব্ধি করেছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের অধীন থেকে মুক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে কলোনিতে পরিণত হয়েছে। সেজন্য তারা প্রথমেই জাগ্রত ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার কাজে উদ্যোগী হন। এর মধ্যে জাতিগত উপাদান মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলিত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব হতেই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বিতর্ক বিক্ষোভে পরিণত হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু গণপরিষদে গৃহীত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলা উপেক্ষিত হয়। এমনকি পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা উর্দু ছিল না। জিন্নাহ নিজেও উর্দুভাষী ছিলেন না। তার মাতৃভাষা ছিল গুজরাটি। কিন্তু উত্তর প্রদেশ থেকে আগত নেতৃবৃন্দ, বেসামরিক-সামরিক বাহিনী শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সিন্ধু প্রদেশে লোকায়ত উর্দু ভাষার প্রচলন ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে উর্দু ছিল মূলত সেনা ছাউনির ভাষা এবং তৎসঙ্গে আলীগড়, উত্তর প্রদেশের মুসলিম নবাব, অভিজাত ভূস্বামীদের ঘরোয়া ভাষা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হলেও এর জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয় ফারসিতে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বুদ্ধিমান, চতুর, চৌকস ও একরোখা। আলীগড় 'আশরাফ' শ্রেণীর অভিজাত্যে জিন্নাহ মাত্র সাড়ে সাত ভাগ মানুষের ভাষা গোটা জাতির উপর চাপিয়ে দেন। তার কথাই তখন আইন এবং কর্তৃত্ববাদী পরিচালিত রাষ্ট্র। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ তিনি ঢাকা এসে ঘোষণা দেন, কেবল উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। তিনি হুমকির সুরে বলেন, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করবে, তাহলে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু।

এর পূর্বে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৪ ফেব্রুয়ারি ভাষা সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হোক। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান তীব্র ভাষায় এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বলেন পাকিস্তান অধিবাসীদের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য ও মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল মুসলিম সদস্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, হিন্দু সদস্যগণ একযোগে প্রস্তাব সমর্থন করেন।

পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অধিবাসীর মনোভাব হলো একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের নেতারা হরহামেশাই 'ইসলাম' ও 'মুসলিম ভ্রাতৃত্বের' অজুহাতে উর্দু ভাষা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কেউ যুক্তিসঙ্গত কোনো কথা বললে অথবা গণতন্ত্র চাইলে তাকে 'ইসলাম বিরোধী', 'পাকিস্তান-বিরোধী', 'ভারতের দালাল', এমনকি 'কাফের' বলতেও তারা কোনোরকম কুণ্ঠাবোধ করেননি। পূর্ব বাংলা যখনই তার ন্যায্য হিস্যার প্রশ্ন তুলেছে, তখনই 'ইসলাম গেল' চিৎকারজুড়ে দিয়েছেন এবং নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কমরেড মণি সিংহসহ পূর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার নেতাদের তাঁরা 'ভারতের দালাল', 'ইসলামবিরোধী' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

অথচ পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন নেতাদের ব্যক্তি চরিত্র ছিল জঘন্য ও ইসলামবিরোধী। প্রথমত, পাকিস্তানের 'জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ব্যক্তি ইতিহাসের অনেক দুর্বলতা ছিল। জিন্নাহর দাদা ছিলেন 'কনভার্টেট' মুসলিম। জিন্নাহর অন্যতম জীবনীকার এম.এইচ. সায়ীদ লিখেছেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব পুরুষ চামড়ার ব্যবসায়ী এবং রাজকোটের খোজা পরিবারের। এ পরিবার পরে করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট'-এর লেখকদ্বয় জানিয়েছেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন এবং শুক্রবারে জুমআর নামাজ কখনো তিনি পড়েছেন এমন ইতিহাস জানা নেই। পবিত্র গ্রন্থ কোরআন ও সৃষ্টিকর্তার কোনো স্থান জিন্নাহর পৃথিবীতে ছিল না। জীবনের শেষ তিনটি বছর তিনি বেঁচেছিলেন ইচ্ছাশক্তি, হুইস্কি আর সিগারেটের ওপর ভর করে। শূকরের মাংসও তিনি ভক্ষণ করতেন।[১] এসব ঘটনা পাকিস্তানে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। সাধারণ্যে প্রচার ছিল না। পাকিস্তানের ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু দু'জন গবেষক জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সকল কিছুতেই এত বেশি অসঙ্গতি ও গোঁজামিল ছিল যে, তার টিকে থাকার কোনো যুক্তিই তারা ধারণা করতে পারছিল না।

ভাষা প্রশ্নে বিশ্বাসঘাতকতা করেন খাজা নাজিম উদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এই সময় জিন্নাহর পূর্ব পাকিস্তানের সফরের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ জিন্নাহ ঢাকা আসেন। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তাঁর সম্মানে এক নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ঐ সভায় ভাষা আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন: আপনাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক কমিউনিস্ট এবং বিদেশীদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্ট আছে এবং এদের সম্পর্কে সাবধান না হলে আপনারা বিপদগ্রস্ত হবেন।[২] রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তিনি তাঁর সদম্ভ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন, "একথা আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্যকোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে যে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু।" জিন্নাহর রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতায় জনগণ, বিশেষ করে ছাত্রদের দারুণভাবে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করে। কারণ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রসমাজ পূর্ব বাংলা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও জিন্নাহ সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট মোহ ছিল। জিন্নাহর বক্তৃতা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় বিচ্ছিন্নভাবে, কোথাও কোথাও জিন্নাহর সম্মানে নির্মিত তোরণ ভেঙ্গে ফেলা হয়। কোথাও তাঁর ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়। ২৪ মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জিন্নাহ যখন পুনরায় 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' ঘোষণা দেন, তখন হলে উপস্থিত বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র এক সঙ্গে 'না' প্রতিবাদ ধ্বনি করেন। জিন্নাহ অল্প সময়ের জন্য থমকে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করে তাঁর কথার সুর বদলে ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, আমার মতে একমাত্র উর্দুই হতে পারে সেই ভাষা।[৩] এদিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জিন্নাহর একটি নির্ধারিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছাত্রদের সম্পাদিত ৮-দফা চুক্তি মানতে অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন, ওটা জোরপূর্বক করা হয়েছে। ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার রাজনৈতিক যুক্তি উত্থাপন করার প্রেক্ষিতে জিন্নাহ রাগত স্বরে বলেন, তিনি ছাত্রদের কাছে রাজনীতি শিক্ষা নিতে আসেননি। ছাত্ররা বিতর্কের এক পর্যায়ে 'অবাধ্যের' মতো বলে বসে যে, তিনি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, রানী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত, সুতরাং ছাত্ররা ইচ্ছে করলে তাঁকে অপসারণের জন্যে ব্রিটেনের রাণীর কাছে তার অপসারণের আবেদন করতে পারেন। একথায় তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। হৈ-চৈয়ের মধ্যেই মাগরেবের নামাজের সময় হয়ে এলে ছাত্ররা 'কায়েদে আযমকে' নামাজ পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এতে 'কায়েদে আযম' আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। ছাত্রদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিচ্ছিল, তখন ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে স্থানীয় বিভিন্ন রকম সমস্যা দানা বাঁধে। পেশাগত স্বার্থ নিয়ে অন্যান্য সরকারি কর্মচারী, এমন কি বেতন ভাতা না পাওয়ায় পুলিশের মধ্যেও আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে ওঠে।[৪] প্রকাশ্য রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করলে সরকার সেনাবাহিনীকে পুলিশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত দুজন পুলিশ নিহত ও নয়জন আহত হয়।

খাজা নাজিম উদ্দিনের আমলে উর্দু ভাষাকে বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র জনসাধারণের উপর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকেই যে রাষ্ট্রভাষা চায় তার জন্য মুসলিম লীগ সরকার কৌশলে একটি আদমশুমারী চালায়। একথা প্রকাশিত হয়ে পড়লে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মীরা ১৯৫১ সালের আদমশুমারী চলাকালে গণনাকারীদের কাছে জনগণ যাতে তাদের উর্দু ভাষার না জানার কথা স্বীকার করে সে কথা বলার জন্য দেশব্যাপী এক অভিযান চালায়। তারা যে এ ব্যাপারে সফলকাম হয়েছিল সেন্সাস কমিশনারের মন্তব্য থেকে তা জানা যায়।[৫] মুসলিম লীগ সরকার ও খাজা নাজিম উদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বিরুদ্ধে যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল শামসুল হুদা চৌধুরী, শাহ আজিজুর রহমান ও মাযহারুল হক কুদ্দুসের নেতৃত্বে পরিচালিত নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ছিল তার সহযোগী। এসব নতজানু ও বিশ্বাসঘাতক দালাল ছাত্র নেতাদের হাত থেকে দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংগঠনটির ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান, নাঈম উদ্দিন আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, অলি আহাদ, আজিজ আহমদ, আবদুল মতিন প্রমুখ নেতাবৃন্দ নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমানের কাছে গিয়ে সংগঠনটির সাধারণ কর্মী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থকদের পক্ষ থেকে কাউন্সিল অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলে তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। কাউন্সিলারদের মধ্যে তার তেমন কোনো সমর্থক ছিল না। শাহ আজিজুর রহমানের পশ্চিম পাকিস্তানের দালালী ও ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সোহরাওয়ার্দী সমর্থক ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছাত্রনেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন, "আপনারা এগিয়ে আসুন, আমরা একটি নতুন ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলি।" উপস্থিত ছাত্রনেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের প্রস্তাবে সম্মত হন। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম সমর্থিত ছাত্রনেতৃবৃন্দকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মিলনায়তনে ছাত্রলীগের এক কর্মিসভায় আসেন। এই কর্মিসভায় ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠিত হয়।[৬] অলি আহাদ ও মোহাম্মদ তোয়াহা সংগঠনের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়ার দাবি জানান। এই দাবির বিরোধিতা করে ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'এ সময় এটা বাদ দেয়া ঠিক হবে না। সরকার ভুল ব্যাখ্যা দেবে। পরে সময় হলে তা বাদ দেয়া যাবে। প্রায় সবাই শেখ মুজিবের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানান। অলি আহাদও তা মেনে নিলেন। 'মুসলিম' শব্দটি রাখা হলো। কিন্তু মোহাম্মদ তোয়াহা তা মানলেন না। ফলে ছাত্রলীগের সাথে তিনি আর কোনো সম্পর্ক রাখলেন না।[৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য ১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ ধর্মঘট শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ পূর্ণ সমর্থন জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১০ মার্চ যৌথভাবে ছাত্র কর্ম পরিষদের উদ্যেগে ছাত্র কর্মচারীদের সভার ধর্মঘটের মাধ্যমে আন্দোলনের পথ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্মচারীরা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু কাজে যোগদান করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক ভবনে তাদেরকে ঢুকতে দিতে অস্বীকৃত জানান। এতে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ ১১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। ১৩ মার্চ বিশ্ববিদ্যায়য়ের প্রায় সব ছাত্রছাত্রীই হোস্টেল ত্যাগ করে বাড়ি চলে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে কর্তৃপক্ষ ২৯ মার্চ সাত শ' ছাত্রনেতা ও নেত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৮] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাদের বহিষ্কার করা হয় তারা চিরদিনের জন্য ছাত্রজীবন হারান। যাদের জরিমানা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ জরিমানা দিলেন। আবার কেউ কেউ জরিমানা না দিয়ে মাফ চেয়ে লেখাপড়া শুরু করলেন। একমাত্র জরিমানা দিতে অস্বীকার করলেন তেজদৃপ্ত সংগ্রামী ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। সেই থেকে তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের সমাধি। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ না করায় মুসলিম ছাত্রলীগের সংগ্রামী ছাত্রনেতা হিসেবে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ছাত্রলীগের উদ্যোগে এই সময় যে সমস্ত আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত হতো তার মূল সূত্রধর ছিলেন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বই পুস্তকে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাচারিতা, শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, দুঃশাসন ও রাষ্ট্রভাষা বিরোধী কার্যকালাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে মুসলিম ছাত্রলীগের জনপ্রিয়তা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া মুসলিম ছাত্রলীগের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে যে আবেদন করা হয়েছিল, তাতেও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে সাড়া পাওয়া যায়।[৯] ১৯৪৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পুরান ঢাকার আরমানিটোলার নিউ পিকচার্স সিনেমা হলের মিলনায়তনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক জনাব দবিরুল ইসলাম পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম সভাপতি এবং জনাব খালেক নেওয়াজ খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[১০]

অন্যদিকে একদল তরুণ কর্মী ১৯৪৭-এর জুলাই মাসেই ঢাকায় গঠন করেন গণআজাদ লীগ। এর নেতৃত্বে ছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ। সংগঠনের ঘোষণায় উল্লেখ্য আছে যে, 'আমরা স্থির করিয়াছি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকিব।' ১৯৫০ সালে এই সংগঠনের নাম বদলে হয় সিভিল লিবার্টিস লীগ।

১৯৪৭-এর ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বরের সম্মেলনে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। মুসলিম লীগ প্রশাসন ও নেতৃত্বের ভয়ানক বিরোধিতার মুখে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নেতা ছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, নূরুদ্দীন আহমদ, আবদুল ওদুদ, হাজেরা মাহমুদ প্রমুখ। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক বিকাশ এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের স্বাধীন ভাষাগত, সাংস্কৃতিক বিকাশের অধিকারের দাবি এই সংগঠনের ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়।

১৯৫১ সালের ২৭ ও ২৮ মার্চ ঢাকায় এক যুব-সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ গঠিত হয়। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘটনাটির মধ্যে চমৎকারিত্ব রয়েছে। পাকিস্তানে তখন উত্তেজনাকর অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছিল। এই সময় 'রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত ঘটনাটি ঘটে। মেজর জেনারেল আকবর খান অনেকের সঙ্গে ধরা পড়েন। মামলা চলে। এই মামলায় আসামি পক্ষের কৌশলীর দায়িত্ব নেন বিরোধী দলের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খাজা নাজিম উদ্দিন, মওলানা আকরাম খাঁ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক এবং কর্তৃত্ববাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ের তোলার জন্য নতুন সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ করে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।[১১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন কাজী মোহম্মদ বশিরের (ঢাকা পৌরসভার মেয়র) পুরান ঢাকার কে.এম. দাস লেনস্থ 'রোজ গার্ডেন' বাসভবনের 'হল' রুমে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল কর্মী, সমর্থক ও নেতৃবৃন্দ এবং পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবির বা ওয়াকার্স ক্যাম্পের কর্মীদের নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জুন সম্মেলনে প্রায় ৩০০ জন ডেলিগেট বা প্রতিনিধি যোগদান করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মওলানা ভাসানী উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সামনে লিখিত ভাষণ পাঠ করার পর সম্মেলনের মূল সভাপতি আতাউর রহমান খান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে গঠিত নতুন দলের নাম দেয়া হয় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' অর্থাৎ "জনগণের মুসলিম লীগ"।

"আওয়ামী মুসলিম লীগের" ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।[১২] ১৯৪৯ সালের ২৪ জুন বিকেলে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত দলেন প্রথম জনসভায় সভাপতির ভাষণে মওলানা ভাসানী বলেন, "মাতৃভাষা মানুষের অস্তিত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং যে জাতি মাতৃভাষার কদর জানে না, সে জাতি স্বীয় অস্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না। আজ যারা মাতৃভাষা বাংলার বিরোধিতা করছে তারা শুধু বিশ্বাসঘাতকই নয়– তারা জাতীয় শত্রু। বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না, হতে দিব না। দরকার হলে বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার পূর্ণ মর্যাদা আদায় করব ইনশাল্লাহ।" এই একই জনসভায় আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক বলেন, "আজ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্ররত তারা সেদিন পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধেও গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু একথা জেনে রাখা দরকার যে, পাকিস্তান অর্জনে রয়েছে বাংলার মুসলমানদের আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। তেমনি বাংলা ভাষাও মুসলিম শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা কোটি কোটি মানুষের মুখের ভাষা। এই ভাষা হরণের যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে তা বাংলার মানুষ নস্যাৎ করবেই। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি বুকের তাজা খুন ঢেলে দেব।

এভাবে দেশের যেখানেই নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক সভা হতো, সেখানেই নেতৃবৃন্দগণ বাংলা ভাষার জাতীয় দাবিতে সোচ্চার হতেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। এর সাথে সাথে দেশব্যাপী নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দারুণভাবে বেড়ে যায়। জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। দুর্ভিক্ষের জন্য সারাঢাকা শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে আর্মানিটোলা ময়দানে এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "একজন অন্যজনকে খুন করলে ফাঁসি হয়। যে নূরুল আমিন দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে শত শত লোক খুন করছে তার কি করা উচিত? তাকে এই মাঠের মধ্যে এনে গুলি করা উচিত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জনসমাবেশ থেকে একটি বিরাট মিছিল শোভাযাত্রা সহকারে গভর্নর হাউসের (বর্তমানে বাংলা একাডেমি) দিকে রওনা হয়। মিছিল ফুলবাড়ীয়া রেলগেটের কাছে এসে পৌঁছাল পুলিশ আক্রমণের শিকার হয়। পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, ইয়ার মোহাম্মদ খান, শামসুদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও আবদুল মতিনকে নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। ফলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পুলিশ পরে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে।

১৯৫৫ সালের ২১,২২ ও ২৩ অক্টোবর ঢাকার সদর ঘাটে অবস্থিত 'রূপ মহল' সিনেমা হলে তিনদিনব্যাপী দলের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগকে 'আওয়ামী লীগে' রূপান্তরিত করা হয়। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৩ অক্টোবর কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়ার সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, "অবিভক্ত ভারতে হিন্দু কংগ্রেসের সৃষ্টি হওয়ায় সেদিন পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি করা হয়েছিল। যদি এখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি ঠিক একই ধরনের ব্যবহার করা হয়, কাউন্সিলার মহোদয়গণ কি আমার সাথে এই মর্মে একমত হবেন না যে, এখানেও সংখ্যালঘুরা বিভাগ পূর্ব ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের মতো একই রকমের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।" সংগ্রামী জননেতা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিলারদের উদ্দেশে বলেন, "দেশের বৃহত্তর স্বার্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া নৈতিক দায়িত্ব। এই নৈতিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে আজকের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগকে আওয়ামী লীগে রূপান্তরিত করা হলো।" আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগে পরিণত করতে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেন সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ তিনি ছিলেন মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যকার মতপার্থক্য দূর করার একমাত্র সেতুবন্ধন। তাছাড়া এ সময় তিনি ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগেরও প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[১৩]

আপাতদৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ মূলত ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোনো দল ছিল না। এটি ছিল মুসলিম লীগের বিভিন্ন মতের সাবেক সদস্যদের নিয়ে গঠিত মুসলিম লীগবিরোধী একটি প্ল্যাটফরম যার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরুদ্ধবাদী, ডানপন্থী, বামপন্থী, কেন্দ্রবাদী, জাতীয়তাবাদী, আঞ্চলিকতাবাদী, মিশ্র মতাদর্শবাদী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ। শুধু নেতিবাচক প্রবণতাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের পেছনে প্রণোদনা শক্তি হিসেবে কাজ করেনি, যদিও তা মুসলিম লীগবিরোধী দলছুট গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে সত্যি ছিল।[১৪] এ কারণে আমরা লক্ষ্য করি যে, বহুবার এ দল থেকে অনেক নেতা পদত্যাগ বা তাদের বহিষ্কৃত করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মহৎ আদর্শের জন্য বিশাল আত্মত্যাগ"

১৯৫০ সালে শেখ মুজিবকে নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে ফরিদপুর কারাগারে আটকে রাখা হয়। জেল থেকেই তিনি এইচ. এস সোহরাওয়ার্দীকে ২১ ডিসেম্বর একটি পত্র লেখেন। চিঠিটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জে যেতে ৬০টা ঘণ্টা সময় লাগে যা অত্যন্ত ক্লান্তিকর। তিনি আরো লিখেছেন, আবদুস সালাম খান জেলে তার সঙ্গে দেখা করেছেন এবং হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস রুলে পিটিশন করবেন। এটি হলো পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম মামলা যেখানে পুলিশ মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করে লাঠিচার্জ করে জনগণকে মারপিট ও ছত্রভঙ্গ করেছে। অনুগ্রহ করে আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি জানি যে মহৎ কর্মের জন্য যে মৃত্যুকে বেছে নেয় তাকে কদাচিৎ পরাজিত করা সম্ভব। তিনি লেখেন "Great things are achieved through great sacrifices." বিগত অক্টোবরে যখন আপনার সঙ্গে ঢাকা জেল গেটে দেখা হয়েছিল তখন আপনি কিছু বই দেয়ার জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন। আপনার ভোলা উচিত নয় জেলে আমি একাকী এবং বই হলো আমার একমাত্র সাথী।" আপনার স্নেহধন্য মুজিবুর।[১৫]

জাতীয় ঐক্যের জন্য এক ও অভিন্ন ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে পাকিস্তানি শাসকদের যুক্তিগুলো ছিল বাস্তবতা বিবর্জিত ও আক্রমণাত্মক। ভারতের দশ কোটি মুসলমানের ভাষা উর্দু ছিল না। পাকিস্তানের মাত্র ৭% লোকের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। তাছাড়া উর্দুকে একমাত্র ইসলামী ভাষা বলারও কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। উর্দু মূলত একটি ভারতীয় ভাষা এবং উহার ৭৫% শব্দ সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষাজাত। সুতরাং পাকিস্তানি শাসকদের রাষ্ট্রভাষা-নীতির দ্বারা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের গণতান্ত্রিক অধিকারকেই অস্বীকার করা হয়নি, তা ছিল মাতৃভাষা ও দেশপ্রেমের প্রতি প্রত্যক্ষ আঘাত। তবে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি শুধু আবেগের প্রশ্ন ছিল না, এর সঙ্গে বাঙালির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। কেবল উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে বাঙালিকে চাকরি তথা প্রশাসনে অংশগ্রহণের জন্য একটি বিদেশী ভাষা 'উৎপীড়ন' হিসেবে চেপে বসত। ১৯৪৮-৫১ সময়কালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি ছাত্র-বুদ্ধিজীবী এবং ক্ষুদ্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫২ সালে বিরোধী আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ প্রভৃতি সংগঠনের সমন্বয়ে একটি 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ একুশে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করে। অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব-বাংলার নুরুল আমিন সরকার ঐ দিন ঢাকায় সকল প্রকার সমাবেশ শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে। ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটে। রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম প্রমুখ ছাত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে ঢাকা ও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এক গণবিস্ফোরণের রূপ লাভ করে। এই বিস্ফোরণ এতই প্রচণ্ড ছিল যে, তদানীন্তন পূর্ব বাংলার আইনসভা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৩ সালের মূলনীতি কমিটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিপোর্টেও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম 'সরকারি ভাষা' হিসেবে মর্যাদাদানের সুপারিশ করা হয়। পরিশেষে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে উর্দুর সঙ্গে বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

পাকিস্তানের শাসকগণ মুসলিম সাংস্কৃতিক উন্নয়নের বাংলা ভাষা উপযুক্ত নয় মনে করেছেন। তাদের মতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য ছিল মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের। তাঁরা বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল প্রথমে আরবী এবং পরে রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব। বাংলা সাহিত্যে ইসলামী তথা আরবী, উর্দু, ফারসি শব্দ ও বাকধারার ব্যাপক ব্যবহারের প্রতি উৎসাহদান। তাছাড়া রেডিও টেলিভিশনে 'পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী' রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নাটক পরিবেশনার উপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু পূর্ব বাংলার প্রধান সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠনের কাছে সব পদক্ষেপকে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সর্বোপরি বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র বলে প্রতীয়মান হয়। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় বিরোধীদল তথা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে। এর প্রভাবে ১৯৫১-৫৩ সালের মধ্যে গণতন্ত্রী দল, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি ছিল একটি প্রধান ইস্যু এবং সরকারের ভাষানীতিই ছিল বিরোধী যুক্তফ্রন্টের কাছে শাসক দল মুসলিম লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল জনজীবনের সংকটের প্রশ্নগুলো, শাসন-শোষণের কব্জা হতে নিস্কৃতির দিক দর্শন। সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা যায় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি।[১৬]

পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর কছে প্রায় অপরিচিত 'উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য লীগ নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন উদ্যোগ এ বিরোধকে আরও ঘণীভূত করে তোলে। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদের অসম বণ্টন ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। বস্তুত, বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক চক্রান্ত ও বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের ক্রমাগত পূর্বাংশে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে এবং এ অঞ্চলে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে জাগ্রত করে, যা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে রূপান্তরিত হয়। পার্ক ও হুইলারের মতে,

> "ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানিরা বুঝতে পারে যে, তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানিদের ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়েছে; পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকার একটি 'উপনিবেশ' হিসেবে ব্যবহার করছে। ভাষাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাকে পরিহার করে উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে জনপ্রিয় করার পদক্ষেপ গৃহীত হলে এ মনোভাব আরও পুঞ্জীভূত হয়। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি এ অসন্তোষের পাশাপাশি প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের দুর্নীতি এবং অদক্ষতা, নির্বিকার, নিপীড়ন পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তোলে।"[১৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫৫ সাল। ২১ সেপ্টেম্বর। করাচী। বুধবার বেলা ১০টা। শেখ মুজিব গণপরিষদে বলেন, "বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাস করতে হবে।" বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, "আমাদের বাংলায় কথা বলতে দিতে হবে। আমরা ইংরেজি জানলেও বাংলায় কথা বলতে চাই, যদি তা অনুমতি না দেয়া হয় তাহলে আমরা অধিবেশন বয়কট করব। এটাই হলো আমাদের স্ট্যান্ড।"

ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই চিন্তা ও কর্ম উভয়বিধ ক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবজাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবাদের লালনক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণা ও মূল্যবোধকে শাণিত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাপ্তি প্রদান। বেরিয়ে এসেছিলেন পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, সরকারি আমলা এবং বেসরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও শিল্প-উদ্যোক্তারা। এঁরাই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মানসিক চেতনার দিক থেকে স্ফীত করেছিলেন, যাঁরা ৬০-এর দশকে এসে প্রত্যক্ষ করেন পাকিস্তানি শাসক মহল কীভাবে তাদের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

জেনারেল আইয়ুব চক্রের কাছে প্রত্যক্ষ হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সংগ্রামী ছাত্রসমাজ। যারা ছিল ক্রমবর্ধমান সরকারবিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠক। ১৯৬২ সালের পর থেকেই ছাত্রদের সরকার বিরোধী বিক্ষোভের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এ তীব্রতার ছাত্রবিক্ষোভের কারণগুলো যেমন ছিল শিক্ষাসংক্রান্ত তেমনি রাজনৈতিকও। তাদের দাবিগুলোই তার প্রমাণ। তারা চেয়েছিল সর্বস্তরে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, স্বৈরতন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৬১ বাতিল ঘোষণা, পূর্ব পাকিস্তানসহ অন্যান্য প্রদেশের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র, সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকার, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, ছাত্রসহ সকল রাজবন্দি মুক্তি ইত্যাদি। তখন শিক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগগুলো রাজনৈতিক অভিযোগ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হতো। কাজেই ছাত্রদের শিক্ষাসংক্রান্ত দাবিগুলো বৃহত্তর আর্থ-রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়েছিল।

ছাত্রবিক্ষোভের মোকাবেলায় সরকার বেছে নিয়েছিল নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের পথ। দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা, ব্যাপক ধরপাকড়, জেল-জুলুম, বহিষ্কার, ডিগ্রি-ডিপ্লোমা প্রত্যাহার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন.এস.এফ) নামধারী সরকার সমর্থিত তথাকথিত ছাত্র সংগঠনের গুন্ডা বাহিনীর কর্তৃক ছাত্রদের উপর দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে সরকার এসব আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন নিয়োগ করে। হামিদুর রহমান ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপ্রতি এবং ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। যদিও এটি ছাত্র সমস্যা ও ছাত্রকল্যাণ কমিশন নামে অভিহিত হয়েছিল, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো শিক্ষা কমিশন ছিল না।[১৮] এর প্রধান কাজ ছিল ছাত্র অসন্তোষের কারণ খুঁজে বের করে প্রতিকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপায় সম্বন্ধে সুপারিশ প্রদান করা। ১৯৬৫ সালে প্রদত্ত রিপোর্টে কমিশন "উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধির অভিযোগ"-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উপসংহারে বলে যে, "১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের অধীনে যে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল তাতে বিরাজমান অবস্থায় আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হয়নি বরং হতে বিপরীতে হয়েছে।"[১৯] তাদের প্রস্তাব ছিল, উপযুক্ত রক্ষাকবচসহ সিনেট ও সিন্ডিকেটকে পুনর্বহালকরণ যাতে করে 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তিবর্গ অনুপ্রবেশ করতে না পারে অথবা পারলেও কোনো ক্ষতিসাধন করতে না পারে। অতি সীমিত মাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থায় নির্বাচন প্রথার সুপারিশ করা হয়। এর বেশি কিছু করতে কমিশন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কমিশন স্বীকার করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে একজন রাজনৈতিক গভর্নরের নিযুক্তিকে অত্যন্ত উত্তপ্ত একটি ইস্যুতে পরিণত করেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসংগঠনগুলো সম্বন্ধে কমিশনের বিরূপ মনোভাব। বাঙালি ছাত্রদের কাছে এর প্রতিক্রিয়াশীল চেহারাই তুলে ধরেছিল। কাজেই শরিফ কমিশনের মতো এ কমিশনকেও ছাত্ররা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে।

পাকিস্তানের উভয় অংশে তীব্র ছাত্রবিক্ষোভ[২০] ও গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালে আইয়ুব শাসনের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নূতন রাজনৈতিক বিন্যাসের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আইয়ুবের উত্তরসূরিদের সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার নৈতিক শক্তি ও সাহস মোটেই ছিল না। ফলে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কালক্রমে এসে মিশে যায় একাত্তরে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝে।[২১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট নামে নির্বাচন করে বিজয়ী হয়। এ বিজয় ছিল স্বৈরাচার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও প্রগতিশীলতার বিজয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট গঠনের আওয়াজ তোলেন।[২২] যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিরোধী ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। কিন্তু ছাত্রদের চাপে তিনি যুক্তফ্রন্ট গঠনে সম্মত হন। এক্ষেত্রে শেরে বাংলা ফজলুল হক নতুন জটিলতা সৃষ্টি করেন। তার প্রস্তাব ছিল নেজামী ইসলামকে যুক্তফ্রন্টের অংশীদার করতে হবে। যদিও নেজামী ইসলাম যুক্তফ্রন্টের মূলনীতির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করত। কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপনে থাকলেও তাদের সিদ্ধান্ত ছিল যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী ও মুসলিম লীগের পরাজয়কে অবশ্যম্ভাবী করতে হবে। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামী ইসলাম, গণতান্ত্রিক দল, খেলাফতে রব্বানী দলগুলো নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ঐতিহাসিক ২১ দফার প্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দেশব্যাপী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ। বিশেষ করে ছত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কর্মীরা। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠার দাবির মধ্যে বাঙালি মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি নিহিত ছিল। লাহোর প্রস্তাবের পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ এবং সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' এ উভয় উদ্যোগের পেছনে এ ধারণাই কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল যে, বাঙালিরা কখনও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হিস্যা পাবে না, কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে একমাত্র স্বায়ত্তশাসন লাভের মাধ্যমে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনী যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ১৯তম দফা অন্তর্ভুক্ত ছিল যা সংযোজিত হয়েছিল ঐতিহাসিক ৬ দফায়। ২১ দফায় ১৯তম দফায় বলা হয়েছে:

> "ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা এবং কেবল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়সমূহ ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে আর সকল বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের বৈধ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা হবে। এমনকি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে সামরিক বাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে থাকে। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং বর্তমান আনসার বাহিনীকে পুরাদস্তুর মিলিশিয়াতে পরিবর্তিত করা হবে।"

পরবর্তী ১২ বছরে উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের এ দাবিটি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এবং বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণকে গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত রাখার দরুন ১৯৬৬ সালে এ দাবিটি আরও তীব্র ও চূড়ান্ত আকারে পুনরুজ্জীবিত হয়।[২৩] পূর্ববঙ্গের সংসদের আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। পৃথক নির্বাচনী প্রথা চালু থাকায় অমুসলিম আসন ছিল ৭২টি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৩, কৃষক শ্রমিক পার্টি ৪৮, নেজামী ইসলাম ২২, গণতন্ত্রি পার্টি ১৩, খেলাফতে রব্বানী পার্টি ২, জাতীয় কংগ্রেস ২৫, তফসিলী ফেডারেশন ২৭, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ১৩, কমিউনিস্ট পার্টি ৪ এবং মুসলিম লীগ ৯টি আসন লাভ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ময়মনসিংহে ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়। নির্বাচনের পরেই পুনরায় রাজনৈতিক খেলা শুরু হয়।

১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রথমে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে পরে চাপে পড়ে তরুণতম সদস্য শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই শেখ মুজিব পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের ঘৃণ্য রূপের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলেন, যে আমলাতন্ত্র পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ গোষ্ঠী ও কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। সে সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানের আমলা চক্রই কেন্দ্রের সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে বাঙালি-অবাঙালি কর্মচারীদের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে হেয় করা—এটিকে ভেঙ্গে দেয়ার অজুহাত সৃষ্টি করা।

১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আতাউর রহমান খান। শেখ মুজিব লক্ষ্য করলেন যে কেন্দ্রের প্রশ্রয়ে লালিত-পালিত পূর্ব পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র মন্ত্রীদের কোনা পাত্তাই দিতে চান না। আমলাদের আচরণে লক্ষ্য করেছেন তারাই যেন নিজেরা এক একজন 'সুলতান'। তাই শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিলেন আমলাদের 'প্রভুত্ব' ভেঙ্গে তাদের 'সেবক' বানাতে হবে। ফলে তাকে কঠোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা নিতে হয় যেন জনপ্রতিনিধিদের বা মন্ত্রীদের হেয় বা নাজেহাল করার সাহস না পায়। শেখ মুজিব কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদের কাছে শুনেছিলেন কীভাবে প্রতিরক্ষা দফতরের সেক্রেটারি তাঁকে এই দফতর-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে অস্বীকার করেছিলেন। শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হন। বিরক্ত হন। কিন্তু আশ্চর্য হননি। কারণ তখনই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে করাচী-রাওয়ালপিন্ডির চোখে পূর্ব পাকিস্তান একটি অধিকৃত কলোনি মাত্র।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই জনসাধারণের রায়ে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ও একজন মন্ত্রী হিসেবে যে অথরিটি বা ক্ষমতা তাঁর প্রাপ্য তাই নিয়ে আমলাদের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু করলেন। আমলা যত বড় অফিসারই হোন না কেন–এমন কি চিফ সেক্রেটারি বা আই.জি.কে-ও দরকার হলে তিনি ছেড়ে কথা বলতেন না। শেখ মুজিব একজন নামমাত্র মন্ত্রী নন। তার প্রখর ব্যক্তিত্ব ও উদ্যোগী কর্মকাণ্ডের ফলেই অল্প দিনেই আমলারা তাকে যথাযথ সমীহ করে চলতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই শেখ মুজিব এসব জবরদস্ত আমলা গোষ্ঠীর মধ্যে সুপ্ত ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন–কিন্তু কোনো দুর্ব্যবহারের দ্বারা নয়, তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, নির্ভীক সিদ্ধান্ত ও আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু হয়। সেই চক্রান্তের সর্পিল পথ ধরে যুক্তফ্রন্টের গণরায়কে বানচাল করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। কেন্দ্রের চক্রান্তে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। দলবাজি শুরু হয়। জনগণের ম্যান্ডেট উপেক্ষিত হয়।

রাজনৈতিক কূটচাল

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় চিফ মিনিস্টার হিসেবে শেরেবাংলা ফজলুল হক এপ্রিল ৩০ তারিখে (১৯৫৪) কলকাতা সফরে যান। বৃদ্ধ হক সাহেব তাঁর জীবনের প্রায় ষাট বছরের অজস্র স্মৃতিবিজড়িত কলকাতায় এসে, যাঁদের সঙ্গে দীর্ঘদিন সুখে-দুঃখে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন, এমন অনেক বন্ধুস্থানীয় হিন্দু নেতাদের চোখের সামনে দেখতে পেয়ে আবেগভরে বলেছিলেন; "ভাইরা দেশভাগ হলেও আমি এখনও পর্যন্ত 'পাকিস্তান' ও হিন্দুস্থান' এই কথা দুটিকে রপ্ত করে উঠতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বত্র প্রবল প্রচার শুরু হয়ে যায় যে ফজলুল হক পূর্ব-বাংলাকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করার জন্যই কলকাতায় গিয়েছিলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেব একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন, "পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্য আমি সর্ব শক্তি দিয়ে রক্ষা করব।" কিন্তু প্রচারের প্রবল বন্যায় তাঁর বিবৃতিটি তলিয়ে যায়। কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে এসে ১৫ মে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব তাঁর মন্ত্রিসভা পরিবর্ধিত করলেন। দশ জন নতুন মন্ত্রী নিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান নিযুক্ত হলেন বাণিজ্য, শিল্প ও দুর্নীতি নিবারণ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৪। তিনি হলেন এই ঐতিহাসিক "যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রিসভার সবচেয়ে কম বয়সের মন্ত্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক টাইমস ও রয়টারের দুজন সংবাদদাতাকে হক সাহেবের কাছে পাঠালেন একটি ইন্টারভিউর জন্য। সাক্ষাৎকারের পরে এক সংবাদে প্রকাশিত হলো যে পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বলেছেন যে, "পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা অর্জনই হবে আমার মন্ত্রিসভার প্রথম কাজ।" এই মিথ্যা খবরটি প্রকাশিত হবার পর আবার প্রতিক্রিয়াশীল মহল প্রবল আক্রমণ শুরু করে দিলো জননেতা ফজলুল হক ও "যুক্তফ্রন্ট" মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে। করাচী ও ঢাকার মুসলিম লীগ মহল ও সংবাদপত্রগুলো শেরে বাংলা ফজলুল হককে "বিশ্বাসঘাতক" "দেশের শত্রু" বলে আখ্যা দিল।

প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলি ফজলুল হককে করাচীতে তলব করলেন। মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেব, শেখ মুজিবুর রহমান, ফরিদপুরের ইউনুস আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), আতাউর রহমান খান প্রমুখ তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে করাচী গেলেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব ও শেখ মুজিবকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে ও পরে হুমকি দিয়ে যুক্তফ্রন্টের ও আওয়ামী লীগেরও ঐক্য ভাঙাতে চাইলেন। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে বললেন যে, তাঁকে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করবেন। শেখ মুজিবকে বললেন, "আপনাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য করব– শুধু আপনারা যুক্তফ্রন্ট সরকার থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তফ্রন্টকে ভেঙ্গে দিন", কিন্তু হক সাহেব ও মুজিব দুজনেই ঘৃণাভরে মহম্মদ আলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

ঢাকায় পৌঁছে ফজলুল হক কে. এম. দাস লেনে তাঁর বাড়িতে হলেন অন্তরীণ। কেন্দ্রীয় শাসক চক্র ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে পদচ্যুত করে। পূর্ব বঙ্গে ৯২-এ ধারা প্রয়োগ করে "যুক্তফ্রন্ট" মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার আলি মির্জাকে গভর্নর ও কুখ্যাত সিভিলিয়ান নিয়াজ মহম্মদ খানকে (এন.এম খান যিনি ভারত বিভাগের আগে একজন জবরদস্ত আই. সি. এস আমলা ছিলেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন) চিফ সেক্রেটারি করে সেদিনই পূর্ব বাংলায় পাঠালেন। পূর্ব-পাকিস্তানের বিদায়ী গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান (ইনি দেশ বিভাগের আগে ভারতের উত্তর-প্রদেশে খ্যাতনামা মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন) যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়ার বিরোধিতা করেছিলেন বলে তাঁকেও বরখাস্ত করল।

পূর্ববঙ্গে ইস্কান্দার মির্জা ও এন. এম খানের দুঃশাসন শুরু হলো। তাঁরা নির্যাতন ও নিষ্পেষণের স্টিম রোলার চালান। ৩১ মে গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা ঢাকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন: "আমার শাসনের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করলে তা বরদাস্ত করা হবে না।'

শেখ মুজিবর রহমানসহ পূর্ব বাংলার বহু রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে মির্জা-শাহী গ্রেফতার করল। পূর্ব পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো। সারা পূর্ব-বাংলাই যেন গোলাম মোহম্মদ ও ইস্কান্দার মির্জার শাসনে একটি বন্দি-শিবিরে পরিণত হলো। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সভা, শোভাযাত্রা অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতার সমস্ত অধিকার নিষিদ্ধ করা হলো। যুক্তফ্রন্টের নেতারা, যাঁরা তখনও গ্রেফতার হননি– একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে সর্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করলে পুলিশ সেখানেও উপস্থিত হয়ে বৈঠকটি ভেঙ্গে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব রকম গণতান্ত্রিক অধিকারের চূর্ণ করে সারা পূর্ব বাংলায় কায়েম হলো পাঞ্জাবি সন্ত্রাসবাদের এক চরম নিপীড়ন। পূর্ব পাকিস্তানে উপর সাম্রাজ্যবাদী জুলুমবাজির চাবুক হাঁকিয়ে পাঞ্জাবি চিফ সেক্রেটারি হুঁশিয়ার জানালেন– "পূর্ব বাংলাকে আমি এমন শিক্ষা দিয়ে দেব যে, কোনোদিন যেন আর বাঙালিরা সে কথা ভুলতে না পারে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়ার হাতিয়ার হিসেবে শাহেদ আলী হত্যাকাণ্ডকে সামনে নিয়ে আসে। ১৯৫৮ সালে ২০ সেপ্টেম্বর। পূর্ব পাকিস্তানের বিধান সভায় স্পিকার আব্দুল হাকিম আসন গ্রহণ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুসলিম লীগ দলের হাশেম উদ্দিন আহমেদ প্রস্তাব তুললেন যে, আওয়ামী লীগের যে ছয়জন সদস্য পাবলিক প্রসিকিউটর পদে যোগদান করেছেন সংসদ থেকে তাদের বহিষ্কার করতে হবে। কিন্তু ঐ সময় পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নূন অর্ডিনান্স জারি করে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দেন। উত্থাপিত প্রস্তাব নিয়ে শ্রীমনোরঞ্জন ধর বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু একদল ক্রুদ্ধ সদস্য তাৎক্ষণিক এ বিষয়ে স্পিকারের কাছে রুলিং দাবি করলে পাল্টাপাল্টি ন্যাপের সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী স্পিকার আব্দুল হাকিমের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। এসব নিয়ে পার্লামেন্টে ছোটখাটো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায়। স্পিকার আব্দুল হাকিম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সভাকক্ষ ছেড়ে দেন। তখন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী স্পিকারের শূন্য আসনে উপবেশন করেন। দেওয়ান মাহবুব আলীর প্রস্তাবের পক্ষে কংগ্রেস সদস্য পিটার পল গোমেজ স্পিকার আব্দুল হাকিমকে 'বদ্ধ উন্মাদ' ঘোষণা করে প্রস্তাব আনলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

এ সময় কৃষক-শ্রমিক দলের ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) উত্তেজিতভাবে স্পিকারের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সরকার পক্ষের সদস্যরা তাকে বাধা প্রদান করেন। ২১ সেপ্টেম্বর স্পিকার ডেপুটি স্পিকার না থাকায় প্যানেল সদস্য কৃষক-শ্রমিকপার্টির নেতা সৈয়দ আজিজুল হক সেদিন বিধানসভার মামুলি রীতিনীতি পালন করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বিরোধী পক্ষ হট্টগোল শুরু করে। সংখ্যাশক্তির দিক থেকে তখন পরিষদে বিরোধী দল ছিল দুর্বল। সেজন্য তারা দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে।

ডেপুটি স্পিকারের সভাপতিত্বে হাউস শুরু হলে অপজিশন দলের হট্টগোল বেপরোয়া হয়ে দাঁড়ায়। জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, আবদুল মতিন, গোলাম সরোয়ার, মহম্মদ-উন-নবী চৌধুরী প্রমুখ বিরোধীদলীয় সদস্যরা সমস্বরে দাবি জানালেন যে শাহেদ আলী সাহেব কালবিলম্ব না করে স্পিকারের আসন যেন ত্যাগ করেন। এমনকি কৃষক শ্রমিক পার্টির মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার উত্তেজিত হয়ে ডেপুটি স্পিকারের উদ্দেশে চিৎকার করে বলেন: "আপনি যদি এই মুহূর্তে স্পিকারের চেয়ার না ছাড়েন তবে আপনাকে আমরা খুনই করে ফেলব"। আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর বইতে আবুল মনসুর আহমেদ লিখেছেন, "শুধু মৌখিক নয়, কায়িক। শুধু খালি-হাতে কায়িক নয়, সশস্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কায়িক। পেপার ওয়েট, মাইকের মাথা, মাইকের ডাণ্ডা, চেয়ারের পায়া-হাতল ডেপুটি স্পিকারের দিকে মারা হইতে লাগিল। শান্তিভঙ্গের আশংকা করিয়া সরকার পক্ষ আগেই প্রচুর দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তারা ডেপুটি স্পিকারকে অস্ত্র-বৃষ্টির ঝাপটা হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অপজিশনের কেউ কেউ মঞ্চের দিকে ছুটলেন। তাদের বাধা দিতে আমাদের পক্ষেরও স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী দু-চারজন আগ বাড়িলেন। নিজ জায়গায় অটল-অচল বসিয়া-বসিয়া সিনেমায় ফ্রি স্টাইল বক্সিং বা স্টেডিয়ামে ফাউল ফুটবল দেখার মতো এই মারাত্মক খেলা দেখিতে লাগিলাম।" বিরোধীদলীয় চক্রান্তকারীদের ইট-পাটকেলে ডেপুটি স্পিকার আহত হন। তিনি ছিলেন ডায়াবেটিস রোগী। আহত অবস্থায় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরের দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শাহেদ আলী হত্যা ছিল একটি পরিকল্পিত চক্রান্তের পরিণতি।

ইস্কান্দার মীর্জা কেএসপি সদস্যদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি তাদের উসকানি দেন যেভাবে হোক পার্লামেন্টে দাঙ্গা হতে হবে, যাতে কেএসপি ক্ষমতায় আসতে পারে। তার সঙ্গে মুখ্য যোগাযোগ রেখেছেন মোহন মিয়া। তারা সেই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে ইস্কান্দার মীর্জা ও আইয়ুব খানের ব্লুপ্রিন্ট বাস্তবায়নে লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করেছেন। জেনারেল আইয়ুব খান মার্কিন সিআইএ প্রধান এ্যালেন ড্যালেসের সঙ্গে একমত হন যে, 'পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার জন্য গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক শাসন হবে উত্তম।' প্রকৃত অর্থে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের বিপুল গণরায় বানচাল, বাঙালি জাতির অধিকার, শোষণ বৈষম্যের অবসানে এবং স্বশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে এটা ছিল এক গভীর চক্রান্ত। সেজন্য যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল সামরিক আমলে তা কার্যকর থাকেনি।

শাহেদ আলী ছিলেন আওয়ামী লীগ দলের সদস্য। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বা অন্য কোনো সদস্য চেয়ার ছুড়ে তাকে হত্যা করেছেন এমন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবেন না। আবুল মনসুর আহমেদ বলেছেন, "শাহেদ আলী নিহত হইলেন অপজিশনের ঢিল-পাটকেলে অথচ পূর্ব বাংলার দুশমনেরা তখনও বলিলেন ও আজও বলেন আওয়ামী লীগ শাহেদ আলীকে হত্যা করিয়াছে।" এ ধরনের ইতিহাস বিকৃতির মানসিকতা ত্যাগ না করলে কখনো কেউ দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন না। সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে ইতিহাসে বিশালত্ব অর্জন করা যায় না।

পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্টের অভ্যুদয় এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে পূর্ব বঙ্গের গণসংহিত পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সামনে প্রচণ্ড বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে যুক্তফ্রন্টের চ্যালেঞ্জ যদি রোধ করা সম্ভব না হয় তা হলে অদূর ভবিষ্যত হয় পূর্ব বঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে নয় তো অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে রক্তাক্ত বিদ্রোহ সৃষ্টি হবে। এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গে নির্মম দমনীতির আশ্রয় নেয়া ছাড়াও যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকের মধ্যে ফাটল ধরার কূটনৈতিক তৎপরতাতেও লিপ্ত ছিলেন গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ ও তাঁর পাঞ্জাবি-গোষ্ঠী।[২৪]

এই সময় পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, সংখ্যাসাম্য, এক ইউনিট গঠন এবং বাংলাদেশের শোষণ বৈষম্য সম্পর্কে পাকিস্তান গণপরিষদের বাংলাদেশের পক্ষে যারা ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করেন তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি তখন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসন, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। তিনি গণপরিষদে বলেন যে, বাস্তবক্ষেত্রে করাচী সরকারের কাছে পূর্ব বঙ্গের কণ্ঠস্বর পৌঁছে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অঞ্চলের বক্তব্যেরও কোনো গুরুত্ব নেই। এক হাজার মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সিদ্ধান্তে পূর্ব বঙ্গের ক্ষেত্রে তাই অবিচার হতে বাধ্য। পূর্ব বঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং তার ফলে দুই ভূখণ্ডের জনসাধারণের পক্ষে পরস্পরকে জানা এবং পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন যে, 'শাসকগোষ্ঠী আমাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করছে কিন্তু জনগণ বেশিদিন এই শক্তি সহ্য করবে না। গভর্নর জেনারেল যা করবে তাই মেনে নিতে হবে এমনটি হতে পারে না। জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিকে যে ক্ষমতা দিয়েছে গভর্নর জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিনি যা ইচ্ছা তাই করছেন। তিনি পাকিস্তানের সর্বেসর্বা। জনগণ চায় কি না চায় তার ধার ধারেন না। তিনি আমলাদের নিয়োগ দেন। তাদের বরখাস্ত করেন। ইচ্ছামতো পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন।'[২৫]

পার্লামেন্টে এক বিতর্কে তিনি বলেন, "অর্থনীতির দিক দিয়েও পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অতি যুক্তিসঙ্গত। কারণ, পরস্পরের মধ্যে পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। যোগাযোগের অভাব, উৎপাদনের ব্যবহার ভিন্ন প্রকৃতি এবং মূল্যমানের বিরাট পার্থক্যের ফলে এক অঞ্চলের পারস্পর্য রক্ষা করাও সম্ভব নয়।"

"পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী ও পূর্ব বঙ্গের মধ্যে চৌদ্দ শ' মাইলের ভারতীয় ভূখণ্ড অবস্থিত। স্থলপথে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই। বিমান বা স্থলপথে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য। খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব বঙ্গের তুলনায় অনেক কম। প্রায় সমস্ত জিনিসই প্রথমে করাচীতে আমদানি করা হয় এবং তারপরে আবার রফতানি করা হয় পূর্ববঙ্গে। তার ফলে, পশ্চিম-পাকিস্তানের রপ্তানিকারকরা যে শুধু অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে তাই নয়–পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে মাল রপ্তানি করার জন্যও অতিরিক্ত দাম ধার্য করে। সেজন্য বৈদেশিক জিনিসপত্র যে পূর্ব-বঙ্গের চাহিদার তুলনায় অনেক কম পাওয়া যায় তাই নয়, পূর্ব বঙ্গের বাজারে অত্যন্ত চড়া দামেও বিক্রি হয়।"[২৬]

"রাজনীতির দিক দিয়েও পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অনস্বীকার্য। বর্তমান যুগে সবদেশেই সরকারি কাজকর্ম জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখে পরিচালিত করা হয়। তিন হাজার মাইল দূর থেকে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সামান্য যোগাযোগ রাখাও সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে অধিকতর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করে তাই রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরে এই রাষ্ট্রে সমস্ত কাজকর্মে 'ইউনিটারি' বা ঐকিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কতখানি ঐক্য স্থাপন করা হয়েছে? জোর জুলুম করে অথবা পিস্তল দেখিয়ে কোনো দেশে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব নয়।[২৭]

যদিও পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমের তুলনায় অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত তবুও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বঙ্গের বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য এই টাকা খরচ করতে দিত না। এই মূল্যবান ফরেন এক্সচেঞ্জের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তান তার নিজের শিল্প প্রসারের জন্য নির্লজ্জভাবে গ্রাস করত। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিবছরে গড়ে ৩৪ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান নামক অগ্রাসী শোষণ যন্ত্রটির কাছে হারাচ্ছিল। অধ্যাপক আহমদ সখেদে মন্তব্য করেছিলেন "পূর্ব-পাকিস্তানের উর্বরা মাটিতে যে সোনা ফলে তা আমাদের বাধ্য হয়ে তুলে দিতে হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে, কিন্তু প্রতিদানে আমরা কি পাচ্ছি? কিছুই না। এ ধরনের নির্মম শোষণের নজির বোধহয় পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজেই পূর্ববাংলার নিপীড়িত মানুষ স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকেই তাদের বাঁচার একমাত্র উপায় বলে মনে করে।"

পাকিস্তান গণপরিষদের পূর্ববঙ্গীয় সদস্য জনাব আবদুর রহমান খান করাচীতে ১৭ মার্চ অধিবেশনে গভীর হতাশার সঙ্গে বলেছিলেন "আমাদের স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্রে আমাদের সহধর্মী পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলমানরা পূর্ব বাংলার দরিদ্র চাষীদের উপর যে নিষ্ঠুর শোষণ চালাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার এবং হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা বোধহয় তার এক-চতুর্থাংশ অত্যাচারও আমাদের উপর করেনি।"[২৮]

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিধ্বংসী বন্যার ফলে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাল, গৃহহারা হলো, দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা দিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো পরিকল্পনাই গ্রহণ করল না।[২৯]

দেশের শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 'পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা' গঠন করেন। এর চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর, সেক্রেটারি, সবাই ছিলেন অবাঙালি। ৯০ অফিসারদের মধ্যে একজন এবং ৭০০ অধস্তন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১২ জন– ৭ জন কেরানী ও ৫ জন পিয়ন ছিলেন বাঙালি। গবেষণার কাজের জন্য উক্ত সংস্থায় ১৫০টি প্রদত্ত স্কলারশিপের মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ২ জন। সংস্থার চাকরির জন্য ঢাকায় কখনও কোনো ইন্টারভিউ নেয়া হতো না, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা চাকরি প্রার্থী তাদেরও ডাকা হতো করাচীতে। কিন্তু এদের কোনো ভ্রমণ–ভাতা দেয়া হতো না–ফলে ঢাকা থেকে করাচী পর্যন্ত বিমান বা জাহাজ ভাড়া দিয়ে কজন বাঙালি ইন্টারভিউ দিতে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে পারত তা সহজেই অনুমেয়। কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে কথা দিয়েছিলেন যে পূর্ব বঙ্গে তাদের অফিসগুলোতে ওরা শতকরা পঁচাত্তরজন বাঙালি নিয়োগ করবেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উচ্চপদে দূরে থাকুক শ্রমিকের কাজেও তারা বাঙালি নেয়নি। গণপরিষদে এসব বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তুলে ধরে বলেন, "মাননীয় কেন্দ্রীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পমন্ত্রী যদি পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে ভালো করে খোঁজ-খবর নেন তবে তিনি দেখতে পাবেন যে বিভিন্ন দফতরগুলোতে স্থানীয় মানুষ কোনো কাজ-কর্ম, কোনো সুযোগ-সুবিধা পান না। তিনি বলেন, অনারেবল স্পিকার মহোদয়, আমি কি সবিনয়ে একটি প্রশ্ন করতে পারি? প্রশ্নটি হচ্ছে—বাঙালিরা কি পাকিস্তানি নয়? আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট সদস্য জনাব জহির উদ্দিনও ঐ দিন প্রশ্ন তুলেছিলেন: "পূর্ব বাংলার মানুষ যদি প্রতিটি বিষয়ে এভাবে কেন্দ্রের বৈষম্যের শিকার হন তবে পাকিস্তানের ভেতরে পূর্ব পাকিস্তানের থাকার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি?" কেন্দ্রীয় সরকার যে সব পারমিট বা কনট্রাক্ট বিতরণ করতেন তার প্রায় সবগুলোই পেতেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা। শেখ মুজিবুর রহমান এ ব্যাপারেও প্রকট বৈষম্যের প্রতি করাচীর 'বড় কর্তাদের' দৃষ্টি আকর্ষণ করে ২১ মার্চ, ১৯৫৬ সালে। গণ-পরিষদে বলেছিলেন: "বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করার পারমিট একজন বাঙালিও এখন পর্যন্ত পাননি। ঢাকায় কয়লা সংক্রান্ত যে সরকারি দফতর আছে তাদের পারমিট ইস্যু করার কোনো এক্তিয়ার নেই। তাই যে সব উদ্যোগী বাঙালি কয়লার ব্যবসা করতে চান তাঁদের অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে করাচী গিয়ে প্রভাবশালী পশ্চিম পাকিস্তানিদের দরজায় দরজায় ধর্না দিয়ে বেড়াতে হবে।" শেখ মুজিব আরও বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের খবরের কাগজগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা সাধারণত চার থেকে ছয়, বড় জোর আট, কিন্তু সেগুলোর জন্য পর্যাপ্ত নিউজপ্রিন্ট দিতে করাচীর বুক ফেটে যায় অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে বত্রিশ, ছত্রিশ এমনকি ছাপান্ন পৃষ্ঠার সংবাদপত্রের জন্য টন টন নিউজপিন্টের সরবরাহ দিতে করাচীর একটুও দেরি হয় না। দেশরক্ষার ব্যাপারে ডিফেন্স বা পরিস্থিতি বোধহয় আরও শোচনীয় ছিল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮— এই এগার বছরে প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রায় সব টাকাই খরচ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে সুরক্ষিত করে তুলতে। প্রতিরক্ষা বিভাগের তিনটি শাখারই (আর্মি, এয়ার ফোর্স ও নেভি) সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীতে পূর্ব-পাকিস্তানিদের নেয়া হতো না বললেই চলে—এগারো বছরে মাত্র দু ব্যাটেলিয়ান বাঙালি সৈন্য সৃষ্টি হয়েছিল। অফিসার গ্রেডে বাঙালি ছিলেন শতকরা দুজনের বেশি নয়। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দুজন পূর্ব পাকিস্তানি কোনো মিলিটারি অফিসারকে মেজর জেনারেলের চেয়ে উচ্চতর কোনো পদমর্যাদা দেয়া হয়নি। তাদের মধ্যে মেজর জেনারেল ওয়াসি উদ্দিন নামেই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানি, তিনি প্রকৃতপক্ষে উর্দুভাষী, ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান। অপরজন মেজর জেনারেল মজিদ। তিনি আয়ুব খানের চেয়েও সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু জনাব মজিদের বিরুদ্ধে একটি অবিশ্বাস্য অভিযোগ এনে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। তিনি নাকি ইরাকের বাদশাহ ফয়সলের পাকিস্তান সফরের সময় তাঁকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানি আরেকজন উচ্চপদাধিকারী অফিসার সিলেটের কর্নেল উসমানীর যথাসময়ে জেনারেল হওয়া উচিত ছিল।[৩০]

গণপরিষদে শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দেন এবং অন্যান্য প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ যারা পূর্ববঙ্গের স্বার্থ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সকল বক্তব্য রেখেছিলেন তারই সার-সংক্ষেপ করে শেখ মুজিবুর রহমান একটি পুস্তিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকারে পূর্ব-বাংলার প্রকৃতচিত্র লিখিতভাবে তুলে ধরেন। ঐ পুস্তিকাটি সংগঠন ও জনগণের জন্য প্রকাশ ও বিলি করেন। সেখানে বলা হয়, "বাস্তবক্ষেত্রে রাজধানী করাচী সরকারের কাছে পূর্ব বঙ্গের কণ্ঠস্বর পৌঁছে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অঞ্চলের বক্তব্যেরও কোনো গুরুত্ব নেই। এক হাজার মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সিদ্ধান্তে পূর্ব বঙ্গের ক্ষেত্রে তাই অবিচার হতে বাধ্য। পূর্ব বঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং তার ফলে দুই ভূখণ্ডের জনসাধারণের পক্ষে পরস্পরকে জানা এবং পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।"[৩১] "অর্থনীতির দিক দিয়েও পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অতি যুক্তিসঙ্গত। কারণ, পরস্পরের মধ্যে পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। যোগাযোগের অভাব, উৎপাদনের ব্যবহার ভিন্ন প্রকৃতি এবং মূল্যমানের বিরাট পার্থক্যের ফলে এক অঞ্চলের পারস্পর্য রক্ষা করাও সম্ভব নয়।"[৩২]

স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বৈষম্যের চিত্র

বঙ্গের ইতিহাস এক শোষণের ইতিহাস। এই অঞ্চলের জনসাধারণের আয় থেকে এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কাজে। এই অর্থ থেকে পূর্ব বঙ্গের ভাগ্যে সামান্য অংশও জোটেনি। পাকিস্তান গঠনের পরে রাষ্ট্রের সমস্ত সামরিক সংগঠন স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলে। মিলিটারি কলেজ, প্রি-ক্যাডেট স্কুল এবং অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরির সবই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানে ও করাচীতে। এরূপ কাজে অথবা এরূপ সংগঠন তৈরির ব্যাপারে পূর্ব বঙ্গ কোনো অংশই পায়নি। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার ৬০-৭০ কোটি টাকা পূর্ব বঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে কিন্তু তার প্রায় সবই ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এরূপ এবং অন্যান্য শোষণের ফলে পূর্ব বঙ্গের সর্বশ্রেণীর জনজীবন আজ এক শোচনীয় দারিদ্র্যের সম্মুখীন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ভূখণ্ড দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভূখণ্ড হওয়ায় এবং একটি অর্থনৈতিক সংগঠন বা অঞ্চল না হওয়ায় পূর্ব-বঙ্গের পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়ে এই পূর্ব ভূখণ্ডের অর্থনীতিকে আজ এক চরম দুর্বিপাকের দিকে ঠেলে দিয়েছে।"

"পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্য ও আমদানির ক্ষেত্রে এমন পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে যে, তার ফলে পূর্ব বঙ্গের জনজীবন গুরুতরভাবে বিপন্ন হচ্ছে। পূর্ব বাংলা বহুবার এই অভিযোগ করেছে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স এবং বৈদেশিক আমদানির সুযোগ পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের এমন পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে দেয়া হচ্ছে যে তার ফলে আমদানির প্রায় অধিকাংশই যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। এরূপ পক্ষপাতিত্বের জন্য পূর্ব বঙ্গের বাজারে জিনিসপত্র শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, অগ্নিমূল্যও বটে। বর্তমানে পূর্ব বঙ্গকে সমস্ত বৈদেশিক জিনিসপত্র আমদানি করতে হয় করাচী থেকে এবং তার ফলে প্রত্যেক জিনিসের জন্য পূর্ব-বঙ্গকে পঞ্চাশ শতাংশ বেশি দাম দিতে হয়। এভাবেও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বঙ্গের পুঁজি নিয়মিতভাবে শোষণ করে নিচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন্দ্রীয় সরকাররের কাজকর্মে কিভাবে পূর্ব বঙ্গকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কুক্ষিগত কেন্দ্রীয় সরকারে নিযুক্ত কর্মচারীদের আঞ্চলিক পদ বন্টনের তথ্যে তা অতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।"

কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়র গেজেটেড পোস্ট, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট–পশ্চিম পাকিস্তান ৬৯২, পূর্ববঙ্গ; ৪২, শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন– পশ্চিম পাকিস্তান ১৩২, পূর্ববঙ্গ; ৩, রেডিও–পশ্চিম পাকিস্তান; ৯৮, পূর্ববঙ্গ ১৪; সাপ্লাই ও ডেভেলপমেন্ট– পশ্চিম পাকিস্তান ১৬৪, পূর্ববঙ্গ ১৫; রেলওয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ১৫৮; পূর্ববঙ্গ ১৪; পোস্ট ও টেলিগ্রাফ–পশ্চিম পাকিস্তান ২৭৯, পূর্ববঙ্গ ৫০; কৃষি–অর্থনীতি করপোরেশন– পশ্চিম পাকিস্তান ৩৮, পূর্ববঙ্গ ১০; সার্ভে– পশ্চিম পাকিস্তান ৬৪; পূর্ববঙ্গ ২; বিমানবাহিনী– পশ্চিম পাকিস্তান ১০২৫, পূর্ববঙ্গ ৭৫; শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং মেডিক্যাল সংগঠনেও পূর্ববঙ্গের অবস্থা একই রকম শোচনীয়। যথাঃ নতুন কলেজ– পশ্চিম পাকিস্তান ১, পূর্ববঙ্গ ০; মেডিক্যাল কলেজ– পশ্চিম পাকিস্তান ৬, পূর্ববঙ্গ ১; ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ–পশ্চিম পাকিস্তান ৩, পূর্ববঙ্গ ১; ইউনিভার্সিটি–পশ্চিম পাকিস্তান ৪, পূর্ববঙ্গ ২; কলেজ– পশ্চিম পাকিস্তান ৭৬, পূর্ববঙ্গ ৫৬; প্রাইমারী স্কুল–পশ্চিম প্যাকিস্তান ৬,২৪৬, পূর্ববঙ্গ ২২১৭; হাসপাতালের বেড সংখ্যা–পশ্চিম পাকিস্তান ১৭৬১৪, পূর্ববঙ্গ ৫৫৮৯; ডাক্তার–পশ্চিম পাকিস্তান ৮৫০০, পূর্ববঙ্গ ৩৩৯৩; মেটারনিটি হাসপাতাল– পশ্চিম পাকিস্তান ১১৮, পূর্ববঙ্গে ২২; কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তান– পূর্ব বাংলাকে শোষণ করে একটি কলোনিতে পরিণত করেছে এই পুস্তিকায় সংক্ষিপ্তভাবে তার একটি নির্মম চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[৩৩]

গণপরিষদে স্বাধীন বাংলা

শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষোভের সঙ্গে বলতেন, পশ্চিম পাকিস্তান যে শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পর্কে নগ্ন, নির্লজ্জ বৈষম্য নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে তাই নয়, তারা তাদের একই দেশের মানুষ শুধু মানুষ নয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের মানসিকতা, চিন্তাধারা, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারা বোঝার বিন্দুমাত্রা চেষ্টাও কখনও করে না। বাঙালিদের সম্পর্কে পাকিস্তানিদের বিচিত্র বিকৃত সব ধারণা। তারা মনে করত, যে মুসলমান সে আবার বাংলা ভাষা নিয়ে এত মাতামাতি করে কী করে! বাংলা ভাষা ও হরফ দুই-ই তো সংস্কৃত ঘেঁষা। কাজেই সে তো হিন্দু পণ্ডিতদের ভাষা! পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাজ্জব বোধ করত যে রবীন্দ্রনাথের মতো একজন অমুসলিম ভারতীয় কবিকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি মুসলমানদের এত উচ্ছ্বাস কী করে সম্ভব! পশ্চিম পাকিস্তানে লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, করাচীতে অফিসার, ছাত্র এমন কি শিক্ষক, অধ্যাপক ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত–কে কত দামি আর হালফ্যাশনের স্যুট-বুট পরে ঘোরাফেরা করতে পারেন। ওদের মতে এটা হচ্ছে "ইজ্জতের সাওয়াল"। কাজেই ওরা যখন দেখতেন যে পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন ধর্মের সামাজিক স্তরের বহু বাঙালি অতি সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরেই দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে কোনো সংকোচ বোধ করেন না, তখন ওরা বলতেন: "পূর্ব পাকিস্তানিরা ভীষণ পশ্চাৎপদ"। নিচু জাতের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বাঙালিদের সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অদ্ভুত মনোভাবের এবং ততোধিক অদ্ভুত নানা ধরনের কয়েকটি নজির তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানের প্রথম উজিরে আজম নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান একবার ঢাকা সফরে এসে আতাউর রহমান খানকে ডেকে পাঠিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন: কী চেঁচামেচিই না করেছেন আপনারা এই বাংলা ভাষা নিয়ে? এতে আপনাদের গৌরবের কি আছে? বাংলা ভাষা হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অথচ এই ভাষা নিয়েই মারামারি করে আপনারা পাকিস্তানের মূল আদর্শটাই ধ্বংস দিচ্ছেন।" আতাউর সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রীর কথার প্রতিবাদ জানালেন, তখন প্রধানমন্ত্রী আরও রেগে গিয়ে বলে উঠলেন: "বুঝেছি আপনাদের মতলব, আপনারা স্বাধীন বাংলা করতে চান। আপনারা চান আলাদা হয়ে যেতে।"[৩৪]

শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ জানুয়ারি ১৯৫৬ গণপরিষদে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে পরিষদের কার্যবিবরণী সবই ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভাষা বাংলার কোনো স্থানই সেখানে নেই। ঢাকা বিমানবন্দরে যাবতীয় ঘোষণা করা হচ্ছিল শুধু ইংরেজি ও উর্দুতে। আর পাকিস্তানি পাসপোর্টগুলোতে ইংরাজি, উর্দু ছাড়া ফরাসি ভাষাও ব্যবহার করা হচ্ছিল। সেখানে ছিল না শুধু বাংলার কোনো চিহ্ন।

শেখ মুজিবুর রহমান বার বার বলতে থাকেন যে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দাবিয়ে রেখে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট শাসন চালিয়ে যাওয়া পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের চিরন্তন বৈষম্যেরই পরিচয়। অতএব অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাষ্ট্রপতি শাসন তুলে নিয়ে আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকা হোক।

শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের অচল, অনড়, ঘোর পক্ষপাতদুষ্ট ও সহানুভূতিহীন রাষ্ট্র পরিচালকদের হুঁশিয়ারি জানিয়ে বললেন, "ভৌগোলিক দিক দিয়ে আমাদের দেশের একটি অংশ অপরটি থেকে বহু দূরে–হাজার মাইলের বেশি দূরে অবস্থিত। বাইরে গেলে দুটি পৃথক দেশেরই চেহারা এদের। কিন্তু তবুও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার না করেন, তাদের অভাব অভিযোগের কোনো প্রতিকার না করেন। তবে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জাগ্রত সচেতন যুবশক্তি হতাশার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করবে। তখন প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী লীগেরও কিছু করার থাকবে না। এখনও সময় আছে, আপনারা দেয়ালের লিখন পড়ার চেষ্টা করুন।"[৩৫]

অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রেসিডেন্ট রুল প্রত্যাহার করার দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশজুড়ে যে গণআন্দোলনের সূচনা করেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা তা উপেক্ষা করতে পারলেন না। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূনের প্রধানমন্ত্রিত্ব নির্ভরশীল ছিল আওয়ামী লীগ সদস্যদের সমর্থনের উপর। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতেন যে চরম পন্থা হিসেবে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ যদি কেন্দ্রে তার মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় তবে তাঁর প্রাইম মিনিস্টারশিপ থাকবে না। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীবিরোধী কুচক্রী প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা যথারীতি প্রথমে কৃষক-শ্রমিক দলের একজন পান্ডা ফরিদপুরের ইউসুফ আলি চৌধুরীর (মোহন মিয়া) মাধ্যমে চেষ্টা চালালেন যে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বা তাদের থেকে কিছু লোককে ভাগিয়ে নিয়ে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একটি নতুন রাজনৈতিক জোট গঠন করে কোনো মন্ত্রিসভা বসানো যায় কি না। কিন্তু মির্জা সাহেবের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো–মোহন মিয়া তাঁকে রিপোর্ট দিলেন, "বড় পেরেশানী হলাম কিন্তু কাজ হাসিল করতে পারলাম না।" এই সময় আওয়ামী লীগ আশান্বিত ছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নূন নিজের স্বার্থেই তাঁদেরই আবার পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেবেন। কিন্তু কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতারা আশা করছিলেন যে তাদের মুরুব্বী প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা নতুন কোন প্যাঁচ কষে তাঁদেরই একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী নূন সাহেব অবশ্য দেখাতে চাইলেন যে তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণই নিরপেক্ষ এবং তাই তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর সুলতান উদ্দিন আহমদকে নির্দেশ দিলেন যে তিনি যেন প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর সদস্যদের রাজভবনে ডেকে পাঠিয়ে কাদের প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তা যাচাই করে দেখেন। এই "রাজনৈতিক যাচাই" অনুষ্ঠানের পর গভর্নর সুলতান উদ্দিন আহমদ রিপোর্ট দিলেন যে তাঁর মতে আওয়ামী লীগই পূর্ব-পাকিস্তানে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে সক্ষম। ফলে ২৪ আগস্ট ১৯৫৭ সালে জনাব আতাউর রহমান খান আবার পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। তিনি গঠন করলেন দেশ বিভাগের পরে এগার বছরের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের নবম মন্ত্রিসভা।[৩৬]

পক্ষপাতদুষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য অনেক কম টাকা বরাদ্দ করলেও একটা বড় অংশ প্রাদেশিক সরকার খরচ করতে পারে না। এই অজুহাতে কেন্দ্রে তা ফিরে যেত। কেন এরকম হতো তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন যে, করাচীর ও ঢাকার অর্থ দফতরের অফিসাররা প্রায় সবাই অবাঙালি এবং তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোনো আর্থিক প্রস্তাব নিয়ে ইচ্ছে করেই এত গড়িমসি করেন। এত কালহরণ করেন যে তাঁরা এবিষয়ে পাকাপাকি কিছু করে উঠবার আগেই আর্থিক বছর হয়ে যায় এবং অব্যয়িত টাকা কেন্দ্রে ফেরত চলে যায়। আবার বহু উন্নয়ন প্রস্তাব করাচী শেষ মুহূর্তে নানা ফ্যাকরা তুলে, নানা অজুহাতে নাকচও করে দেয়। শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদে এ বিষয়ে একটি স্মরণীয় বিবৃতিতে বললেন: "মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে, কেন কেন্দ্রের আর্থিক বরাদ্দ পূর্ব পাকিস্তান সরকার সবটা খরচ করে উঠতে পারেন না। প্রাদেশিক সরকারকে সামান্য কিছু কিনতে হলেও পদে পদে করাচীতে সিভিল সাপলাইয়ের ডিরেক্টর জেনারেলের কাছে আসতে হয়,– আর এই আসা-যাওয়া করতে করতে বরাদ্দ টাকাও ফিরে আসে করাচীতে, কিন্তু মজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার এই যে দোষটা পুরোপুরিই চাপান হয় পূর্ব-বাঙলার মন্ত্রীদের উপরে। আপনারা কি জানেন যে পূর্ব পাকিস্তানে সামান্য একটি পরিকল্পনা চালু করতে হলেও আমাদের কতকগুলো বন্ধ দরজার মাথা খুঁড়তে হয়? যে কোনো শিল্পের স্কিমের কথা–তা বড়ই হোক বা ছোটই হোক–ধরুন প্রথমে এটি যায় কেন্দ্রীয় অর্থ দফতরে, তারপর করাচীর ফিন্যান্স মিনিস্ট্রিতে, সেখান থেকে পরিকল্পনা বোর্ডে এর পরেও এক দফতরে এবং এত ঘোরাঘুরির পরেও বেশিরভাগ সময়ই স্কিমটি অনুমোদিত হয় না, বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু যদি বা বাঙালিদের ভাগ্যক্রমে কোনো পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়ও তবুও যতদিন করাচীর বড় কর্তারা তাদের সিদ্ধান্ত জানাবার সময় পান, ততদিনে আর্থিক বছর শেষ, ফলে কেন্দ্রের টাকাও কেন্দ্রে ফেরত।"

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের জন্য কোনো বৃহৎ শিল্পের পরিকল্পনা করেননি বললেই চলে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি দেশের পূর্বাঞ্চলে আটান্নটি নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য বৈদেশিক অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা ও সংবাদপত্রগুলো এই ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে তীব্র সমালোচনা করতে লাগলেন এবং সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের পর পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের এই পরিকল্পনাটির ভাগ্যে কি হলো তা বোধহয় আর না বললেও চলবে। পুরো ব্যাপারটাই ধামাচাপা পড়ে গেল। বড় বড় পরিকল্পনার কথা ছেড়েই দেয়া যাক, পূর্ববঙ্গের জন্য ছোট ছোট প্রজেক্টও কেন্দ্রীয় সরকার নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাকচ করে দিত। এমন কি মালিক ফিরোজ খান নূনও জাতীয় পরিষদে একবার বলে ফেলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার জলের পাম্পের কিছু প্রয়োজনীয় অংশ (প্রতিটির দাম তিন থেকে চার টাকার বেশি নয়) কিনতে পারেননি। কারণ? করাচীর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ঢাকা এ ব্যাপারে অনুমতি পায়নি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পদে পদে আটকে যাচ্ছিলেন, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের স্টোরস ও সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যম ছাড়া কোনো যন্ত্রপাতি কেনার অধিকার তাঁদের ছিল না।

দেশের মঙ্গল চিন্তায় অধীর হয়ে জঙ্গী নায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানও ২৮ আগস্ট ১৯৫৮ সালে তার দিনপঞ্জীতে লিখলেন: "রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপের দরুন যে অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল এবং যার ফলে জনসাধারণের হতাশা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা প্রেসিডেন্টসহ রাজনীতিবিদদের উপর যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল এ সম্বন্ধে হতাশাব্যঞ্জক সব সংবাদ আমি পাচ্ছিলাম। সাধারণ বিশ্বাসে এই দেখা যাচ্ছিল যে কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা এসব অনিষ্টকর বস্তুকে নির্মূল করার জন্য যে সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং দেশহিতৈষণা দরকার, তা এসব লোকদের মধ্যে নেই। সাধারণ লোকদের মধ্যে এমনও বিশ্বাস জন্মাচ্ছে যে, সেনাবাহিনী এবং সেই সঙ্গে আমিও তাদেরকে এই অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যা করার তা করছিনে"।[৩৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যাসাম্য ও এক ইউনিট শাসন এবং শোষণের নব কৌশল

পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে কুচক্রী গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ দেশের গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালের ১৫ এপ্রিল গোলাম মহম্মদ পাকিস্তানের উভয় খণ্ড থেকে ৪০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করলেন। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের বাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও এই নতুন গণপরিষদের তার ভাগ্যে জুটল পশ্চিম পাকিস্তানের সমান সংখ্যক আসন। "প্যারিটি" বা সমতা প্রথার সূত্রপাত হলো। পাকিস্তানের পশ্চিমা বিশেষ করে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী ও আমলাতন্ত্রের একচ্ছত্র প্রভুত্ব কায়েম হওয়ার পথ নিষ্কণ্টক হয়ে গেল।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী "প্যারিটি" বা "সমতা" পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু শেখ মুজিবকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল, যদিও তিনি ছিলেন মুজিবের রাজনৈতিক নেতা। শেখ মুজিবুর স্পষ্টই সোহরাওয়ার্দীকে বলেছিলেন: "আমরা কিছুতেই এই প্যারিটি ব্যবস্থা মেনে নিতে পারি না, কারণ এর একমাত্র উদ্দেশ্য সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানিদের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্ব অর্জন করতে দেয়া। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ মুজিবকে বোঝালেন যে প্যারিটি প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তান মেনে না নিলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা চলতেই থাকবে এবং সংবিধান রচনার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। সোহরাওয়ার্দী আরও যুক্তি দিলেন যে কৌশল হিসেবে সাময়িকভাবে হলেও "প্যারিটিকে" মেনে নিলে কেন্দ্রীয় সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের চাকরিতে এবং শিল্প ও অর্থ বাণিজ্য ইত্যাদি কেন্দ্রীয় বিষয়েও পূর্ব পাকিস্তান সমান অংশীদার হওয়ার দাবি জানাতে পারবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ব-বঙ্গের ভাগ্যে এতদিন শুধু সামান্য অংশই জুটেছিল। তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর চাপে শেখ মুজিব অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্যারিটি প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু শাসনতন্ত্র পাসের সময় শেখ মুজিব স্বাক্ষর করেননি এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াকআউট করেন।

পূর্ব পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে করাচীর আমলাতন্ত্র আরেকটি চক্রান্ত করলেন–এক ইউনিট প্রথার প্রবর্তন। পাঞ্জাবি স্বার্থচক্রের বিরুদ্ধে যে শুধু পূর্ব পাকিস্তানই রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল তাই নয়, পশ্চিমাঞ্চলেও পাঞ্জাবি আধিপত্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। সিন্ধি, বেলুচি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশী পশ্চিম-পাকিস্তানের অপাঞ্জাবি সব রাজ্যের মানুষই পণ করলেন যে পাঞ্জাবিদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও অবাধ শোষণ তাঁরা প্রতিহত করবেন। কিন্তু পাঞ্জাবি গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ এই আন্দোলনের নাম দিলেন প্রাদেশিকতা। বললেন– "এ হলো ইসলামবিরোধী সঙ্কীর্ণতা। পাকিস্তানকে যদি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হয় তবে এ ধরনের স্বাতন্ত্র্যের বুলি ছাড়তে হবে" অর্থাৎ সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে পশ্চিম পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের পশ্চিম ভূখণ্ডে এক ইউনিট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তিনি করলেনও তাই। লাহোর হলো পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী। ১৯৫৫ সালের ১৪ অক্টোবর সিন্ধু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলুচিস্তান, উত্তর সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব এক ইউনিটের অর্থাৎ পাঞ্জাবি চক্রের কবজায় এলো। পাঞ্জাবি ভূস্বামী গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা মিয়া মমতাজ দৌলতানা খোলাখুলিভাবেই বললেন যে "এক ইউনিট হয়ে শুধু যে পাঞ্জাবিদেরই কপাল খুলে গেল তাই নয়, এখন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে আরও ভালোভাবে আরও শক্ত হাতে কেন্দ্রের হালটা ধরতে পারবে।"

শেখ মুজিবুর রহমানও এক ইউনিট প্রথার প্রবল বিরোধী ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্যারিটির মতো পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে এ আরেকটি ষড়যন্ত্র। ৩০ সেপ্টেম্বর, করাচী, গণপরিষদে শেখ মুজিব বলেন, "রাষ্ট্রযন্ত্র, অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, বা চাকরি দেশরক্ষায় সর্বক্ষেত্রে প্যারটি চাই। প্যারটি বলতে আমরা সর্বক্ষেত্রে সমতা চাই।"[৩৮] তারপরেও শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে সংখ্যাসাম্য এবং এক ইউনিটের বিরোধিতা করে বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, যদি তারা সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংখ্যাসাম্য না মানে তাহলে এটাকে আমরা ছুড়ে ফেলে দেব। তিনি বলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতেই পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

টীকা

১. Carny Collins and Dominisque Lapirre, Freedom at Midnight. (New Delhi, Tagang paperbacks, twenty first edition, 1986, P. 1015… M.H Saiyid, The Sound of Fury, A political study of M.A Jinnah (New Delhi, Document press. 1981) p. 17-18.
২. পুস্তিকা, প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র বিভাগ, পাকিস্তান সরকার, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৭, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৬৬।
৩. সাক্ষাৎকার, আবদুল মতিন, আবুল কাসেম এবং ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, বদরুদ্দীন উমর থেকে সংগৃহীত।
৪. ১৯৪৮ সালের ১৪ জুলাই তারিখে দেড় মাসকাল কোনো বেতন না পাওয়ায় ঢাকায় পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ধর্মঘট।
৫. E. H. Slade, Census Commissioner, Pakistan, Census of Pakistan, 1951 (করাচী, ১৯৫৫), বালাম ১, পৃ.৬৬-৬৭।
৬. রাজশাহীর নঈম উদ্দিন আহমদ আহ্বায়ক মনোনীত হন। আহ্বায়ক কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন দিনাজপুরের দবিরুল ইসলাম, ফরিদপুরের শেখ মুজিবুর রহমান, বরিশালের আবদুর রহমান চৌধুরী, কুমিল্লার অলি আহাদ, নোয়াখালীর আজিজ আহমদ, পাবনার আবদুল মতিন, রংপুরে মফিজুর রহমান, কুষ্টিয়ার আবদুল আজিজ, ঢাকার নওয়াব আলী, ময়মনসিংহের সৈয়দ নূরুল আলম, ঢাকা সিটির নূরুল কবির, খুলনার শেখ আবদুল আজিজ এবং চট্টগ্রামের আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী।
৭. কে এম শামসুল আলম, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইতিহাস, পৃ-১৪-১৬।
৮. জনাব দবিরুল ইসলাম, আবদুল হামিদ চৌধুরী, অলি আহাদ, আবদুল মান্নান, উমাপতি মিত্র ও সমির কুমার বসুকে চার বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। হল থেকে বহিষ্কার করা হয় আবদুর রহমান চৌধুরী, মোল্লা জালাল উদ্দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, আবদুল মতিন খান, নুরুল ইসলাম, আবদুল্লাহ বাকি, জে পাত্রনিশ ও অরবিন্দ বসুকে। ছাত্রলীগের সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, নঈম উদ্দিন আহমদ, আবদুল ওয়াদুদ, নাদিরা বেগম, কল্যাণ দাস গুপ্তকে পনের টাকা এবং লুলু বিলকিস বানুকে দশ টাকা জরিমানা এবং সদাচরণের মুচলেকা দাখিলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করেন।

৯. ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করলে জনাব দবিরুল ইসলাম নিজ জেলা দিনাজপুরে চলে যান। ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক জনাব দবিরুল ইসলামকে জুলুম প্রতিরোধ দিবসে সরকার বিরোধী ভূমিকা পালনের অপরাধে "পূর্ববঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স" বলে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করা হয়।

১০. কে এম শামসুল আলম, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইতিহাস, পৃ-৪১-৪৩।

১১. এই প্রচেষ্টার সাথে জড়িত ছিলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, কুষ্টিয়ার ডা. আবদুল মোতালেব মালেক, কুমিল্লার তফাজ্জল আলী, ফরিদপুরের শেখ মুজিবুর রহমান, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, পাবনার এম, মনসুর আলী, নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলী, শামসুজ্জামান, রংপুরের খয়রাত হোসেন, কুমিল্লার খন্দকার মোশতাক আহমদ ও দিনাজপুরের দবিরুল ইসলাম। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যে বগুড়ার মোহম্মদ আলী রাষ্ট্রদূত এবং কুষ্টিয়ার ডা. আবদুল মোতালেব মালেক ও কুমিল্লার তফাজ্জল আলী মন্ত্রী হয়ে রাজনৈতিক দল গঠনে উদ্যোগী সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

১২. মওলানা ভাসানী সভাপতি, আতাউর রহমান খান, সাখাওয়াত হোসেন, আলী আহমদ খান, আলী আমজাদ খান, আবদুস সালাম খান, সহসভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক, শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক, খন্দকার মোশতাক আহমদ সহ-সম্পাদক, এ কে এম রফিকুল হোসেন সহ-সম্পাদক ও ইয়ার মোহাম্মদ খান কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

১৩. কে এম শামসুল আলম, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইতিহাস, পৃ- ৩৮-৪১।

১৪. শ্যামলী ঘোষ, আওয়ামী লীগ, ১৯৪৯-৭১, পৃ-১০।

১৫. Government of East Bengal, Home poll, F/N, 606-48PF, part-3, ড. সুনীল কান্তি দে, বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, পৃ-২৪,২৫।

১৬. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি।

১৭. ভাষা আন্দোলন, বদরুদ্দীন উমর। সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৭০।

১৮. কমিশনের অন্যান্য সদস্য হচ্ছেন- এস. এ মাহমুদ, বিচারপতি, পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট: মমতাজউদ্দীন আহমদ, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং নাসির আহমদ, সভাপতি, পশ্চিম পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

১৯. ঐ কমিশন রিপোর্ট-১৯৬৫, ৫।

২০. আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে আর একটি কমিশন গঠন করেছিলেন এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে। পাকিস্তান শিক্ষা মন্ত্রণালয় নূর খান কমিশনের রিপোর্ট 'নতুন শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব' নামে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে প্রকাশ করেছিল। এ প্রস্তাবগুলো উদার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক চরিত্রের ছিল এবং এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। স্পষ্টতই এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্যসমূহ দূর করা। কিন্তু ততক্ষণে বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে এগুলো চিরতরের জন্য ইতিহাসে পাদটীকায় স্থান লাভ করে।

২১. সূত্রঃ জাহেদা আহমদ, রাষ্ট্র ও শিক্ষা। সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ-১০৪, ১০৫।

২২. শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, বার্ষিক কাউন্সিল, ২১-২২-২৩ অক্টোবর ১৯৫৫।

২৩. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ-৫৭২-৫৭৩।

২৪. অমিতাভ গুপ্ত, গতিচঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব, পৃ- ৭৬-৮১

২৫. পাকিস্তানের গণপরিষদ অধিবেশন, করাচী, বৃহস্পতিবার, ২৫ আগস্ট ১৯৫৫ বেলা ১১টা। গণপরিষদ কার্যপ্রণালী দ্রষ্টব্য।

২৬. পাকিস্তানের গণপরিষদ কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

২৭. ঐ।

২৮. ১৯৫৬ সাল ১৭ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদ।

২৯. অমিতাভ গুপ্ত, গতিচঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব, পৃ-২৬৯।

৩০. শেখ মুজিবুর রহমান ৯, ১৩, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সনে গণপরিষদের কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

৩১. গণপরিষদ কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

৩২. ঐ।

৩৩. অমিতাভ গুপ্ত ,গতিচঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব, পৃ- ৮৪-৮৮।

৩৪. ঐ, পৃ-২৭৯, ২৭৭।

৩৫. গণপরিষদে শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণের কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য, ১৫ জানুয়ারি ১৯৫৬।

৩৬. অমিতাভ গুপ্ত, গতিচঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব, পৃ-২৮০, ২৮১, ২৮২।

৩৭. আইয়ুব খানের আত্মচরিত "প্রভু নয় বন্ধু" দ্রষ্টব্য।

৩৮. Now, in this Bill, my friends have not provided parity in the matter of services, defence and other matters. We had expected parity in financial allocations, parity in the matter of subjects– I mean there should have been parity in all respects. Sheikh Mujibur Rahman in parliament, page-70.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : চার

রাজনীতির অঙ্গনে কালো থাবা

[চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করবো রাজনৈতিক অঙ্গনে কালো থাবা নেমে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি সামরিক প্যাক্ট এবং মার্কিন প্রভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের যতটুকু বাতাবরণ দৃশ্যমান হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সরাসরি সামরিক শাসন দেশের বুকে চেপে বসে। সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'বাংলায় মুসলিম লীগের পতন, পাকিস্তান সরকারের নীতিতে কোনো পরিবর্তন হবে না।' এসময় প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান রাজনৈতিক মঞ্চে চলে আসেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২১ দফা এড়িয়ে 'জিরো থিওরীতে' চলে যান। আওয়ামী লীগ ও একুশ দফায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা ও লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনে অঙ্গীকার করা হয়েছিল। এই মূল দাবি দু'টি উপেক্ষিত হলো। ফলে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। এক অস্থির পরিস্থিতির ভিতরে ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়া হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জাতীয় নির্বাচন দাবি করেন। কিন্তু পাকিস্তানের কুচক্রীরা দেখলেন এভাবে গণতন্ত্রের দাবী এমন এক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, যেক্ষেত্রে তাদের কায়েমী স্বার্থে প্রচন্ড আঘাত লাগবে। সেজন্য তারা সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবসহ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেন।
সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের ফলে ছাত্রসমাজ এই প্রথমবারের মতো ধর্মঘটের রাজনীতির দিকে অগ্রসর হয়। মূলত এ সময় ছিল বাঙালি জাতির আত্মানুসন্ধানের অভিযাত্রা। সেই লক্ষ্যে ১৯৬২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়েতে ইসলাম, নেজামী ইসলাম ও মুসলিম লীগের একাংশ নিয়ে গঠিত হয় এন. ডি. এফ। যার লক্ষ্য ছিল সবার আগে গণতন্ত্র চাই। চারিদিকে আন্দোলন ও প্রচন্ড ছাত্র বিক্ষোভে দিশেহারা জেনারেল আইয়ুব খান আন্দোলন দমাতে কঠোর ব্যবস্থা নেন। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বী মিস ফাতেমা জিন্নাহ রাজশাহীতে এলে শেখ মুজিবুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং পরিষ্কারভাবে বলেন, এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে, 'আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে।']

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক প্যাক্ট গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়। সিয়্যাটো স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খান এবং অর্থমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাদের উষ্ণ আতিথেয়তা জানান। পাশাপাশি তারা অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। সিয়্যাটো স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে

আর একবার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নামে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পাকিস্তানে একটি গণপ্রতিনিধিত্বহীন 'গণপরিষদ' ছিল। 'শাসনতন্ত্রের মূলনীতি' হিসেবে লিয়াকত আলী খান মার্চ ১৯৪৯ নভেম্বর ১৯৫০ এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের ডিসেম্বর ১৯৫২ প্রদত্ত দুটি রিপোর্ট অগ্রাহ্য হয়। ১৯৫৩ সালের ৭ অক্টোবর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী উপস্থিত করে 'মোহাম্মদ আলী ফর্মুলা।' কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রণীত হলো না।

গভর্নর জেনারেল তখনো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বলে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করেছিলেন। নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো হয়। অগণতান্ত্রিক পথটি বন্ধ করার জন্য বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে উদ্যোগ নেন। এর ফলে সকল ক্ষমতা চলে আসত মন্ত্রিপরিষদের হাতে। গভর্নর জেনারেল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হ্রাস পেত। ২১ সেপ্টেম্বর গণপরিষদ সে শাসনতান্ত্রিক রিপোর্টটি গ্রহণ করে, ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী অধিবেশনে তার ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক বিল নিয়ে আলোচনা ধার্য ছিল। কিন্তু এর মধ্যেই গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ শক্ত হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন। সেই সাথে সারাদেশে জরুরি অবস্থাও ঘোষিত হয়। বিশেষজ্ঞ মহল এই ঘটনাটির পেছনে আমেরিকার হস্তক্ষেপের ধারণা পোষণ করেন। কেননা, গভর্নর জেনারেল যে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তরবারি উঁচিয়ে ধরার নামে পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন, সেই বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকেই তিনি আবারও প্রধানমন্ত্রিত্ব পদে বসাতে বাধ্য হলো।

বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের সময় দেশে ৯২-ক ধারা জারি হয়। ইস্কান্দার মীর্জা গভর্নর হয়ে আসেন। তার প্রকাশ্য বক্তব্য ছিল, 'মওলানা ভাসানী দেশে ফিরলে তাকে গুলি করা হবে। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়ে স্বয়ং কলকাতা গিয়ে মওলানা ভাসানীকে এদেশে নিয়ে আসেন। 'নির্বাসিত' জীবনশেষে মওলানা ভাসানী ফিরে আসেন ১৯৫৫ সালের ২৫ এপ্রিল। মে মাসে এক প্রচারপত্রে তিনি পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়্যাটো এবং বাগদাদ চুক্তি বাতিলের দাবি জনান। ৯ ও ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের উত্তরবঙ্গ কর্মি সম্মেলনেও তিনি একই দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালের ২১,২২ ও ২৩ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 'এই কাউন্সিল অধিবেশনের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পাকিস্তান সরকার বিগত কয়েক বছর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেছেন, যে চুক্তি দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং দেশের অর্থনৈতিক, ব্যবসাগত ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে।'[১]

অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রকাশ্যেই চলতে থাকে। এর প্রথম ঘটনাটি ছিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন বিজয়ের পরপর। মার্কিন রাষ্ট্রদূত হোরেস হিলড্রেথ বলেন যে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের পতনে পাকিস্তান সরকারের নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না। সে সময়ে সারাদেশে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পাকিস্তান সরকার দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননাকর এই বিবৃতির প্রেক্ষিতে কোনো কথাও উচ্চারণ করেননি।[২]

প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুবের একটি বক্তব্য থেকে এর সত্যতা মেলে। ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় দেশরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর লাহোরের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন: 'পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষণীয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নির্ভর করে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর।' ভারত কখনো হামলা করলে কিংবা দখল করে নিলে পশ্চিম পাকিস্তান দিল্লী দখল করে নেবে এবং ভারত পূর্ব বাংলা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। পূর্ব বাংলাকে এক ভারত ছাড়া আর কেউ আক্রমণ করবে না। তাই পূর্ব-দক্ষিণ দিকের সীমান্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর এ কারণেই পূর্ব বাংলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন নেই বলে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি মনে করতেন। এমনিতর ধ্যানধারণার ফলে পূর্ব বাংলা সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত অবহেলিত হয়। শতকরা পনের ভাগেরও কম অর্থ এ প্রদেশে ব্যয়িত হয়, সশস্ত্র বাহিনীসমূহে চাকরিতে ২২৩০ জনের মধ্যে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ জন (শতকরা মাত্র ৩.৫ ভাগ) অথচ বৈদেশিক সাহায্যের বাইরেও কেবলমাত্র রাজস্ব আয়েরই শতকরা বাষট্টি ভাগ তখন প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়িত হতো।[৩] অর্থাৎ তিনি গৃহীত সামরিক ব্লুপ্রিন্ট নিয়েই অগ্রসর হচ্ছিলেন, যা তিনি বিশ্বাস করতেন।

'জিরো থিওরি'

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়ে পাকিস্তান-মার্কিন চুক্তি সমর্থন করেন। তার ফলে দলে ও দলের বাইরে ব্যাপক সমালোচনা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে চমক সৃষ্টি করে ১৯৫৬ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে হেলিকপ্টারে অবতরণ করেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল প্রাঙ্গণে। ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন: 'যারা ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতে চান, তাদের আমার সাথে হাত মেলানোর প্রয়োজন নেই। কেননা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি চাই পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে। আমার এ হাত পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য নয়।' প্রসঙ্গত তিনি জোটনিরপেক্ষতার ধারণার কঠোর সমালোচনা করেন। মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে তিনি বলেন: 'আরব দেশগুলোর সাথে প্রতিরক্ষা সম্পর্কের অর্থ হলো, একটি শূন্যের সাথে কয়েকটি শূন্যের যোগফলের সমান, আর একটি শূন্য।' এটাই সোহরাওয়ার্দীর বিখ্যাত 'শূন্যতত্ত্ব'। সমাবেশে উপস্থিত প্রগতিশীল ছাত্রদের অনেকে সেদিন এর প্রতিবাদ এবং প্রশ্ন করার জন্য উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর 'স্বেচ্ছসেবকরা' তাদের বসিয়ে দেয়।

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে প্রকাশিত সোহরাওয়ার্দী-আইসেনহাওয়ার যুক্ত ঘোষণা বক্তব্য থেকে। ১৩ জুলাই প্রকাশিত যুক্ত ঘোষণায় বলা হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এ বিষয়ে একমত হন যে স্বাধীন বিশ্বের নিরাপত্তার পথে আন্তর্জাতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিউনিজম এক বিরাট হুমকি হিসেবে অবস্থান করছে। এশিয়ায় প্রবর্তিত সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি তারা পুনরায় সমর্থনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কমিউনিস্ট আক্রমণ বিরোধিতার প্রত্যয়ও পুনরায় ঘোষণা করেন। তারা ঐকমত পোষণ করেন যে সাউথ-ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন, বাগদাদ চুক্তি এবং পাকিস্তান-মার্কিন পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে কমিউনিস্ট আক্রমণ বিরোধিতায় যে প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে, তা কমিউনিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে, এবং এর ফলে চুক্তিভুক্ত অঞ্চলে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪]

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩১মে আসন্ন নির্বাচনে প্রস্তুতি দল ও জনশক্তি সংগঠিত করার লক্ষ্যে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পদত্যাগ করেন। অপর এক প্রস্তাবে জুনের প্রথম সপ্তাহে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এক ইউনিট সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত যাচাইয়ের পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্তের আলোকে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার দৈনিক 'সংবাদ' জানায় সমাপ্তি অধিবেশনে 'দেশের স্বার্থানুকূলে' সর্বমোট চল্লিশটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।[৫]

আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতা এবং বিবৃতির মাধ্যমে সংগঠনের কর্মসূচী থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিচ্যুতি এবং তার পরিপন্থী বক্তব্যের দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করেন। ১৯৫৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী বলেন যে, সংগঠনের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী পরিবর্তনের অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভারই রয়েছে, কোনো ব্যক্তি বিশেষের নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেন।

সোহরাওয়ার্দীর 'যুক্তিপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী' ভাষণের পর ১৯৫৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রনীতির ওপর জাতীয় পরিষদের ভোট গ্রহণ করা হয়। মুসলিম লীগসহ বিরোধী দলগুলো ভোটদান বিরত থাকে। পক্ষে চল্লিশটি এবং বিপক্ষে দুটি ভোট দেন মিয়া ইফতিখার উদ্দিন ও মিয়া অবদুল বারী।

১৯৫১ সনের সামরিক চুক্তি নবায়িত হয়েছিল ১৯৫৮ সালেও। এর পরও ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হলো। মর্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডী এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলানকে ভারতকে সাহায্য প্রদান না করার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নানাভাবে চেষ্টা করেন। পাকিস্তান-মার্কিন সম্পর্ক জোটের শর্তগত বাধ্যবাধকতার উল্লেখ থেকে শুরু করে তাদের 'মিত্র' পাকিস্তানের বিপন্ন হওয়ার আশংকা পর্যন্ত জানিয়েছেন তিনি, কিন্তু লাভ হয়নি। ভারতের হুমকির কারণে সোহরাওয়ার্দীসহ পাকিস্তানের শাসকদের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির অকার্যকরতা প্রকট হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালেও তারা ভারতকে সাহায্য করেন। চীন-ভারত যুদ্ধের পর থেকে ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বের নবতর অধ্যায়ে আমেরিকা এই উপমহাদেশে 'নিরপেক্ষ' হওয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছে। আর সেজন্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় আমেরিকা উভয় দেশকেই অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।[৬]

কাউন্সিল অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং মওলানা ভাসানীর ক্রমাগত চাপের ফলে ১৯৫৭ সালের ২ মার্চ আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় দলের এম. এল. এ-দের প্রতি অবিলম্বে প্রাদেশিক পরিষদে স্বায়ত্তশাসনের ওপর সরকারিভাবে প্রস্তাব উত্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। বলা হয়: স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষ এখন এমন ঐক্যবদ্ধ যে এর বিরোধিতা করে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই প্রদেশের মাটিতে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। সে দল ছোট বা বড়, নতুন বা পুরান–যাই হোক না কেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে তা বাস্তবায়নে শুরু করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও একুশ দফা বাস্তবায়নে গাফলতি এবং খাদ্য সংকট সমাধানে ব্যর্থতার প্রতিবাদে ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।[৭]

আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিয়ে মওলানা ভাসানী ন্যাপ গঠন করেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সভার নয়জন আওয়ামী লীগের সদস্য দল ছেড়ে ন্যাপে যোগ দেয়াতে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর মন্ত্রিসভাকে সুরক্ষিত করার জন্য কৃষক-প্রজা পার্টির একাংশের সমর্থন আদায়ের করার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান বাধা সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির কোয়ালিশন প্রস্তাব ভেঙ্গে যায়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা করাচী ফিরে গেলেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর কার্যকলাপে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় রিপাবলিকান নেতা ডা. খান সাহেবের মন্তব্যে। তিনি ঢাকা ছাড়ার আগে এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বললেন: "ওই ভদ্রলোকটি যেসব কাজ করছেন তাতে মাত্র একঘণ্টার মধ্যেই আমরা তার সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু করছি না এই কারণে যে এতে ঘন ঘন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন সারা পৃথিবীতে দেশটি হাস্যাস্পদ হয়ে পড়বে।" প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর চরম বিরোধী মওলানা ভাসানীর প্রশংসা করে ডা. খান সাহেব বললেন: "মৌলানা সাহেব যে শুধু সৎ ও আদর্শবান তাই নয়, তিনি একজন দেশপ্রেমিকও।"

ডা. খান সাহেব মওলানা ভাসানীর প্রশংসা করলেন যা ছিল নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক সভায় মওলানার ন্যাপ দলের সদস্যদের সমর্থন প্রত্যাশা করছিলেন। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সালে এই "ন্যাপ ও মুসলিম লীগ" সদস্যদের সঙ্গে একযোগে রিপাবলিকানরা লাহোরে একটি প্রস্তাব পাস করালেন (পক্ষে ১৭০ ভোট বিপক্ষে মাত্র ৪ ভোট)। প্রস্তাবে দাবি করা হলো: "অবিলম্বে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রথা ভেঙ্গে ঐ অঞ্চলের চারটি রাজ্য পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে তাদের সাবেক অবস্থা ফিরিয়ে দেয়া হোক।"

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা চালু করার সময় আওয়ামী লীগ তার বিরোধিতা করেছিল। পরে তা মেনে নেয়। আওয়ামী লীগ একথা বলেছিল যে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পশ্চিম পাকিস্তানিদের; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানিরা তার সঙ্গে সম্পর্কিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু এই কারণে যে পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশকে সংঘবদ্ধ করার সংকীর্ণ ও অসাধু উদ্দেশ্য থেকেই পাঞ্জাবি নেতা ও আমলারা এক ইউনিটের কাঠামোগত কৌশল আবিষ্কার করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সব রাজ্যের বিভিন্ন দলের নেতারা সেই এক ইউনিট ভেঙ্গে দেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করায় আওয়ামী লীগের সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী দলের সুস্পষ্ট নীতির কথা ভুলে বেঁকে বসলেন। কারণ সে সময় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনিও ইস্কান্দার মীর্জার সঙ্গে আঁতাত করেন। তাদের বক্তব্যে হবে সেপ্টেম্বর মাসে এক ইউনিট বিরোধী প্রস্তাবটি যখন লাহোরে বিধানসভায় গৃহীত হয়, সে সময় প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন। আমি ও প্রেসিডেন্ট দুজনেই পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভাঙবার বিরোধিতা করব।" বিচলিত শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্য আওয়ামী নেতারা তাঁদের নেতাকে এ ধরনের রেডিও বক্তৃতা না দিতে অনুরোধ করলেন। প্রেসিডেন্ট মীর্জার এটা ছিল একটা ষড়যন্ত্র। উদ্দেশ্য পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের তাঁর বিরুদ্ধে একজোট করা এবং সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বাদ দেয়া। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ধারণা প্রেসিডেন্ট তাঁর ওয়াদার খেলাপ করতে পারেন না। সোহরাওয়ার্দী বলেন: "এক ইউনিট ভেঙ্গে যাবার অর্থ পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়া।" রেডিও পাকিস্তান তাদের পরবর্তী অধিবেশনেই জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রচার করলেন।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব এক ইউনিট ভাঙ্গার বিরুদ্ধে এত দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনমতকে এ বিষয়ে তাঁর স্বপক্ষে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক ট্যুর প্রোগ্রাম করলেন। যদিও তিনি জানতেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান তিনটি পার্লামেন্টারি পার্টিই মুসলিম লীগ, রিপাবলিকান পার্টি ও ন্যাপ একমত হয়ে এক ইউনিট ভেঙে আগেকার মতো পৃথক রাজ্যে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রিপাবলিকান ও ন্যাপ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর উপর থেকে তাদের আস্থা তুলে নেন। এই সুযোগে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা, আবুল মনসুর আহমদকে রাষ্ট্রপতি ডাকলেন। পশ্চিম পাকিস্তানি মন্ত্রীর লেখা চিঠি পড়তে দিলেন। এরা সবাই প্রায় একই কথা লিখেছেন: "প্রাইম মিনিস্টার আমাদের এবং আমাদের পার্টিকে ট্রেটর বলে গালাগালি দিয়েছেন। এই অবস্থায় আমরা এই প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করতে অনিচ্ছুক।"

ডা. খান সাহেব, মোজফফর আলী খান কিজিলবাস, পীর পাগারো, আইয়ুব খুরো, গাফফার খান প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ এবং সোহরাওয়ার্দী বিরোধী পূর্ব পাকিস্তানি নেতারাও প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শুরু করেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী ৪ অক্টোবর ১৯৫৭ সালে তার নিজের জেলা নোয়াখালিতে একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে বিদ্রূপ করে বলেন, "যিনি নিজে এক বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০০ দিনই সরকারি খরচে বিশ্ব ভ্রমণ করেন।" অথচ তিনি একথা বিস্মৃত হলেন যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে সমর্থ হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডা. খান সাহেব যিনি পাকিস্তান বিরোধী ছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান পতাকাকে স্যালুট পর্যন্ত করেননি তিনিও বলেন: "প্রধানমন্ত্রী পদে সোহরাওয়ার্দীকে রাখতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।" ডা. খান সাহেব জানতেন যে তাঁর দল জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেই আওয়ামী লীগ মেজরিটি হারাবেন এবং সেই সঙ্গে চলে যাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রাইম মিনিস্টারশিপ।

আরেকটি কারণেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে অনেকে প্রধানমন্ত্রীর উপর এ সময় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় পরিষদে একটি বিবৃতি দিয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পাকিস্তান নিরাপত্তা (Security Act) আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তা আর বাড়ানো হবে না। কিন্তু অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে সোহরাওয়ার্দী একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে নিরাপত্তা আইনের বলবৎ রাখলেন।[৮]

১০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে যুগোশ্লাভিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্টের সামনে একটি স্টেট রিসেপশন ছিল। বহু অতিথি এসেছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি মন্ত্রীরা একজনও আসেননি। টোটাল বয়কট। কিন্তু সারাদিন এই মন্ত্রীরা প্রেসিডেন্ট মীর্জার সঙ্গে দরবার করেছেন। ঐদিনই তিনি ইস্কান্দার মির্জার একটি "টপ সিক্রেট" চিঠি পান। প্রেসিডেন্টর প্রেরিত চিঠিটি ছিল জাতীয় পরিষদের রিপাবলিকান সদস্যদের অনাস্থার কথা। ওই চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দীকে তিনি অবিলম্বে পদত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট মির্জার চিঠির জবাব লিখলেন। তিনি লিখে পাঠালেন, প্রেসিডেন্ট অবিলম্বে পার্লামেন্ট ডাকুন। জাতীয় পরিষদে নিজের শক্তি পরীক্ষা না করে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে পারেন না। এটা সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতি। প্রেসিডেন্ট ভবনে এই চিঠি পাঠানো হলো। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যও দেয়া হলো। প্রেসিডেন্ট মির্জার দফতর থেকে চিঠির জবাব এলো না। বরং প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে বলা হলো, তিনি প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। তিনি মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন। ১৮ অক্টোবর ১৯৫৭। ১৪ জন মন্ত্রী নিয়ে আই. আই. চুণ্ডিগড় মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। এই মন্ত্রিসভা মুসলিম লীগ, রিপাবলিকান পার্টি, নেজামে ইসলাম ও কৃষক শ্রমিক পার্টির কোয়ালিশন। বিদায়ের আগে সোহরাওয়ার্দী একটি প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট আমার পরামর্শ গ্রহণ করেননি। আমি তাঁকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে বলেছিলাম। সেখানে আমি আমার সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারতাম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আমার কথা মানলেন না। তাই পদত্যাগ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না।"[৯]

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান দুজনেই উপলব্ধি করেন যে ইস্কান্দার মির্জাকে তাড়াতে হলে অবিলম্বে কেন্দ্রে সাধারণ নির্বাচন অপরিহার্য। কিন্তু কুচক্রী প্রেসিডেন্ট মির্জা তাঁর ক্ষমতা অব্যাহত রাখার অপচেষ্টায় তৎপর। তিনি ভাষণে দেশের রাজনীতিবিদদের অকর্মন্যতা ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ নির্বাচনের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রকাশ করলেন গভীর সন্দেহ। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে একটি বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট বলেন যে পাকিস্তান এক গভীর "চারিত্রিক সংকটের" সম্মুখীন হয়েছে।[১০]

কালো হাত

প্রেসিডেন্ট মির্জা নতুন চাল খেললেন। তিনি সামরিক বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বাতিলের চক্রান্ত করলেন। এক. কেন্দ্রে ও প্রদেশে বিশেষ করে পূর্ব বঙ্গ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করা, দুই. পূর্ণ সামরিক শাসন বা মিলিটারি ডিকটেটরশিপের পথ প্রশস্ত করা।

১৭-১৮ ডিসেম্বর। ১৯৫৭। মধ্যরাতে প্রেসিডেন্ট মির্জার পরামর্শে ও নির্দেশে পূর্ব-পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, এয়ারফোর্স ও নেভির ইউনিট নিয়ে গঠিত "অপারেশন ক্লোজ ডোর" নামে একটি পরিকল্পনায় সামরিক বাহিনীকে নামিয়ে দেয়া হলো। উদ্দেশ্য ভারতীয় সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা। পূর্ব পাকিস্তানের জি.ও.সি মেজর জেনারেল উমরাও খান ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, প্রাদেশিক সরকারের অনুরোধে তাঁরা এই দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছেন। সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'প্রাদেশিক সরকার তাদের সহায়তা দেবে।' তাঁর এই উক্তি শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি তীব্র মন্তব্য করে বলেন, "জেনারেল উমরাও-এর ইঙ্গিত অত্যন্ত সন্দেহজনক। প্রয়োজনে সামরিক বাহিনী অসামরিক প্রশাসনের আহবানে সাহায্যে করার কথা। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ও সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন উল্টো মিলিটারিকে সহায়তা দেবে।" এ কোন্ আইন বা প্রথা? পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানের আচরণ ও মনোভাবে কংগ্রেস এবং অন্য সংখ্যালঘু সদস্যরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। ২১ মার্চ ১৯৫৮ সালে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দেন যে তাঁরা আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। ফলে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা চরম সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়ে।[১১]

এ সময় মওলানা ভাসানীর ভূমিকা

ন্যাপ সভাপতি মওলানা ভাসানী মনে করলেন যে, বিরোধী পক্ষ আওয়ামী লীগ ও এই দলের নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত করার এই একটি বড় সুযোগ। তাই তিনি প্রস্তাব রাখেন যে ন্যাপসহ প্রাদেশিক সভায় সব বিরোধী দলের একজোট হয়ে আতাউর-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট দেবে। মন্ত্রিদের পতন ঘটবে। কিন্তু প্রাদেশিক সভার ন্যাপ নেতারা অনেক বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁরা আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোটাভুটির সময় নিরপেক্ষ থাকবেন। ফলে ২২ মার্চ ১৯৫৮ সালে একটি সরকারি প্রস্তাব যখন ভোটে দেয়া হলো তখন সরকার পক্ষ ১৩৬, বিপক্ষে ১০৬ ভোট পেয়ে সরকার টিকে গেল।[১২] মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যাপ সদস্যরা বুঝতে পেরেছিলেন যে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার পতন হলে কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মুসলিম লীগ প্রভৃতি যে সব দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী দল সরকার গঠন করবে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে চরম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো মাথা চাড়া দেবে। বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করবে। হিন্দু-মুসলমানে বা বাঙালি-অবাঙালিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এই সুযোগে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিধন করবে। দেশে সরাসরি সামরিক শাসন ও ডিকেটটরশিপ চালু করবে। ন্যাপের এই পরোক্ষ সহায়তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও তাঁর সরকার বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি। মাত্র ন'দিন পরেই আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

জাতীয় নির্বাচনের দাবি

চারদিকে সামরিক-বেসামরিক চক্রের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় সোহরাওয়ার্দীর কাছে একমাত্র পথ ছিল জনগণের শরণাপন্ন হওয়া, তাদের ম্যান্ডেট গ্রহণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় গঠনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা। সেই লক্ষ্যে তিনি দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি, সমস্যা ও সংকট নিরসনে জনগণের কাছে চলে এলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৬ জুলাই ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জে এক বিশাল জনসভায় বলেন: "এগার বছরে ভারতে দু-দুবার সাধারণ নির্বাচন ইতোমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, তৃতীয় নির্বাচনও যথারীতি হবে। কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত একটিও জাতীয় নির্বাচন হয়নি, হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।" মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রেসিডেন্ট মির্জাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন: "সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করুন। নয় তো দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে।" এ সময় দেশের দুই অংশেই নির্বাচনের দাবি এত সোচ্চার, এত জোরদার হয়ে উঠেছিল যে, পরিস্থিতিকে সাময়িকভাবে এড়িয়ে যাবার জন্য প্রেসিডেন্ট মির্জা ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে জেনারেল ইলেকশন হবে। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূনের উদ্যোগে গৃহীত বিলেও প্রেসিডেন্ট ১৯৫৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অনুমোদন দেন। কিন্তু একমাসের মধ্যেই অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের বুকে চেপে বসল পূর্ণ সামরিক শাসন।

জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

জেনারেল আইয়ুব খানকে যদিও ইস্কান্দার মীর্জা তার কেবিনেটে প্রধানমন্ত্রী করে ক্ষমতার অংশীদারীত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু আইয়ুব খান এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বরং মীর্জার অধীনে প্রধানমন্ত্রী হওয়াকে অপমান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আইয়ুব খান দেখলেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ফিরোজ খানের নূনের ঘোষণা মতো নির্বাচন দেবেন না বরং সংবিধান বাতিল করবেন। ইতোমধ্যে ড. খান সাহেব মে মাসে গুলিতে নিহত হয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে শাহেদ আলী হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং চারদিকে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭ অক্টোবর ১৯৫৮ প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী আইয়ুব খান বরাবর পত্র লেখেন। পত্রে উল্লেখ করেন তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তাকে দেশের মঙ্গলে সর্বাত্মক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।"[১৩] তার দু'দিন পূর্বে ৫ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান সরাসরি প্রেসিডেন্ট মীর্জার সঙ্গে দেখা করে বলেন, দায়িত্ব গ্রহণে তিনি এখনো মনস্থির করেননি। এ সময় ইস্কান্দার মীর্জার বুদ্ধিমতি ও সুন্দরী স্ত্রী বেগম নাহিদ জেনারেল আইয়ুব খানকে শেষ করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করেন। ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মীর্জা জেনারেল আজম খান, জেনারেল বার্কি এবং জেনারেল শেখকে সরাসরি আইয়ুব খানের অধীনে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। মঞ্জুর কাদেরকে বিদেশমন্ত্রী, মোহাম্মদ শোয়েবকে অর্থ ও জুলফিকার আলি ভুট্টোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় জেনারেল আজম খান, বার্কি ও শেখ যারা ছিল প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খানের অধীনস্থ তাদের ইস্কান্দার মীর্জার বাসভবনে গমন করেন। তারা প্রেসিডেন্টকে বলেন, অবিলম্বে পদত্যাগ করুন। তাহলে আপনার জীবন রক্ষা হবে এবং আপনি পেনশনও পাবেন। কোনো গতি না দেখে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্র নিয়ে তারা আইয়ুব খানকে দিলে তিনি বলেন, এসব বিষয় নিয়ে কেন আমাকে বিব্রত করছেন। ইস্কান্দার মীর্জাই তো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারত।" একথা ছিল আইয়ুব খানের ভাওতাবাজি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেনারেল আইয়ুব খান পরের দিন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এই ক্ষমতা গ্রহণকে তিনি বিপ্লব বলে অভিহিত করেন।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বাতিল হয়ে গেল। গঠনতান্ত্রিক চর্চা নিষিদ্ধ। চারদিকে ভীতিকর সামরিক সন্ত্রাস। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ। নির্যাতন। গ্রেফতার। সঙ্গিলের ডগায় বিদ্ধ গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার বাতিল। রাজনীতি নিষিদ্ধ। রাজশাহী থেকেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। সামরিক শাসন জারির বিরুদ্ধে মিছিল। বিক্ষোভ। বেপরোয়া লাঠিচার্জ। নেতা কর্মীরা গ্রেফতার। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ। সামরিক আদালতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাজী আব্দুস শহীদ লালের ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। একই সঙ্গে বেত্রাঘাতের হুকুম। কাজী আব্দুস শহীদ লাল তখন রাজশাহী ছাত্র সামাজে আন্দোলনের এক সাহসী নাম। বাম চেতনায় বিশ্বাসী। কিন্তু কড়া সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালের পূর্বে সামগ্রিক অর্থে ছাত্র আন্দোলন রচনা সম্ভব হয়নি। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্র সমাজের বিভিন্ন দাবি 'দিবস' নিয়ে ব্যস্ত। দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব। রাজশাহী ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব বর্তায় মূলত নবাগত তরুণ অনার্স ছাত্রদের ওপর।

ষাটের দশক বাঙালি জাতির আত্ম-অনুষ্ঠানের অভিযাত্রা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের লৌহ কঠিন সামরিক শাসনের কৃষ্ণ যবনিকা ছিন্ন করে স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও বাঙালির মুক্তি আকাঙ্ক্ষার এক অদমিত দশক। তারুণ্যের আবেগ, বঞ্চনা-দগ্ধ প্রত্যয় এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উচ্চকিত এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিকাল উদ্বেলিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিস্ফোরণে আকীর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬২ সালে জানুয়ারি মাসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকা এলেন। তিনি বলেন, দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ, রাজনীতির দলও নেই। এই অবস্থায় সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করাই হবে একমাত্র পথ। দলাদলি, কোন্দল এবং বিগত দিনের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সকলকে একই লক্ষ্যে কাজ করার আহবান জনান। তিনি বলেন 'যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল এককভাবে কিছুই করতে পারবে না'। ১৯৬২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামাত-ই-ইসলাম, নিজামে ইসলাম ও মুসলিম লীগের একাংশ নিয়ে গঠিত হয় 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (এন.ডি.এফ.), লক্ষ্যঃ সবার আগে গণতন্ত্র।

জেনারেল আইয়ুব বিপদ দেখলেন

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হন। পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ বিশেষত তরুণ ছাত্র সমাজ এই গ্রেফতারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১ ফেব্রুয়ারি। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঢাকা উপস্থিত। ছাত্র সংগঠন ধর্মঘট ডাকে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবিলম্বে মুক্তি ও গণতান্ত্রিক স্লোগানে ঢাকা উচ্চকিত। সামরিক কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। গণমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা। ঢাকার কোনো সংবাদপত্রে সত্য ঘটনা প্রকাশ করা যাবে না। তারপরও 'পাকিস্তান টাইমস' লিখেছে, ঢাকা ছাড়াও মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, বরিশাল, পিরোজপুর, যশোরে, খুলনা, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি জায়গায় এ সময় প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সরকারি নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এক মাসের জন্য রমজানের দীর্ঘ ছুটি ঘোষণা করে। রাজশাহীর ছাত্র সমাজ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বন্দি মুক্তির আন্দোলন থেকে দূরে ছিল না। প্রথমে ছোট ছোট বৈঠক। তারপর কলা ভবনের সামনে খণ্ড মিটিং-মিছিল। তারপর শহরে বিক্ষোভ চলে।

ধনীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছাত্র অসন্তোষের প্রেক্ষিতে শিক্ষা নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠন করেন শরীফ কমিশন। শরীফ কমিশনের শিক্ষানীতিতে ঘোষিত হয় 'ধনী' ও 'মেধাবী' ছাত্ররাই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্য। দু বছরের পাস কোর্সকে তিন বছর করা হয়। শুরু হয় ব্যাপক আন্দোলন। এ সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান লিখেছেন, "১৯৬৩ সালের গোটা বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২৭দিন ক্লাস হয়েছে। আমরা দুটি প্রদেশকে সর্ববিষয়েই সমপর্যায়ে আনবার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র যারা রাজনীতি করে এবং রাজনীতিবিদদের দ্বারা বিপথে চালিত হয়ে সময় নষ্ট করে, তাদের দ্বারা আমাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমি মনে করি যে, শিক্ষা সংস্কার রীতিমতো ভালো ফল দিচ্ছে এবং আগামী দু'তিন বছরের ভেতরেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নত ধরনের শিক্ষিত ব্যক্তিদের লাভ করব।"[১৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসক গোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা পদ্ধতির যে মৌলিক দুর্বলতা বিবেচিত হয়েছে তা হল শৃঙ্খলার অভাব, শাসক কর্তৃত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং আঞ্চলিক ও প্রাদেশিকতায় প্রভাবান্বিত হওয়া। মূলত এসবই ছিল রাজনৈতিক ইস্যু।

এই প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল আন্দোলন ঘোষিত হয়। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয় জঙ্গি মিছিল। মিছিল হাইকোর্ট পর্যন্ত এগিয়ে যায়। পুলিশের গুলিতে বাবুল, গোলাম মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহ নিহত হয়। ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজাশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। যশোরে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ৪৩ জন আহত হয়। রাজশাহী বিভাগের বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের নতুন গতি সৃষ্টি করে। ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলনের প্রভাবে রাজশাহীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুনভাবে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়। জাতীয় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার পূর্বেই রাজশাহীর একাধিক ঘটনা ছাত্র-সমাজকে সামগ্রিক আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষিত হয়।

সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারে সামরিক চক্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল আজম খান মার্শাল আইয়ুব খানের বরাবর ৭ জুন ১৯৬২ সালে একটি গোপনীয় পত্র লেখেন। জেনারেল আজম খানকে আইয়ুব খান লিখেছিলেন সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানবিরোধী শক্তির সমবেশ ঘটাতে সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু আজম খান আইয়ুব খানের পত্রের জবাবে বলেন, "প্রশাসক কাজের মৌলিক নীতি হচ্ছে, আইন শৃঙ্খলা কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার আগে ঘটনাস্থলে যিনি আছেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। যদি জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে কোনো তথ্য থেকেই থাকে, তাহলে তা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই বেশ কিছুকাল ধরে ছিল। এটা নিশ্চয়ই গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টা আগে জোগাড় করা হয়নি যে আপনি বলতে পারবেন আমার সাথে আলোচনা করার মতো সময় আপনার ছিল না। যদি এমন হতো যে, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্তব্য পালনে আমি ব্যর্থ হয়েছি, সেক্ষেত্রে আমাকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া বা আমাকে সরিয়ে দেয়াই আপনার উচিত ছিল। যেভাবে আপনি এবং আপনার সরকার বিষয়টি নিষ্পত্তি করেছেন গভর্নর হিসেবে আমার প্রতি সুনির্দিষ্টভাবেই অবিশ্বাসের একটি পরিচয়। তিনি আরও বলেন, "ব্যক্তির ইচ্ছা ও মেজাজের কারণে দেশকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, এর দৃঢ় নীতি ও আদর্শের পরিবর্তে প্রশাসনে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণের যে সুযোগ দেয়া হয়েছে, তা আমরা সবাই ভালোভাবে জানি। ঐ সমস্ত আদর্শের প্রশ্নে আপোস করতে হলে বিপ্লবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। কাজেই যখন কতগুলো মৌলিক আদর্শ লঙ্ঘিত হলো, তখন পদত্যাগ করা ছাড়া আমার কোনো বিকল্প থাকল না, যেমনটা আমি আমার ১১ মার্চের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদত্যাগপত্রে ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি। ঐ পত্রের জবাবে আপনি আমাকে পাঠানোর এক জরুরি বার্তায় বলেছিলেন, যে বিষয়টা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বিধায় পূর্ব পাকিস্তানে আপনার পরবর্তী সফরকালে তা আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে মনস্থ করছেন। এই আলোচনা আপনি করেছিলেন, কিন্তু গভর্নর হিসেবে বহাল থাকতে অসম্মতি জানিয়ে আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্তেই অটল থাকি এবং যথাশীঘ্র সম্ভব অব্যাহতি প্রাপ্তির ইচ্ছাও আমি প্রকাশ করি।"[১৫]

জেনারেল আজম খান সামরিক ব্যক্তিত্ব হলেও তিনি পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় ছিলেন। তার পদত্যাগ জনমনে সামরিক শাসকদের মধ্যে বিরোধ প্রকাশিত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এই সুযোগ গ্রহণ করে। আন্দোলনের প্রাথমিক পদক্ষেপ ঠিক হয়েছিল, সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণতন্ত্রের দাবিতে করাচী থেকে সর্বপ্রথম শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি বিবৃতি দেবেন। কিন্তু বিবৃতিদানের পূর্বেই সংবাদটি সামরিক সরকারের কাছে পৌঁছে যায়। ৩০ জানুয়ারি বিকেল। করাচীতে কোনো প্রকার প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের ফলে সারাদেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এগিয়ে আসে ছাত্রসংগঠন। মূলত আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং জনমত গড়ে তোলা সেসময় এক দুঃসাহসিক দায়িত্ব পড়েছিল ছাত্রসমাজের উপর। ছাত্র সমাজ সেই চ্যালেঞ্জটিই সেদিন গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘ চার বছর পর বাষট্টিতে এসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে জেনারেল আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাতে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয় ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত। কর্মসূচিতে ছিল ক. আইয়ুব খান প্রবর্তিত সংবিধান বিরোধী আন্দোলন (মার্চ থেকে এপ্রিল), খ. শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল, গ. রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মোহাম্মদ ফরহাদের উদ্যোগে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ একটি গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬১, ইস্কাটনের একটি বাড়িতে। দুই সংগঠনের প্রায় ৩০-৩৫ জন নেতা কর্মী সেই গোপন বৈঠকে যোগ দেয়। তবে আন্দোলনের চেতনার দিক থেকে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা পার্থক্য ছিল। ছাত্রলীগ প্রধানভাবে সামরিক শাসনের পরিবর্তে একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করার কথাই চিন্তা করেছে। নেতৃবৃন্দের একটা বড় অংশের মধ্যেই আইয়ুব খানের পরিবর্তে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট করার ইচ্ছাই ছিল প্রধান। ছাত্রলীগ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। অন্যদিকে ছাত্র ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবির সঙ্গে জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী চেতনায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তবু এই গোপন সিদ্ধান্ত হয়, যে কোনো কিছুর বিনিময়ে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সামনের একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) থেকেই তা শুরু করা হবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকার প্রয়োজন হলো না ছাত্রদের।[১৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা পহেলা তারিখে আইয়ুব খান ঢাকা পদার্পণ করলেন। আর এ দিনই ধর্মঘট বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয়া হয়। রাত তখন দুটো। এস. এফ ও ছাত্র শক্তির নেতৃবৃন্দ চলে যাওয়ার পর সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাদের কাছ থেকে সংবাদ টুকে নিলেন 'আগামীকাল ধর্মঘট হচ্ছে না'। প্রকৃতভাবে এন. এস. এফ ও ছাত্রশক্তির সামনে পরদিনের কর্মসূচি নিলে ছাত্রনেতৃবৃন্দের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ধর্মঘট বানচাল হয়ে যেত। সাধারণ ছাত্র সমাজে যে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে পুনরায় তা স্তিমিত হয়ে পড়ত। রাত দুটোর পর শুধু ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ সভায় পরদিন ধর্মঘটের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা যখন উচ্চ মহলে রিপোর্ট লিখছেন, আগামীকাল ছাত্র মহলে উত্তেজনা হচ্ছে না। যৌথ সভায় আরো সিদ্ধান্ত হলো, ধর্মঘটটি সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে এমন ভাব দেখাতে হবে এবং এরকম ছাত্র সভায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ কেউই বক্তৃতা করবেন না। বৈঠকের পর নেতৃবৃন্দ চলে যান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে স্থাপিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। সেখানে অপেক্ষা করছিল বিভিন্ন শাখার নেতা ও কর্মীরা। কলেজ ও হলগুলোতে ধর্মঘটের খবর পৌছে দেয়া হলো। পরদিন সকালে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। একজন নিরপেক্ষ প্রগতিশীল ছাত্রকর্মী আনিসুর রহমান তাতে বক্তৃতা করলেন।[১৭]

ফেব্রুয়ারি ৭। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এদিন আইয়ুব খানকে ঘেরাও করার কর্মসূচি নেয়া হয়। এক বিশাল জমায়েত অনুষ্ঠিত হয় এদিন। পুলিশের সাথে সেনাবাহিনীও রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে থাকে। হাইকোর্ট ও কার্জন হলের সামনে দুটি ফিল্ডকামান বসানো হয়েছিল। এমন করে চতুর্দিকে ঘেরাও করা হয়েছিল যাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা বের না হতে পারে। কিন্তু কৌশলে ছাত্ররা এদিন শেষ পর্যন্ত মিছিল শহরে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। কার্জন হল থেকে মিছিল ঢাকা হলের ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে ছাত্ররা প্রথমে বিশ্ববিদালয় মাঠে প্রবেশ করে সেখান থেকে মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের ভেতর দিয়ে বকশীবাজারে পুরনো ঢাকায় প্রবেশ করে। মিছিল পুরনো ঢাকা অতিক্রম করে হাটখোলা রোডে এসে আবার বাধার সম্মুখীন হয়। প্রচণ্ড লাঠিচার্জে মিছিল শেষ পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

বিকেলে ঢাকা হলে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের বৈঠক ছিল। বৈঠক চলে অধিক রাত পর্যন্ত। ছাত্র নেতারা ঢাকা হল ও ফজলুল হক হলে থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ রাতেই পুলিশ ও সেনাবাহিনী হল ঘেরাও করে একটি মাত্র গেট দিয়ে ছাত্রদের বের হওয়ার নির্দেশ দেয়। হল ত্যাগ করতে বলা হয় সকল ছাত্রকে। ৭ দিন পর্যন্ত সময় লেগেছিল সমস্ত ছাত্রদের বের করতে। অনেকের বাড়ি যাওয়ার মতো কোনো টাকা তাদের ছিল না। তাদের টাকা পর্যন্ত দেয়া হলো। তবু জোরপূর্বক হল ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এই ৭ দিন গোয়েন্দা পুলিশ সারাক্ষণ ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করা জন্য ওঁৎ পেতে ছিল। বের হওয়ার আর কোনো পথ ছিল না। সপ্তম দিবসে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হলে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা গুটিয়ে গেলে সন্ধ্যার পর শেখ ফজলুল হক মণি, মোহাম্মদ ফরহাদ প্রমুখ পুলিশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু ছাত্রনেতাদের নামে হুলিয়া জারী করায় সাময়িকভাবে আন্দোলনে ভাটা পড়ে।[১৮]

এই সময় সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চরম নির্যাতন নেমে আসে। সম্মুখীন হয় গ্রেফতার নির্যাতনের। কিছু দিন পর ৬২-র সংবিধান প্রশ্নে আবার ছাত্ররা সংগঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬০ সালে জানুয়ারি মাসে তার মৌলিক গণতন্ত্রে নির্বাচন শেষে ১৫ ফেব্রুয়ারি ৯৫.৬ শতাংশ মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এর দুদিন পরই তিনি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। এর সুপারিশের ভিত্তিতে ৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় পাকিস্তানের ভাষা প্রশ্নে নতুন করে বিতর্ক উত্থাপন করা হয়। ভাষা কমিশনের কারো কারো অভিমত ছিল আরবী হরফে বাংলা লেখা অথবা রোমান হরফে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা প্রবর্তন। কমিশন আরো সুপারিশ করেন যে, 'বিকল্পভাবে সরকারের পক্ষে তিনটি ভাষাবিদ কমিটি নিয়োগ করা উচিত। একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নয়নকৃত মুদ্রণযোগ্য একটি উর্দু বর্ণমালা নির্ধারণ করবে। দ্বিতীয়টি বাংলা বর্ণমালা সংস্কার করবে এবং তৃতীয়টি উর্দু ও বাংলার জন্য একটি রোমান বর্ণমালা গঠন ও মান নির্ধারণ করবে।" প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বললেন, "সব ভাষা মিলিঝুলি 'পাকিস্তানি ভাষা তৈরি' করতে হবে। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের পর একই সাথে ১৯৬২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিবকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং আট মাস তাকে জেলের মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটকে রাখা হয়।

সবার আগে চাই গণতন্ত্র

৪ অক্টোবর। ১৯৬২। করাচী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল দলমতনির্বিশেষে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "পাকিস্তান কোনো ব্যক্তি, গ্রুপ বা দল বিশেষের নয়। দেশ পাকিস্তানি জনসাধারণের। জনসাধারণকে তাদের চিরন্তন স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই।" তিনি বলেন, "এ কথা তার কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানের হোন জাতীয় ঐক্য প্রচেষ্টায় দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এক গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়। যে শাসনতন্ত্র হবে দেশবাসীর ইচ্ছার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক।" এই ফ্রন্টে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ কাউন্সিল, কৃষক শ্রমিক পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি।[১৯] এনডিএফ গঠনকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। বেসামাল হয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সোহরাওয়ার্দীকে আক্রমণ করে বলেন, 'লোকটা তো পাকিস্তানে বিদেশী'।[২০] পার্টিশনের অনেক পরে তিনি এ দেশে আসেন ও নাগরিকত্ব লাভ করেন। এই সব কথায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী গুরুত্ব দিলেন না। তিনি গণসংযোগের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৬ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করাচী থেকে ঢাকায় এলেন। সাংবাদিকদের বললেন, এন.ডি.এফ-এর কোনো ন্যূনতম সর্বসম্মত কর্মসূচি নেই। শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রীকরণের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলাই হবে ফ্রন্টের প্রধান উদ্দেশ্য। ৭ই অক্টোবর পল্টনে জনাব নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি ও গুজরানওয়ালায় সোহরাওয়ার্দীর জীবনের উপর আক্রমণ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে এই সভা আহূত হয়। পল্টনের জনসভায় লাখ লাখ লোক সমবেত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জনসভায় বলেন, "যে পথে আমরা পা বাড়িয়েছি সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমাদের পথে আছে অজস্র কাঁটা। শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা যদি আপনাদের কাম্য হয়ে থাকে তবে সেই কন্টকাকীর্ণ পথে পাড়ি জমাতে আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। সমবেত লাখ লাখ মানুষকে সোহরাওয়ার্দী প্রশ্ন করলেন: "এই বিরাট জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি জানতে চাই– গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র আপনারা চান কি চান না?" জন সমুদ্রে সমস্বরে গর্জে উঠলেন: "চাই, চাই"। পরদিন ৮ অক্টোবর ('৬২) "দৈনিক ইত্তেফাক" এই জনসভার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখলেন: "জনগণই পাকিস্তানের মালিক এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া শাসতন্ত্রের গণতন্ত্রায়নের সুস্পষ্ট ওয়াদা লইয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল দল ও মতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এক কাতারে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র দেশে গণঐক্যের এক অপূর্ব ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।"

সেদিনই রাতে জনাব নুরুল আমিনের বাড়িতে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতাদের এক বৈঠক বসল। সেখানে শেখ মুজিব ৭ অক্টোবরের জনসভা সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ মহলে মন্তব্য করেছিলেন: "পল্টন ময়দানের জনসমুদ্রের এই প্রাণপ্রবাহ দেখার জন্য যদি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আজ এখানে থাকতেন, তবে তিনি বুঝতে পারতেন যে দেশের মানুষের মনে কী আগুন জ্বলছে।" ১১ অক্টোবর ('৬২) বৃহস্পতিবার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট গণসংযোগ সফরের প্রথম পর্যায়ে ঢাকা থেকে যশোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শেখ মুজিব বললেন: "গোলামির জিঞ্জির ছিন্ন করার জন্য গ্রামে গ্রামে আন্দোলন গড়ে তুলুন।" তিনি আরও বললেন: "দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। যেহেতু জনতাই সরকার গঠন করে, তাই সরকারকে জনগণের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে।" যশোর জনসভায় সভাপতি সৈয়দ শামসুর রহমান শেখ মুজিবকে "যুব বাংলার প্রাণের প্রতীক" বলে স্বাগত জানালেন। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বললেন: "জনগণের ট্যাক্স দেবার অধিকার থাকলে ভোট দেবার অধিকার থাকবে না কেন? কিন্তু ট্যাক্সের বোঝা যতই বেড়ে চলেছে ততই তাদের মৌলিক অধিকারও হরণ করা হচ্ছে।" শেখ মুজিব আরও বলেন: "আজ আমাদের কোন দল নেই। আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বলে আজ আর আলাদা আলাদা কোন দল নেই। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র পথ হলো: দলমত নির্বাসন দিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েম করা।" যশোর থেকে খুলনা। খুলনা থেকে বরিশাল। বরিশাল থেকে চাঁদপুর হয়ে ঢাকা ফিরে আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজশাহী যাত্রা। প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঝটিকা সফর। আতাউর রহমান খান তাঁর "স্বৈরাচারের দশ বছর" বইতে সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব ও অন্য পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের এই সফরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন: "সারাদেশ জেগে উঠল। মানুষ অভূতপূর্ব উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। রাস্তাঘাট, ট্রেন-স্টিমার, হাট-ঘাট, বাজার-বন্দর লোকে লোকারণ্য। জনসভায় তিল ধারণের স্থান নেই। জাগরণের হিল্লোলে দেশ কাঁপায়ে তুলল।" উপরের সফরসূচী ছাড়াও জনতার আগ্রহে, অনুরোধে পথে বহু জায়গায় সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবকে আকস্মিকভাবে জনসভা করতে হয়েছে। ভাষণ দিতে হয়েছে। বিভিন্ন জনসভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন: "আমাদের মধ্যে আর কোনো দলাদলি নেই। বিবাদ নেই। জাতির জীবনে আজ গভীর সংকট। আমরা যদি দলাদলি করি তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, কিন্তু ভেতরে বাইরে অপচেষ্টা চলছে এই ঐক্যকে বিনষ্ট করার। আপনারা শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নীতিগুলো প্রচারে সাহায্য করুন। পাকিস্তানকে দেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করুন। শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন ভাষণে বলেন: "পাকিস্তানের জনসাধারণই দেশের একমাত্র মালিক এবং দেশকে শাসন করার অধিকার একমাত্র তাদেরই। তাই পাকিস্তানে জনগণের শাসন কায়েমই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য একতাবদ্ধ হোন।" আবেগে উদ্বেল হয়ে শেখ মুজিব জনতার উদ্দেশে বলেন: "আমরা কেউ আজ আর আপনাদের নেতা নই। আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে আমরা সবাই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নগণ্য স্বেচ্ছাসেবক মাত্র। আজ সবাই আমরা গণতান্ত্রিক শিবিরের কর্মী, সবাই আমরা একই কাফেলায়।" ৬২ সালের ২৫ অক্টোবর তারা দুজনে ঢাকায় ফিরে এলেন। পরদিন ময়মনসিংহে সার্কিট হাউজ ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী গণসংযোগ সফরের প্রথম পর্যায় শেষ হলো।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস। ঠিক সেই সময় আন্তর্জাতিক জগতে অত্যন্ত গুরুতর দুটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। একটি পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কিউবায় সংকট উপলক্ষ করে দুনিয়ার বৃহত্তম দুটি শক্তি রাশিয়া ও আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিনারায় এসে দাঁড়ায়। আরেকটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় দ্বারপ্রান্তে নেফায় ও আসামে চীন-ভারত সংঘর্ষ। পূর্ব ভারতে চীনা অভিযান নিয়ে পূর্ব বঙ্গের মানুষ ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে স্বভাবতই যথেষ্ট উত্তেজনা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ এই যুদ্ধ হচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় দ্বারপ্রান্তে। এই সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গণসংযোগ সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭ নভেম্বর মাদারীপুরে গেলেন। সেখানে এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব বললেন: "শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়নের মধ্যেই আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।" ১০ নভেম্বর শনিবার তারা গেলেন সিলেটে। সেখানে এক উদ্দীপ্ত ভাষণে শেখ মুজিব বলেন: "প্রায় পাঁচ বছর পরে আমার আবার সিলেটে আসার সুযোগ হলো। এর মধ্যে দীর্ঘ চার বছর ধরেই আমাদের দেশে সামরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসন চলছে। এই রাষ্ট্র আপনাদের বেদখল হয়ে গিয়েছে। একে আবার দখল করতে হবে। এর জন্য আমাদের বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।" ১১ নভেম্বর রবিবার নোয়াখালীতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব বললেন "শত দমননীতির মুখেও জনগণের কাফেলা চলতে থাকবে।"

জনাব সোহরাওয়ার্দী ১৩ নভেম্বর করাচী ফিরে গেলেন, কিন্তু যাওয়ার আগে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের" সংগঠন ও কমিটি করেন। জনাব নুরুল আমিনকে করা হয়েছিল আহ্বায়ক। সোহরাওয়ার্দী নুরুল আমিনকে "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের" পূর্ব পাকিস্তান শাখার নেতা নির্বাচিত করায় শেখ মুজিব তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "নুরুল আমিনের মতো একজন প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদের অধীনে কাজ করা আমাদের পক্ষে কি করে সম্ভব?" তখন সোহরাওয়ার্দী মুজিবকে বোঝালেন যে, একটি ঝটিকা-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বন্যাপ্লাবিত দ্বীপে মানুষ, বাঘ, সাপ, সিংহ সবাইকে সহাবস্থান করতে হয় এবং দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। সে সময় কে ভালো, কে মন্দ তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেখ মুজিব তাঁর নেতার নির্দেশ মেনে নিলেন। কিন্তু তিনি কোনো দিন মনে-প্রাণে এন.ডি. এফ-এর নেতৃত্বে নুরুল আমিনের অবস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারেননি। ১৪ নভেম্বর শেখ মুজিব শেরে বাংলার "স্মৃতি-সৌধ কমিটি" পুনর্গঠনের দাবি জানালেন। বললেন: "বর্তমান কমিটি বাস্তবে কোন কাজই করেনি।"

জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর গণসংযোগ সফরের তৃতীয় পর্যায়ে আবার ঢাকায় এলেন। ২৩ নভেম্বর ফরিদপুরে ও পরদিন ২৪ নভেম্বর কুষ্টিয়ায় দুটি বিশাল জনসভায় তিনি ও শেখ মুজিব ভাষণ দিলেন। শেখ মুজিব বলেন: "প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের এই গণতন্ত্র বিরাট এক ধাপ্পা। জঙ্গীশাহীর হাত থেকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের ছিনিয়ে আনতে হবে। আপনারা প্রস্তুত হন। আর সময় নেই।"

জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর সফরসূচীর চতুর্থ পর্যায়ে ৩ ডিসেম্বর ('৬২) পুনরায় পূর্ববঙ্গে এলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব ৫ ডিসেম্বর উত্তর বাংলা সফরে বেরুলেন। ৫ ডিসেম্বর বগুড়ায়, ৬ দিনাজপুরে ও ৭ পাবনায় জনসভায় তাঁরা ভাষণ দিলেন। তাঁরা বলেন: "বহুমুখী জাতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।" পূর্ব বাংলার মাটিতে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই শেষ পরিক্রমা। এবার ঢাকা বিমানবন্দর থেকে তিনি যে বিদায় নিলেন, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সোহরাওয়ার্দীর সেই শেষ যাত্রা।

১৯৬২ সালে উদ্বিগ্ন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ১৮ ডিসেম্বর ন'দিনের সফরে পূর্ব পাকিস্তানে এলেন। সিলেট গেলেন। রাজশাহীতে গেলেন। ভেবেছিলেন তিনি একবার গিয়ে দাঁড়ালেই সোহরাওয়ার্দী মুজিবের সফরের প্রভাব তিনি কাটিয়ে দিতে পারবেন। ২৩ ডিসেম্বর ঢাকায় আইনজীবীদের এক সম্মেলনে আইয়ুব বেশ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বললেন: "আমার দেয়া শাসনতন্ত্র পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। এই শাসনতন্ত্র সব গণতান্ত্রিক অধিকারের গ্যারান্টি স্বরূপ।" কিন্তু রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দুটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। ১. "এবডো" করা রাজনীতিবিদরা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত বা রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতে পারবেন না। এ ছাড়া তাঁদের কোনো জনসভায় বক্তৃতা বা রাজনৈতিক বিবৃতি দেয়া এমন কি প্রেস-কনফারেন্সে কিছু বলাও ছ-মাসের জন্য নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হলো। ২. অর্ডিনান্সটিতে প্রেসিডেন্ট "এবডো" করা রাজনীতিবিদরা আবেদন জানালে তাঁদের অযোগ্যতার মেয়াদ কমিয়ে দেয়ার বা মওকুব করার বিষয়টি স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। ঠিক এ সময়ে এ দুটি অর্ডিনান্স থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব এবডো করা রাজনীতিবিদদের নিজের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ বলেই গণ্য করছেন। তাই নতুন করে এসব বাধা-নিষেধ যার মূল উদ্দেশ্য ছিল "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট" ও এর সঙ্গে যুক্ত "এবডো" করা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অধিকার খর্ব করা। সংগঠন ছত্রভঙ্গ করে দেয়া। অন্যদিকে পোডো অর্থাৎ সরকারি পদলাভে অযোগ্যতা, সে সকল অফিসার ও কর্মকর্তার বাংলাদেশের প্রতি অধিক অনুগত তাদের চাকরি থেকে বিদায়ের ব্যবস্থাকরণ।

জনাব সোহরাওয়ার্দী করাচীর জিন্না সেন্ট্রাল হাসপাতালে তাঁর রোগ শয্যা থেকে একটি বিবৃতিতে আইয়ুবের নয়া অর্ডিনান্স-দুটির তীব্র সমালোচনা করে বললেন: "This is the most blatant form of corruption on the one hand and coercion and suppression on the other" এমন কি করাচীর ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল "ডন" পত্রিকাও ৯ জানুয়ারি ('৬৩) তাঁদের সম্পাদকীয়তে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের এই পদক্ষেপকে "descent to pettiness" বলে মন্তব্য করলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ৮ জানুয়ারি ('৬৩) একটি বিবৃতিতে বললেন "এবডোভুক্ত রাজনীতিকদের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে প্রেসিডেন্ট যে নয়া অর্ডিনান্স জারি করেছেন তা এই শাসন ব্যবস্থার দমনমূলক আইনগুলোর ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশেই এর দ্বিতীয় নজির পাওয়া যাবে না। অর্ডিনান্স দুটি শুধু এবডোভুক্ত রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়নি, বস্তুত এগুলো গোটা জাতির কণ্ঠরোধেরই একটি ব্যবস্থা। জনসাধারণের ধৈর্য চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে। তারা শাসক কর্তৃপক্ষের এই অবৈধ হস্তক্ষেপের কাছে কোনোমতেই নতিস্বীকার করবে না।"

এদিকে ঢাকায় প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র প্রতিরোধের সামনে দিশাহারা প্রাদেশিক সরকার আকস্মিকভাবে রমজান মাসকে ছুটি হিসেবে গণ্য করে ১৬ জানুয়ারি ('৬৩) থেকে ২ মার্চ ('৬৩) পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার আদেশ দিতে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছিলেন। প্রসঙ্গত এই সময় ঢাকায় ছাত্র আন্দোলনকে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার বিশিষ্ট পণ্ডিত জনাব মাহমুদ হোসেন, এভাবে দীর্ঘ ছুটি দেয়ার সরকারি চাপ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে সরকারি হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। এ ছাড়া যখন তখন সরকারি হুকুমে ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও অন্যান্য শিক্ষা ও ছাত্র-দলন নীতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারি নির্দেশ বিশেষত "অশিক্ষিত" গভর্নর মোনায়েম খানের হুকুমনামা মেনে চলা মাহমুদ হোসেন সাহেবের পক্ষে একেবারেই সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি নির্ভীকভাবে এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মোনায়েম খানের কাছে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন। ক্রমে মোনায়েম খানের অসভ্যতা ও অভব্যতা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে ভাইস চ্যান্সেলর মাহমুদ হোসেন হতাশা বিরক্তির এক চরম মুহূর্তে নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে পদত্যাগ করলেন ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩।

মওলানা ভাসানী '৫৮ সাল থেকেই বন্দি ছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে ২৭ অক্টোবর তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোহরাওয়ার্দী, নূরুল আমীন, আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, শাহ আজিজুর রহমানসহ অনেক নেতা হাসপাতালে ভাসানীকে দেখতে যান ২৯ অক্টোবর। তাঁরা তাঁকে অনশন ভঙ্গের জন্য অনুরোধ করেন। তা ছাড়া সরকারের প্রতিও তাঁরা জোর দাবি জানান তাঁকে মুক্তি দেয়ার জন্য। সকলের চাপের মুখে '৬২-র ৩ নভেম্বর ভাসানী মুক্তি পান।

অভ্যন্তরীণ অবস্থা থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি সন্তোষে চলে যান। ১৬ নভেম্বর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রাদেশিক ন্যাপের নির্বাহী পরিষদের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। সেখানে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচিত হয়। ভাসানী সন্তোষে ছিলেন বলে দলের এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল সেখানে গিয়ে তাঁর মতামত নিয়ে আসেন। তিনি সোহরাওয়ার্দী গঠিত এনডিএফ-এর সঙ্গে ন্যাপ নেতাদের কাজ করার অনুমতি দেন।[২১]

AMARBOI.COM

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন

আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ মার্চ ৬৩ ঢাকা। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন। ১৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে দেশরক্ষা বিভাগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি কাশেম মালিক বিরোধী দলের তীর্যক প্রশ্নের জবাবে বলতে বাধ্য হন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সামরিক স্কুল, কলেজ বা অর্ডিনান্স ফ্যাক্টোরি স্থাপনের কোনো ইচ্ছা কেন্দ্রের নেই। তিনি বলতে বাধ্য হন আইয়ুবের আমলে ৭৯০ জন সেকশন অফিসারের যে নতুন পদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ জন। স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানের ৩০৭ জন অফিসারের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানি ছিল মাত্র ১৪ জন।

৭ এপ্রিল ঢাকা বার লাইব্রেরিতে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতাকর্মীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। জনসাধারণ ও আইন সভার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, ফেডারেল ও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঐ দিন ঢাকায় ছিলেন। আওয়ামী লীগ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট হাউসে প্রেস কনফারেন্সে বলেন, "গণতন্ত্র একটি বিদেশী মাল। আমি উদ্ভ্রান্ত দার্শনিক নই। দেশকে একটি উপযুক্ত শাসনতন্ত্র দেয়াই আমার কাজ ছিল এবং আমার বিশ্বাস যে বর্তমান শাসনতন্ত্রই দেশের পক্ষে উপযুক্ত।" এ সময় রেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করছিল। তার সমর্থনে ছাত্ররা কার্জন হলে বিক্ষোভরত থাকা অবস্থায় ১০ এপ্রিল পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ৭ মে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে পশ্চিম পাকিস্তানে এনডিএফ নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, খাজা মোহাম্মদ রফিক, ন্যাপের মোহাম্মদ আলী কাসুরী এদের গ্রেফতার করা হল। পূর্ব পাকিস্তানে জুলাই মাসের ৩,৪,৫ তারিখে নুরুল আমিনের বাসভবনে এনডিএফ-এর বৈঠক বসে এবং বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় প্রতিটি জেলায় এর শাখা গঠন করা হবে। কিছুদিন পর এনডিএফ থেকে মওলানা ভাসানী নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ভাসানীকে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেন, "হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বা নুরুল আমিনের সঙ্গে তিনি কিভাবে কাজ করেন?"

১৯ জুলাই জাতীয় পরিষদের ১৭ জন পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য কেন্দ্রীয় রাজধানী ঢাকায় স্থানন্তরের দাবি জানান। এ দাবি সমর্থন করে এনডিএফ নেতারা বললেন, ঢাকায় দেশের কেন্দ্রীয় রাজধানীর স্থানান্তরের প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগণ একমত ও ঐক্যবদ্ধ।

AMARBOI.COM

আইয়ুবের চাল

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচনে এনডিএফ সম্মিলিতভাবে প্রার্থী দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর প্রেক্ষিতে, ২৭ আগস্ট প্রেসিডেন্ট আইয়ুব একটি অর্ডিনান্স জারি করে ফতোয়া দিয়েছেন যে জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের জন্য কোনো নির্বাচনে বা উপনির্বাচনের প্রচার অভিযানে প্রেসিডেন্ট, প্রাদেশিক গভর্নর বা মন্ত্রীদের অংশগ্রহণের কোনো বাধা থাকবে না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের এই অর্ডিনান্স পাকিস্তানে প্রভাবমুক্ত নির্বাচনের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিল।

শেখ মুজিবকে লন্ডনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন যে, তিনি তখনও পার্টি অর্থাৎ আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের বিরোধী। তিনি তখনও মনে করতেন যে, "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের" মাধ্যমেই দলহীন রাজনীতি দ্বারা দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত। তখনও তাঁর বিশ্বাস ছিল যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিয়ে দলাদলি করতে গেলে দেশের মানুষ আবার হতাশ এবং দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

২ সেপ্টেম্বর ('৬৩) জঙ্গী শাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আবার তাঁর হিংস্র রূপ প্রকাশ করলেন। তিনি এক নয়া অর্ডিনান্স জারি করে সারা পাকিস্তানে সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকার উপর নানা বিধি-নিষেধের আরোপ করেন। প্রাদেশিক বা জাতীয় পরিষদের অথবা হাইকোর্টের কার্যবিবরণী স্পিকার অথবা চিফ জাস্টিস বা তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত অফিসারদের দিয়ে পরীক্ষা না করিয়ে ছাপা যাবে না। প্রাদেশিক বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারিত প্রেস নোট প্রকাশ করলে তা পুরাপুরিই ছাপতে হবে। এর অন্যথা হলে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার ছাপাখানা সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। একজন সাহসী সাংবাদিক পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জনাব গোলাম নবী মেননকে জিজ্ঞেস করেন: "স্যার, ভাষাগত ভুল থাকলেও কি প্রেস নোট হুবহু ছাপতে হবে?" উজির সাহেব অম্লান বদনে জবাব দিয়েছিলেন: "হ্যাঁ"। এই কুখ্যাত অর্ডিনান্সে আরও বলা হয়েছিল যে, যে কোনো ছাপাখানা বা সংবাদপত্র সম্পর্কে তদন্ত কমিশন গঠনের পূর্ণ ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

২০ অক্টোবর ('৬৩) রবিবার শেখ মুজিব ঢাকায় ধানমণ্ডিতে তাঁর বাসভবনে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে গোপালগঞ্জে ও খুলনায় উপনির্বাচনের গভর্নর থেকে শুরু করে চৌকিদার পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীরা কীভাবে ন্যক্কারজনকভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন, ভোটারদের বিশেষত সংখ্যালঘু ভোটারদের কি জঘন্যভাবে ভীতি প্রদর্শন করেছেন তার এক নগ্ন চিত্র তুলে ধরেন। বলেন যে, এত যে কম সংখ্যক ভোটার তারাও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেননি। শেখ মুজিব আরও বলেন যে, দেশের এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে আজ আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি যে পূর্ব পাকিস্তান পিন্ডি-করাচীর একটি কলোনিতে পর্যবসিত হয়েছে এবং এও আমরা বুঝতে পারছি যে, ঔপনিবেশিকতার এই শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, কেন্দ্রীয় রাজধানী, পুঁজি গঠন, সেনাবাহিনী এবং রাজনৈতিক সমতা এই পাঁচটি বিষয়কে শেখ মুজিব রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রের পাঁচটি স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করে বললেন: "এই পাঁচটি স্তম্ভের চারটিতে পূর্ব পাকিস্তানিদের কোন অধিকার এখন নেই বা আগেও ছিল না। বাঙালিদের একমাত্র অধিকার ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু আজ তাও নেই। প্রেস কনফারেন্স শেষে শেখ মুজিব আইয়ুব ও তাঁর তল্পিবাহক সরকারকে হুঁশিয়ারি জানিয়ে বললেন: বাঙালিদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়ার প্রতি ক্রমাগত উপেক্ষা প্রদর্শন করে রাওয়ালপিন্ডি যে খেলায় মেতে উঠেছে তা আগুন নিয়ে খেলারই শামিল এবং এই বিপজ্জনক খেলার ভয়াবহ পরিণতি একদিন এই তথাকথিত রাষ্ট্রনায়কদের অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২৯ নভেম্বর তাঁর ইন্তেকালের মাত্র দু-দিন আগে বৈরুত থেকে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে নিজের হাতে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন   একথা ক'টি শুধু তোমারই জন্য। মরতে পারলেই আমি সুখী হব। বেঁচে থাকার আর কি সার্থকতা? কারো কোন কাজে আমি আর আসব না। কেবল নিজের জন্যই যদি বাঁচতে হয়, তবে সে বাঁচায় আর লাভ কি?"

২৯ নভেম্বর এই চিঠিতে অর্থাৎ সম্ভবত পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো সহকর্মীকে লেখা তাঁর জীবনের এই শেষ চিঠি আরম্ভেই সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ মুজিবুর রহমানের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন: "আমাকে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাগিদ দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমার একান্ত ইচ্ছা এ মাসের শেষ দিকে আমি দেশে ফিরে আসব।" কিন্তু সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুব খানকে কালো পতাকা

১৯৬২ সালের জানুয়ারি শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের রাজশাহী সফরকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে ওঠে। লৌহ শাসনের এই দুঃসহ দিনগুলো তাঁর বিরুদ্ধে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ সাংঘাতিক দুঃসাহস। রাজশাহীর ছাত্র-সমাজ দুঃসাহসে ভর করে ভয়ানক ঝুঁকি মাথায় তুলে নেয়। মিটিং বসে ফুলার হোস্টেলের ছাদে। আইয়ুব খানকে কালোপতাকা দেখানোর সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তখন এলোমেলো, অসংগঠিত। আইয়ুবের আগমনের একমাস পূর্ব থেকে নাটোর-রাজশাহী রোডে পুলিশের টহল। নিরাপত্তা মহড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পুলিশ পোস্ট বসানো হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার। এসবের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া ঘনীভূত। এ যেন ভিন দেশি রাজার আগমন! ছাত্রদের বৈঠক। ছোট আকারে। এ সভায় সরদার আমজাদ হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক শক্তি তুলে ধরেন। রাজশাহী সরকারি কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে আবু আলম ভি.পি. এবং মোঃ রফিক, প্রো ভি. পি. নির্বাচিত হন। সে দিন রাজশাহী কলেজে আবু আলমের সভাপতিত্বে সিদ্ধান্ত হয় যে, আইয়ুব খানের গাড়ির ওপর ইস্টক বর্ষণ, কালোপতাকা প্রদর্শন ও আইয়ুব বিরোধী স্লোগান তোলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিও সভা থেকে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি করা হয়। আইয়ুবের রাজশাহী আগমনের দিনে রাজশাহী কলেজের ছাত্রদের সেই দুঃসাহসী অভিযান। বিদ্রোহে বিক্ষুব্ধ। প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিরোধের শক্তি নিয়ে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান, প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের গাড়িবহরকে সার্কিট হাউসের যাত্রাপথে রাজশাহী কলেজের সামনে ছাত্ররা রুখে দেয়। সাহেব বাজারের তৎকালীন সরু অপ্রশস্ত রাস্তার মুখে রাজশাহী কলেজের গেটের সামনে উন্মত্ত স্লোগান। পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ। পরিণত হলো ভয়াল আর্তচিৎকার। নিউ হোস্টেলের সামনে তৎকালীন 'আল হেলাল মেডিক্যাল হোস্টেলে'র মাঝের রাস্তায় আইয়ুব খানের কালো শেভ্রোলেট। হোস্টেলের ছাদ থেকে অসংখ্য ইট ও মাটির কলস তাঁর গাড়ি বহরে নিক্ষিপ্ত হয়। নিউ হোস্টেলের ভেতরে ঢুকে সরকারি পান্ডারা সাধারণ ছাত্রদের বেধড়ক পিটাল। নির্যাতনের এক করুণ কাহিনী। প্রতিটি কামরায় ভাংচুর আর নিরপরাধদের ওপর নির্দয় হামলা, মারপিট। জঘন্য নির্যাতন। আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন আবু আলম, রফিক, মাইদুল ইসলাম মুকুল, মঞ্জুর হোসেন, মাইদুল ইসলাম, রফিকসহ ছাত্রনেতারা। প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর নির্যাতনের নেতৃত্ব দেন মুসলিম লীগ নেতা এবং তৎকালীন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি জনাব মুহম্মদ আয়েনুদ্দীন এবং সরকারি দলের ছাত্রনেতা এন. এস. এফ-এর জাফর ইমাম।[২২]

১৯৬৩ সালের ১১ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। ছাত্রলীগ দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এসময় আন্দোলন চালিয়ে নেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে গভর্নর ও চ্যান্সেলর মোনায়েম খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর জনাব মাহমুদ হোসেনকে শিক্ষক ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বললে তিনি অস্বীকৃতি জানান। তিনি ১২ ফেব্রুয়ারি বলেন, "কোন শিক্ষাবিদ কখনো পুলিশের মনোভাব নিতে পারেন না।" গভর্নর মোনায়েম খান তার বশংবদ ময়মনসিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ ড. এম. ওসমান গনিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি সামরিক শাসন-উত্তর প্রথম শহীদ দিবসে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ডাকসু ও সংসদের ২৯ জন ছাত্রনেতাদের স্বাক্ষরে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অটল থাকার লক্ষ্যে "প্রতিজ্ঞা ও কর্মে, শপথে ও সংকল্পে" দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনের সামনে আমতলায় অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করে এই প্রথমবারের মতো ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। কালো ব্যাচ ধারণ, আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছাত্রনেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাংলা বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকগণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

ছাত্র রাজনীতির বৈশিষ্ট্য

ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হলো ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সংগঠন কর্তৃক রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তির প্রতি অনীহা। ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলনের ভ্যানগার্ড হিসেবে কাজ করেছে। সে সময়ে ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলোর অগ্রবাহিনী হিসেবে আন্দোলন পরিচালনা করেছে। তার অর্থ এই নয় যে, রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল না। অপরিহার্য না হলে রাজনৈতিক নেতৃত্বও ছাত্রদের সরাসরি 'ব্যবহার' করতে আসেনি। তবে ছাত্র রাজনীতিতে দমন-পীড়নে রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিবাদ জানাতেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহমেদ ছাত্রদের উপর যেকোনো হামলা, গ্রেফতার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। ১৯৬৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। শেখ মুজিব সরাসরি এক বিবৃতিতে বলেন: "বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার যে কেবল দেশের প্রশাসন ক্ষেত্রেই নয়, বস্তুত শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গনে পর্যন্ত বল প্রয়োগ ও দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে পদত্যাগে বাধ্য করা তার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকারের এই জঘন্য কার্যকলাপ নিজেদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ব্যবহার করার ব্যাপারে তাদের প্রয়োগের এক নগ্ন কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ক্ষুব্ধ পদত্যাগ ও সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপে ছাত্র সমাজের মধ্যে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকাশ্য এই প্রতিবাদ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁর 'গ্রহণযোগ্যতার' মাপকাঠিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ষাটের দশকের ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলন সম্পর্কে ঐতিহাসিক কারণেই কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। কেননা পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা ব্যতীত মাত্র আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় হলো রাজশাহী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়। বৃহত্তর খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রধানত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। তাছাড়া রাজশাহী সরকারি কলেজ ব্রিটিশ আমল থেকেই সুনাম অর্জন করেছিল।

রাজশাহী কলেজে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনের কাজ শুরু হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে রাকসুতে সৈয়দ মাযহারুল হক বাকি সহ-সভাপতি ও আব্দুর রউফ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। শাহ মখদুম ছাত্রাবাস ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ছাত্রাবাস। শাহ মখদুম ছাত্রাবাসের প্রথম সংসদ নির্বাচনে মুহম্মদ জাকারিয়া সহসভাপতি এবং সরদার আমজাদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সংকটের সময়ে স্বৈরচারীর শাসনের বিরুদ্ধে সরকারবিরোধী সাহিত্য-স্মরণিকার দায়িত্ব পালন করেন আবু সাইয়িদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিদারুণ আর্থিক সংকট ছিল। ছাত্ররা নিজেরা স্বপ্রণোদিতভাবে চাঁদা দিয়ে তহবিল সংগ্রহ করতেন। বাইরে থেকে অর্থ প্রাপ্তির তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। ছাত্ররাও সুনজরে দেখেনি।

স্বাধীনতার ভাবনা

১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি কে. এম. ওবায়দুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান। এ সময় রাজশাহীর ছাত্রনেতা আবু সাইয়িদ ঢাকায় এসে ইকবাল হলের একটি রুমে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আবু সাইয়িদকে নিয়ে ইকবাল হল সংলগ্ন পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বের মাঠে বসেন। তিনি পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপক বৈষম্য তুলে ধরেন। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এক ছাত্রনেতার কাছ থেকে সরাসরি স্বাধীন বাংলার মন্ত্র উচ্চারিত হওয়া নিঃসন্দেহে অগ্রিম বার্তা হিসেবে বিবেচ্য। মূলত এ সময় থেকেই স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়। পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য এ সময় 'নিউক্লিয়াস' গঠিত হয়।[২৩] পরবর্তীতে জননেতা আবদুর রাজ্জাক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য 'নিউক্লিয়াস' গঠন করা হয়। উক্ত 'নিউক্লিয়াস'-এ সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, আরেফ আহমেদ ও পরবর্তীতে তোফায়েল আহমেদ যুক্ত ছিলেন।

'৬২ সালে শেরে বাংলা ফজলুল হকের মৃত্যু, '৬৩-এ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু, এবডোর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের '৬২ সালের নির্বাচনে বঞ্চিতকরণ, নতুন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে রোমান হরফে বাংলা লেখা, রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধের উদ্যোগ এবং ব্যাপক শোষণ-বৈষম্য ও স্বৈরশাসন, জেল-জুলুম দেশব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, ঠিক এমনি সময়ে ছাত্র সমাজের মাঝে নতুন করে সরকারবিরোধী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়ামী লীগ সম্মেলন

১৯৬৪ সালের ৬ মার্চ গ্রীন রোডে আমবাগানে মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৩ দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। সাবেক মুসলিম লীগ নেতা শাহ্ আজিজুর রহমান ৬ মার্চ আওয়ামী লীগে যোগ দেন। সম্মেলনে মূল দাবি প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, স্বায়ত্তশাসন এবং বৈষ্যমের অবসান।

রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবনের পূর্বেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের শাখা গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে শাহ্জাহান বিশ্বাস সভাপতি এবং সালাহ্উদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অনুরূপভাবে নুরুল ইসলাম ঠাণ্ডুকে আহ্বায়ক করে রাজশাহী জেলা ছাত্রলীগ গঠিত হয়। ঐ সময় রাজশাহী সরকারি কলেজে ছাত্রলীগের গোড়া পত্তন করেন নুরুল আলম, সাইফুল ইসলাম, মোস্তাক আহমেদ, ফকির আব্দুর রাজ্জাক, মোজাফফর হোসেন, নাজির উদ্দিন, শফিউল ইসলাম, সোহরাব হোসেন রবি, নজরুল ইসলাম, আবদুল করিম প্রমুখ, তাদের নিয়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়।

মোনায়েম খানের ভাষা তলিয়ে যায়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাজহারুল হক বাকি ও সিরাজুল ইসলামের কর্মতৎপরতায় অনার্স ছাত্রদের মধ্যে আওয়ামীকেন্দ্রিক একটি টিম গড়ে ওঠে। যা পরবর্তীতে আন্দোলন, সংগঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক বিষয়ে প্রতিবাদী শক্তি 'নিউক্লিয়াস' হিসেবে কাজ করে। এ টিমে ছাত্রদের মধ্যে শাহ্জাহান বিশ্বাস, সালাহউদ্দীন আহমেদ, আয়েশ উদ্দীন, নেফাজ উদ্দীন, সরদার আমজাদ হোসেন, আবু সাইয়িদ, মোজাফফর আহমেদ, হামিদুর রহমান, খলিলুর রহমান, আহসান হাবিব, জুলফিকার মতিন প্রমুখ উল্লেখ্য।

দেশের বিরাজমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ হতে সমাবর্তনের ঘোষণা আসে। গভর্নর মোনায়েম খান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবেন। এ ব্যাপারটি ছাত্র সমাজ মেনে নিতে পারেনি। সমাবর্তনের ঘোষণা হওয়ার পর থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এক অস্বস্তিকর থমথমে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তৎকালিন উপাচার্য ড. মোমতাজ উদ্দীন আহমেদ ছিলেন মোনায়েম খানের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ শান্ত এবং কনভোকেশন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেন। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি জিন্নাহ হলের প্রভোস্ট অফিসে নির্বাচিত ছাত্র নেতাদের ডাকেন। সভায় হল ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রথমে তিনি 'শান্ত' ও 'ভদ্র'ভাবে কনভোকেশন সম্পর্কে একাডেমিক কর্তব্য ব্যাখ্যা করেন। তারপর এ অনুষ্ঠানে তাঁর করণীয় সম্পর্কে খোলামেলাভাবে তুলে ধরেন। প্রথম দিকে স্বাভাবিকভাবে সভা শুরু হয়। এক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের ভি.পি. মাজহারুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হক বাকি, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রউফ মোনায়েম খানকে 'খুনি' ও আইয়ুব খানের 'লাঠিয়াল' হিসেবে উল্লেখ করেন। ছাত্রনেতাদের মুক্তি দাবি করেন। বৈঠক শেষ হয় অস্বাভাবিকভাবে। কারণ ছাত্র প্রতিনিধিরা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, তারা গভর্নরের আগমনকে প্রতিরোধ করবেন।[২৪] ভিসির সাথে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হয়। তিনি হুমকি দেন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। ভি.সি'র সাথে বৈঠকের পর পরই ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী মিটিং মিছিল সমাবেশ ঘোষণা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর গরম হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ফিজিক্স বিল্ডিংয়ের পেছনে প্যান্ডেল তৈরি শুরু হয়। ডেকোরেটরদের নির্মাণ সামগ্রী আসছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রাজুয়েট এবং মাস্টার ডিগ্রিধারী ছাত্ররাও আসতে শুরু করেছে। সার্টিফিকেট গ্রহণের নিয়মাবলি পালনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যাতায়াত শুরু করেন। অন্যদিকে ব্যাপক মিছিল। প্রতিবাদ। সমাবেশ। ১৪ তারিখ বিকেলে কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার সামনে ছাত্র জমায়েত। এ সভায় দৃঢ়ভাবে রাজশাহীতে উপস্থিত সার্টিফিকেট গ্রহণকারী ছাত্রদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়। এ সভায় মাজহারুল বাকি সভাপতিত্ব করেন। আবদুর রউফ, সরদার আমজাদ হোসেন, মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। বিশেষভাবে বক্তব্য রাখেন আবদুর রৌফ চৌধুরী। রাতের মধ্যেই আগতদের ক্যাম্পাস ত্যাগ করার আহবান জানানো হয়। এছাড়া তাদের ভয়াবহ পরিণতির জন্য তারাই দায়ী হবেন। পুলিশ রাতে আবদুর রউফসহ বহু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেফতার করল। সহ-সভাপতি মাজহারুল হক বাকি ও সরদার আমজাদ প্রমুখ ছাত্র নেতা আত্মগোপন করেন। অন্ধকার রাতে নির্ধারিত প্যান্ডেলের এক অংশে আগুন ধরে। ক্যাম্পাসে ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। সকাল ১০টায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিয়ে গভর্নর এবং চ্যান্সেলর আব্দুল মোনায়েম খান ফিজিক্স বিল্ডিংয়ের পেছনের গেটে হেলিকপ্টারে নামলে ছাত্ররা প্রতিরোধ করে। পুলিশ লাটিচার্জ করে। ছাত্ররা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। বাইরে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কনভোকেশন প্যান্ডেলে প্রখ্যাত ছাত্র নেতা আব্দুর রৌফ চৌধুরী ও যশোরের রেজা শাজাহানের নেতৃত্বে প্যান্ডেলের ভেতরে 'নিরাপত্তা কার্ডধারী' ছাত্রদের মধ্য থেকে স্লোগান শুরু হয়। অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে চ্যান্সেলর মোনায়েম খান কিছু প্রতীকী সার্টিফিকেট প্রদান করেন। প্যান্ডেলের মধ্যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও সরকারবিরোধী স্লোগানে তার ভাষণ তলিয়ে যায়। মঞ্চ থেকে তিনি নেমে যেতে বাধ্য হন।

রাজশাহীতে শেখ মুজিবঃ আপদ-বিপদ-মুসিবৎ

১৯৬৪ সালের মে মাস। রাজশাহী নগর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি মনিরুজ্জামান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মে রাজশাহীতে জনসভা করবেন। তিনি প্রচার-প্রচারণায় ছাত্রদের সহযোগিতা চান। শাহজাহান বিশ্বাস, সালাহউদ্দিন আহমেদ, সরদার আমজাদ হোসেন, আবু সাইয়িদ, নাজিম উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ শেখ মুজিবের জনসভাকে সফল করার কর্মপন্থা গ্রহণ করে। মাইকিং করার জন্য চট্টগ্রামের নাজিম উদ্দিনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ছাত্রনেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজিম উদ্দিনের যেমন ছিল শক্ত শরীর তেমনি ভারি কণ্ঠ। সাহস ছিল প্রচণ্ড। ৫ মে মাইকিং করতে গেলে হেতেম খানার মোড়ে তাকে এন.এস.এফ.-এর ছাত্র নামধারী পান্ডারা বেদম প্রহার করে। তার মাথা ফেটে যায়। সারাশরীরে রক্ত। গভর্নর মোনায়েম খানের গুন্ডারা প্রকাশ্যে হুমকি দেয়, 'শেখ মুজিবকে সভা করতে দেয়া হবে না।' চারদিকে সন্ত্রাসের রাজত্ব। এমনি অবস্থায় রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট মুজিবর রহমান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরিস্থিতির পর্যালোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের একটি ঘরোয়া বৈঠক বসে। বৈঠক চলাকালীন মুজিবুর রহমানের অনুজ মোঃ রফিক এসে উপস্থিত হন। সিদ্ধান্ত হয় অশুভ শক্তির মোকাবেলায় শক্তি প্রয়োগের। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে রফিক, আবু সাইয়িদ প্রমুখ রাজশাহীর দর্গাপাড়ায় আনফোরের কাছে যায়। পুনরায় প্রচার কাজ শুরু হলে মোনায়েম-এর পান্ডারা হামলা করলে আনফোরের নেতৃত্বে ছাত্র-যুবকেরা তা প্রতিহত করে। এই প্রতিরোধে রাজশাহী শহরের ছাত্ররা নূরুল ইসলাম ঠাণ্ডুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। আনফোর দর্গাপাড়ায় সাহসী একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিত। তার সক্রিয় সহযোগিতায় প্রচার কাজ সম্পন্ন হয়।

৭ মে। ১৯৬৪ সাল। রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী ভবন মোহন পার্ক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিরাট মিছিলসহকারে উক্ত জনসভায় ছাত্ররা যোগ দেন। শ্লোগান ছিল "আইয়ুব-মোনায়েমের গুন্ডারা হুঁশিয়ার সাবধান", "জনসভায় যোগ দিন" ইত্যাদি। সন্ধ্যার আগেই শেখ মুজিব জনসভায় ভাষণ দিতে ওঠেন। শুরু হয়ে যায় গণ্ডগোল। মোনায়েম খানের গুন্ডারা মিটিংয়ে হামলা করে। ডানপাশে রাস্তার উপরে মাইক ভাংচুর করে। হৈ চৈ! স্লোগানঃ "ভারতের দালাল হুঁশিয়ার, সাবধান।" লাঠি। রামদা। খোলা তলোয়ার নিয়ে "আল্লাহ আকবার" স্লোগান দিয়ে তারা সমাগত জনতার উপর আক্রমণ করে। সভায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এসময়ে মঞ্চে রক্তাক্ত অবস্থায় ধরাধরি করে নিয়ে আসা হয় মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি মাতব্বর হোসেনকে।

শেখ মুজিব গর্জে ওঠেন। মাইকে তিনি বলতে থাকেন, "কে আছিস্ আয়? আহসান মঞ্জিলের গুন্ডাদের শায়েস্তা করেছি, এদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে।" তিনি মঞ্চ থেকে মাইক স্ট্যান্ড খুলে নিয়ে নিচে নামতে উদ্যত হন। ছাত্রনেতৃবৃন্দ মঞ্চে ও মঞ্চের আশেপাশে অবস্থান করছিল। মঞ্চের নিচে বাঁশের লাঠি তৈরি। ছাত্র-জনতা গুন্ডাদের প্রতিরোধ করে। জনগণ তাদের ধাওয়া দেয়। আবার জনসভা শুরু হয়। জনসভায় তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম-পাকিস্তানে জৌলুসের সমারোহ চালাচ্ছে আর পূর্ব পাকিস্তানকে পরিণত করেছে কাঙালে, ভিখারিতে। আপদ-বিপদ ও মুসিবৎ, এই তিনটি বস্তু আজ দেশবাসীর উপর সওয়ার হয়েছে। সম্রাট দেশ শাসন করছে। রাজপুরুষরা যেখানেই তশরিফ রাখেন সেখানেই আপদ-বিপদ-মুসিবৎ নেমে আসে। শেখ মুজিব আইয়ুব-মোনায়েমকে হুঁশিয়ারি জানিয়ে বলেন, সেদিন সুদূর নয় যখন জনগণের রুদ্র রোষে ক্ষমতাসীনদের হাওয়াই প্রাসাদ ধ্বসে পড়বে। দেশবাসীকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী জাতির কপালে অবিশ্বাসের যে তিলক এঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে সেই গ্লানি মুছবার জন্য আজ দেশবাসিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই মিটিংয়ে যেসব ভাড়াটে গুন্ডারা হামলা করেছিল তাদের মধ্যে হাতকাটা হাকিম, ডাইলমন্ত্রী আমজাদ, শাহ আলম কসাই, হাতেম, এতিম, বেল্টু এবং এন.এস.এফ.-এর জাফর ইমাম, মন্টু সিং, সন্টু, মঈদ, মোকছেদ অন্যতম।[২৫]

রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমা সদরে মুক্তি সিনেমা হলে ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবসে' যে ছেলেটি নিহত হয়েছিল সে ছিল পার-নওগাঁর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা তৎকালীন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ডা. মঞ্জুর হোসেনের অনুজ। 'পাকিস্তান দিবসের' অনুষ্ঠানের চেয়ারে বসা নিয়ে কথা কাটাকাটির সৃষ্টি। উত্তেজিত পুলিশ সিনেমা হলের মধ্যে গুলি চালায়। সাথে সাথেই সে নিহত হয়। এ হত্যার প্রতিবাদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডাকা হয়। মিছিল হয়। রাতে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগানো হয়। পুলিশ হলগুলো ঘেরাও করে। ভোরে পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র শরীফ উল্লাহ বাইরে গেলে দেখতে পান হলের অদূরে ব্যাপক পুলিশের উপস্থিতি। তিনি দ্রুত এসে খবর দেন। অনেকেই বাইরে চলে যেতে সক্ষম হন। জনাব গোলাম কিবরিয়া রাজশাহীর এস.পি.। সেদিনের অপারেশনের দায়িত্বে এস.পি স্বয়ং। ঘুম থেকে উঠিয়ে শেষ রাতে গ্রেফতার করল অনেককে। তাদেরকে জিন্নাহ হলের বারান্দায় নিয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড় করিয়ে নামের তালিকা করেন এস.ডি.ও আব্দুল মালেক। জিন্নাহ হলের বারান্দায় তালিকা তৈরি পূর্বক সিরাজুল হক, নজরুল ইসলাম, মাহবুবুল আলম, সরদার আমজাদ হোসেন, আব্দুর রশীদ, অর্থনীতির আব্দুর রশিদসহ ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরের দিন পুনরায় হরতাল। হরতালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জঙ্গি মিছিল রাজশাহীর সাহেব বাজার পর্যন্ত গিয়ে সভা করে। আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষিত হয়। এ সময় সাহেব বাজারের মোড়ে স্টার স্টুডিও থেকে এ সব মিছিলের ছবি তোলা হতো। মিছিলটি ফেরার পথে সরকারি গুন্ডারা আক্রমণ করে। আহত হন নেফাজ উদ্দিন, আয়েস উদ্দিন, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। ড. এ. আর. মল্লিক তখন জিন্নাহ হলের এবং ডক্টর এনামুল হক এস.এম. হলের প্রভোষ্ট। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এ দুটি হলের প্রভোস্টদের পরামর্শ ছাত্রদের মানসিক ও মানবিক চাপের হ্রাস হয়। শিক্ষা জগতের দু'বরেণ্য দিকপাল ড: মল্লিক ও ড. এনামুল হকের প্রচেষ্টায় ৭ দিনের মধ্যেই বন্দিয়া কারাগার থেকে মুক্তি পান।"

'আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে'

১৯৬৪ সালে ২২ ডিসেম্বর। রাজশাহীতে আসন্ন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রজেকশন মিটিং। রাজশাহী স্টেডিয়াম। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো থেকে বেসিক ডেমোক্রেসির সদস্যগণ উক্ত মিটিংয়ে যোগদানের জন্য এসেছেন। এসেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান, তার মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নি মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ ও অন্যান্য প্রার্থীরা। আইয়ুব খান ছিলেন সার্কিট হাউসে। সম্মিলিত বিরোধী দলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর থাকার জায়গা ছিল জেলা পরিষদ ডাকবাংলো। ডাক বাংলোর অবস্থা শুনে ফাতেমা জিন্নাহ রাজশাহী স্টেশনে রেলের মধ্যেই একটা সেলুনে অবস্থান করছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল নিয়ে রেলওয়ে সেলুনের দিকে ভিড় জমায়। মিছিলের আওয়াজে ফাতেমা জিন্নাহ কোচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত কর্কশ স্বরে বলে ওঠেন, "স্টপ জিন্দাবাদ, মুর্দাবাদ!" ছাত্ররা তখন মাদারে মিল্লাত জিন্দাবাদ, আইয়ুব খান মুর্দাবাদ স্লোগান দিচ্ছিল। মাদারে মিল্লাতের ধমক খেয়ে ছাত্ররা চুপসে যায়। এক পর্যায়ে তারা স্টেডিয়ামের দিকে অগ্রসর হয়।

রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন থেকে শুরু করে সাহেব বাজার ও স্টেডিয়াম পর্যন্ত ছিল জনারণ্য। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রজেকশন সভায় পৌঁছার পথে রেল স্টেশন ও স্টেডিয়ামের মুখে ছাত্র-জনতার প্রতিরোধে তিনি বাধাগ্রস্ত হন। পুলিশ, ইপিআর এবং সেনাবাহিনী ব্যাপক লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। চারদিকে তুমুল বিশৃঙ্খলা। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর আজম খান রেলওয়ের কবরখানার পাশে পড়ে যান। লাঠিচার্জে আহত হন। এ সময় ঢাকা থেকে আগত ছাত্রনেতা সফিউদ্দিন আহমেদ, লুৎফুল হাই সাচ্চু, আব্দুর রউফ, সিরাজুল হক সহ বেশ কজন ছাত্র নেতা আহত হন। তাদেরকে নিয়ে সরদার আমজাদ হোসেন, শাহজাহান বিশ্বাস, আবু সাইয়িদ, নুরুল ইসলাম ঠাণ্ডু প্রমুখ সেরিকালচারের পেছনে একটি ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। এ সময়ে গুরুতর আহত হন তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য শাহাজাদপুর থেকে নির্বাচিত সৈয়দ হোসেন মুনসুর। তাঁকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে দেখতে যান। পথে মোনায়েম খানের পান্ডারা হেতেম খানার মোড়ে তাঁকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। শেখ মুজিব জীপ থেকে নেমে পথে দাঁড়ান। তিনি তাদের ধমক দেন। তাঁর ধমকে এন.এস.এফ পান্ডারা থমকে দাঁড়ায়। শেখ মুজিব বলেন, 'মোনায়েম খান দেশ ছেড়ে পালাবে। তোরা কি করবি?' সংবাদ পেয়ে লুৎফুল হাই সাচ্চু, শাহজাহান বিশ্বাস, নাজিম উদ্দিন, আবু সাইয়িদ প্রমুখ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের দিকে দ্রুত রওনা হয়। কিন্তু ততক্ষণে শেখ মুজিবুর রহমান রেলওয়ে সেলুনে ফিরে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্রনেতৃবৃন্দ সেলুনে উপস্থিত হন। সাচ্চু ভাই ছাত্র নেতাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, "তোরা ছাত্রলীগকে সংগঠিত কর। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হয়েছে, আমরা লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই স্বায়ত্তশাসন চাই। আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে।"

পূর্ব পাকিস্তান রুখে দাঁড়াও

দেশের এমনি ভয়াবহ অবস্থায় ঢাকায় আইয়ুববিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন এবং একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। ১৭ জানুয়ারি ইত্তেফাক, আজাদ ও সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে এই ইশতেহার প্রকাশিত হলে তা এক ঐতিহাসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেদন হিসেবে পরিগণিত হয়। আবেদনটি প্রচারপত্র হিসেবে ছাপিয়েও বিলি করা হয়। ১৯৬৪-এর ৩০ এপ্রিল এই আবেদন ছাপানোর অপরাধে মোনায়েম খাঁ সরকার ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ঢাকা মহকুমা প্রশাসকের এজলাসে এক মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই মামলা নিয়ে হয়রানি চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৬৯ সালে ৫ এপ্রিল এই মামলা প্রত্যাহার করা হয়।[২৬]

ঢাকায় সমাবর্তন

মোনায়েম খান গভর্নর হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য ছিলেন। তাঁর শখ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের অনুষ্ঠানগুলোতে তিনি যোগদান করবেন। প্রথম পর্যায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে শেষ করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে এসে ছাত্রদের দ্বারা তিনি ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হন। এক বিশৃঙ্খলা অবস্থার সৃষ্টি হয়। ২২ মার্চ, '৬৪, কার্জন হলে সমাবর্তনের এই অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল। ছাত্ররা পূর্বেই মোনায়েম খান কর্তৃক সনদপত্র বিতরণে অস্বীকার ও আপত্তি করছিল এবং প্রতিবাদে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ হচ্ছিল।

আইয়ুব খান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে ছাত্র অসন্তোষের কারণসমূহ বের করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু হামিদুর রহমান অনাহূতই ছাত্রদের সম্বন্ধে বিভিন্ন অপ্রীতিকর মন্তব্য করে সমস্যা বৃদ্ধি করেন। তিনি শরীফ কমিশনের প্রতিবেদনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। ছাত্ররা এই কমিশনের প্রতিবেদন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধেই ছাত্রদের আবার নতুন করে রাজপথে নামতে হয়। কিন্তু হামিদুর রহমান কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার আগেই ১৯৬৫ সালে ছাত্রদের কাছে আগমন করে নতুন রকম সংকটের বছর হিসেবে। এ বছর অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী হলো মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ্। আইয়ুব বিরোধী ছাত্র সমাজ এই নির্বাচন নিয়ে মাঠে নামে। প্রবল গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ছিল না। ভোটার ছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রীরা। এদের সংখ্যা সমগ্র পাকিস্তানে ছিল ৮০হাজার। চরম দুর্নীতি ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র আড়াই হাজার ভোট বেশি পান।[২৭]

ছাত্র আন্দোলনের মূল সংকট দেখা দেয় ছাত্র ইউনিয়নের ভাঙন নিয়ে। ৬৫ সালেই ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া চৌধুরী ও রাশেদ খান মেননের দুই বিবদমান নেতৃত্বে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারপর আসে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যকার অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, এই যুদ্ধ দুটি বিষয়ে বাঙালি জাতির কাছে দৃশ্যমান হয়ে উঠে।

এক. এতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী স্লোগান দিয়ে আসছিল যে, শক্তিশালী কেন্দ্র ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুর্জয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার রক্ষার কবজ। কিন্তু যুদ্ধের সময় দেখা গেল ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তানের লাহোর পর্যন্ত প্রায় ঢুকে পড়েছিল, তারা পশ্চিম পাকিস্তানকেই রক্ষা করতে নাকানি-চুবানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়েছে। ভুট্টো অবশ্য বলেছিল, তারা নাকি চীনের হাতে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিল। সেই ভয়ে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি। এটা ছিল ভাওতাবাজি।

দুই. এই যুদ্ধে বাঙালিরা পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রমাণ করেছে তারা সুদক্ষ সৈনিক ও যুদ্ধে পারদর্শী। এতদিন পশ্চিম পাকিস্তানিরা বলত যে বাঙালিরা ভীত, তারা যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। এই কথাটি এই যুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বাঙালিদের মধ্যে এমন প্রত্যয় ফিরে আসে তারা প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেও সক্ষম।

টীকা

১. ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, শাহ আহমদ রেজা, পৃ-২৫।
২. ঐ, পৃ-২৬।
৩. ঐ, পৃ-৩১।
৪. ঐ, পৃ-৪৪, ১১১।
৫. ঐ, পৃ-৭০।
৬. ঐ, পৃ-১১৪-১১৫।
৭. ঐ, পৃ-৭৯।
৮. গতিবেগ-চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তি সৈনিক শেখ মুজিব, অমিতাভ গুপ্ত, পৃ- ২৩৪-২৩৯।
৯. প্রেসিডেন্ট মীর্জার এক ইউনিট নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যে আঁতাত তা ছিল সুদূর সুদূরপ্রসারী কূটচাল, ঐ, পৃ-২৪০-২৪২।
১০. ঐ, পৃ- ২৪৯,২৫০।
১১. ঐ, পৃ-২৫১,২৫২,২৫৫,২৫৬।
১২. মহিউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথোপকথন।
১৩. Firoz Khan Noon, From memory, Lahore, 1966, page-297
১৪. মুহম্মদ আইয়ুব খান, প্রভু নয় বন্ধু, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮, করাচী-ঢাকা, লাহোর, পৃ. ১৩০-১৩১।
১৫. ব্যক্তিগত গোপনীয় ১৬ই জুন ১৯৬২, আজম খান ফিল্ড মার্শাল মো. আইয়ুব খানকে ৭ জুন তার উদ্দেশে প্রেরিত পত্রের জবাবে উক্ত পত্র লেখেন।
১৬. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, মোহম্মদ হান্নান, পৃ-৫৬, ৫৭।
১৭. ঐ, পৃ-৫৮, ৫৯।
১৮. ঐ, পৃ-৬১, ৬২।
১৯. পূর্ব পাকিস্তানঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক, মাহমুদ আলি, প্রমুখ। পশ্চিম পাকিস্তান মিয়া মমতাজ দৌলতানা, সরদার বাহাদুর খান, মীর গোলাম আলি খান তালপুর, মৌলানা আবুল আলা মওদুদি, মহম্মদ আয়ূব খুড়ো, জেড. এইচ. লারী, হাশিম গাজদার প্রমুখ সহ সর্বমোট ৫৪ জন।
২০. কীভাবে সোহরাওয়ার্দী সদস্যপদ বাতিল ও তাকে পাকিস্তানে ঢুকতে দেয়া হয়নি- প্রথম অধ্যায়ে তা তুলে ধরা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সৈয়দ আবুল মকসুদ, পৃ-২৪০-২৪১।

২২. সরদার আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশে জয়-পরাজয়ের রাজনীতি, প্রকাশক ঐতিহ্য, ঢাকা, পৃ. ২২-২৩।

২৩. ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান 'স্বাধীনতার' দাবি উত্থাপন করলে তারা বলেন যে, জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে, গণদাবি নিয়ে জনগণের মধ্যে যেতে হবে আগে। এখনো সময় আসেনি।

২৪. সেদিনের সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পক্ষে সৈয়দ মাজহারুল হক বাকি, আব্দুল রউফ, এস. এম. হলের মোঃ জাকারিয়া ও সরদার আমজাদ হোসেন, জিন্নাহ হলের নিজামুদ্দীন ও সুলতান আহমেদ, সিরাজুল হক, নজরুল ইসলাম, বায়েজিদ আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক, বজলুল করিম প্রমুখ।

২৫. নূরুল ইসলাম ঠাণ্ডুর সাক্ষাৎকার।

২৬. নয় নেতার বিবৃতি, ২৪ জুন ১৯৬২ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের নয়জন নেতা এক যৌথ বিবৃতি দেন যা পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এতে স্বাক্ষরকারী ছিলেন আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমান খান, কেএসপি-র হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) ও পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ, মুসলিম লীগের ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও নূরুল আমীন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মাহমুদ আলী। 'নয় নেতার বিবৃতি' নামে পরিচিত এই দলিলে মৌলিক গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়– পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ ও সংবিধান অগণতান্ত্রিক ও অকার্যকর এবং শাসন ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্রের কুক্ষিগত। এমতবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নতুন করে নির্বাচিত একটি বিশেষ পরিষদে ছয় মাসের মধ্যে জনমতভিত্তিক এক নয়া সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবিত সংবিধানে পার্লামেন্টারি ও ফেডারেল পদ্ধতির সরকারের বিধান এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত করার সুপারিশ করা হয়। তাছাড়া রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরাজিত বিপুল অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনের জন্য কার্যর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও ওই বিবৃতিতে উচ্চারিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ড. প্রীতি কুমার মিত্র, পৃ-১০০।

২৭. আইয়ুব খান ২১,০১২ ভোট এবং মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ ১৮,৪৩৪ ভোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায়: পাঁচ

কাউকে না কাউকে ফাঁসির ঝুঁকি নিতে হবে

[পঞ্চম অধ্যায়ে কাউকে না কাউকে ফাঁসিতে যেতে হবে এ অঙ্গীকারে বঙ্গবন্ধু ছয় দফার মূল রূপরেখা নিয়ে আতাউর রহমান খানের বাড়িতে যান এবং তাকে ছয় দফার রূপরেখা পড়তে দেন এবং বলেন আমাদের পক্ষ থেকে আপনি এটি দেশবাসীর নিকট পেশ করুন। জননেতা আতাউর রহমান খান ছয় দফা পড়ে মন্তব্য করেন, "তুমি কি আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে চাও? এটা আমিতো দিবই না, তোমারও দেয়া ঠিক হবে না। এর জন্য তোমার ফাঁসি হতে পারে।" শেখ মুজিব জবাবে বলেন. "জনগণের মুক্তির জন্য কাউকে না কাউকে ফাঁসির ঝুঁকি নিতে হবে।"

ছয় দফা কে বা কারা রচনা করেছে, কীভাবে রচিত হয়েছে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো ছয় দফার মূলকথা ছিল পূর্ণস্বায়ত্তশাসন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সর্বোপরি বাংলার মুক্তি। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয় দফায় বলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান হবে পূর্ণ স্বশাসিত, সার্বভৌম সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের সরকারের হাতে থাকবে, নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের বৈষম্য দূর করতে হবে।

৬৫ সালে প্রথমবার পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে প্রমাণিত হয় পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন সামরিক জান্তা বলতো যে, শক্তিশালী কেন্দ্র থাকলেই পূর্ব পাকিস্তান রক্ষিত হবে। দেশরক্ষা বাহিনীতে এতদিন বাঙালিদের যেভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল তা ভাওতাবাঁজি হিসাবে প্রমাণিত হয় এসময় ছয় দফা আওয়ামী লীগ কমিটিতে গ্রহণ করা হলে আওয়ামী লীগ ভেঙে যায়। আইয়ুব খান বুঝতে পারেন ছয় দফা হলো 'পিনখোলা গ্রেনেড'। ফলে তিনি কিছু দিনের ভিতরেই শেখ মুজিবসহ ছয় দফা পন্থী আওয়ামী লীগের নেতাদের প্রায় সকলকেই গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠান। এসময় ছাত্রলীগ সমগ্র দেশে সুসংগঠিত হয়। ছাত্রলীগই ছয় দফাকে গ্রামে, গঞ্জে, হাটে-ঘাটে সর্বত্র প্রচার করে এবং ছয় দফার ভিত্তিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আওয়ামী লীগের সহায়তায়। আইয়ুব খান এসময় রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নেয়। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তিনি গোপনে বৈঠক করেন। মওলানা ভাসানী চীনে গমন করেন। তার এসময়কার নীতি ছিল 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব'। আতাউর রহমান খানের যে উক্তি ছিল ছয় দফার জন্য ফাঁসিতে যেতে হবে, ঘটনা প্রবাহ সেদিকে অগ্রসর হতে থাকে।]

শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত গোপনে ছয় দফা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য নিয়ে যান। যাওয়ার পূর্বে তিনি তৎকালীন প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খানের কাছে ছয় দফার রূপরেখা দেখতে যান এবং বলেন, বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে আপনি জাতির সামনে দফাগুলো পেশ করুন। দফাগুলো পড়ে আতাউর রহমান খান শেখ মুজিবকে বলেন, 'তুমি কি আমাকে

ফাঁসিতে ঝুলাতে চাও?' এটা আমি তো দিবই না। তোমারও দেয়া উচিত হবে না। এর জন্য তোমার ফাঁসি হতে পারে।' শেখ মুজিব জবাবে বলেন, জনগণের মুক্তির জন্য কাউকে না কাউকে তো ফাঁসির ঝুঁকি নিতে হবে।[১]

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের নির্মম, শোষণ, বৈষম্য, নির্যাতন এবং বাঙালির জাতির প্রতি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণা ও অবহেলো এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যে শেখ মুজিবুর রহমান গণআকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশা পূরণে সর্বাত্মক ঝুঁকি গ্রহণ করেন। ছয় দফা কে রচনা করেছেন বা কারা রচনা করেছেন তার চেয়ে বড় কথা হলো ছয় দফার মধ্যে ২১ দফার ১৯ নং দফা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, "লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বশাসিত ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে স্বতন্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।" এ সঙ্গে একুশ দফার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার মূল দাবিগুলোতে বাস্তব অর্থেই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এছাড়া সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের যে বিরাট পার্থক্য তা নিয়ে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রেসিডেন্ট শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে ফেডারেল কাঠামো জরুরি। দীর্ঘদিন বিভিন্ন বিদগ্ধজন, পণ্ডিত, দক্ষ আমলা এবং তার নিজস্ব কষ্টকর অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে ছয় দফার ভিত্তিভূমি ঐতিহাসিকভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল।

শেখ মুজিব কর্তৃক ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করার পর সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তৎকালীন ভাসানী ন্যাপ, চীনপন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপসমূহ এবং ছাত্র ইউনিয়ন। মওলানা ভাসানী ৬ দফার বিরোধিতা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো মওলানা ভাসানীকে বলেছিলেন, ছয় দফা আমেরিকা কর্তৃক প্রণীত এবং যা পাকিস্তানকে বিভক্ত করবে, একই সাথে চীনের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব আছে তা বিনষ্ট করবে। মওলানা ভাসানী চট্টগ্রামের জনসভায় প্রকাশ্যে ছয় দফার বিরোধিতা করে বলেন, এর মধ্যে সমাজতন্ত্র নেই। ৬ দফা জন্ম সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং প্রমাণিতও হয়নি। অনেকে মনে করেন, ৬ দফা আসলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বাঙালি সি.এস.পি অফিসার, জনাব রুহুল কুদ্দুস, শামসুর রহমান খান, আহমদ ফজলুর রহমান প্রমুখ দ্বারা সৃষ্ট। এই মতেরই একটি অংশ মনে করেন, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপকসহ অন্য বুদ্ধিজীবীদের যৌথ সৃষ্ট। ভিন্ন একটি সূত্রের ধারণা, ৬ দফা ভারতের একদল বামপন্থীদের রচনা। তারা তা তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা খোকা রায়ের কাছে তুলে দেন। খোকা রায় দেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও পীর হাবিবুর রহমানের কাছে। তাদের কাছ থেকে এটা যায় জনাব খায়রুল কবীরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে। জনাব কবীর এটা শেখ মুজিবের কাছে পৌঁছে দেন। একদল মনে করে ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের মূলনীতি নির্ধারক কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরা যে সুপারিশ করেছিল ৬ দফা ছিল তারই ভিত্তি। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর আইয়ুব খান কর্তৃক ঢাকায় আহূত সর্বদলীয় সভায় পেশ করার জন্য প্রায় ৫০ জন রাজনীতিবিদ অর্থনীতিবিদ বুদ্ধিজীবীর যৌথ উদ্যোগে রচিত ৭ দফার অবিকল হচ্ছে ৬ দফা। একটি অংশ অবশ্য এ প্রচারণাও চালাত যে, আইয়ুব খানই তাঁর ঘনিষ্ঠ আলতাফ গওহরকে দিয়ে তা রচনা করান। উদ্দেশ্য ছিল, এ থেকে রাজনৈতিক ফয়দা লুটা। ৬ দফা সম্পর্কে এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ও মতামত যাই থাকুক না কেন এ দফা ছিল প্রকৃত অর্থেই বাঙালির বাঁচার দাবি।[২]

আইয়ুব খানের কাছে ৬-দফা ছিল পিনখোলা তাজা গ্রেনেড।

১৯৬৪ সালে ২৯ মার্চ প্রতিবাদ দিবসে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জন সমাবেশ মুহুর্মুহু স্লোগান উঠল কালাকানুন প্রত্যাহার করা 'সর্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাই-ই চাই।' প্রধান বক্তা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান জালেম ও স্বেচ্ছাচারী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি চরম হুঁশিয়ারি জানিয়ে বলেন, 'এমন একদিন আসতে পারে যেদিন জনসাধারণ রুখে দাঁড়িয়ে বলবে, যেহেতু আমাদের ভোটাধিকার নেই সেহেতু আমরা অতঃপর আর ট্যাক্স দেব না।'[৩]

২৯ মার্চ শেখ মুজিব এইদিন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে তিনি সরকারকে সতর্ক করে দিলেন যদি দেশে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত না হয় এবং কর্তৃপক্ষ যদি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ না দেয়, তবে তাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, এই অসহনীয় অবস্থায় খুব স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণ অনিয়মতান্ত্রিক পথ নিতে পারে। ভিয়েতনামের মতো তরুণ সমাজ গেরিলাযুদ্ধ শুরু করলে তখন যেন আমাদের কেউ দোষারোপ না করেন।[৪]

২১ মার্চ ১৯৬৫ সারে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের জন্য ভোট নেয়া হলো। ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা গেল যে যথানিয়মে সরকারি দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। সি.ও.পি. ১০টি, এন, ডি, এফ-৫টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬টি মাত্র এই ২১টি আসন সরকারবিরোধী প্রতিনিধিরা জিতলেন। সদ্য সমাপ্ত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ৩ এপ্রিল ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠক-শেষে দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করে বললেন একমাত্র লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই আমরা নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে শরিক হতে পারি এবং এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের মাধ্যমেই জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ নিরন্তর সংগ্রাম করে যাবে।"

আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া পূর্ব পাকিস্তান প্রথমে চেয়েছে ফেডারেল সংবিধানের অধীনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলনের মাধ্যমে তার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে। সে আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সে দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এদেশেরই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। এসব সচেতন, জাগ্রত নারী-পুরুষের চোখেই পাকিস্তানি শাসনের ঔপনিবেশিক চরিত্রটি ধরা পড়েছিল সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে প্রকটভাবে। পাকিস্তানি শোষণ এদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের গতিকে যেভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছিল তার প্রবল চাপ জনগণ অনুভব করতে পেরছিল তীব্রভাবে। এ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অংশ হিসেবে নিজেদের বাঁচার তাগিদেই বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তনি শাসনকে চ্যালেঞ্জ করতে। কারণ সামনে এগোবার আর কোনো পথ তাদের সামনে খোলা ছিল না।

নবজাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। সেদিন ছাত্ররাই ছিল বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্রদূত এবং সক্রিয় কর্মী। রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ নবতর মাত্রা ও তীব্রতা লাভ করে ষাটের দশকে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে।[৫]

১৯৬৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বরে প্রথম সপ্তাহে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ বেধে যায়। এই যুদ্ধ মাত্র সতের দিন স্থায়ী হয়। যুদ্ধে বাঙালির সেনা অফিসার তাদের সাহসিকতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে পাকিস্তান সামরিক চক্র এতদিন যেভাবে বলে আসছিল বাঙালি যুদ্ধজাতি নয় তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সে সময় লক্ষ্য করেছি বাঙালি জাতির ভেতরে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এভাবে যে, সামরিক ক্ষেত্রে ও প্রয়োজনবোধে তারা সক্ষমতা দেখাতে সমর্থ। এই যুদ্ধে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি। কেন করেনি তার জবাবে ভুট্টো লিখেছেন, চীনের ভয়ে তারা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়নি। কিন্তু এ কথাটি সামগ্রিক অর্থে সঠিক নয়। সে সময় আমাদের মনে হয়েছে দুটো কারণে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি, প্রথমত, আক্রমণের ফলে বিপুল সংখ্যক হিন্দু শরণার্থী সীমান্ত পাড়ি দিত এবং এটা প্রমাণ করে যে পাকিস্তানের কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার সমর্থন রাখে না। যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ছিল অসহায় ও নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত। এই যুদ্ধে জাতিসংঘের সম্মতিতে সোভিয়েত রাশিয়া মধ্যস্থতা করে। ১৯৬৬ সালে ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দ চুক্তিতে উপনীত হন। তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর সমগ্র পাকিস্তানে এর প্রতিক্রিয়া বিরূপ হয়।

এ প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে লাহোরে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপন করেন। তিনি করাচীতে প্রেস কনফারেন্সে ৬-দফার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, '১৯৬৫ সালের যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে, সেই ভয়াবহ যুদ্ধ দিনে পাকিস্তানের দুই অংশ এক অন্যের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ার মাধ্যমে দেশ রক্ষার এতদিন যে অজুহাত দেখানো হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের যে কোনো ন্যায্য দাবিকে কায়েমি স্বার্থবাদীরা 'ইসলাম' ও 'পাকিস্তান ধ্বংসের' অজুহাত তুলেছেন। কখনও বা তারা এও বলেছেন পূর্ব পাকিস্তান সিক্রেটলি কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সেজন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতাবাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মার্কিনীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং চীনের সহযোগিতা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আজও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মওলানা মওদুদী একত্রিত হয়ে ৬ দফার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে এটি স্বাভাবিক। বিভিন্নভাবে আমাদের হুমকি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি অন্যায়ের কাছে মাথানত করব না। জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আমি এগিয়ে যাবো। আমার শক্তি এখানেই, এর জন্য যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে আমি প্রস্তুত। তিনি বলেন, "I am fully prepared to make any sacrifice in their service. The life of any individual like myself is nothing compared to the salvation of the people of my country. I know of no nobler battle than to fight for the rights of the exploited millions."[৬]

নবলব্ধ অভিজ্ঞতার সুযোগ

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার ব্যবস্থায় সামরিক মৌলনীতির অসারত্ব প্রামাণিত হলো। মূলত যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তান ও বহির্বিশ্ব হতে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। দেশপ্রেমিক বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মউপলব্ধিতে উপনীত হলো যে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এদেশের প্রতি কোনো প্রকার দায়দায়িত্ব নেই। পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই বাঙালির কাছে প্রচলিত শক্তিশালী কেন্দ্র ও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দারুণ বিপদ সম্পর্কে তাদের সচেতনতা এনে দেয়। জেনারেল আইয়ুবের এতদিনব্যাপী প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী কেন্দ্রের ফর্মুলা প্রকৃত বিপদের দিনে যে তাদের কোনোই কজে আসবে না এই অভিজ্ঞতাই বাঙালিকে নতুন করে মানসিক ধাক্কা দেয়। যুদ্ধকালীন এই বিচ্ছিন্নতার কারণে বাঙালি জাতি বুঝতে শিখল আইয়ুব ও তার দালালগণ যাই বলুন না কেন বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার মতো মৌলিক বিষয়েও বাঙালির কোনো অংশীদারিত্ব ও ভূমিকা নেই। দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্ববাংলার প্রতি এতদিনের বঞ্চনা যুদ্ধের মধ্যে বাঙালি জাতিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

আওয়ামী লীগে ভাঙন

প্রধান বিরোধীদল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ও অন্যান্য প্রশ্নে ভাগ হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের যে অংশ ৬ দফা সমর্থন করতেন না তাঁরা আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান, খন্দকার মোশতাক প্রমুখের নেতৃত্বে পি.ডি.এম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) এ থেকে যায়। তাঁরা আওয়ামী লীগ (পি.ডি.এম পন্থী) বলে পরিচিতি লাভ করে। অপর অংশ শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ (৬ দফা পন্থী) হিসেবে সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিষ্ঠিত জেনারেল চক্র, আমলতন্ত্র ও পুঁজিবাদ ধনিক বণিক চক্রের কাছে বেশি করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রণাদায়ক বিষয়টি ছিল কেন্দ্রীয় পরিসম্পদে বাঙালিদের ন্যায্য হিসেবের দাবি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কলোনি হিসেবে একযুগ পূর্ববঙ্গের সম্পদ শোষণের প্রবাহধারা শুকিয়ে এলে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ ও সাহায্য সংস্থার কাছে থেকে প্রাপ্ত সম্পদে বাঙালিদের অধিকার দাবি ও তাদের নিকট এক অসহনীয় ও অমার্জনীয় অপরাধ করেই বিবেচিত হয়েছিল।

শেখ মুজিবের দাবি ও সংগ্রাম তাদের পরিতুষ্ট হৃৎপিণ্ডে সরাসরি শূলবিদ্ধ। শেখ মুজিবের ছ' দফা ছিল তাদের কাছে মারাত্মক বিভীষিকাময় অস্ত্র। শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের এই দাবির পক্ষে দীর্ঘদিন তার পক্ষে প্রচারণা চালানোর সময় সুযোগ হবে অত্যন্ত কম।

মূলত ছাত্রলীগ ছয়দফা প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। হাটে-মাঠে-গঞ্জে বাঙালির বাঁচার দাবি ছয়দফাকে গণমানুষের সামনে তুলে ধরে জনপ্রিয় করে তোলে। ছাত্রলীগে পঞ্চম সম্মেলনে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন সভাপতি এবং শেখ ফজলুল হক মনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্মেলনে আলোচিত রাজনৈতিক ও দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য জাতীয় ও ছাত্র রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এতে আইয়ুব খানের প্রতি ছাত্র জনতার মোহ কাটতে থাকে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। বিশেষ করে সভাপতি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাহসিকতা এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেশের সর্বস্তরের ছাত্র সমাজকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত ও আন্দোলিত করে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কথায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন তা জানতে চেয়ে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে আইয়ুব খান বলেছিলেন, "Ask Shatra league president shah Moazzem Hossan"। মূলত আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপরে নির্যাতন, পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ প্রভৃতি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়েজ্জেম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি সর্বপ্রথম সাংগঠনিকভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন।[৭]

মওলানা ভাসানী-আইয়ুব বৈঠক

এছাড়া ১৯৬৩ সালেই আইয়ুব খান ও মওলানা ভাসানীর এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকের পর থেকে মওলানা প্রকৃতপক্ষে সরকারবিরোধী আন্দোলন সক্রিয় অংশগ্রহণে তীব্র অনীহা প্রকাশ করতেন এবং বিরত থাকতেন। কালক্রমে এই প্রবণতাতেই ন্যাপ (ভাসানী) আইয়ুব খানের গদি রক্ষার সহায়ক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩। বিকেলে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পিকিংয়ের উদ্দেশ্যে করাচির পথে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। মওলানা ভাসানীর সালে জনাব শওকত আলী খান ও তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. আব্দুল করিমও করাচী যাত্রা করেন। ৬ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের অপর দুই জন পূর্ব পাকিস্তানি সদস্য জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ ও জনাব মফিজুর রহমান করাচি যান। দুদিন পর প্রতিনিধিদল পিকিংয়ের সাথে করাচী ত্যাগ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা ত্যাগের পূর্বে স্থানীয় সাবেরিয়া হোটেলে মওলানা ভাসানীর সম্মানার্থে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেন যে, জনসাধারণের মৌলিক অধিকার না পেলে সরকার তাদের কাছে হতে সম্মান ও আস্থা আশা করতে পারেন না। কেড়ে নেয়া মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য মওলানা ভাসানী জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

২৫ সেপ্টেম্বর সাবেক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রেসিডেন্ট মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী করাচী যান। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন যে, এশিয়া ও আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরস্পরের সহযোগিতা করার জন্য তিনি চীনা প্রজাতন্ত্রে দিবসের উৎসবে যোগদানকারী আফ্রো-এশিয়া প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানাবেন।

চীন থেকে ফিরে

১ ডিসেম্বর পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতারূপে দুই মাসব্যাপী চীন সফর শেষে আজ রেঙ্গুন হয়ে পতেঙ্গা বিমানবন্দরে আগমনের পর এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি বলেন, চীন যাত্রার পূর্বে ঢাকার পল্টন ময়দানে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্য তিনি যে আহ্বান জানিয়েছেন তা সুস্থ চিন্তাপ্রসূত ছিল না, বরং তা ছিল তদানীন্তন সময়ে পরিস্থিতির ভ্রান্ত অনুধাবনের ফল। প্রসঙ্গত, আগামী ১৫ ডিসেম্বর হতে তিনি আইন অমান্য করার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন।

মওলানা ভাসানী বলেন যে, নয়াচীন দুই মাসব্যাপী অবস্থানকালে তিনি তার সমগ্র রাজনৈতিক জীবন বিচার-বিশ্লেষণ করে অতীতের ভুল অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ব্যাপারটি সুস্থভাবে চিন্তা করতে পারেননি। তিনি বলেন, আজ তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, বর্তমান সময়ে আইন অমান্য করার পরিবর্তে দেশকে রক্ষার জন্য জাতীয় সংহতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা অধিক।

দেশের প্রতিরক্ষার উপর হামলা আসন্ন কিনা, এই ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে মওলানা ভাসানী বলেন, সাম্রাজ্যবাদী মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রো-এশীয় দেশসমূহকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লেলাইয়া দেয়ার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, আমাদের জনসাধারণকে আমরা মুজাহিদরূপে সংঘবদ্ধ করে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য নিবেদিতপ্রাণ এবং রাজনৈতিক দলসমূহকে সুসংবদ্ধ করে না তোলা পর্যন্ত আমাদের কোনো দাবিই গৃহীত হবে না। মওলানা ভাসানী আরও বলেন যে, তার দাবিসমূহের প্রতি জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন রয়েছে–এ কথা তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছে প্রমাণ করতে না পারার দরুণই প্রেসিডেন্ট তার কোনো দাবি গ্রহণ করেননি। তিনি অভিযোগ করেন স্বাধীনতা–উত্তর ১৬ বছরের মধ্যে আমাদের কোনো দাবি কখনও মেনে নেয়া হয়নি।

তিনি আরো বলেন, সকল রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা এই কথাই প্রমাণ করে যে, শুধু বুদ্ধিজীবীদের সমবায়ে গঠিত রাজনৈতিক দল কখনও সাফল্য লাভ করতে পারে না। রাজনৈতিক দলের সাফল্যের জন্য কৃষক মজুরদের রাজনৈতিক দলের অবিচ্ছেদ্যে অঙ্গরূপে সংগঠিত করতে হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মওলানা ভাসানী প্রকাশ করেন যে, চীন সফরান্তে তাহার গোটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, চীনারা কথা বলে কম কিন্তু কাজ করে বেশি। অপর দিকে আমার ত্রুটি হচ্ছে, "আমি কথা বলি বেশি কাজ করি কম।"

তিনি প্রকাশ করেন যে, এখন হতে তিনি আর কখনও সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করবেন না। এমন কি চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত ন্যাপ সম্মেলনেও যোগদান করবেন না। তিনি বলেন যে, এখন হতে তিনি কৃষক মজুরদের সমাবেশেই বক্তৃতা করবেন। এবং তাদের সমস্যা অনুধাবনে আত্মনিয়োগ করবেন।

তিনি বলেন, সুচিন্তিত চিন্তাধারা অনুযায়ী জনসাধারণকে অবশ্যই সংঘবদ্ধ করতে হবে এবং রাজনৈতিক দলসমূহকেও সুসংগঠিত করতে হবে। চীন প্রত্যাগত মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন যে, তিনি শীঘ্রই তার অতীত ভুলভ্রান্তি ও আত্মসমালোচনা সংবলিত একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করবেন।

জনৈক সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি পাকিস্তানের সরকারি প্রতিনিধিদলের নেতারূপেই চীন সফর করেছেন। এর সালে পাকিস্তান সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি আরও বলেন, চীনা কনসাল চীন সরকারের পক্ষ হতে আমাকে চীন সফরের জন্য আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। বিগত ১৪ বছরে পাকিস্তান সরকার পাসপোর্ট না দিলেও এইবারে সরকার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে পাসপোর্ট প্রদান করেন। অতঃপর আমি চীন সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

পূর্বাহ্নে মওলানা ভাসানী বলেন যে, চীনের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে চীন সফরে যাওয়ার সুপারিশ করে তিনি চীন হতে প্রেসিডেন্টকে একটি পত্র লিখেছেন। রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে ন্যাপের পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী। তবে এ সম্পর্কে ন্যাপের উর্ধ্বতন সংস্থাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র অধিকারী।

অপর এক খবরে বলা হয় যে, পতেঙ্গা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে মওলানা ভাসানী আফ্রো-এশিয়া দেশসমূহের দ্বিতীয় বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন।[৮] মওলানা ভাসানী ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব নীতি গ্রহণ করেন।

সেই সময়ে মধ্যবিত্ত চিরায়ত নেতাদের জড়তা এবং দ্বিধাগ্রস্ততা, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষেত্রে চারিত্রিক দুর্বলতা এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি একটি অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের বখরা হাতড়িয়ে নেয়ার প্রবণতার বিপরীতে একটি মাত্র পথ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার ঐক্যসূত্রতার সঙ্গে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আন্দোলনে জড়িয়ে ফেলা। এই আন্দোলন গড়ে তোলার পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট অংশের সঙ্গে শেখ মুজিবের সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত সাংগঠনিকভাবে অন্য কোনো পথ ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পুরনো নেতৃত্ব যারা আওয়ামী লীগে ছিলেন তাদের কাছে ছ'দফা গ্রহণযোগ্য ছিল না। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদের ব্লুপ্রিন্ট হিসেবেই ছ'দফাকে চিহ্নিত করেছিলেন। ছ'দফার স্বার্থে সংগ্রাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি গ্রহণের ভয়ে তারা দল পরিত্যাগ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্তুত বাঙালি জাতীয়তাবাদের আকৃষ্ট উঠতি তরুণদের নিয়েই তিনি পার্টির নবরূপ দান করেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিকে বিশাল জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদের শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে ছ'দফার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে পেশ করলেন। ঔপনিবেশিক সরকারের বাধাধরা ছকের বাইরে ছ'দফা আন্দোলন ছিল নব সংগঠিত পার্টির তরুণদের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই আন্দোলনের উপর প্রচণ্ড দমননীতি নেমে এলে পার্টির মধ্যে অবস্থানরত সুবিধাবাদী ও দুর্বলচিত্ত নেতারাও দল থেকে ঝরে গেলে তরুণ জঙ্গি ও তেজোদৃপ্ত নতুন নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ সংগঠন দখল করে ছ' দফার আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই নেতৃত্বের ভিত্তি ছাত্র ও শ্রমিক শক্তির মধ্যে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগে বাম উপাদান ও ঝোঁক প্রকট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি মুনির লিখেছেন, '৬ দফার ভেতরে বিদেশ মুদ্রার বিনিময়, রফতনির বাণিজ্যের মূলধন ও সম্পদ বণ্টনের প্রস্তাব পাকিস্তানকে ফেডারেশন রাষ্ট্রের প্রহসনে পরিণিত করবে এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানকে বিভক্ত করবে।'[৯]

আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যর্থতা পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে। আন্দোলনের লক্ষ্য, বৈষম্য দূরীকরণের দিক থেকে স্বায়ত্তশাসনে দিকে যায়। ১৯৬৯ সালের গোড়ার দিকে আইয়ুব সরকার যে রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, তা নিরসন ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান বৈঠকে বক্তব্য পেশকালে তাঁকে সহায়তাদানের জন্য তিনজন প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও অধ্যাপক ওয়াহিদুল হককে এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বায়ত্তশাসনের ছয় দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্যে সংবিধানের সংশোধনী প্রণয়নের জন্য ডক্টর কামাল হোসেনকে আমন্ত্রণ জানান।

আইয়ুব সরকারের পতনের পরে ১৯৬৯ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী লড়াইয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছয় দফাই ছিল মূল রণধ্বনি। তার মানে, বৈষম্যের ইস্যুটি আবার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। "সোনার বাংলা শ্মশান কেন" শিরোনামে আওয়ামী লীগ কর্তৃক তৈরি পোস্টারটি নির্বাচনী প্রচারের অত্যন্ত ফলপ্রদ হাতিয়ারে পরিণত হয়। এ পোস্টারটিতে আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বঞ্চনা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা যেসব পরিসংখ্যান এক সময় তুলে ধরেছিলেন সেগুলি সন্নিবেশিত হয়। পোস্টারটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে যায়। এভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি পরিবারের রাজনৈতিক সচেতনতার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। তখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমবর্ধমানভাবে বাংলাদেশ বলে মনে করা হতে থাকে।[১০]

শেখ মুজিবের এই 'ছয় দফা' কর্মসূচির মূল দাবি ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে শোষণ মুক্তি ও পূর্ণ স্বাধিকার অর্জন। ছয় দফা দাবির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ও কর ব্যবস্থার ওপর প্রদেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করেন। রাজনৈতিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি পেশ করেন। শেখ মুজিবের 'ছয় দফা' দাবি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতীয়তাবাদের বুনিয়াদকে ব্যাপক ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। লাহোরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব 'ছয় দফা' ব্যাখ্যা করে বললেন, সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং দেশ রক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রশ্নটিই সবচেয়ে জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

শেখ মুজিব ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ফিরে বিমানবন্দরে বললেন, পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে পাঁচ কোটি বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয় বলেই জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে আমি সব সম্পর্ক ছিন্ন করে এসেছি। 'ছয় দফা' পুনরায় ব্যাখ্যা করে মুজিব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে, একমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব ছাড়া অন্য সব রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে দিতে হবে, যদিও আঞ্চলিক মিলিশিয়া বা আধা সামরিক ফৌজ গঠন করার ও বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি নির্ধারণ করার সম্পূর্ণ অধিকার প্রদেশের হাতে থাকবে। 'ছয় দফা' দাবি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। শাসকগোষ্ঠীর দাবি করেন মুজিবের এই প্রস্তাব দেশদ্রোহিতারই নামান্তর। দেশদ্রোহীর যা শাস্তি তাই তাঁর প্রাপ্য।

ঢাকায় প্রেস কনফারেন্সে এক সাংবাদিক শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করলেন– যদি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী আপনার দাবি না মানেন, যদি তাঁরা দমন নীতির অস্ত্রাঘাত করেন তবে আপনি কী করবেন? শেখ মুজিব বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে উত্তর দিয়েছিলেন–তাঁরা হয়ত সাময়িকভাবে সফল হবেন। কিন্তু তারপর বিশ্বের মানচিত্র থেকে পাকিস্তান নামে একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য মুছে গেলে নিশ্চয়ই আমাকে দায়ী করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা ছিল বাঙালির নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের কৌশল মাত্র। শাসকগোষ্ঠী ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা বুঝেছিলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের ছয় দফা দাবি কালক্রমে এক দফা দাবি অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হবে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনমনীয়। বাঙালির স্বার্থে। বাংলাদেশের স্বার্থে। ভীত হবার লোক নন তিনি। বাঙালির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারবে না। বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে গেলেন তিনি। দেশের মানুষের কাছে 'ছয় দফার' তাৎপর্য তুলে ধরা এবং 'ছয় দফার' পেছনে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব লাহোর থেকে ফিরে এসে 'ঝটিকা সফর' ও গণসংযোগে' বেরিয়ে পড়লেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি (৬৬) চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক 'লালদীঘি' ময়দানে প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী এক জনসভায় শেখ মুজিব 'ছয় দফার' বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে বললেন–আজ আমরা বার্ধক্যের কোঠায় পৌঁছতে চলেছি, কিন্তু নতুন দিগন্তে নতুন মুখের দেখাও পাচ্ছি। অন্তত এই নতুনদের জীবনকে যাতে আমরা বঞ্চনা ও নির্যাতনমুক্ত করে তাদের সুখ ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তার সন্ধান দিয়ে যেতে পারি , আসুন, সে জন্য প্রস্তুত হই। আওয়ামী লীগের 'ছয় দফাই' 'নতুন দিগন্তের এই নতুনদের মুক্তির সনদ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ধর্মীয় জিগির তুলে 'গভর্নর হাউসে' অনুষ্ঠিত এক মিলাদ মাহফিলে বললেন—একমাত্র ইসলামের বন্ধনেই পাকিস্তানের কোটি মানুষের ঐক্য নিহত (১১ মার্চ, ৬৬)। পরদিনই ময়মনসিংহে এক বিশাল জনসভায় আইয়ুবের ইসলামিক আকুতির উপযুক্ত জবাব দিলেন শেখ মুজিব, বললেন, "ইসলামের দোহাই দিয়ে আজ যাঁরা ছয় দফার বিরোধিতা করছেন সেই ভণ্ডদের আজ আমি স্মরণ করে দিতে চাই, ইসলামের মর্মকথা হলো ইনসাফ, কিন্তু আইয়ুবশাহী এতদিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কি ইনসাফ করেছেন তার জবাব দিতে হবে?

'ছয় দফা' পূর্ব পাকিস্তানে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাল। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, বিত্তহীন মানুষরা এই দাবি আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন। বিপরীতে 'ছয় দফা' তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র ও রাজনীতিবিদদের কাছে। তাঁরা বললেন 'ছয় দফা' প্রস্তাব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত। সরকার পরিচালিত বা সরকার সমর্থক সংবাদপত্রগুলো শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের ভারতের স্টুজ বা দালাল বলে আখ্যা দিলেন। অনেককেই টেক্কা দিলেন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী প্রাক্তন 'ডন' সম্পাদক সিলেটের আলতাফ হোসেন সাহেব। তিনি এ প্রেস কনফারেন্সে হুঙ্কার দিলেন, ছয় দফা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের পক্ষে গোলামির কর্মসূচি এবং বাঙালিরা কেউ কখনই মুজিবের মেকি জিনিস কিনবে না।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ১৬ মার্চ রাজশাহীতে বলেন, "মুজিবের 'ছয় দফা' সার্বভৌম যুক্তবাংলা গঠনের পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আইয়ুব খান বলেন. বললেন যে, মুজিবের চক্রান্ত যদি রোখা না যায় তবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ভোগ করবে চিরস্থায়ী গোলামি। যথারীতি সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছাড়লেন। আইয়ুব-ছয় দফা দাবি পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের হিন্দুদের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র। প্রেসিডেন্ট পরিকল্পিতভাবে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা অঞ্চলে গিয়ে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিষ ছাড়তে লাগলেন। ১৩ মার্চ তিনি ভক্তি-বিনম্র চিত্তে বরিশালে শর্ষিনার পীর সাহেবকে দর্শন করতে গিয়ে ডাক দিলেন. 'হোল্ড ফাস্ট টু ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামকে বাঁচাও, ছয় দফা রুখো।

আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে থাকতেই ১৮ মার্চ ঢাকার মতিঝিলে ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনি দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন বসল। জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি শীর্ষক ১৬ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা এই উপলক্ষে প্রকাশ করলেন। ছয় দফার পটভূমিকা ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য সবিস্তারে বর্ণনা করে শেখ মুজিব ছয় দফা বিরোধী ও সমালোচকদের কায়েমি স্বার্থের ঘৃণ্য দালাল বলে বর্ণনা করলেন। তিনি সখেদে বললেন—অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠেছে তখনই শোষকের দল ও তাদের তল্পিবাহকরা 'ইসলাম' ও 'পাকিস্তান ধ্বংসের' ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

আইয়ুব খানের পাশাপাশি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ বিরূপতায় ছয় দফার মধ্যে যা আছে মওলানা ভাসানী তা শুধু উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন না, এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুবের যে স্বৈরতন্ত্রকে তারা সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন তার মধ্যে সমাজতন্ত্র বা অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তির সম্ভাবনাও নেই, বরঞ্চ সেই স্বৈরতন্ত্রকে প্রথমেই দূর করতে না পারলে অর্থনৈতিক শোষণমুক্তি বা সমাজতন্ত্র কিছুই সম্ভব নয়।

চীনপন্থী নেতৃবৃন্দ এটাও বুঝলেন না যে, রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় বসে থেকে সমাজতন্ত্রকে একটা ডগমা বা মন্ত্র উচ্চারণের মতো বারবার আবৃত্তি করলে বা নিরাপদ দূরত্বে বসে তত্ত্ব চর্চায় সময় নষ্ট করলে জনগণের মুক্তি আসবে না। মে মাসের ৮ তারিখ। রবিবার। ঐ দিন শেখ মুজিবুর রহমান নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় মে দিবস স্মরণে লক্ষাধিক মানুষের এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিলেন রাত আটটা পর্যন্ত। আদমজী জুট মিল থেকেই প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক এই সমাবেশে যোগ দিতে এলেন। এ ছাড়া দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন কৃষক, মজদুর, ছাত্র ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। ছয় দফার প্রতীক ছ'টি পায়রা আকাশে উড়িয়ে দেয়া হলো। ছটি তারকা সংবলিত ছয় দফার প্রতীক একটি স্বর্ণপদক উপহার দেয়া হলো ছয় দফার স্রষ্টা ও রূপকার শেখ মুজিবকে। চটকল শ্রমিকরা পাট দিয়ে তৈরি রংবেরঙের মালা পরিয়ে ও পদক উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বাঙালির স্বার্থে যে কোনো চরম আত্মত্যাগের অঙ্গীকার করল। শেখ মুজিবও বজ্রকঠিন সঙ্কল্প ঘোষণা করে বললেন–ছয় দফা প্রশ্নে কোনো আপোস নেই। উদ্দীপিত লাখো মানুষ হাত তুলে তাঁদের মুজিব ভাইকে সমর্থন জানালেন এবং সভার পরে এক বিশাল মশাল শোভাযাত্রা বের হলো। মেঘনার বাঁধভাঙা স্রোতের মতো জনসমুদ্রে বলিষ্ঠ আওয়াজে সেদিন ছোট্ট শহর নারায়ণগঞ্জের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত।

সেদিন রাতেই পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২ ধারা অনুযায়ী আইয়ুবশাহী গ্রেফতার করল শেখ মুজিবুর রহমানকে আর সেই সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতম কয়েকজন সহকর্মী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ, শ্রম সম্পাদক জহুর আহমদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম চৌধুরী, রাজশাহী আওয়ামী লীগরে সভাপতি মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সম্পাদক এমএআজিজসহ কয়েক শ' নেতাকর্মীকে। পরবর্তীতে আরও বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

২০ মে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হলো–ছয় দফা বাস্তবায়ন, শেখ মুজিবসহ আটক সব নেতার মুক্তি, জরুরি অবস্থার অবসান, দেশরক্ষা আইন বাতিল, সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার। এসব দাবিতে ৭ জুন সারা-পূর্ব পাকিস্তানে ডাকা হলো হরতাল।

মেহনতী শ্রমজীবী মানুষের রক্তে বাঙালির স্বাধিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের নবতর অধ্যায় সূচিত হলো। রক্তে লেখা ঐতিহাসিক উজ্জ্বল এক অমলিন কীর্তিগাথা। বাংলার স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে শেখ মুজিবকে একাকী চলতে হয়েছে। লৌহমানব আইয়ুবের রক্তচক্ষু ও নির্মম নিপীড়নের ভয়ে ভীত হয়ে তথাকথিত নেতারা তেমন কেউ প্রকাশ্যে আসেনি। এসেছে জনগণ, দুঃখী মানুষ। কৃষক, শ্রমিক ছাত্র-জনতা। বাংলার শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সনদ ছয় দফা নিয়ে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে সাহসী পদক্ষেপ এসেছে এগিয়ে আসেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে রক্তচক্ষু, হুমকি, মৃত্যুভয়। চলছে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র। তাঁকে চিরতরে নিঃশেষ করার ব্লুপ্রিন্ট। একদিকে ফাঁসির রশি, অন্যদিকে জনগণের ভালোবাসা। জনগণের ভালোবাসায় উৎসর্গীকৃত যে জীবন তাকে দাবিয়ে রাখে এমন সাধ্য কার? বাংলায় ছয় কোটি মানুষের হৃদয় যন্ত্রণা, দুঃখ, বেদনা ধারণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন অনির্বাণ অমিত শক্তির আধার। তাঁর দুঃসাহসী চিত্তে অনুপ্রেরণার উৎস কবিগুরুর সঙ্গীত 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে'। একলা চলার বন্ধুর পথে নির্যাতন, নিপীড়ন, হামলা, মামলা, নির্জন কারাগার, ফাঁসির রশি কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম থেকে। কোটি লোকের বজ্রকঠিন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে কারাগারের লৌহশৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন। সেই মহামানবের একলা চলা চরণচিহ্ন অনুসরণ করে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি মুক্তির পথকে আলোকিত করেছে, সেই পথের দিশা ধরেই এসেছে স্বাধীনতা, স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

আইয়ুবের হুমকি: মুজিবের জবাব

আইয়ুব খান দেখতে পেলেন শেখ মুজিব যে কথাটি বাঙালিকে বুঝাতে চাইছেন তা হলো পাকিস্তান একটি রাষ্ট্র হলেও একটি দেশ হতে পারে না। সেজন্য অস্ত্রের ভাষায় দ্রুত জবাব দিতে তার কোনো কুণ্ঠা ছিল না। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের ধারণা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। ১৯৬৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আইয়ুবের সরাসরি মন্তব্য ছিল: বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই দলের আদর্শ। এ দল কিছু করবে না যার দ্বারা পাকিস্তান শক্তিশালী হতে পারে।

ঐ একই দিনে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশ শেষে পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, 'কোনো হুমকিই জনসাধারণকেই ছয় দফা দাবি থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না'। শেখ মুজিব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক শোষণ বৈষম্যের অবসান, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম, পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্র জুলুমশাহীর নিপীড়ন, অত্যাচার, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের বহুবিদ তথ্য ও সত্য উদ্ঘাটন করে, উল্কার মতো দেশের গ্রাম বাংলা, শহর, গঞ্জ, নগরে ব্যপক গণসংযোগের মাধ্যমে দ্রুত জনমত গঠনের ক্লান্তিহীন কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

নজিরবিহীন হয়রানি ও গ্রেফতার

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে পয়লা ভাষণে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির উল্লেখ করে বলেন, একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছে। কিন্তু কার্যকরণের প্রতীয়মান হলো 'এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে' তিনি ভুলতে পারছেন না। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্বৈরশাসন, শোষণ এবং আঞ্চলিক বৈষম্য প্রতিকার ও প্রতিবিধানের লক্ষ্যে উপস্থাপিত বাংলার মুক্তিসনদ ছয় দফা কর্মসূচির প্রচারকালীন সময়ে শেখ মুজিবের উপর যে ধরনের অত্যাচার, হয়রানি ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয় তার নজির সমকালীন ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়নি। খুলনা হতে ফেরার পথে যশোরে, যশোর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামিন নিয়ে ঢাকায় এবং ঢাকার দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে সন্ধ্যেয় বাসায় ফেরার পরপরই পুলিশ বাসা থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে সিলেটে প্রেরণ করেন, সিলেটের দায়রা জজ কর্তৃক জামিন প্রদানে মুক্ত হবার পূর্বেই জেল হাজতের দরজায় পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ময়মনসিংহ জেলে প্রেরণ করা হয় এবং ময়মনসিংহ হতে জামিনে মুক্ত লাভ করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলেই এ সকল ধারাবাহিক গ্রেফতার ও হয়রানি চলতে থাকে।

মুজিবের কৌশল

সামরিক চক্রের অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মার্কিন সক্রিয়তার পিছুটানের প্রেক্ষিতে এতদিনের সামরিক শাসনের পরিবর্তে গ্রহণযোগ্য বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা জরুরি হয়ে পড়লে আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘোষণা করেন। শেখ মুজিব ত্বরিত গতিতে এই ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করে দাবি তুললেন– প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাই, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার চাই, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন চাই। শেখ মুজিব জানতেন মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে আইয়ুবকে হটানো যাবে না, কিন্তু জনগণের দাবিগুলো জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া যাবে। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সম্মিলিত বিরোধীদল থেকে মি. জিন্নাহ্‌র ভগ্নি মিস ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পদপ্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হলো।

আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সারা পাকিস্তানে যে অভূতপূর্ব জাগরণ শুরু হলো তার নেপথ্যে ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। শেখ মুজিব অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জনগণের এই আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়তার পরিমাপ করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়নের যথার্থতা যাচাই করে নিলেন। জেনারেল আইয়ুবের স্বৈরাতন্ত্রের লড়াইয়ের এই পর্যায়ের সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী দাঁড় করানোর প্রয়াস শেখ মুজিবের ভবিষ্যৎ সংগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে প্রস্তুতের কৌশল হিসেবেই বিবেচিত। এ সময় সর্বদলীয় ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন কর্ম পরিষদের এক প্রচারপত্রে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়, 'সুদীর্ঘ ছয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনে নিষ্পিষ্ট আমাদের জাতীয় জীবনে আজ এই একটি সত্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে হয় দাসত্ববরণ, নয় সুদৃঢ় গণঐক্য ও গণ আন্দোলনের দ্বারা স্বৈরাচার প্রতিরোধ–এই দুই ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের জানা তৃতীয় কোনো পথ খোলা নেই। আমরা জানি, গণঐক্য ও দুর্বার গণআন্দোলনই আমাদের পথ।'

মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইয়ুব খানের জয়লাভের পেছনে নানাবিধ কারণ থাকলেও এই নির্বাচনের পরপরই শাসক শ্রেণী অর্জিত অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, একটি শক্তিশালী এককেন্দ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-পদ্ধতির আধিপত্য বিস্তার মোটেই অসম্ভব নয়। এর সঙ্গে কো-পার্টনার হিসেবে বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর আনুগত্য দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাজমান এই অবস্থা শুরু হয় ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা ব্যবস্থার সামরিক মৌলনীতির অসারত্ব প্রমাণিত হলো। মূলত যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তান ও বহির্বিশ্ব হতে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। দেশপ্রেমিক বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মউপলব্ধিতে উপনীত হলো যে, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কোনো প্রকার দায়দায়িত্ব নেই। পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই বাঙালির কাছে প্রচলিত শক্তিশালী কেন্দ্র ও একককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিপদ সম্পর্কে তাদের সচেতনতা এনে দেয়। জেনারেল আইয়ুবের এতদিনব্যাপী প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী কেন্দ্রের ফর্মুলা প্রকৃত বিপদের দিনে যে তাদের কোনোই কাজে আসবে না এই অভিজ্ঞতাই বাঙালিকে নতুন করে সচেতন করে তোলে। যুদ্ধকালীন এই বিচ্ছন্নতার কারণে বাঙালি জাতি বুঝতে শিখল আইয়ুব ও তার দালালগণ যাই বলুক না কেন বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার মতো মৌলিক বিষয়েও বাঙালির কোনো অংশীদারিত্ব ও ভূমিকা নেই। দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্ববাংলার প্রতি এতদিনের বঞ্চনা যুদ্ধের জন্য বাঙালি জাতিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

যুদ্ধে বাঙালি বৈমানিকদের নিপুণতা ও সাহস বাঙালি যে যোদ্ধাজাতি নয় এই প্রচারণার আসরত্ব প্রমাণ করে এবং পরিণতিতে জাতীয় গর্বের আত্মপ্রত্যয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী মূল সচেতনার ধারাকেই শক্তিশালী করে। ১৯৬৬ সাল জানুয়ারিতে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার অব্যবহিত পরেই পশ্চিম পাকিস্তানে উগ্র-সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্ররোচনায় তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। লাহোরে অনুষ্ঠিত তাসখন্দ চুক্তিবিরোধী এই চক্রের কার্যধারার বিরোধিতা করে শেখ মুজিব স্বৈরাচারীর শাসক আইয়ুবের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের লড়াই জোরদার. পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র, প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যে লাহোরে ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন। ছয় দফা দাবির পরিশেষে তিনি বললেন: আমার ছয় দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করিনি। বরঞ্চ আমি যুক্তি তর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমি স্বার্থের মুখপাত্ররা আমরা বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুন ও বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আমার বাপ-দাদার মতো মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন। এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন; আর আমি কোন ছার? দেশবাসী মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা দেখিয়েছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টাও পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতারা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করতে হয়েছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেও ছাত্রসংগঠনটি যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল তাই পার্টিও আন্তঃকোন্দল ছাত্রকর্মীদের মধ্যেও পড়েছিল। মূল পার্টিও একাংশের নেতৃত্বে ছিলেন সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হক। এদের বিরোধী পক্ষ ছিলেন আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আহাম্মদ ও দেবেন সিকদার। পার্টির নাম রেখেছিলেন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের এই দুই ধারা ছাড়াও সিরাজ সিকদার, মাহবুবউল্লাহ এবং আবুল কাসেম ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন অন্য একটি গ্রুপও ছিল। এসব প্রকাশ্য উপদল। ভেতরে ভেতরে আরো উপদল ও উপমত ছাত্র ইউনিয়নে (মেনন) গ্রুপে কাজ করত। একদল মূল পার্টির নেতা হক-তোয়াহার সমর্থক ছিল। আবদুল মতিনের একদল সমর্থক ছিল। কাজী জাফরের অনুসারীও ছিল এক বিরাট সংখ্যায়। তত্ত্বগত দিক থেকে হক-তোয়াহা মনে করতেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো রেখেই পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আবদুল মতিনের অংশ পূর্ব বাংলার আলাদা সত্তার পক্ষে ছিলেন।[১৪] বাষট্টির সেপ্টেম্বর থেকে ঊনসত্তরের জানুয়ারিতে একের পর এক যেভাবে ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল তখন কেউ না বুঝতে পারলেও লড়াকু বাঙালি যে কিছুদিনের মধ্যেই অস্ত্র ধরে বাংলাদেশ স্বাধীন করে ফেলবে তার চিহ্ন প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এদিন পূর্ব ঘোষিত হরতালে ঢাকা শহরে মানুষে মানুষে প্লাবন ডেকে আনে। হরতাল পূর্ণভাবে সফল হয়। নগরীতে সেনাবাহিনীও তলব করা হয়। সচিবালয়ের সামনে পাখীর মতো গুলি করে হত্যা করা হয় প্রথমে ছাত্রকর্মী রুস্তম আলীকে, পরে স্কুল বালক কিশোর মতিয়ুর রহমানকে। বৈদ্যুতিক তার বেয়ে মানুষ সচিবালয়ের প্রয়ার কান্ডিশনের বাক্স ভাঙতে যাচ্ছে। গুলি খেয়ে সেই তার থেকে ছিটকে পড়েছে একজন। আর তা দেখে কিন্তু কেউ থামছে না। আরেকজন উঠছে। এটা উন্মত্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে লড়াকু জনতা। সমগ্র নগরী এক অভূতপূর্ব শিহরণে জেগে উঠে। ছাত্র জনতার মধ্যে এমন একটা লড়াকু মনোভাব জাগ্রত হয়ে উঠে যে তা যে কোনো সময় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে। নেতৃবৃন্দ জনতার এই অগ্নিমূর্তি দেখে ভয়াবহ কিছু ঘটনার আশঙ্কায় ভাবিত করে তোলে। লক্ষ লক্ষ মানুষ পল্টনে দুই শহীদের লাশ নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর অপেক্ষায়, আর ঐ দিকে গভর্নর হাউসে সেনাবাহিনী কামান-মেশিনগান তাক করে প্রস্তুত। যে কোনো সময় প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ ঘটে যেতে পারে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি করে একটা অনাহূত রক্তাক্ত ও বিয়োগান্তক ঘটানো এড়ানো যায় তা সকলকেই চিন্তিত করে তুলছিল। অবশেষে আত্মার মাগফেরাত কমনায় দরুদ পাঠ করার জন্য মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয়। শহীদ মতিয়ুরের পিতা এ সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি উপস্থিত লাখ লাখ বিক্ষোভকারীকে 'মতিয়ুর' বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তী কর্মসূচি দেয়ার জন্য ছাত্র-জনতার থেকে চাপ এলে পরদিন ২৫ জানুয়ারি আবার সর্বাত্মক হরতালের কথা ঘোষণা করা হয়।[১৫] ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় আসেন। এটাই তাঁর জীবনের শেষ ঢাকা সফর। এ উপলক্ষে ঢাকা শহরের সকল যানবাহন, দোকানপাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'আইয়ুব ফিরে যাও' পোস্টার লাগিয়ে দেয়া হয় এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। পূর্ব কর্মসূচি অনুযায়ী স্কুল-কলেজের ছাত্ররা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো পথ ছিল না। "পলিটিক্যাল পার্টিস বিল"টি দ্বারা ধূর্ত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এক ঢিলে কয়েকটি পাখি একসঙ্গে মারতে চেয়েছিলেন। যেমন, এক. রাজনৈতিক দলগুলিকে পুনরুজ্জীবনের দাবিতে পূর্ববঙ্গে যে ব্যাপক গণজাগরণ দেখা দিচ্ছিল তাকে প্রশমিত করা; দুই. গণঐক্যে ভাঙন ধরানো। দলগঠন বা পুনরুজ্জীবনের জন্য অধীর আগ্রহী রাজনীতিবিদদের মধ্যে দলীয় কোন্দল সৃষ্টি করা; তিন. জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যকে রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত করা এবং চার. প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের রাজনৈতিক স্থিতি আরও সুদৃঢ় করা। ১৯৬২ সাল ১৪ জুলাই জাতীয় পরিষদে এ বিল গৃহীত হয়। দীর্ঘ ৪৫ মাস পরে দেশ রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলো। এ প্রেক্ষিতে ছাত্র রাজনীতি করার সুযোগ এনে দেয়। ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তিতে জোট গঠনের তৎপরতা শুরু হয়।

সর্বদলীয় ছাত্রজোট গঠন

ছাত্রদের কর্মসূচি ঘোষণার তিনদিন পর ৮ জানুয়ারি (১৯৬৯) রাজনৈতিক দলগুলো বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করার লক্ষ্যে ৮ দফা দাবিনামার একটি মিলিত কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[১১] এতে দল হিসেবে স্বাক্ষর করেন: ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম: ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, খ. আমীর হোসেন শাহ: ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, গ. মিয়া তোফায়েল: ভারপ্রাপ্ত আমীর, জামায়েতে ইসলাম পাকিস্তান, ঘ. মোহাম্মদ আলী: সভাপতি, নেজামে ইসলাম পাটি, ঙ. মুফতি মাহমুদ: সাধারণ সম্পাদক, জামায়েত উলেমা-ই-ইসলাম, চ. মমতাজ দৌলতানা: সভাপতি, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ছ. নসরুল্লাহ খান: সভাপতি, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পি.ডি.এম), জ. নূরুল আমীন: সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) সংক্ষেপে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ জোটের নাম রাখা হয় 'ডাক'। ভাসানী ন্যাপ ও পিপলস পার্টিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তাঁরা এই জোটে অংশ নিতে অস্বীকার করে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ সভাপতি যথাক্রমে শেখ মুজিবুর রহমান এবং খান আবদুল ওয়ালী খান জেলে থাকায় তাঁদের পদে ভারপ্রাপ্তরা স্বাক্ষর করেন।[১২] "ডাক সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে নেই। কিন্তু ১৭ জানুয়ারি পাকিস্তানব্যাপী দাবি দিবস পালনের আহ্বান দেয়। এই দিবস হতেই প্রত্যক্ষ আন্দোলনের সূচনা করার জন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। কারণ আইয়ুবশাহীর অবসানের জন্য পাকিস্তানব্যাপী একই দিনে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার তাৎপর্য ও গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি। ১৭ জানুয়ারি সভার পূর্বেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সুতরাং সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আয়োজিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্ধারিত সভায় নতুন কর্তব্য উপস্থিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের এটি ছিল প্রথম ছাত্রসভা। এতে সভাপতিত্ব করে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ।[১৩]

প্রকৃতপক্ষে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপে তখন বহু উপদল কাজ করত অথচ এই গ্রুপের সবাই ছিল না মাও সে তুংয়ে চিন্তাধারার অনুসারী। কিন্তু একই চিন্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেও ছাত্রসংগঠনটি যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল তাই পার্টিও আন্তঃকোন্দল ছাত্রকর্মীদের মধ্যেও পড়েছিল। মূল পার্টিও একাংশের নেতৃত্বে ছিলেন সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হক। এদের বিরোধী পক্ষ ছিলেন আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আহাম্মদ ও দেবেন সিকদার। পার্টির নাম রেখেছিলেন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের এই দুই ধারা ছাড়াও সিরাজ সিকদার, মাহবুবউল্লাহ এবং আবুল কাসেম ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন অন্য একটি গ্রুপও ছিল। এসব প্রকাশ্য উপদল। ভেতরে ভেতরে আরো উপদল ও উপমত ছাত্র ইউনিয়নে (মেনন) গ্রুপে কাজ করত। একদল মূল পার্টির নেতা হক-তোয়াহার সমর্থক ছিল। আবদুল মতিনের একদল সমর্থক ছিল। কাজী জাফরের অনুসারীও ছিল এক বিরাট সংখ্যায়। তত্ত্বগত দিক থেকে হক-তোয়াহা মনে করতেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো রেখেই পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আবদুল মতিনের অংশ পূর্ব বাংলার আলাদা সত্তার পক্ষে ছিলেন।[১৪] বাষট্টির সেপ্টেম্বর থেকে উনসত্তরের জানুয়ারিতে একের পর এক যেভাবে ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল তখন কেউ না বুঝতে পারলেও লড়াকু বাঙালি যে কিছুদিনের মধ্যেই অস্ত্র ধরে বাংলাদেশ স্বাধীন করে ফেলবে তার চিহ্ন প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এদিন পূর্ব ঘোষিত হরতালে ঢাকা শহরে মানুষে মানুষে প্লাবন ডেকে আনে। হরতাল পূর্ণভাবে সফল হয়। নগরীতে সেনাবাহিনীও তলব করা হয়। সচিবালয়ের সামনে পাখীর মতো গুলি করে হত্যা করা হয় প্রথমে ছাত্রকর্মী রুস্তম আলীকে, পরে স্কুল বালক কিশোর মতিয়ুর রহমানকে। বৈদ্যুতিক তার বেয়ে মানুষ সচিবালয়ের প্রয়ার কান্ডিশনের বাক্স ভাঙতে যাচ্ছে। গুলি খেয়ে সেই তার থেকে ছিটকে পড়েছে একজন। আর তা দেখে কিন্তু কেউ থামছে না। আরেকজন উঠছে। এটা উন্মত্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে লড়াকু জনতা। সমগ্র নগরী এক অভূতপূর্ব শিহরণে জেগে উঠে। ছাত্র জনতার মধ্যে এমন একটা লড়াকু মনোভাব জাগ্রত হয়ে উঠে যে তা যে কোনো সময় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে। নেতৃবৃন্দ জনতার এই অগ্নিমূর্তি দেখে ভয়াবহ কিছু ঘটনার আশঙ্কায় ভাবিত করে তোলে। লক্ষ লক্ষ মানুষ পল্টনে দুই শহীদের লাশ নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর অপেক্ষায়, আর ঐ দিকে গভর্নর হাউসে সেনাবাহিনী কামান-মেশিনগান তাক করে প্রস্তুত। যে কোনো সময় প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ ঘটে যেতে পারে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি করে একটা অনাহূত রক্তাক্ত ও বিয়োগান্তক ঘটানো এড়ানো যায় তা সকলকেই চিন্তিত করে তুলছিল। অবশেষে আত্মার মাগফেরাত কমনায় দরুদ পাঠ করার জন্য মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয়। শহীদ মতিয়ুরের পিতা এ সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি উপস্থিত লাখ লাখ বিক্ষোভকারীকে 'মতিয়ুর' বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তী কর্মসূচি দেয়ার জন্য ছাত্র-জনতার থেকে চাপ এলে পরদিন ২৫ জানুয়ারি আবার সর্বাত্মক হরতালের কথা ঘোষণা করা হয়।[১৫] ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় আসেন। এটাই তাঁর জীবনের শেষ ঢাকা সফর। এ উপলক্ষে ঢাকা শহরের সকল যানবাহন, দোকানপাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'আইয়ুব ফিরে যাও' পোস্টার লাগিয়ে দেয়া হয় এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। পূর্ব কর্মসূচি অনুযায়ী স্কুল-কলেজের ছাত্ররা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাশ বর্জন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব নির্মিত কলাভবনের সামনে জমায়েত করে। সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে ডাকসু নেতা তোফায়েল আহমেদ গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বশর্ত হিসেবে শেখ মুজিব, ওয়ালী খান, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, ভুট্টোসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি এবং মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক ও মোহাম্মদ ফরহাদের উপর থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি জানান।[১৬] আন্দোলন রক্তাক্ত সোপান বেয়ে তীব্রগতিতে ইতিহাসের নির্ধারিত লক্ষ্যে এগিয়ে যায়।

টীকা :

১. শেখ শহীদুল ইসলামের সঙ্গে গ্রন্থকারের কথোপকথন।
২. মোহম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ-১২০।
৩. অমিতাভ গুপ্ত, *গতিবেক-চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তি সৈনিক শেখ মুজিব*, পৃ-৫১৭।
৪. ঐ, পৃ-৫১৮।
৫. সূত্রঃ জাহেদা আহমদ, *রাষ্ট্র ও শিক্ষা, বাংলাদেশের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড*, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, পৃ-১০৩।
৬. সূত্রঃ ২৩ই মার্চ ১৯৬৬ করাচীতে শেখ মুজিব কর্তৃক সাংবাদিক সম্মেলনের অংশবিশেষ। তিনি ঐ সম্মেলনে ছয় দফার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।
৭. কে এম শামসুল আলম, *বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইতিহাস*, পৃ-৯৫।
৮. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ*, পৃ-১৮৭-১৮৯।
৯. About Mujibur Rahman and his Six-Points, chief Justice Munir writes "The six-points if accepted, Particularly the points relating to foreign exchange currency and the export of capital and resources would have made a federation a farce and would have led to the disintegration of Pakistan" Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh. page- 372.
১০. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ-৫৫৩।
১১. দৈনিক পাকিস্তান, ৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯।
১২. মোহম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ-১৬৩, ১৬৪।
১৩. ঐ, পৃ-১৬৫।
১৪. ঐ, পৃ-১৬৯।
১৫. ঐ, পৃ-১৭০-১৭১।
১৬. ঐ, পৃ-১৭২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায়: ছয়

গণঅভ্যুত্থান ও সশস্ত্র পরিকল্পনা

[ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঢাকা সেনা ছাউনিতে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান-এর রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার চলছিল। বিচারের সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিস্তরঙ্গ। শংকাহীন। ঐ মামলাকে শাসকগোষ্ঠী নাম দিয়েছিল আগরতলা মামলা। কারণ ছিল বাঙালি জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ভারত বিদ্বেষী হাতিয়ারকে কাজে লাগানো, যাতে শেখ মুজিবের প্রতি জনগণের ঘৃণা জন্মায় এবং তা শাসককূলের অনুকূলে আসে। বিভিন্ন তথ্যে জানা যায়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্র-জনতা ছয়-দফা তথা বাংলার স্বার্থ ও স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই যে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার, নির্যাতন এবং সর্বশেষে ফাঁসি দেয়া হবে এ বিষয়টি উপলব্ধি করে উত্তাল আন্দোলন শুরু করে। সেদিন ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে জনগণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বিরাজমান কঠিন পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ দেখলেন এই বৈঠক শেখ মুজিবের উপস্থিতি ব্যতীত অর্থহীন হবে। নানা কুট-কৌশলের মধ্যে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন ডাকসুর ভিপি ও ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ।

বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে যান। ছয় দফা পেশ করেন। ছয়-দফা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের মন্তব্য ছিল 'এই প্রস্তাব হলো পাকিস্তানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা। আমার দেশের ধ্বংসের উপর আমি সভাপতিত্ব করতে পারি না। ছয়-দফা মেনে নিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।' এছাড়াও এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর কার্যক্রম এবং তিনি যে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের সঙ্গে তার যে যোগাযোগ ছিল তাও উল্লেখ করা হয়েছে।]

ঢাকা সেনা ছাউনিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বন্দি শেখ মুজিব। বিচার চলছে। আগরতলা মামলা শুরুর প্রথম দিন। আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব সংশ্লিষ্ট সবার উদ্দেশে শংকাহীন কণ্ঠে এমন এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যা আদালতে উপস্থিত বিচারক, সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার লোক এবং আইনজীবী-সাংবাদিকদের স্তম্ভিত করে দেয়। এ বিষয়ে ওইদিন আদালত কক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ লিখেছেন, '১৯৬৮ সালের ২০ জুন, সকাল ৯টায় মামলা শুরুর দিন ঢাকা শহর ও সামরিক এলাকায় উত্তেজনাকর উৎকণ্ঠাময় এক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সুস্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, কুর্মিটোলাস্থ সামরিক বাহিনী আর জনগণের অবস্থান পৃথক সত্তায় অবস্থিত। তখন থেকে ডিএফআই (তিন বাহিনীর

সংযুক্ত গোয়েন্দা সংস্থা) সামরিক বাহিনীর বাইরে কিছুটা প্রকাশ্য কিছুটা অপ্রকাশ্যভাবে মামলার প্রতিক্রিয়া জানা ও জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত হতে থাকে। এদের প্রধান সহযোগী ছিল প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ। জনাব মুস্তাফিজুর রহমান তখন অভিযুক্তদের ইন্টারোগেশনের কর্তৃত্ব করতেন বলে সংশ্লিষ্টগণ জানান। ট্রাইব্যুনাল কক্ষে প্রথমদিকে প্রবেশের সময় মনে হতো একটি ভীতিকর নির্যাতন কক্ষে অথবা গ্যাস চেম্বারে প্রবেশ করছি।

ক্ষুদ্র কক্ষের বিচারকদের ডানপাশে ছিল নির্দিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিকের জন্য চেয়ার ও টেবিল। তাঁদেরই বামপাশে গা ঘেঁষে বক্ষ সমান্তরাল বেড়ি দিয়ে অভিযুক্তদের (আসামি) জন্য স্থান করা হয়েছিল। উঁচু এজলাসের মুখোমুখি অতি কাছে ছিল দুই পক্ষের কৌসুলিদের বসার স্থান। তাঁদের পেছনে ছিল দর্শকদের জন্য নির্ধারিত চেয়ার। সাক্ষীর কাঠগড়া এজলাসের বাঁ হাতের কোণায়।

ন'টা বাজার মিনিটপাঁচেক আগে বিচার কক্ষের ডানদিকের দরজা দিয়ে অভিযুক্তদের নির্দিষ্ট এলাকায় উপস্থিত করা শুরু হয়। সমগ্র কক্ষ নিস্তব্ধ। পিন পতনের শব্দও যেন শোনা যাবে। ন'টা প্রায় বাজে বাজে। বিচারকগণ পেছনের দরজা দিয়ে এজলাসে স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করবেন। বিচারপতিগণ আগমনের পূর্বে উৎকণ্ঠিত আইনজীবীগণ এবং অতিকষ্টে অনুমতিপ্রাপ্ত অভিযুক্তদের মা-বাবা-সন্তান ও আত্মীয়স্বজন দর্শকরূপে নির্বাক হয়ে পাশের দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রথমেই অভিযুক্তদের অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রদত্ত আসন নম্বর আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। প্রথম যিনি পাশের দরজা দিয়ে ট্রাইবুনাল কক্ষে প্রবেশ করলেন– রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত এক নম্বর ব্যক্তি, দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরিহিত দীর্ঘকায় শংকাহীন মানুষটি দৃঢ় পদক্ষেপে নির্দিষ্ট আসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রবেশের পরেই তিনি সমগ্র কক্ষটির ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন। খালি উঁচু এজলাসের দিকে তাকালেন। মৃদু হাসি, বলিষ্ঠ মনোভাব ও অকুতোভয় মানুষটিকে দেখার সাথে সাথে দর্শক ও আইনজীবীদের মধ্যে একটি গুঞ্জরন শোনা গেল। তিনি যেন ভুলেই গেছেন যে ফাঁসি দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্রের কোনো মামলায় তাঁকে আনা হয়েছে। তাঁর পাশেই ছিলেন দু'নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদ্রোহের প্রধান পরিকল্পনাকারী লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও তৃতীয় ব্যক্তি তেজী স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরেই সুলতান উদ্দিন।

শেখ মুজিব চিরাচরিত অভ্যাসমতো পা বাড়িয়ে প্রথম সারির কোণায় প্রথম আসনে অতি স্বাভাবিকভাবে পা ক্রস করে বসলেন। তখনী আমি তাঁর পাশাপাশি হয়ে গেলাম। মাঝখানে কাঠ ও লোহার রডের বিভাজন মাত্র। আমি রিপোর্টারদের সারিতে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বসা ছিলাম বলে আমার ও তাঁর মধ্যে মাত্র হাত দুয়েক ব্যবধান ছিল। এমনটি ঘটবে তা আগে ভাবিনি। একবার তাঁর মুখের দিকে চাইবার সাথে সাথে ঘোষণা হলো বিচারকগণ প্রবেশ করছেন।

প্রধান বিচারপতি এসএ রহমানের আসন গ্রহণের সাথে সাথে দুপাশে দুজন বিচারপতি আসন অলঙ্কৃত করলেন। এখন বিচার শুরু। স্বাভাবিকভাবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারপক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। মঞ্জুর কাদের দাঁড়িয়ে মৃদু ও স্বাভাবিক কণ্ঠে আনুষ্ঠানিক দিক ব্যাখ্যা করছেন। আমি এবং অন্য সমস্ত রিপোর্টারই ফাঁসির আসামি এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সারাজীবনই মুজিব ভাই বলতাম। ফলে সবার মনেই একদিকে যেমন তাঁর সম্পর্কে উৎকণ্ঠা, অপরদিকে তাঁর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য নানা প্রশ্ন জাগছিল। এমন কি এত সতর্কতার মধ্যেও কথা বলা যায় কিনা সেই ফাঁক আমরা স্ব-স্ব পদ্ধতিতে ভাবছিলাম। কিন্তু যমের মতো জাঁদরেল কালো গাউন পরিহিত তিনজন বিচারপতি এবং সতর্কতাদানকারী বহুসংখ্যক ডিএফআই এবং আইবির লোক ক্ষুদ্র কক্ষটিতে শ্যেনদৃষ্টিতে শেখ সাহেবের দিকে চেয়ে আছেন। ভাবলাম, ডানদিকে বাঁকা করলেই গর্দান যাবে। এমন সময় আকস্মিক ডাক, 'ফয়েজ, ফয়েজ, এই ফয়েজ! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাথরের মূর্তির মতো বিচারকদের দিকে চেয়ে রইলাম। একটু পরেই আমার ডান উরুতে শেখ সাহেব হাত বাড়িয়ে কিছু একটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিলেন। দেখলাম তাঁর সেই বিখ্যাত পাইপের আঘাত। নিশ্চয়ই তিনি অভ্যাসের দাবিতে (তামাকহীন) পাইপ আনতে অনুমতি পেয়েছিলেন। সাধারণত কোর্টে এ সমস্ত অনুমতি দেয়া হয় না। এবার কি করি! আমি দুই পক্ষের কৌসুলিদের সামান্য তর্ক-বিতর্ক ফাঁকে পূর্বের ন্যায় প্রস্তর মূর্তির মতো অন্যদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললাম, 'মুজিব ভাই, কথা বলা মানা। মাথা ঘোরাতে পারছি না। বের করে দেবে।' তক্ষুণি উত্তর আসলো যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে, 'ফয়েজ, বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলতে হবে।' তার এই কথা ছিল রাজনৈতিক ও প্রতীক ধর্মী। স্তম্ভিত কোর্ট, সব আইনজীবী ও দর্শকগণসহ সরকারি অফিসাররা তাঁর এই সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। প্রধান বিচারপতি একবার ডানদিকে ঘাড় বাঁকা করে শেখ মুজিব ও অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দিকে তাকালেন। কিছুই বললেন না। কোনো সতর্ক উচ্চারণ ছিল না। তিনি হয় তো কোর্টের আভিজাত্য বোধ থেকে এই দৃষ্টিপাতকেই যথেষ্ট সতর্কতা প্রদান বলেই মনে করেছিলেন এবং বোধহয় নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, শেখ মুজিব এমন কারাগার, ভয়ভীতি, শংকা ও ট্রাইব্যুনালের বিচারের মধ্যেও শেখ মুজিবই রয়ে গেছেন। তবে কিসের সমর্থনে শেখ মুজিবের এই মনোবল, তা তিনি এমন সুউচ্চ অবস্থান থেকে অনুমান করতে পারেননি। তখন তিনি জানতেন না যে, শেখ মুজিবের এই প্রতীকী উচ্চারণ একজনের জন্য নয়, সমগ্র দেশের জনগণের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলনের বাণীস্বরূপ।'[১]

উত্তাল আন্দোলনের মুখে কথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার হয়। বিনা শর্তে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্তদের ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেয়। ১৯৬৮ সালের জুনের তৃতীয় সপ্তাহে এই মামলার শুনানি শুরু হয় এবং '৬৯-এর ২৭ জানুয়ারি তা শেষ হয়, 'রায়' ঘোষণার আগেই শুরু হয় উত্তাল আন্দোলন। দীর্ঘদিন ধরে এই ঘৃণ্য মামলা প্রত্যাহারের জন্য মওলানা ভাসানী দাবি জানিয়ে আসছিলেন, তাতে কাজ না হওয়ার শুরু করেন জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন। নীতিগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও মুজিবের মুক্তির জন্য রাজনৈতিক উদ্যোগ নেন ভাসানী। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব মুক্তি পান। এর আগেই আইয়ুব খান ঘোষণা করেছিলেন, তিনি পরবর্তী নির্বাচনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন না এবং তাঁর আইনমন্ত্রী এস. এম. জাফর আভাস দিয়েছিলেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত করার ব্যাপারেও রাজনীতিবিদদের মতৈক্যে পৌঁছা উচিত। গোলটেবিল বসাসহ এ সবই ছিল পূর্ববাংলার আন্দোলনকে প্রশমিত করার কৌশল।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ওই দিনই রাতে শেখ মুজিব ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দীর্ঘ সময় তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। তবে আলোচনাকালে ভাসানী মুজিবকে গোলটেবিলে যেতে বারণ করেন। ভাসানী মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা এসেছিলেন পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন প্রমুখ। ভাসানী তাঁদের একই কথা বলেন যে, শোষক ও শোষিত টেবিলে আলোচনায় বসলে শোষকেরই জয় হয়। শোষিতের নয়, জালেমের সঙ্গে আর কোনো আলোচনা নয়, জনগণ তাদের দাবি আন্দোলনের মাধ্যমেই আদায় করবে।

১৭ ফেব্রুয়ারি '৬৯ সালে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির এক গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন এবং এতে সভাপতিত্ব করেন নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান। তিনি উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে তিনটি শর্ত আরোপ করেন। ১. জরুরি অবস্থা তুলে নিতে হবে, ২. ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করতে হবে, ৩. সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। উক্ত গোলটেবিল বৈঠকটি ২৬ ফেব্রুয়ারি '৬৯ সালে বৈঠকে বসে এবং ১০ মার্চ পর্যন্ত মুলতবি হয়।

এ সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঘোষণা দেন তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন না এবং '৬২ সালের সংবিধান বাতিল করবেন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হবে। ১০ মার্চ নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান কনফারেন্সে দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল পার্লামেন্ট সিস্টেম চালু হবে. ২. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বিস্তারিত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। কিন্তু ১১ দফা দাবির সঙ্গে ছাত্রদের যে সব দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন: সেকুলার এডুকেশন, সায়েন্স ল্যাবরেটরি উন্নয়ন, কাগজের দাম কমানো, জগন্নাথ কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা, ছাত্র বন্দিদের মুক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, দেশের অখণ্ডতার একমাত্র পথ হলো ৬ দফা ফর্মুলা।

আইয়ুব খান সরাসরি প্রশ্ন করেন, এই অখণ্ডতা কোন দেশের জন্য? প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলেন শেখ মুজিবের ৬ দফা পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলবে। আমি যদি ৬ দফা মেনে নেই তাহলে কায়েদ-এ-আযম যা করেছেন তা বাতিল করা হবে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ওয়ালি খান বলেন, এক ইউনিট এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। জামায়েত-ই ওলামায়ে ইসলামের নেতা মওলানা মওদুদী দাবি করেন, সংবিধানের ইসলামের মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আলী বলেন, লিয়াকত আলী খান ও খাজা নাজিমুদ্দীনের সময় এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়গুলো নিরসন হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ১৯৫৩ সালে মোহাম্মদ আলী বগুড়ায় যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন এই ফর্মুলাগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। কোনো কিছু অর্জন ছাড়াই গোলটেবিল বৈঠক ভেঙ্গে যায়।

১৯৬৯ সালে প্রথম দিক থেকেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ভাবমূর্তি বিনিষ্ট হতে থাকে। তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। গোলটেবিল বৈঠকে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তার সমর্থক সামরিক এবং বেসামরিক পর্যায়ে প্রশ্ন ওঠে। তারপরেও তার মিলিটারি সেক্রেটারি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ রফিক, তথ্য সচিব আলতাফ গওহর ও সৈয়দ ফিদা হাসান যিনি ছিলেন তার রাজনৈতিক সচিব তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক এবং ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষের বিপরীতে তাকে সমর্থন করেন। হোম সেক্রেটারি এ বি আওয়ান ১৯৬৯ সালে মার্চ মাসে ঢাকা এবং করাচী ঘুরে দেখেন কেউ আদেশ-নির্দেশ মানছেন না। আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। কার্ফিউ জারি করা হলেও তা ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে সেক্রেটারিয়েট ঘেরাও হচ্ছে। হরতাল চলছে। এমনকি সুইপাররা তাদের দাবির পক্ষে স্লোগান দিয়ে বেড়াচ্ছে। অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে গেছে। কলকারখানা বন্ধ। এ সময় জাস্টিস পার্টির প্রধান মার্শাল মোঃ আজগার খান বলেন, "অবিলম্বে সরকার মরে যেতে হবে"।[২] কিন্তু তখন এটা ছিল "too little to late"[৩] আইয়ুব খান সেনাপ্রধান ও তিন বাহিনী প্রধান থেকে সক্রিয় সমর্থনের আশ্বাস পাননি। তখন তিনি উপলব্ধি করেন তাকে প্রেসিডেন্ট পদ হতে সরে যেতে হবে।

আওয়ামী লীগের দাবি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, "এই প্রস্তাব হলো পাকিস্তানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা। আমার দেশের ধ্বংসের উপর আমি সভাপতিত্ব করতে পারি না। ৬ দফা মেনে নিলে কেন্দ্রের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।"[৪] এ সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কতগুলো বিকল্প চিন্তা করেন। ১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আংশিক সামরিক শাসন জারি, ২. সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করে প্রধান সামরিক আইন শাসকের ভূমিকা পালন, ৩. জাতীয় পরিষদের স্পিকার আব্দুল জব্বার খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, ৪. পদত্যাগ ও সামরিক বাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। প্রথম ও দ্বিতীয়টির বিকল্প বাস্তবসম্মত ছিল না, যেহেতু তিনি সামরিক বাহিনীতে নেই। তৃতীয় বিকল্প হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাকে যখন বলেন, আপনি স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন না কেন? আইয়ুব খান উত্তরে বললেন, "I don't trust this Bastard" কেননা কোনো বাঙালিকে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দেখতে চান না।

২৩ ফেব্রুয়ারি। '৬৯। রেসকোর্স ময়দান। শেখ মুজিবকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অবিস্মরণীয় গণসংবর্ধনা দেয়। ঐ সংবর্ধনায় ডাকসুর সহ-সভাপতি ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক তোফায়েল আহমেদ ছাত্র-জনগণের পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন।

১১-দফা বাস্তবায়নে মুজিবকে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। ছাত্রনেতারা ঘোষণা করেন, ১১- দফার দাবি পূরণের মধ্যেই শহীদের রক্ত ও নির্যাতিত শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মেহনতি জনতার দাবি পূরণ হতে পারে। আপসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে ছাত্রনেতারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের মাহবুবুল হক দুলন বলেন, 'সারাদেশের ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি আজ জনতার মাঝে ফিরে এসেছেন। জনগণের একমাত্র দাবি ও কর্মসূচি হচ্ছে ১১-দফা। যদি ১১-দফা ছাড়া অন্য কিছু (গোলটেবিলে) আলোচনা হয় তবে এদেশের মানুষ মেনে নেবে না।' ছাত্রনেতারা রাজবন্দিদের মুক্তি দাবি করেন।[৫] অন্য যে-সব রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীর বিরুদ্ধে হুলিয়া রয়েছে তা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা। এই পূর্বশর্ত পূরণ করা ব্যতীত শেখ মুজিবকে আলোচনায় না যাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।"

'ছয় দফা' দেয়ার পর শেখ মুজিব জেলে গেলে নামকরা আওয়ামী লীগ নেতা ৬ দফার বিরোধিতা করে পি.ডি. এমপন্থী (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) চলে যায়। তখন এম.এ. আজিজ 'ছয় দফা'র পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। সে সময় আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন আমেনা বেগম। এদের দুর্বল ও অনভিজ্ঞ নেতৃত্বের কারণে তখনকার আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ৬ দফাপন্থীদের খুবই নাজুক অবস্থা ছিল। ছাত্রলীগ কর্মী ও নেতাদের চাপে এবং এম.এ আজিজের বলিষ্ঠ ভূমিকায় আওয়ামী লীগের জেলা নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'ছয় দফাপন্থী' আওয়ামী লীগের অবস্থাকে সুসংহত করেন। আগরতলা মামলার কথা স্মরণ করে আতাউস সামাদ বলেছেন, "একদিন আদালত প্রাঙ্গণে বসে আমরা তাঁর কাছে আন্দোলনের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বলেছিলেন, 'দেখ, ওরা আমাদের কিছু করতে পারবে না। আমার অনেক লোকজন আছে। তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগও আছে। তোমরা দেখবে অচিরেই তারা কাজে নেমে যাবে। এবার এমন আন্দোলন হবে যে, আমরা সবাই ছাড়া পেয়ে যাব। অন্যদিকে সরকারের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠবে। এবার আমরা রাজপথের আন্দোলন করে দেশ স্বাধীন করব।"

আতাউস সামাদের সঙ্গে কথা বলে এটা স্পষ্ট হয় যে, শেখ মুজিব জেলখানায় বসে বাইরের আন্দোলন তীব্র করার কলাকৌশল নিয়ে ভাবতেন। কাকে দিয়ে কোন্ কাজটি হবে সেটিও ছিল তাঁরা জানা। সে সময় আগরতলা মামলার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহে আসা সাংবাদিকদের মধ্যে আতাউস সামাদ ছিলেন অন্যতম এবং তিনি ছিলেন শেখ মুজিবেরও বিশ্বাসভাজন। আতাউস সামাদ বলেন, "একদিন (সম্ভবত শনিবার) শেখ সাহেব সাংবাদিক আতাউস সামাদকে বললেন, 'তুমি টি-ব্রেকের সময় আমার সঙ্গে একটু দেখা করো।' আমি তখন শেখ সাহেবের পেছনেই বসা। টি-ব্রেকের সময় আতাউস সামাদ সাহেব এলে শেখ মুজিব তাঁকে বলেন, 'মওলানা (আব্দুল হামিদ খান ভাসানী) সাহেবের সঙ্গে তো তোমার ভালো সম্পর্ক। তুমি তাঁকে ভক্তিও করো। এখনো যোগাযোগ আছে তো? সামাদ সাহেব বললেন, হ্যাঁ আছে'।

শেখ সাহেব তাঁকে বললেন, 'তুমি সন্তোষে গিয়ে ওনাকে বলো, শেখ মুজিব বলছেন, আপনাকে আন্দোলনে নামতে। আপনি না নামলে আন্দোলন পূর্ণাঙ্গ হবে না। আর এ ব্যাপারে উনি কী বলেন আমাকে জানাবে।' এরপর রোববারের ছুটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন অর্থাৎ সোমবার টি-ব্রেকের সময় আতাউস সামাদ সাহেব এলে শেখ সাহেব জানতে চাইলেন খবর কী? সামাদ সাহেব বললেন, খবর ভালো। উনি কাগজে স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন, আন্দোলনেও নামবেন শিগরিই। মঙ্গলবারেই পল্টনে সভা করবেন। শুনে শেখ মুজিব আতাউস সামাদকে বললেন, তুমি খুব ভালো কাজ করেছ, আন্দোলন এবার ভালোভাবেই জমবে।"

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে আতাউস সামাদের। স্মৃতিচারণে তিনি বলেন, 'মার্চের শুরুতে একদিন শেখ সাহেবের বাসায় যাই কিছু দরকারি কথা বলার জন্য। সেখানে গিয়ে দেখি একদিকে ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করছিলেন, বঙ্গবন্ধু সেই পতাকা উঠাবেন বলে। আমি ভেতরে যেতে চাইলে ছাত্ররা বললো, 'উনি এখন কারো সঙ্গে দেখা করবেন না, বিকেলে মিটিং আছে। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।' আমি আমার পরিচয় জানিয়ে বললাম, 'আপনারা আমার নামটা বলেন, উনি না করলে আমি চলে যাব। পরে অভ্যর্থনাকারীকে দোতলায় পাঠানো হলো। বঙ্গবন্ধু আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেন। আমি কাছে যেতেই তিনি জানতে চাইলেন, 'কিরে দেশের খবর কি?' আমি তাকে জানালাম, 'সেনাবাহিনী গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছে, যে কোনো সময় আক্রমণ করে বসতে পারে। বিশেষ করে আপনি যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেন তাহলে ওরা আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে তো অত অস্ত্র নেই যে ওদের আক্রমণ ঠেকাবো। অনেক মানুষ মারা যাবে। তিনি তখন জানতে চাইলেন, 'তাহলে কি করা যাবে? আমি তাঁকে অনুরোধ করি আপনি বক্তৃতায় আমাদের যে স্বাধীন হতে হবে এবং এ জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন সে বিষয়ে বলতে পারেন, কিন্তু সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন না।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'দেখ ছাত্ররা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমি ঘোষণা না করলেও ওরা এগিয়ে যাবে। কারণ ওদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আমিই উৎসাহিত করেছি।'[৬]

AMARBOI.COM

গণঅভ্যুত্থানের পারিপার্শ্বকতা

১৯৬৯ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনে শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি মুখ্য হয়ে ওঠে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলছে। মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে সেনা-ঘাতকের হাতে শহীদ হন। এ অবস্থায় সারাবাংলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে।

১৭ ফেব্রুয়ারি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরে পৌঁছে। এক পর্যায়ে দালালদের বাসা ঘেরাও করে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা। লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস। পদ্মা তীরে টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধ। ছাত্র জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আহত হয় ছাত্র জনতা। এ নিয়ে জেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ড. জোহার বিতণ্ডা হয়। লাঠিচার্জে আহত ছাত্রদের নিজ গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করান। তাঁর সাদা শার্ট ছিল ছাত্রদের তাজা রক্তে সিক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তপ্ত। ঐদিন রাতেই বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "ভাষা ও সাহিত্য" সপ্তাহ পালনের জন্য আয়োজিত সভা প্রতিবাদ সভায় রূপান্তরিত হয়। সভা পুলিশী গুণ্ডামির বিরুদ্ধে ছিল বিক্ষুব্ধ। ছাত্ররা গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১৪৪ ধারা ভাঙার।

১৮ ফেব্রুয়ারি। শাহ্ মখদুম হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের সিদ্ধান্তের কথাটি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর ড. জোহাকে তার বাসভবনে গিয়ে জানালে তিনি বের হয়ে আসেন। ড. জোহা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে আসেন তখন নাটোর রোডের দিকে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেছে। ড. জোহার সঙ্গে আরো কতিপয় শিক্ষক ড. মযহারুল ইসলাম, ড. এম. আর সরকার, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, ড. কাজী আবদুল মান্নান, ড. আবদুল খালেক, ড. কছিম উদ্দিন মোল্লা, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, অধ্যাপক আবদুল রাজ্জাক, প্রফেসর জুলফিকার মতিন প্রমুখ বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নাটোর রোড থেকে সরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালান।

ছাত্ররা যখন ফিরে আসছিল ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতক সৈনিকগণ গুলিবর্ষণ করে। ড. শামসুজ্জোহা শহীদ হন। সেদিনের ছাত্র নূরুল ইসলাম রাজশাহী শহরে নির্মমভাবে নিহত হন। আহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আবদুল খালেক, ড. কছিম উদ্দিন মোল্লা, ড. কাজী আবদুল মান্নান প্রমুখ। ড. জোহার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ একযোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ঘোষণা করেন। যা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাংলাদেশে। অচল হয়ে পড়ে দেশ। ড. জোহার সমগ্র জীবনটাই ছিল কমিটমেন্টের। সমকালীন ইতিহাসে তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার ব্লু-প্রিন্ট, অন্যদিকে বাঙালি জাতিসত্তার স্বশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ধূসর দূরবর্তী এখনো, অথচ গৌবরোজ্জ্বল ইতিহাস তার, ব্যাপ্তি অনুদঘাটিত। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে এদের অবদান, মেধা রক্ত-মননকে প্রতিমুহূর্তের অস্বীকৃতি, জাতীয় ইতিহাস সমৃদ্ধ করে না, করে দুর্বল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-জনতার দাবি ছিল দিনটিকে 'জাতীয় শিক্ষক দিবস' ঘোষণা করার। আজ ছাত্র-শিক্ষকের ক্রমাগত সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অপুষ্টি সেই দাবিই পুনরায় অনিবার্যতা নিয়ে এসেছে। ছাত্র-শিক্ষকের সুপ্রীতি, মেধা-মনন ও জ্ঞান চর্চার ভুবনকে সুস্থিত করতে ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্র ও সরকার।

ড. জোহা যদি ঢাকায় প্রাণ দিতেন তাহলে তার মূল্যায়ন কীভাবে হতো। গণমাধ্যমে কীর্তিত হতো জয়ধ্বনি। বাণী আসত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান থেকে। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অনায়াসলব্ধ হতো। উত্তর জনপদে মতিহার চত্বরে শায়িত ড. জোহাকে প্রকৃত অর্থে এই প্রজন্মের সামনে উপস্থিত করা হয়নি আজও। বলা হয়নি ছাত্রের জন্য শিক্ষকের আত্মবলিদানের অত্যুজ্জ্বল গৌরবগাথা। ইত্তেফাকের রিপোর্টে বলা হয়েছে,

"ঐ দিন রাতে রাজধানী ঢাকা নগরীতে অকস্মাৎ সান্ধ্য আইনের কঠিন শৃঙ্খল এবং টহলদানকারী সামরিক বাহিনী সকল প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করিয়া হাজার হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র-জনতা আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের মতো পথে নামিয়া আসে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও 'আগরতলা' ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। গতকল্য রাজশাহীতে জনৈক অধ্যাপকের হত্যা এবং সান্ধ্য আইন জারির খবর এখানকার ছাত্র ও সর্বশ্রেণীর নাগরিকের মনে প্রবল অসন্তোষের সঞ্চার করে। তদুপরি সংবাদপত্রে আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও শেখ সাহেব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে গতকাল ঢাকা ত্যাগ না করায় ছাত্র জনমনে এই বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠে যে, শেখ সাহেবের মুক্তির ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নন। বর্তমান প্রচণ্ড গণজাগরণের পটভূমি উপরোক্ত দুইটি ঘটনা ছাত্র-জনতাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং তারা সান্ধ্য আইনের অনুশাসন উপেক্ষা করে দাবি দাওয়ার প্রতিধ্বনি করার জন্য অকস্মাৎ রাস্তায় নামিয়া আসে।"

"কোন রকম পূর্ব ঘোষণা বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই প্রায় একই সঙ্গে শহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এইভাবে ছাত্র-জনতাকে রাস্তায় বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হয়। রাত্রি ৮টার পর হইতে মধ্য রাত্রি পার হইয়া যাওয়া পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে সমানে বিক্ষোভ চলিতে থাকে। সামরিক বাহিনীর গাড়ির শব্দ এবং বিক্ষিপ্তভাবে বন্দুকের গুলির আওয়াজ পরিবেশকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তোলে।"

পরদিন ঢাকায় কারফিউ থাকা সত্ত্বেও কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দেন। সরকারি নির্দেশে পুলিশ, ই. পি. আর. ও সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে ২০ জন নিহত হন। এছাড়া কুষ্টিয়া ও নোয়াখালীতে ৪ ব্যক্তি নিহত এবং বহু লোক আহত হন।[৭]

গণঅভ্যুত্থান

৬-দফা সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর নেতিবাচক মনোভাব এবং চীনের পরামর্শে 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব' এই নীতিতে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ১৯৬৮ সালের শেষে ও ১৯৬৯ সালের প্রথমে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিরুদ্ধে যখন পূর্ব পাকিস্তানে গণআন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠল, আয়ুবশাহীর অবস্থা হয়ে উঠল টলমল, তখন মৌলানা ভাসানী তীব্র ভাষায় আইয়ুবের সমালোচনা শুরু করে দিলেন। মওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন যে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের দিন ফুরিয়ে এসেছে। যখন আইয়ুব ক্ষমতার তুঙ্গে তখন ভাসানী তাকে পরোক্ষভাবে হলেও সমর্থন দিয়েছেন। আবার আইয়ুব যখন সিংহাসন টলমল তখন মওলানা ভাসানী দিনরাত দুর্বল আইয়ুবের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিতে লাগলেন। মওলানা যখন দেখলেন শেখ মুজিব যখন আগরতলা মামলা থেকে আন্দোলন করার আহ্বান জানান, তখন তিনিও বিবৃতি দিলেন: "শেখ মুজিব ও আগরতলা ষড়যন্ত্রের সব বন্দিকে মুক্ত কর অবিলম্বে, এই মুহূর্তে। নয় তো পরিণাম হবে গুরুতর।"

আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের সময় ছিয়াশি বছর বয়সে মওলানা ভাসানী যেন সংগ্রামী মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। আইয়ুব রাজত্বের অন্তিম দিনগুলোতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মওলানা ভাসানীর এই সংগ্রামী ভূমিকা আন্দোলনকে একধাপ এগিয়ে নেয়। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে রাওয়ালপিন্ডিতে যখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের "রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স" চলছিল সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানে সফররত মওলানা ভাসানী শাহিওয়াল নামে একটি জায়গায় ট্রেনের মধ্যে লাঞ্ছিত হলেন, শারীরিক আঘাত পেলেন। খবর পেয়ে শেখ মুজিব কঠোর ভাষায় দুস্কৃতকারীদের নিন্দা করে বললেন, "আমি মৌলানা ভাসানীর মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতার উপর এই বর্বর আক্রমণের জন্যে যারা দায়ী তাদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। রাজনৈতিক দল বা নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তা প্রকাশ করার পন্থা নেতাদের উপর কাপুরুষোচিত চোরাগোপ্তা আঘাত নয়।"[৮]

১৯৬৯ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে আসার পর 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র কর্মকাণ্ড ও সংগঠন এবং 'নিউক্লিয়াস'র ব্যাপারে শেখ মুজিবকে প্রাথমিকভাবে অবহিত করা হয়। ফলে 'নিউক্লিয়াস'র সাথে শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সময় সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরিফ একই ফোরামের সদস্য হিসেবে কাজ করতেন। এই ফোরামের দায়িত্ব ছিল বৈদেশিক সাহায্য, সমর্থন, ট্রেনিং ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।[৯]

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে আদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও স্বাধীনতার প্রশ্নে নীতিগত অভিন্নতা ছিল। ছাত্রলীগ, বাঙালি জাতীয়তার প্রশ্নে উপনীত হয়ে শেখ মুজিবের নির্দেশে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যারা বলেন, বঙ্গবন্ধু সামরিক বাহিনীকে পূর্বাহ্নে নির্দেশ দেননি তাদের জবাব পাওয়া যাবে হাসান জহির, আব্দুল রহমান সিদ্দিকীর লিখিত বই থেকে এবং শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে। এখানে তিনটি বই থেকে প্রমাণ তুলে ধরা যেতে পারে।

জহির লিখেছেন, ২৫ মার্চ ৭১-এর পর ২০ বালুচ ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্টাল সেন্টার দখল করার পর তিনি গেলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বাসায়। একটি কক্ষে, বলা যেতে পারে অপারেশন রুম। সেই কক্ষের দেয়ালে পুরো পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র। কোথায় কোথায় ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন, ইপিআর, পুলিশ প্রভৃতি মোতায়েন তা চিহ্নিত করা। দেখে মনে হচ্ছিল মজুমদারের কথা ছিল সম্পূর্ণ ইপিআর বা বাঙালি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করার। তার ভাষায়,[১০] ব্রিগেডিয়ার মজুমদার শেখ মুজিব সম্পর্কে কোথাও কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু যে সৈনিকটি বঙ্গবন্ধুকে লাঞ্ছিত করেন, আগরতলা মামলায় নিভৃতে ফেরার সময়, এই জঘন্য কাজটি করেছিল মোস্তাফিজুর রহমান। আর কোনো সৈনিকের ছবি তিনি আলাদাভাবে দেননি। যেন এরূপ আচরণ বঙ্গবন্ধুর পাওনা ছিল এবং যে এই জঘন্য কাজটি করেছিল সে যথার্থ করেছিল, সাহসীও বটে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের গ্রেফতার ও তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তিনি লিখেছেন। অন্য কোনো জেনারেল এ সম্পর্কে তেমন লিখেননি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের কথা আমরা এখন বিস্মৃত, কিন্তু তিনিই ছিলেন তখন সিনিয়র বাঙালি অফিসার যিনি পাকিস্তানিরা আঘাত হানার আগেই আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানিরা তাঁকে গ্রেফতার করে যথেষ্ট নির্যাতন করেছে। তিনি মুখ খোলেননি। স্বাধীনতার পর পুরস্কৃত হওয়া দূরে থাকুক, কেউ তাঁর কথা মনেও রাখেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে মজুমদার যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন তা পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের চোখ নিশ্চয় এড়িয়ে যায়নি। তারা তাঁকে সন্দেহ করেছে, জিয়াউর রহমানকে নয়, কারণ, সন্দেহ করলে ২৫ তারিখ রাতে 'সোয়াত' থেকে অস্ত্র খালাসের জন্য জিয়াকে পাঠানো হতো না।[১১]

ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের ভাষ্য অনুযায়ী-"সিদ্দিকী সাহেব ফিরে এসে আমাকে জানালেন, শেখ সাহেব বলেছেন, 'ব্রিগেডিয়ার সাহেব খামোখা টেনশন করতেছেন। ওনাকে ধৈর্য ধরতে বলুন। আমরা রাজনীতিবিদরা আলাপ করতেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ শেষ না হবে ততক্ষণ ধৈর্য ধরতে বলুন।[১২] সময় আসলে আমি ওনাকে জানাব।' ওসমানী সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন 'সময় আসলে উনি কেমন করে জানবেন?' বঙ্গবন্ধু বলেন, ঢাকায় রেডিও স্টেশনে বাংলার অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হলে জানাবেন আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। আর আমি ওনার জন্য একটা মেসেজ রেকর্ড করে রাখব এবং সেটা জহুর আহমদ সাহেবের মাধ্যমে ওনাকে দেব। ২১ মার্চে ধারণকৃত ঐ মেসেজ শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পর চিটাগাংয়ে ২৬ মার্চ প্রচার করা হয়।" ঢাকায় তার সহপাঠী ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবের বাসায় রাখা হয়। সেখান থেকে তিনি সরে পড়েন ও আবারও জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেই সময় হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে করাচী তারপর খারিয়ার রেস্ট হাউসে নিয়ে যায়।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ছাড়াও '৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসেই স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ধানমণ্ডির ৮ নম্বর রোডের বাড়িতে মেজর খালেদ মোশারফের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়-এ সম্পর্কে তার ভাই সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশাররফ আমাকে বলেছিলেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দেবে না, আমাদের লড়াই করেই দেশ স্বাধীন করতে হবে। এ কথা খালেদ মোশাররফ রাশেদ মোশাররফকে বলেছিলেন। রাশেদ মোশাররফ এ কথা বলেছিলেন, জেনারেল ওসমানীকে সামনে রেখে সশস্ত্র যুদ্ধের মহড়া দিতে হবে। যাতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার চোখ তার দিকে না যায়।

'৬৮ সালের ১৯ জুন মামলা শুরু হয়ে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কর্নেল শওকতসহ অন্য আসামিদের পরস্পরের মধ্যে কথা বলার সুযোগ তৈরি হয়। সে সময় মামলা পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান কী ছিল এমন প্রশ্নের জবাবে কর্নেল শওকত বলেন, মামলা শুরুর পর আমরা একসঙ্গে কোর্টে যাওয়া আসা করতাম। আমাদের ১৩ জনকে একটা অফিসার্স মেসে রাখা হয়েছিল। সেখানেও আমরা মাঝে মধ্যে কথা বলতে পারতাম। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বিকল্প উপায় নিয়েও ভাবতেন। সংশ্লিষ্টদের মনোভাব বুঝে তারপর নিজে সিদ্ধান্ত নিতেন। আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে ঢাকা সেনানিবাসে থাকার সময় এবং আদালতে আসা-যাওয়ার সময় পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন জনের মতামত জানতে চাইতেন তিনি। একদিন বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আচ্ছা এবার তো ধরা পড়ে গেলি। এরপর দেশকে স্বাধীন করতে চাইলে ভবিষ্যতে কি করবি? তখন আমাদের একেকজন এক এক রকমভাবে নিজের ভাবনার কথা বললাম। কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, দেশ স্বাধীন করতে হলে আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অনেক বাঙালি আছেন যারা আমাদের সাহায্য করবেন। কারণ তখন যারা গ্রেফতার হয়েছেন তাদের বাইরে আরও অন্তত তিন হাজার পাঁচ শ' সদস্য রয়ে গেছেন। আবার অনেকে বললেন, এবার রাজনৈতিকভাবে এগোতে হবে। সহকর্মী, সমর্থক যাঁরা আছেন তাদের সেভাবেই সমর্থন সহযোগিতা থাকবে।

কর্নেল শওকত আলী বলেন, 'মামলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি শুনেছি আমাদের সৈনিক সংগঠনের বাইরে তাঁর নিজস্ব একটা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছিলেন তৎকালীন ছাত্রলীগের নেতাদের নিয়ে। দেশের স্বাধীনতা, গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায় এসব বিষয়ে তিনি কথা বলতেন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে।

পরে দেখা গেল বঙ্গবন্ধু আন্দোলনকে পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যান। আমার মনে হয়েছে, তিনি নিজস্ব অন্য কোনো সূত্রের (সোর্সের) মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোথায় গেলে কী রকম সাহায্য পাওয়া যাবে, বিশেষ করে যুদ্ধ বেধে গেলে কী করতে হবে, এসব ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন। এ ব্যাপারে সেই সূত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। তবে সেই সূত্রটিও গোপন রাখা হয়।'

নির্বাচনের নেপথ্যে স্বাধীনতার প্রচারণা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিমের বৈষম্য এবং বাংলাদেশকে শোষণের চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরা হয়। এ সময় '৬ ও ১১ দফাভিত্তিক দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, অন্যথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা' স্লোগানটি জনগণের কাছে চলে আসে। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'র পরিবর্তে 'জয় বাংলা' স্লোগান সর্বত্র ধ্বনিত হতে থাকে। এ সময় 'নিউক্লিয়াস' 'জয়বাংলা' নামের একটি সাইক্লোস্টাইল পত্রিকা বের করে। এই পত্রিকায় নির্বাচনের ফলাফলের সাথে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সফলতার ভাগ্য জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয়া হয়। এ সমস্ত বিষয়ের উপর প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' গঠন করার প্রস্তাব পেশ করেন তৎকালীন প্রচার সম্পাদক স্বপন কুমার চৌধুরী।[১৩] কেন্দ্রীয় কমিটিতে তখন সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর এই প্রস্তাব পাস হয়। প্রস্তাবের বিপক্ষে ছাত্রলীগের ৮ জন[১৪] প্রভাবশালী সদস্য ভোট দেয়। আবদুর রাজ্জাকের মারফত শেখ মুজিব এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এজন্য যে, এ সময় 'সমাজতান্ত্রিক' বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে।[১৫] কেননা জাতি রাষ্ট্র গঠনে জাতীয়তাবাদকে মূল শক্তি ধরে এগুতে হবে এবং এতদিন সেই ধারায় আন্দোলনে অগ্রসর হয়েছে। আমার অবশ্য মনে হয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেউ যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে সেজন্য প্রাথমিকভাবে বঙ্গবন্ধু হয় এসব তাত্ত্বিকতার মধ্যে জড়াতে চাননি। প্রস্তাব গ্রহণের সময় তৎকালীন সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীসহ বিপক্ষের ৮ জন অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সেই প্রস্তাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ মুজিব ও আবদুর রাজ্জাকের অনুরোধে সংশোধন করতে হয়। শেষ পর্যন্ত 'স্বাধীন বাংলাদেশ' গঠন করার প্রস্তাব নেয়া হয়। অবশ্য সেদিনের বিপক্ষে ভোটদানকারী সদস্যরা প্রকৃতই স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন এমনটা বলা যায় না। এই আটজনের ভেতর সাতজনকেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে অংশগ্রহণ করতে দেখি।[১৬]

'৭০ সালে নির্বাচনী প্রচার

জানুয়ারির মাসে শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের মধ্য সময় পর্যন্ত শেখ মুজিব রাজশাহী, টাঙ্গাইল, সিলেট, খুলনা, যশোর, নোয়াখালী, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, সুনামগঞ্জ, বগুড়া, নওগাঁ, রংপুর ও দিনাজপুরের বিভিন্ন জনসভায় ভাষণদান করেন। এসব তার নির্বাচনী প্রচার অভিযান এবং সাংগঠনিক তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলাকে 'স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে '৬ দফা'ভিত্তিক অধিকার অর্জনের স্বপক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। এই শক্তি সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমবেত শক্তি–এই শক্তি গণতান্ত্রিক চেতনার এক জাগ্রত শক্তি।

৭ ডিসেম্বর '৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটার সংখ্যা ছিল পূর্ব বাংলায় ৩,১২,১১,২২০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২,৫৭,৩০,২৮০। আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় জাতীয় পরিষদের ১৬৮টি আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এতবড় পরাজয় সহ্য করার মানসিকতা ছিল না।

২ মার্চ '৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় লক্ষাধিক লোকের সামনে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সভায় আ স ম আবদুর রব কলাভবনের পশ্চিম প্রান্তের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে পতাকাটি প্রদর্শন করেন। এই পতাকাই পরদিন (৩ মার্চ) পল্টন ময়দানে সাজাহান সিরাজের 'স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ'-এর জনসভায় উত্তোলন করা হয়। ঐ মঞ্চে বঙ্গবন্ধুও উপস্থিত ছিলেন।

২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে 'জয়বাংলা' বাহিনী আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যায়। ঐদিন জয়বাংলা বাহিনীকে ৪টি প্লাটুনে ভাগ করে ৪ জন প্লাটুন কমান্ডারকে দায়িত্ব দেয়া হয়। জয়বাংলা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, কামালউদ্দিন (পরে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের অফিসার) ও মনিরুল হক (ঢাকা শহর ছাত্রলীগ সভাপতি)। পতাকা উত্তোলনের মুহূর্তে কামরুল আলম খান খসরুর হাতের ৭ এম. এম. রাইফেল থেকে ফাঁকা গুলি করে শব্দ করা হয়। খসরুর পাশে হাসানুল হক ইনু পতাকাটি হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখান থেকেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেয়। তাঁর বাসায় ও গাড়িতে দুটি পতাকা ওড়ানো হয়। এই 'পতাকা'ই স্বাধীন বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' অনুমোদন করেন।

আওয়ামী লীগের সভা

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি করায় ফরমান জারি করে। প্রথম সুযোগটি গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ। সবদিক দিয়েই ১৯৭০ সালের ১১ জানুয়ারির আওয়ামী লীগের সভাটি ছিল দেখার মতো এবং সুসংগঠিত। সভাবেশের ধরনও ছিল বেশ চমৎকার। সাংবাদিকতার ভাষায়–এটা ছিল একটা 'বিশাল' জনসভা। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রথম নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিলেন। বললেন, 'বাঙালিরা' '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নিয়ে ভুল করেছে। আজো যদি কেউ একে বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত তাহলে তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতেন। ভাষণে তিনি বলেন, এই সভাতেই প্রথমবারের মতো সিরাজুল আলম খান 'জয়বাংলা' স্লোগান নিজ মুখে উচ্চারণ করেন। এই 'জয়বাংলা' স্লোগানই বাঙালির পরিচয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

AMARBOI.COM

জামায়াতের সভা পণ্ড

পরের রোববার (১৮ জানুয়ারি) একই ময়দানে জামায়েতে ইসলামী তাদের প্রথম নির্বাচনী জনসভা করল। জামায়াত এ সভার গুরুত্ব উপলব্ধি করে একে সফল করে তোলার যাবতীয় চেষ্টা করল; কিন্তু চোখের পলকে এ সভাটি একটি হাতাহাতির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। পঞ্চাশজনের মতো আহত হলো। আহতদের মাঝে পঁচিশ জনের অবস্থা গুরুতর ছিল। পার্টির আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদী শুধু জনসভায় বক্তৃতা করার জন্য লাহোর থেকে উড়ে এসেছিলেন; ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাকে মাঠ ত্যাগ করতে হলো। এই খণ্ডযুদ্ধের পর থেকে জামায়াত একটি ক্ষুব্ধ ও অক্ষম রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হলো।

একজন সিনিয়র মার্শাল অফিসার জনসভায় জামায়াতকে সরকারি ছত্রছায়া দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু জামায়াতের পক্ষ থেকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। তাকে জামায়াতের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, 'আমরা সবকিছুর ব্যবস্থা রেখেছি'। অফিসারের ধারণা হলো, জামায়াত প্রমাণ করতে চাইছে যে, যদি আওয়ামী লীগ কোনো সাহায্য ছাড়াই সাফল্যজনকভাবে সভা করতে পারে তা হলে তারা কেন পারবে না? তাদের মতে, একটি দুর্বল দলই সরকারি ছত্রছায়া কামনা করে। এ বিষয়টি জামায়াত-ঘেঁষা একজন সাংবাদিকের কাছে উত্থাপন করলে তিনি বললেন, 'না, জামায়াত ছত্রছায়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়নি। সরকার বেড়ার উপর বসেছিল তার দল নিরপেক্ষ চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭ জানুয়ারি 'নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, জামায়াতের আমির মওলানা মওদুদীকে ১৮ জানুয়ারি ঢাকার পল্টনে জনসভা করতে দেয়া হবে না। জনসভার মঞ্চ প্রায় দশ ফুট উঁচু এবং বিরাট আকারের। মঞ্চের নিচে তারা কয়েক হাজার তিন ফুটের গজারির লাঠি লুকিয়ে রেখেছিল। এক পর্যায়ে জামায়াতের জনৈক বক্তা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় বক্তব্য রাখলে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মী-সংগঠকরা তার প্রতিবাদ করে। পরে তা হাতাহাতি ও মারামারিতে রূপ নেয়। এক পর্যায়ে গুলিস্তান এলাকার সাধারণ হকার, হোটেলের কর্মচারী ও ফকিরাপুলের স্থানীয় লোকেরা জামায়াতের কর্মীদের আক্রমণ করে। প্রথমে জামায়াত খুব সুশৃঙ্খলভাবে তা প্রতিহত করে। তাদের একজন নায়েব মঞ্চের মাইক থেকে বলতে থাকে, 'বদর বাহিনী' পূর্ব দিক থেকে, 'সালেহীন বাহিনী' পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করুন। এমনিভাবে আরো অনেক বাহিনীর নাম উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর জনতার প্রচণ্ড আক্রমণে তারা রণে ভঙ্গ দেয়। মিটিং পণ্ড হয়ে যায়। এতে জামায়াত কর্মী ও পথচারীসহ ৫০০ জন আহত হয়। ২৫ জানুয়ারি ডাকসু ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে পল্টনে বিরাট জনসমাবেশে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়, 'নির্বাচন বানচালের যে কোনো চক্রান্ত এদেশের সংগ্রামী জনতা প্রতিহত করবে'।[১৭]

পতাকা

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র জনতার সভায় অর্ধ লক্ষাধিক মানুষের মহাসমুদ্রে কলাভবনের পশ্চিমের গাড়ি বারান্দাকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের (সিরাজুল আলম খানের পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত হয়।) চার নেতা সভা শুরু করেন। এমন সময় তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের সাধারণ সম্পাদক, নজরুল ইসলাম, ইকবাল হল থেকে প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাসহ মিছিল নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হন। তার কাছে থেকে ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব ঐ পতাকা হাতে নিয়ে দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, 'এই পতাকাই আজ হতে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা।' প্রদর্শনের সময় লাখো জনতা মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে 'নতুন পতাকা'-কে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে, এদিন পূর্ব বাংলার গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস এম আহসান পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল ইয়াকুব খান গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বেতারে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি ঘোষণা করা হয়। সাথে সাথে ছাত্র-জনতা-শ্রমিক-কর্মচারী ও খেটে খাওয়া গরিব মানুষ কারফিউ ভেঙ্গে মিছিল বের করে। স্লোগান ওঠে, 'সান্ধ্য আইন মানি না-মানি না'। ২ মার্চের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রথম দিক-নির্দেশনা। এর পরের প্রধান কাজটি ছিল 'স্বাধীনতার ইশতেহার' প্রণয়ন এবং 'জাতীয় সঙ্গীত' নির্ধারণ করা। কারণ পরদিন ৩ মার্চ পল্টনে নির্ধারিত জনসভা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় সঙ্গীত

স্বাধীনতার ইশতেহার প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করার জন্য সিরাজুল আলম খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক। সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ ও ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি আবদুর রউফকে নিয়ে কাজ শুরু হয়।

ইতোপূর্বে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ, ঢাকার বিভিন্ন কলেজে ছাত্রলীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্র, নজরুল, ডি এল রায় প্রমুখের লেখা বেশ ক'টি দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হতো। এগুলোর মধ্য থেকে তিনটি প্রাথমিক বিবেচনায় এলো: 'আমার সোনার বাংলা......' 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা...', এবং 'চল্ চল্ চল্, উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'। বঙ্গবন্ধুর কাছে পরামর্শ চাওয়া হলে 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে অনুমোদন করেন। সেসময় প্রতিটি অনুষ্ঠানে সোনার বাংলা সঙ্গীতটি গীত হতো।

স্বাধীন বাংলা প্রচারে আব্দুর রাজ্জাক

ষাটের দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের ভি.পি. থাকাকালীন তাঁর সাথে পরিচয় হয়। তখনও সাধারণ ছাত্ররা জানত না স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের কথা। সিরাজুল আলম খান যেমনটি বলেছিলেন তিনিও বলতেন স্বাধীন বাংলার রূপকল্প। স্বাধীনতার জপমালা হাতে ছাত্রলীগকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সমগ্র দেশে তার বিচরণ। ছয় দফা ঘোষণার পর শাসক চক্রের আক্রোশে বঙ্গবন্ধু কারাগারে। চক্রান্ত। অস্ত্রের ভাষায় ছয় দফাকে স্তব্ধ করে দেয়ার ব্লুপ্রিন্ট। একদিকে নির্যাতন-নিপীড়ন অন্যদিকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। নেতৃবৃন্দ জেলে। ছয়-দফা আর আট-দফাপন্থী। আট-দফা নিয়ে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও সালাম খান মাঠে। পাকিস্তান কাঠামোতে গোঁজামিলের স্বায়ত্তশাসন। আর ছয় দফা হলো বাঙালির শোষণ, বঞ্চনা-বৈষম্যের সনদ। বাঙালিদের বাঁচার দাবি। ছয় দফা থেকে স্বাধীনতার স্বশাসন, এক-দফা ও স্বাধীনতা। এ দুঃসময়ে ছাত্রলীগ ছিল কাণ্ডারি। নেতৃত্বে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, মযহারুল হক বাকি, নূরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আব্দুল কুদ্দুস মাখন এবং উত্তর জনপদে আবদুর রউফ, আবদুল জলিল, সরদার আমজাদ হোসেন, আবু সাইয়িদ, আয়েশ উদ্দিন প্রমুখ। সেই কাফেলায় তারা ছিলেন ক্লান্তিহীন, দূরন্ত অগ্রপথিক। দক্ষ সংগঠক। সেই থেকে তাঁদের অবিরত পথ চলা।

শপথ

'৭০ সালে নিখিল পাকিস্তানে নির্বাচন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রাদেশিক পরিষদে ডজনখানেক বাদে সব আসনে বিজয়ী হয়। জনগণ ছয় দফার পক্ষে ম্যান্ডেড দিয়েছে। শুরু হয় চক্রান্ত। ষড়যন্ত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেসরা জানুয়ারি। ১৯৭১। রোববার। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা রেসকোর্স ময়দানে প্রকাশ্যে জনতার সামনে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। জনগণের সামনে প্রকাশ্যে এভাবে জনপ্রতিনিধিদের শপথ অনুষ্ঠান দেখার জন্যে এদিন রেসকোর্স ময়দানে জনতার সমুদ্র।

১২০ ফুট দীর্ঘ ও ১২ ফুট উঁচু বিরাট নৌকার অনুরূপ একটি মঞ্চ হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্য এতে আরোহণ করেন। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয় এবং 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' একটি গানও সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জাহেদুর রহিম, আবদুল জব্বার, অজিত রায়, আবদুর রউফ ও আবদুল গনি বোখারী প্রমুখ এতে কণ্ঠ দেন।

বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রতীক স্বরূপ ৬টি কবুতর বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে আকাশে উড়িয়ে দেন এবং নিজের কণ্ঠে মোট ৬টি স্লোগান দেন। এগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. নারায়ে তাকবীর- আল্লাহু আকবার, ২. পাকিস্তান-জিন্দাবাদ, ৩. আমার দেশ, তোমার দেশ-বাংলাদেশ বাংলাদেশ, ৪. জাগো জাগো- বাংলা জাগো, ৫. জয় বাংলা, ৬. জয় পাকিস্তান।

বঙ্গবন্ধু সেদিন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার দায়িত্ব পালন করেন, অন্যদিকে, 'তোমার দেশ আমার দেশ- বাংলাদেশ বাংলাদেশ' স্লোগানের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থপতি হিসেবে একটি স্বাধীন ও নতুন দেশের স্বপ্নকেও জাতির সামনে দৃশ্যমান করেন।

এদিনের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণ ছিল প্রতীকী ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্লেষকদের অনেকেই এই ভেবে বিস্মিত হন যে, কি করে সেদিন তিনি এত আগে আন্দোলন ও নির্বাচনের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে আরো বলেন, 'শুধু নির্বাচনে জয়লাভ করলেই দাবি আদায় হয় না। দাবি আদায়ের জন্য আরো সংগ্রাম করতে হবে। আগামী দিনের সংগ্রামে যে বাঙালি জাতিকে আরো বুকের রক্ত দিতে হবে, তাঁর ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সম্ভবত তারই আভাস দিয়েছিলেন। তবে আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতাও সেদিন এর তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি।

এদিনই বঙ্গবন্ধু প্রথম তাঁর দলীয় কর্মীদের প্রতিটি ইউনিয়ন ও মহল্লায় দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। ৭ মার্চের বহু পূর্বেই তিনি এ দুর্গ গড়ে তোলার অপরিহার্যতার কথা কর্মীদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রের কারণে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তবু আপনারা নিরস্ত্র হবেন না। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে তিনি তাদের জ্যান্ত কবর দেয়ার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি যদি করি আমাকেও। বঙ্গবন্ধু কর্মী ও অনুসারীদের এদিন থেকে বাঁশের ও সুন্দরী কাঠের লাঠি তৈরিরও নির্দেশ দেন।

আল্লাহর ধর্ম ইসলামের নামে যারা ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে, বঙ্গবন্ধু সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বন্ধে বলেন, তাদের শাস্তি হচ্ছে, চাবুকের বাড়ি। তিনি বলেন, 'ইসলাম গেল, ইসলাম গেল' বলে যারা চিৎকার তুলেছিল, জনগণ এবার এ পরগাছাদের একেবারে সাফ করে দিয়েছে।

ইসলামপন্থীদের ছাড়াও তিনি চরম বামপন্থীদেরও সমালোচনা করেন। কিন্তু ভূমিহীন ও বস্তিবাসীর প্রসঙ্গ তুলে তিনি নিজেই চরমপন্থা গ্রহণের আভাস দেন। তিনি বলেন, রাস্তার পাশে ও বস্তিতে যারা শোচনীয় জীবন যাপন করছে তাদের জমি ভুঁড়িঅলারা কেড়ে নিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। ভুঁড়িঅলাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে বাস্তুহারা ও বস্তিবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হবে। বঙ্গবন্ধু বলেন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেয়া হবে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে ভূমি রাজস্ব বলতে আর কিছু থাকবে না।

আমলাদের কথা বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় আমি কারাগার থেকে অনেক সরকারি আমলার খেলা দেখেছি।'[১৮]

শপথ অনুষ্ঠানের পর রাজ্জাক ভাই হাত টিপে আমাকে বললেন, 'কাজ হয়েছে। মাঠে নেমে পড়তে হবে।' তখন আমি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য। মঞ্চে ছিলাম।

মার্চ মাস থেকে স্লোগান ছড়িয়ে পড়েছিল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। ৩ মার্চ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ঘোষণায় স্বাধীন বাংলার প্রত্যয় ঘোষিত হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা এবং সর্বাধিনায়ক হিসেবে লাখো জনতার সামনে ঘোষণা করা হলো। বাঙালি জাতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে পাকিস্তান সামরিক জান্তা তাদের ক্ষমতা দেবে না, লড়াই সংগ্রাম করে তাদের মুক্তি স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

টীকা:

১. মুহাম্মদ শামসুল হক, স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি, পৃ-২২৮-২৩০।

২. "the government must quit at once", Tragedy of Errors, East Pakistan Crisis, Lt. Gen. (retd) Kamal Matinuddin page-108.
Tragedy of Errors, East Pakistan Crisis, Lt. Gen. (retd) Kamal Matinuddin, page-108.

৪. It is being propossed that country be divided into two parts. I cannot preside over the destruction of my country." "If 6-points are conceded what is the need of the Centre" (Tragedy of Errors, East Pakistan Crisis. lt, Gen. (retd) Kamal Matinuddin, page-108-9.

৫. মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সাইফুদ্দিন মানিক বলেন, "সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শেখ মুজিব মুক্তি পেয়েছেন। এখন তাঁর কর্তব্য খোকা রায়, অনিল মুখার্জি, জ্ঞান চক্রবর্তী, বরুণ রায় কে জেল থেকে বের করা।"

৬. মুহাম্মদ শামসুল হক, স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি, পৃ- ১৭৮-১৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
৮. অমিতাভ গুপ্ত, গতিবেগ-চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তি সৈনিক শেখ মুজিব, পৃ-১৮৫-১৮৭।
৯. 'নিউক্লিয়াস' প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যাঁরা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন তাঁরা হলেন মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মণি), নূর আলম জিকু, চিত্তরঞ্জন গুহ, সৈয়দ আহমদ, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, সুধীর কুমার হাজরা, হাসানুল হক ইনু, আ ফ ম মাহাবুবুল হক, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, মাসুদ আহমেদ রুমি, সাইফুল গনি চৌধুরী, মহিউদ্দিন আহমেদ বুলবুল, স্বপন কুমার চৌধুরী, ফজলে এলাহী, স্বপন আচার্য, কামরুল আলম খসরু, মোস্তফা মোহসীন মন্টু, মহিউদ্দিন, কামাল উদ্দিন ফীরু, তারন, এস এম সুলতান টিটু, শেলী, মাজাহারুল হক বাকি, খালেদ মোহাম্মদ আলীসহ আরো অনেকে। বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র, কাজী আরেফ আহমেদ, পৃ-৬০, ৬১।
১০. "an obvious command headquarters of all the Bengali troops in East Pakistan and Brigadier was to control them" সেজন্য কোথায় কোথায় বাঙালি সৈন্যরা আছে এবং ব্রিগেডিয়ার মজুমদার যাদের কমান্ড করবেন। ইস্ট পাকিস্তান দি এন্ডগেম, আবদুল রহমান সিদ্দিকি, পৃষ্ঠা-২৯৫।
১১. আবদুল রহমান সিদ্দিকী, ইস্ট পাকিস্তান দি এন্ডগেম, পৃ-২৯৯।
১২. শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, ৭১-এর দুঃসহ স্মৃতি, পৃ-৩৫।
১৩. '৭১ এ মুক্তিযুদ্ধে নিখোঁজ/শহীদ হন।
১৪. শেখ সেলিম, শেখ শহিদ, সৈয়দ রেজাউর রহমান, শফিউল আলম প্রধান, এম এ রশিদ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, মনিরুল হক চৌধুরী, ওবায়দুল মোকতাদির।
১৫. সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব নিয়ে তখন চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব চলছিল। তারই প্রতিচ্ছায়ায় ছাত্র ইউনিয়ন (সোভিয়েত) ও মেনন (চীনপন্থী) দুভাগে ভাগ হয়।
১৬. বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র, কাজী আরেফ আহমেদ, পৃ-৭৪, ৭৫।
১৭. ঐ, পৃ-৮০, ৮১, ৮২।
১৮. ড. মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পৃ-২১৪, ২১৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : সাত

অসহযোগিতার নেপথ্যে রাজনৈতিক দাবাখেলা

[সপ্তম অধ্যায়ে পাকিস্তানের চক্রান্ত ষড়যন্ত্রে রাজনৈতিক দাবাখেলার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে অনেকেই মনে করেছেন, ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধি নেতা শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এটি ছিল একটি ভাওতাবাঁজি। ৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাতে পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করতে পারে তা নিয়েও ইয়াহিয়া খান কূটকৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর গণসংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন, তার জনসভায় (যেমনটি সিদ্দিক সালিক লিখেছেন) লোক সমাগমের জন্য ট্রেন ও যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক বৈঠকে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'মুজিবকে ক্ষমতা দেবেন না সে একজন বিশ্বাসঘাতক'। ঐ বৈঠকে উপস্থিত রাও ফরমান আলী একথা লিখেছেন।
এসময় আরো লক্ষণীয় বাঙালি সেনাকর্মকর্তা মেজর (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট) জিয়াউর রহমান ৭০-এর নির্বাচনের আগে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি 'ভোটের আগে ভাত চাই' শ্লোগান দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাড়ান। সেসময় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান জেনারেল আকবরের নির্দেশে কর্মরত জিয়াউর রহমান তার উর্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশে মওলানা ভাসানী ও ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমানকে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু নিরংকুশ বিজয় লাভ করেন। ৩ মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত হয়। প্রচন্ড আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার লক্ষ্যে অসহযোগ আন্দোলনের নেপথ্যে সশস্ত্রভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য জনযুদ্ধের ঘোষণা দেন। যার যা আছে তাই নিয়ে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
এমনকি তিনি ১৫ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন তার সঙ্গে আলোচনার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে আসছিলেন তখন শেখ মুজিব তাকে 'অতিথি' হিসাবে আখ্যায়িত করে বুঝিয়ে দিলেন অখন্ড পাকিস্তান আর নেই। তার পূর্বেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নাম দিয়েছিলেন বাংলাদেশ। পতাকা তৈরী হয়েছিল। জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারিত হয়েছিল এবং একটি সুনির্দিষ্ট ভূখন্ড পতাকার লাল সূর্যের বৃত্তের মধ্যে দৃশ্যমান করা হয়েছিল।]

ব্রিগেডিয়ার আব্দুল রহমান সিদ্দিকী বলেছেন, জেনারেল ইয়াহিয়া আইয়ুব খানকে বাধ্য করেছিলেন ক্ষমতা ছাড়তে। ইয়াহিয়ার চারপাশে ক্ষমতালোভী যে সব জেনারেল জড়ো হয়েছিলেন তাদের কারো ইচ্ছা ছিল না ক্ষমতা ছাড়ার। এ কথাটি ইতিহাসের মুনতাসীর মামুন লিখিত বইটির[১] বহু জায়গায় বহুজনের কথায় উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৬৯ মে মাসে ইয়াহিয়া খান অ্যাবোটাবাদে লে. কর্নেল এবং তার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বলেছিলেন আগামী ১৪ বছর পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করার

জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি নেকড়েদের মুখে দেশটিকে ছেড়ে দিতে পারি না। প্রয়োজন হলে একের পর এক সেনাকমাণ্ড আসবে, তাদের কব্জায় থাকবে দেশটি।

অনেকেই ধারণা করেন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ছিল। আসলে বর্তমানে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও তথ্য থেকে জানা যায়, এটা ছিল একটা লোক দেখানো ধাপ্পাবাজি। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসেই জেনারেল শের আলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে, ইসলাম আদর্শ জোরেশোরে তুলে ধরতে। শের আলীর কৌশল ছিল সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছাড়বে না বরং রাষ্ট্র ও জাতিকে সেনাবাহিনী কব্জায় রাখবে। ইয়াহিয়ার প্রধান স্টাফ অফিসার ছিলেন জেনারেল পীরজাদা। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী তার মাধ্যমে চেয়েছিলেন শের আলীকে নিরস্ত করতে। পীরজাদা বলেছিলেন, কীভাবে তিনি শের আলীকে নিরস্ত্র করবেন যেখানে তিনজন পাঞ্জাবি তার গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান। এরা ছিলেন মেজর জেনারেল আকবর খান (মহাপরিচালক, আইএসআই), রিজভী (পরিচালক ইনটেলিজেন্স ব্যুরো ও উমর (এনএসসি)। এ মন্তব্যে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হয়। জেনারেলদের চক্রের মধ্যেও আধিপত্য বিস্তার করেছিল পাঞ্জাবিরা। শেষ পর্যায়ে সিদ্দিকী লিখেছেন, সামরিক শাসনে বিরাজনীতিকরণ, ইসলামের জিগির বৃদ্ধি এবং বাঙালিদের কোনোরকম ছাড় না দিয়ে শাসন করার লক্ষ্যে তারা দৃঢ় করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে রাষ্ট্র পরিচালনায় যে বাঙালির অধিকার আছে তার নৈতিক ও আইনগত দিকটি তারা উপেক্ষা করেছিল।[২] ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানে তার পাঁচ শর্ত বা এল. এফ. ও (লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডার) ঘোষণা করলেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হলো। পাকিস্তানে দু অংশে জামায়াত দুটি পত্রিকা বের করল। করাচি থেকে দৈনিক মুসাওয়াত ও ঢাকা থেকে দৈনিক সংগ্রাম। দুটি পত্রিকাকেই নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন দিল আইএসআই। এ সময় জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে আধিপত্য বিস্তার করেন মেজর জেনারেল উমর। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিবের দাপট কমানোর জন্য মওলানা ভাসানীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা দেয়ার বিষয়টি ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খান লাহোর হাইকোর্টে তার প্রদত্ত হলফনামায় মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তার বৈঠকের কথা উল্লেখ করে বলেন, "ন্যাপ সভাপতি তাকে বলেছেন, 'সব কিছু ভুলে যান এবং দেশ শাসন করুন। অবশ্য একই সাথে মওলানা ভাসানী দুর্নীতি দূরীকরণ, বাঙালিদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ৯০ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন জে. ইয়াহিয়ার কাছে। এসব দাবি পূরণ করায় নিজ আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানীর কাছে এ সংক্রান্ত সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে জানতে চান। ভাসানী কোনো সমাধান না দিয়েই বলেন, আপনি একজন প্রশাসক আর আমি একজন এজিটেটর। সমস্যার সমাধান বের করার দায়িত্ব তাই আপনার, আমার নয়।[৩] মওলানা ভাসানী আরো বলেছিলেন, "মুজিবকে ক্ষমতা দিবেন না, সে একজন বিশ্বাসঘাতক।[৪] ইয়াহিয়া খান বলেন, আমি তো সৈনিক, রাজনীতিবিদ হিসেবে তাকেই মুজিবের সঙ্গে কথা বলা উচিত।' এ সম্পর্কে মেজর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনারেল রাও ফরমান আলী লিখেছেন, ঐ বৈঠকের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই লক্ষ্যে সামরিক জান্তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভেতরে বিভক্তির কৌশল গ্রহণ করে। ফরমান আলী আরো[৫] বলেছেন, নির্বাচনে সেনাবাহিনী ডানপন্থী দলগুলোকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। শেখ মুজিব তা জানতে পারেন। অন্যদিকে সামরিক চক্র জুলফিকার আলী ভুট্টোকে উৎসাহিত করেছিলেন যাতে শেখ মুজিব নির্বাচনে বিজয়ী বা ক্ষমতায় না যেতে পারে। জেনারেল গুল হাসান বিভিন্ন সময়ে তার আপন লোকদের বলেছেন, শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর বন্ধু নয়। ক্ষমতায় এসে তিনি সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস করতে চাইবেন যা বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিপন্থী।[৬]

ইয়াহিয়া এর মধ্যে ঢাকা এলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে সাংবাদিকদের জানালেন, মুজিবই হচ্ছেন পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। তার এই বাক্যটিকে অনেকে তার ভালোমানুষী ও ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছা হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু সিদ্দিকী জানাচ্ছেন অন্য তথ্য। তার মতে এটি হঠাৎ মুখ ফসকে কোনো কথা নয়, ভেবে চিন্তেই ইয়াহিয়া তা বলেছিলেন। প্রথমত এই মন্তব্যের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে মুজিবের বিরুদ্ধে সজাগ করেছিলেন এবং ভুট্টোকে প্ররোচিত করেছিলেন। তারপর লারকানায় ভুট্টোর আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন ইয়াহিয়া। সেনাবাহিনী বা জুন্তা তখন আরো দৃঢ় হলো যে, কোনো বাঙালিকে প্রধানমন্ত্রী করা যাবে না। এবং ভুট্টোও তখন ক্ষমতার অংশীদার হতে চাইলেন। ভুট্টো ঘোষণা করলেন, জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকা যাবেন না। জেনারেল উমর ছোট ছোট দলের নেতা যারা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন, তাদের কাছে যাতায়াত শুরু করলেন এই অনুরোধ নিয়ে যেন তারা ঢাকা না যান। ক্যান্টনমেন্টে সিদ্দিকীকে একদিন এক অফিসার বলছেন, বাঙালিরা সব বিশ্বাসঘাতক, এদের কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, এমনকি যারা ইউনিফর্মে আছে তাদেরও। সিদ্দিকী জানতে চাইলেন সৈনিক, ইবিআর, ইপিআর মিলিয়ে বাঙালির সংখ্যা কুড়ি হাজারের মতো, কী করা যাবে এদের নিয়ে। কোনো সমস্যা নয়। এই জারজগুলো কাপুরুষ। এখনই তাদের নিরস্ত্র করে ব্যারাকে রাখা উচিত। তাদের দরকার নেই। সরে যাক তারা আমাদের পথ থেকে। জেনারেল পীরজাদা ফরমান আলীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন মুজিব যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়, তাহলে কী ধরনের পাকিস্তান হবে? জেনারেল ফরমান উত্তরে বলেছিলেন, 'একটি দুর্বল ও শিথিল পাকিস্তান।' পীরজাদা বলেন, আমরা চাই শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান। আমরা মুজিবকে সে পথে যেতে দেব না।

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে জিয়াউর রহমানের সাক্ষাৎ

মশিউর রহমানের বক্তব্যে থেকে জানা যায়–"৭০ সালে আমরা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যদি আমরা ঐকবদ্ধ থাকতাম এবং নির্বাচন করতাম তবে ২৫টা আসন অন্তত নিশ্চয়ই পেতাম। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের চারজন ভুট্টোর সাথে যোগ দিয়ে জিতেছিলেন, এটা অনেকেই হয় তো জানেন। সেদিন নির্বাচন বিরোধিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডামাডোলের সময় কিন্তু এমন কয়েকজন ছিলেন আনোয়ার জাহিদ, নুরুল হুদা, কাদের বকশ্, মোহাম্মদ সুলতান এবং শ্রদ্ধেয় হাজী দানেশ, যাঁরা ন্যাপের নির্বাচন করার স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

খুলনায় ঐ সময় ভাসানী ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। মশিউর রহমান ওই অধিবেশনেই দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং সে কারণে দলের বামপন্থী উপদল অধিকতর ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেছেন, "৬৯-এর মাঝামাঝির দিকে ইন্টেলিজেন্সের এক অফিসার মেজর কমল (মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান) দেখা করেছিলেন মওলানার সাথে। কমল ছিল জিয়াউর রহমানের ডাক নাম। তখন ইন্টেলিজেন্সের চিফ ছিলেন জেনারেল আকবর। মেজর কমল মওলানার সাথে স্বাধীনতার প্রশ্নে আলোচনা করেছিলেন। পূর্বাপর বিচার করে মওলানা ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং এ সময় আমার সাথে তাঁর বহু আলাপ হয়, যা আমার জন্যে এক বিরাট অভিজ্ঞতা। আমাদের নিজেদের পার্টি তখন ক্ষত-বিক্ষত। সাধারণ নেতা এবং কর্মীরা বিভ্রান্ত। বামপন্থী বন্ধুরা নৈরাশ্যের ঘোরে আচ্ছন্ন প্রায় সবাই। এমনি এক অবস্থায় রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ বেড়ে চলল নেপথ্যে। এ সময় ঘোষিত হলো, ইয়াহিয়া চীন যাচ্ছেন সেপ্টেম্বর মাসে। মওলানা আমাকে বললেন, "প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনীতি বাঁচাতে হলে ইলেকশন বন্ধ ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ ইলেকশন হলেই ৬ দফার আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে রূপ নেবে। সুতরাং ইলেকশন আপাতত স্থগিত রাখার জন্যে যদি কিছু করা যায় তো তাই কর।" তিনি আরো বলেন, "আমি পাকিস্তানে চীনা রাষ্ট্রদূত, যিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে পিকিং যাচ্ছিলেন তাঁকে বললাম, আপনি প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইকে আমার এই ছোট্ট চিরকুটটি পৌঁছে দেবেন।

চীন থেকে ফিরে এলেন ইয়াহিয়া। সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউসে আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম। তাঁর সাথে হুজুরের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন, প্রধানমন্ত্রী চৌ-সেই জ্ঞানী বৃদ্ধও এমনি আশংকার কথা আমাকে বলেছেন। কিন্তু আমি বলছি, বেশি খারাপ অবস্থা দেখলে আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করব না। তাঁকে আমি বোঝাতেই পারলাম না যে, কোন পথে এর সমাধান নিহিত। তিনিও বুঝতে চাইলেন না, সেতুর কোন পারে সংকট থেকে মুক্তি।"[৭]

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে জিয়াউর রহমান কেন কি জন্য মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন? উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে এ সময় সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী অত্যন্ত তৎপর ছিল যাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন না পান। জিয়াউর রহমান যদি সেই বার্তা বহন করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি মওলানা সাহেবকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। ন্যাপের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান নির্বাচনে 'অন্তত' ২৫টা আসনের আশা করলেও আওয়ামী লীগের উত্তাল জনপ্রিয়তার মুখে কয়েকটি আসন দখল করলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে ব্যর্থ হতো। পরিণামে স্বাধীন বাংলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যেত। আওয়ামী লীগের ছয় দফার জোয়ারের মুখে মওলানা ভাসানী সে পথে অগ্রসর হননি। তিনি মনে করেছেন তাঁরা দু চারটি আসন পেলেও অতো আসনে বিজয়ী হতে পারবেন না, সেটা ভাসানীর মতো বিচক্ষণ রাজনীতিকের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয়নি। তিনি নির্বাচনের ব্যাপারে একেবারে নিরুৎসাহী ছিলেন।

বামপন্থীরা নির্বাচন না করার জন্য এবং দক্ষিণপন্থীরা যখন ভাসানীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করছিলেন তখন তিনি সেই কাউন্সিল অধিবেশনে তিনটি শর্ত আরোপ করেন, যেমনঃ ১. আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধন, ২. সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত সকল শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রনেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তিদান, তাঁদের হুলিয়া ও মামলা প্রত্যাহার, এবং ৩. ১৯৭১-এর মার্চ মাসের দিকে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ। বলাবাহুল্য, এ শর্ত পূরণ করা সম্ভব ছিল না ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষে। কারণ দেশের সকল প্রধান দল তখন নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল।[৮] যে কারণেই হোক মওলানা জিয়াউর রহমানের বৈঠকের নেপথ্য রহস্য অজানা থাকলেও মওলানা ভাসানী সেদিন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলেই ইতিহাসে লিখিত থাকবে।

’৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারে ভাসানীর রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে নানা ব্যক্তি নানা ধরনের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের ব্যাখ্যা এক-রকম, বিরোধী দলীয়দের ব্যাখ্যা ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে কাদের সিদ্দিকী (বীরোত্তম) যিনি ’৭২-পরবর্তীকালে ভাসানী-মুজিব উভয়েরই বিশেষ স্নেহভাজনে পরিণত হন এবং তাঁদের সঙ্গে রাখতেন অব্যাহত যোগাযোগ, তিনি লিখেছেনঃ ‘জয় বাংলা’ স্লোগান তখন সমগ্র জাতিকে মোহিত করে ফেলেছিল। পরবর্তীতে মহান নেতা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যতোই মিশেছি, ততোই বুঝেছি–কেন তিনি অমন করেছিলেন। কিন্তু ’৬৯-৭০-এর তাঁর কাজকর্ম সত্যি বুঝিনি। আমার কাছেও বেখাপ্পা ঠেকেছে। সাধারণ লোককে আমি বলতে শুনেছি “ভোটের সময় যাও-বা দুই একটা পানবিড়ি সিগারেট পামু, ভোট বন্ধ করে দেখতাছি হুজুর তাও পাবার দিবার চায় না। ভাত দেওয়া কি সোজা কথা। রেজেক-হেডা অইলো আল্লার কাম।” লোকজনের কথা শুনে আমারও মনে হয়েছে, সত্যি হুজুর ভেজাল করছেন। নির্বাচন যতোই ঘনিয়ে এলো, হুজুর ততোই নিষ্ক্রিয় হতে লাগলেন। তিনি আর তেমন ভোটের বাক্সে লাথি মারতে চান না। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তো একেবারেই মুখ খুললেন না। যাওবা দুই একবার খুললেন, তা বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই- “মুজিবর তো আমার পোলার মতো। আমার ছয়ডা সেক্রেটারির মধ্যে মজিবর আছিল এক নম্বর। মজিবরের মতো ভালো সংগঠক আবার হয় নাকি?” আমি তখন বুঝিনি, পরে শুনেছি, আগরতলা মামলা থেকে বেরিয়ে বঙ্গবন্ধু হবার পর সবক’টি বড় বড় সিদ্ধান্তে তিনি হুজুরের পরামর্শ ও আশীর্বাদ নিয়েছেন। স্বাধীনতার পর দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলে পরিষ্কার জেনেছিলাম, ’৭০-এর জানুয়ারি থেকে নির্বাচনের ফল ঘোষণা পর্যন্ত হুজুর যা কিছু করেছেন, যাতে তাঁর মজিবরের সুবিধা হয়, সে-ভাবেই করেছেন।[৯]

ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের কয়েক মাস আগে পাকিস্তানের সামরিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেসামরিক আমলা এবং এক শ্রেণীর গণবিরোধী ও স্বার্থন্বেষী রাজনীতিতে নতুন ষড়যন্ত্রের রাস্তা খুঁজছিল। নির্বাচন হলে অসামরিক সরকার গঠিত হলে আমলাদের ক্ষমতার দাপট ক্ষুণ্ন হবে। এজন্যে নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে আর একটি সামরিক আইন পর্যন্ত জারি করা যায় কিনা তারও চিন্তা-ভাবনা চলে কোনো কোনো স্বার্থন্বেষী মহলে। ভাসানীর কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না এবং তাঁর নিজের দলেই এমন অনেকে ছিলেন যাঁদের গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবহিত। এই শ্রেণীর রাজনীতিকগণ ভাসানীকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের সে-অভিসন্ধি বানচাল করে দেন। সাংবাদিক আরো লিখেছেন,

"মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বেই প্রেসিডেন্ট ভবনের গাড়ি এসে পিন্ডির ফ্লাসম্যান হোটেল থেকে উন্নতশির মওলানা ভাসানীকে আলোচনা স্থানে নিয়ে যায়। দু'ঘণ্টারও বেশি দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে মওলানা সাহেব সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলেন: 'দেশটা তোমার বা আমার কারো বাপের সম্পত্তি নয়। দেশের জনগণ যা চায় তা দিয়ে চক্রান্তের সুযোগ আর সৃষ্টি করো না। এসব করে এমনিই তো এ দেশটারও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। আর বেশি ক্ষতি করার চেষ্টা করলে কারো লাভ হবে না। সে দিনের বিকেলের লিয়াকতবাগের এক বিশাল জনসভায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর আলোচনার এ সব কথা বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানালে সেখানে উপস্থিত শ্রোতাদের তিনি সহর্ষ অভিনন্দন লাভ করেন। তাঁর সমর্থকসূচক বলিষ্ঠ স্লোগানে পিন্ডির আকাশ-বাতাস সে দিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

সেদিন পিন্ডিতে অবস্থানকারী অন্যান্য কয়েকজন সংবাদ রিপোর্টারের মতো আমিও ফ্লাসম্যান হোটেলে গিয়েছিলাম। ভাসানী-ইয়াহিয়া আলোচনা সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়ে ভুল করে যাদু মিয়ার হোটেল কামরায় ঢুকে পড়েছিলাম। সে কামরায় পাক-বাহিনীর আমলাচক্রের বেশ কয়েকটি 'বিশেষ চেনামুখ' আমার নজরে এসেছিল। সেখানে ঢুকতে দেখেই যাদু মিয়া বিরক্ত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, এখানে কেন আসছেন? বুড়োটা ঐ পাশের কামরায় রয়েছে সেখানে যান। 'বুড়োটা' অর্থাৎ মওলানা ভাসানীর সম্পর্কে সামান্যতম শ্রদ্ধার ভাবও তখন তার সেই কণ্ঠস্বরে আমি দেখতে পাইনি। মওলানা সাহেব সেদিন তাদের সবাইকে হতাশ করেছিলেন বলে আমার ধারণা জন্মেছিল।

ঢাকা থেকে লাহোর পৌঁছালে তাঁকে 'লালটুপি-পরা' হাজার হাজার জনতা সংবর্ধনা দেয়। তিনি ছিলেন মিয়া ইফতেখারউদ্দিনের পুত্র ন্যাপনেতা মিয়া আরিফ ইফতেখারের অতিথি। তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানকার ন্যাপ প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে। ১৩দিন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন, জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন এবং সাক্ষাৎকার দিয়েছেন নানা পত্র-পত্রিকায়। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তিনি এমন খোলামেলা বক্তব্য রেখেছেন যা সেখানকার ন্যাপ নেতাদের জন্যে ছিল বিব্রতকর। তাঁর একজন সফরসঙ্গী লিখেছেন: ১৩দিনের এই সফরে মওলানা সাহেব ছোট বড় সর্বমোট ১২টি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন এবং ৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় লাহোর, মুলতান, কোয়েটা, করাচীতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেছেন।

মওলানা ভাসানীর সহযোগীদের অনেকের অভিমত, তখন তিনি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান গিয়েছিলেন। সে দেশে সেটাই তাঁর শেষ সফর।[১০]

১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে সর্বকালের নৃশংসতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। সংবাদপত্রে হোক, রেডিওতে হোক খবরটি তৎক্ষণাৎ দেশবাসী জানতে পারেনি। দুই দিন পরে বিবিসি-র প্রাথমিক খবরে বলা হয়: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পঞ্চাশ হাজার মানুষ হয় নিহত হয়েছে অথবা বঙ্গোপসাগরে ভেসে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য জানা যায় এই প্রাণহানির সংখ্যা দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। উপকূল এলাকার কোনো কোনো জনবহুল জনপদে জনমানবের চিহ্ন নেই। ১০ নভেম্বর, ভাসানী জ্বর-কাশি ও আরো কিছু উপসর্গ নিয়ে ঢাকার ধানমণ্ডির একটি নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ডা. ফজলে রাব্বীসহ কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ছিলেন তিনি। বিবিসিতে পঞ্চাশ হাজার নিহত হওয়ার কথা শোনামাত্রই তিনি রোগশয্যা থেকে উঠে বসেন এবং সহকারীদের বলেন: আমার চট্টগ্রাম যাওয়ার ব্যবস্থা করো। ডা. রাব্বী বললেন: এ শরীরে আপনার কোথাও যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু মওলানার তখন কারো কথায় কান দেয়ার সময় নেই। তিনি শুধু বললেন: আমার জীবনের গ্যারান্টি দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহতালা। তোমাদের কথা আমি শুনবো না আমাকে যেতেই হবে ভোলা-সন্দ্বীপ।

১৬ নভেম্বর রাতের ট্রেনে তিনি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে পৌঁছেন। সেটি ছিল রমজান মাস। তিনি নিয়মিত রোজাও রাখছিলেন। চট্টগাম থেকে বহু কষ্টে একটি জলযানে ১৮ নভেম্বর হাতিয়া, ১৯ নভেম্বর রামগতি, ২০ নভেম্বর ভোলা এবং ২১ নভেম্বর বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে কখনো নৌকায়, কখনো হেঁটে প্রলয়বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে তিনি শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন। তখন সেখানে শুধু লাশ আর লাশ। শুধু মানুষের নয় গবাদিপশু পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয়।

২২ নভেম্বর তিনি ঢাকা পৌঁছে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপদ্রুত এলাকার বিবরণ দেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে, কিন্তু সাংবাদিকরা লক্ষ্য করেন, চোখে তার আগুন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথাটি ছিল: এই দুর্দিনেও ওরা (পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক) কেউ আসেনি। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে ত্রাণসামগ্রী পাঠাবার আকুল আবেদন জানান ইতোমধ্যেই অবশ্য ভারত, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বাঙালির এই মহাদুর্দিনে 'আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা– সেখানকার শাসকবর্গ ও রাজনৈতিক নেতারা– রইলেন নিশ্চুপ।

২৩ নভেম্বর তড়িঘড়ি করে ভাসানী পল্টন ময়দানে এক জনসভা করেন। জাতির ইতিহাসে সে ছিল এ ঐতিহাসিক জনসভা। ক্ষয়ক্ষতি বর্ণনার পরে সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি সেই সভায় স্লোগান দেন: "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্দাবাদ'। তাঁর সেই অবিস্মরণীয় ভাষণ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়। ওই দিনই রাতে এবং পরদিন আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়: "পূর্ব পাকিস্তানে বর্ষীয়ান জননেতা মওলানা ভাসানী স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।"[১১]

মুজিবকে বেঁধে ফেলা হলো

২৮ মার্চ '৭০ ইয়াহিয়া আরেকটি ভাষণ দেন, তাতেও নানা আদেশ-নির্দেশ ছিল। ৩০ মার্চ 'আইনগত কাঠামো' Legal Framework Order, 1970 ঘোষিত হয়: এই ঘোষণার রূপরেখার ভিত্তিতেই প্রণীত হবে নতুন সংবিধান। এতে '৫৬ ও '৬২ সালের শাসনতন্ত্রের সংখ্যাসাম্য নীতির অবসান ঘটে– এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিজয় হয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আসন বণ্টন করা হয় এ ভাবে: পূর্ব পাকিস্তান ১৬৯টি-এর মধ্যে মহিলা আসন ৭টি, পাঞ্জাব ৮৫টি-এর মধ্যে মহিলা আসন ৩টি, সিন্ধু ২৮টি-এর মধ্যে মহিলা আসন ১টি, বেলুচিস্তান ৫টি-এর মধ্যে মহিলা আসন ১টি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৯টি-এর মধ্যে মহিলা আসন ১টি, কেন্দ্র শাসিত উপজাতি অঞ্চলসমূহ ৭টি, মহিলা আসন নেই। সর্বমোট ৩১৩টি আসন। পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদের ৬০০ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল ৩০০ মহিলা ১০, পাঞ্জাবে ১৮০, মহিলা ৬ ইত্যাদি। পূর্বেই ঘোষিত হয়েছিল প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন হবে এবং নির্বাচন হবে যুক্ত-নির্বাচন পদ্ধতিতে।

'আইনগত কাঠমোতে আরো বলা হয়েছিল: পাকিস্তানের ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের নাম হবে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান'। যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সংরক্ষণ করতে হবে, রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান, প্রদেশগুলোর থাকবে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি। আইনগত কাঠামো ঘোষণার পরদিনই ভাসানী এক বিবৃতি দিয়ে ইয়াহিয়ার পূর্ববর্তী ভাষণসমূহ ও তাঁর প্রণীত আইনগত কাঠামোর সমালোচনা করেন। প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক পাকিস্তানিরই এই ধারণা হবে যে, শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত কাঠামোর ব্যাপারে নির্বাচিত সদস্যদের কোনো কথা বলারই অধিকার থাকবে না।

শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দলের নির্বাহী পরিষদের সভায় "প্রেসিডেন্টকে গণতন্ত্রের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য আইনগত কাঠামোর নির্দেশ যথাযথভাবে সংশোধনের আহ্বান জানানো হয়। অন্য কয়েকটি দল ও সংগঠনও 'আইনগত কাঠামো'র শর্তাবলির সমালোচনা করে।"[১২] সামরিক শাসকবৃন্দ মনে করলেন এল. এফ. ওর মাধ্যমে শেখ মুজিবের হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়েছে। ৬ দফা বাস্তবায়িত হবে না। শেখ মুজিব বললেন, ৬ রদফার ভিত্তিতে তিনি নির্বাচনে যাবেন। তিনি বলেন এটা হলো বাংলার জনগণের জন্য রেফারেন্ডাম। তিনি আরো বলেন, তিনি বিজয়ী হলে যেমনটি সিদ্দিকী সালিক লিখেছেন 'এল. এফ.-ও' টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।[১৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে কথোপকথন হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা দিয়েছেন হাসান জহির। সেজন্য নিজস্ব ভাষ্যে না গিয়ে হাসান জহির থেকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া হবে শ্রেয়।

নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া ঠিক করলেন পূর্ব পাকিস্তান সফর করবেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করবেন। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন মুজিব যাতে বুঝতে পারেন যে, তিনি ক্ষমতা ছেড়ে ইয়াহিয়া চলে যাবেন ব্যারাকে, এটাই তো হওয়ার কথা। শেখ মুজিবকে বোঝাবার কী ছিল? এখানেই ইয়াহিয়া মূল কথাটা বলে ফেলেছেন। "আমি জানতাম এর দরকার আছে", লিখেছেন ইয়াহিয়া, "কারণ ভারতীয় এজেন্টরা তার মধ্যে সেনাবিরোধী ফোবিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছে।"[১৪]

ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার কি ধারণা প্রেসিডেন্টের আসলে কোনো ক্ষমতা নেই? শেখ সাহেব ঠিকই উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যতদিন জেনারেলরা তাঁর সঙ্গে আছে ততদিনই তিনি ক্ষমতাধর। ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনি শেখ মুজিবের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর 'ট্রেন্ডস' সম্পর্কে তিনি কী জানেন? এবং ইয়াহিয়া বিস্মিত হলেন জেনে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে শেখ মুজিব যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

ইয়াহিয়া বলেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন শেখ মুজিবের আশপাশে যেসব পাকিস্তানবিরোধী আছে তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করে মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে। এটি যে মিথ্যা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যই তো শেখ মুজিব ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁকে মানসিকভাবে ইয়াহিয়া কী প্রস্তুত করবেন?

ইয়াহিয়া বলছেন, তিনি শেখ মুজিবকে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক করতে চেয়েছিলেন। ছেলেমানুষী প্রস্তাব বলে মুজিব তা উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তা যথাযথই ছিল। তখন ইয়াহিয়া প্রস্তাব করেছিলেন এমন কোনো সেনা অফিসার যাকে তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁকে ইয়াহিয়া সামরিক আইন প্রশাসনের কাঠামোয় স্থান দেবেন। মুজিব বললেন, তিনি পরামর্শ করে জানাবেন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, এই পরামর্শের কথা শুনেই বুঝে নিলেন প্রস্তাবটি মাঠে মারা গেছে এবং ঠিক তাই হলো। তিনি পরে জানালেন, সেনাবাহিনীর ৭৫% ছাঁটাই করে দিতে হবে। ইয়াহিয়া কি আর তা মানতে পারেন? তবে ইয়াহিয়ার মতে, তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন শেখ মুজিবের আস্থা অর্জনে এবং এক সময় তার মনে হয়েছে, মুজিব তাকে বিশ্বাসও করেছেন। কিন্তু সেনাবাহিনীকে তিনি কখনো বিশ্বাস করেননি এবং কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা এতে আরো ফাটল ধরিয়েছেন। তবে ইয়াহিয়া তাঁদের নাম বলেননি। এরপর ইয়াহিয়া কী করতে চেয়েছিলেন তা বর্ণনা করেছেন। সেটি বড় কথা নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো তার এই মন্তব্য যে, ভুট্টোকে তিনি সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন ভুট্টো যখন বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে পারে, কিন্তু তার একক ইচ্ছায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে দিতে পারা যায় না, তখন ইয়াহিয়া মনে করেন, এটি "ভ্যালিড পয়েন্ট"। কিন্তু গণতন্ত্র মানলে ভুট্টোর দাবিকে "ভ্যালিড পয়েন্ট" বলা যায় না।

১১ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া এসেছিলেন ঢাকায়। শেখ মুজিবকে তিনি জানিয়েছিলেন, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ফেব্রুয়ারির আগে সংসদের অধিবেশনে ডাকা যাবে না, তখনই তিনি কঠোর এবং বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন। তিনি জানালেন, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে অধিবেশন ডাকতে হবে। এবং এ ব্যাপারে তিনি কারও সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক নন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, "আমি বলব এটি আন্তরিক মনোভাব নয়, যদিও এ লজিক অস্বীকার করা যায় না।"[১৫] এই একটি মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, শাসকরা কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে ইয়াহিয়ার কথায় কান দিলেন না এর ফলে সৃষ্টি হলো তিক্ততা। ৭ ঘণ্টার অধিকাল স্থায়ী ইয়াহিয়া-মুজিব শীর্ষ বৈঠক ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ধারণা দেয়া হয়েছিল ইয়াহিয়া মুজিব সমঝোতা হয়েছে। বাস্তবে তা ছিল ফাঁকা বুলি। রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পার্লামেন্ট ডাকার যে দাবি জানাচ্ছিলেন, ইয়াহিয়া খান তা কৌশলে এড়িয়ে যান। এর ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ভুট্টো ও জেনারেলরা একজোট হওয়ার সময় পেয়ে গেল। একদিকে শেখ মুজিবকে ধোঁকা দেয়া ও অন্যদিকে প্রকাশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন একথা বলার মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন জনগণকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন অন্যদিকে জেনারেলদের কাছে বার্তা পাঠালেন যে তারা একজন পূর্ব পাকিস্তানির অধীন হতে যাচ্ছেন।

ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৭ ফেব্রুয়ারি ভুট্টোর বাড়িতে যান এবং ভুট্টো জেনারেলদের ভেতরে এক বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা বৈঠক হয়। বৈঠকে তারা বাঙালিদের প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার জন্য কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইয়াহিয়ার পরামর্শে ২৭ জানুয়ারি একটি বৃহৎ দল নিয়ে ভুট্টো ঢাকায় আসেন। ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'ছয় দফার ব্যাপারে কোন দরকষাকষি চলবে না।'[১৬]

অধিবেশন আহবানে বিলম্ব ও ইয়াহিয়া ভুট্টোর ষড়যন্ত্র বাঙালিদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। বাধ্য হয়ে ইয়াহিয়া গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, ৩ মার্চ '৭১ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। অধিবেশনকে সামনে রেখে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটের এক সভায় শেখ মুজিবুর রহমান সংসদীয় দলের নেতা এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপনেতা এবং পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের নেতা নির্বাচিত হন এম মনসুর আলী।

১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঘোষণা করেন তার দল ঢাকা অধিবেশনের যোগদান করবে না কারণ জাতীয় পরিষদ হবে 'কসাইখানার মতো', অধিবেশনে ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়া হবে। তিনি বলেন, যেসব ক্ষুদ্র দলের সদস্যরা রয়েছেন তারা অধিবেশনে যোগ দিতে গেলে তাদের ঠ্যাং ভেঙ্গে দেয়া হবে। কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুট্টোর দলের ভেতরেই গ্রুপ তৈরি হয়েছিল। তাদেরকে সামলে রেখে ভুট্টো বললেন, 'খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত আইন অমান্য করা হবে এবং যারা যাবে তাদের খতম করে দেয়া হবে। 'অন্য এক সূত্রে জানা যায় জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান জেনারেল ওমর জাতীয় পরিষদের সদস্য যারা পিপিপির সদস্য নয় তাদেরকে অধিবেশন বর্জনের জন্য ইয়াহিয়া খানের বার্তা পৌছে দেয়।'[১৭]

১৯৭১ সালের আগেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আস্থা তারা হারিয়েছিলেন এবং "মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, দীর্ঘস্থায়ী সামরিক শাসনের কারণে আমরা পাকিস্তানিরা এই দাম দিয়েছি। পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় বাহিনী জয় করেনি। তাদের সাহায্যে স্থানীয় জনগণই তা নিয়েছে।"[১৮]

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি যখন এ রকম, তখন ইয়াহিয়া বার বার শেখ মুজিবকে জানিয়েছিলেন যে, যেহেতু তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন সেহেতু তিনি যেন সংযম প্রদর্শন করেন। কিন্তু তার হঠাৎ মনে হলো, মুজিব যেন আর প্রধানমন্ত্রী হতে চান না। "তিনি নিজেই নতুন একটি রাষ্ট্রের পিতা হতে চান। নিজেকে তিনি বিচার করেছেন তখন আব্রাহাম লিঙ্কন অথবা কায়েদে আযমের কাতারে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন ম্যাগালোম্যানিয়াক। এ ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য একা ছিলেন না। অনেকের মধ্যেই এই ধারা দেখা দিচ্ছিল।" এই অনেকের নাম অবশ্য ইয়াহিয়া উল্লেখ করেননি।

২৮ ফেব্রুয়ারি। প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার লেঃ জেঃ এস. পি. এম পীরজাদা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আহসানকে টেলিফোনে বললেন ৩ মার্চের আহূত পরিষদে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। পীরজাদার ইচ্ছানুসারে সন্ধ্যা সাতটায় গভর্নর হাউসে ভাইস এ্যাডমিরাল এস. এম. আহসান শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার কথা অবহিত করালেন। আশ্চর্যের বিষয় মুজিব কোনো উদ্বেগই প্রকাশ করলেন না বরং যুক্তি সহকারে বললেন মার্চে অধিবেশন পুনঃ আহ্বান করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এপ্রিল হলে বড্ড অসুবিধা হবে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষদ স্থগিত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ঐদিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়া রাওয়ালপিন্ডিকে জানানো হয়। এবং বলা হয় এই ঘোষণায় যেন পার্লামেন্ট বসবার নতুন তারিখ থাকে। এর জবাবে রাওয়াপিন্ডি ঠাণ্ডাভাবে শুধু বলে পাঠায় 'ইয়োর মেসেজ ফুললী আন্ডারস্টুড'। এক গভীর ষড়যন্ত্রের আবর্তে সেদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবর্তিত হয়েছিল তারই প্রমাণ প্রেসিডেন্টের ১ মার্চের ভাষণ।[১৯]

সিদ্দিকী সালিক লিখেছেন, পরিষদে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সম্পর্কে শেখ মুজিব পূর্বেই অবগত ছিলেন বলে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য বেশ সময় পেয়েছিলেন। ঘোষণার আধা ঘণ্টার মধ্যে ক্রুদ্ধ জনতা বাঁশের লাঠি, লোহার রড এবং আপত্তিকর স্লোগানে রাস্তায় নেমে আসে। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলার প্যান্ডেলে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।[২০] কেননা শেখ মুজিব ওই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তার দলীয় কর্মীদের সংগঠিত করার সময় পেয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ মুজিব এ পরিস্থিতিতে হোটেল পূর্বাণীতে আয়োজিত জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন 'উই ক্যান নট লেট ইট গো আনচ্যালেঞ্জড। তিনি ২ মার্চ ঢাকায় পূর্ণ হরতাল এবং ৩ মার্চ সারা বাংলাদেশে হরতাল আহ্বান করেন এবং সরকারকে চিন্তা করার জন্য তিনি দিনের সময় প্রদান করে বঙ্গবন্ধু বলেন, আগামী ৭ মার্চ তিনি জনসভায় তার পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

এ প্রসঙ্গে সিদ্দিকী সালিক লিখেছেন: জনগণের সামনে কঠিন মনোভাব দেখানোর পর শেখ মুজিব গভর্নমেন্ট হাউসে এসে বললেন, এখনো সময় আছে যদি অধিবেশন বসার নতুন তারিখ প্রদান করা হয় তবে জনগণের ক্রোধ প্রশমিত করা যাবে, তার পরে হলে 'ইট উইল টু লেট'। ঢাকায় মুখ্য সামরিক কর্মকর্তাগণ চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রত্যুত্তরে শেষ রাতে জেনারেল পীরজাদা জেনারেল ইয়াকুবকে এ্যাডমিরাল আহসানের কাছে থেকে ক্ষমতা অধিগ্রহণের কথা ফোনে জানালেন।[২১]

এরপর শেখ মুজিব ষড়যন্ত্র বিষয়ক কথিত ধারণায় বদ্ধমূল হলেন। এ প্রসঙ্গে আসগর খানের বক্তব্যে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একান্ত এক আলোচনায় তিনি বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কি রূপ নেবে এবং অচলাবস্থার অবসান কিভাবে সম্ভব? উত্তরে শেখ মুজিব বলেছিলেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত সহজ। ইয়াহিয়া খান প্রথম ঢাকা আসবেন, এম. এম. আহমদ (প্ল্যানিং কমিশনের প্রধান) তাকে অনুসরণ করবেন। ভুট্টো আসবেন, আলোচনা ভেঙ্গে যাবে। ইয়াহিয়া খান সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেবেন। তারপরই পাকিস্তানের শেষ।[২২]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান লিখেছেন, "ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে আমি পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে লারকানায় গেলাম জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করতে। শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তবে তিনি অনুরোধ জানালেন, জাতীয় সংসদ বসার আগে এ ধরনের আলোচনার পর পিপিপি নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে এলেন। আমাকে জানানো হলো, দুটি প্রধান দলের মধ্যে আরো আলোচনা প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত হলাম যে, দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতার অবকাশ আছে।" এখানে যে বিষয়টি ইয়াহিয়া তুলে ধরেছেন তা হলো ভুট্টো আলোচনায় প্রস্তুত ছিলেন এবং সামগ্রিক বিষয়ে তার কোনো ভূমিকা ছিল না। ফেব্রুয়ারি থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদে অধিবেশন আহ্বান করা ছাড়া উপায় ছিল না। প্রেসিডেন্ট অধিবেশনে আহ্বান করলেন। কিন্তু তখনই পিপিপি অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করল। তারা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে লাগল। কেন তারা এমন করছিল সেটা জুলফিকার আলী ভুট্টোই কমিশনকে[২৩] বলতে পারেন। ইয়াহিয়ার এতে একটু খারাপ লেগেছিল। কারণ সৈনিক হিসেবে তিনি রাজনীতির ব্যাপার-স্যাপারগুলো বুঝছিলেন না। তার ভাষায়, তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতির কবলে বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন।[২৪] পরিস্থিতি আরো সঙ্কটময় হয়ে উঠলে জেনারেল ইয়াকুবকে গভর্নরের দায়িত্ব দেয়া হলো। ইয়াহিয়া লিখেছিলেন, মার্চের ২,৩ তারিখে তিনি ইয়াকুবকে লিখিতভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন, যে কোনো মূল্যে পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে। সে সময় ভুট্টো ইয়াহিয়ার রুমে ছিলেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভুট্টো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন সে সময় ইয়াহিয়ার রুমে ছিলেন এবং ইয়াহিয়া তার সামনেইবা কেন ইয়াকুবকে নির্দেশ দিলেন? ইয়াহিয়া এর ব্যাখ্যা দেননি। তিনি লিখেছেন, "ভুট্টো উৎসাহের সঙ্গে আমাকে সমর্থন জানালেন, বললেন, জেনারেল আপনি পাকিস্তানকে রক্ষা করেছেন।" আমার নিজের অবশ্য তা মনে হচ্ছিল না, বুঝছিলাম পাকিস্তান ভেঙ্গে যাচ্ছে। জুলফিকার ভুট্টোকে বললাম, "মনে রাখবেন এর মূল্যে হয় তো পাকিস্তান নিজেই। ভুট্টো এটা তো চিন্তার মধ্যে আনলেনই না বরং বখে যাওয়া ছেলের মতো ব্যবহার করলেন।"

"জেনারেল ইয়াকুব এর মধ্যে পদত্যাগ করলেন। এ পদত্যাগের ইয়াহিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তিনি ইয়াকুবকে কাপুরুষই শুধু বলেননি, বিদেশি চর হিসেবেও ইঙ্গিত করেছেন। আরো অনেক সেনা কর্মকর্তাও চলে আসতে চাচ্ছিলেন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনিই শুধু তার স্থানে অটল ছিলেন এবং তারপর কেন তাকে এভাবে রাখা হয়েছে তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।"[২৫]

আই ওন্ট বি দেয়ার: ইয়াহিয়া

১২ জানুয়ারি। ৭০ সাল।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলেন। সাথে এলো তার প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল এস.জি.এম. পীরজাদা। মুখোমুখি বৈঠক। একদিকে ইয়াহিয়া খান ও তার সহযোগী। অপর দিকে বঙ্গবন্ধু মুজিব এবং হাইকমান্ড।[২৬] বঙ্গবন্ধু ছ'দফা থেকে একচুলও নড়লেন না। ছ'দফার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, এতে কি অন্যায় ও আপত্তিকর কিছু আছে? ইয়াহিয়া বলল, আই একসেপ্ট ইয়োর সিক্স পয়েন্ট। প্রফেসর এ. ডব্লিউ চৌধুরীকে রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া ডেকে পাঠালেন। রমনা গ্রীন সংলগ্ন প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ। ইয়াহিয়া বিমর্ষ। হতাশ। বললেন, মুজিব হ্যাজ লেট মি ডাউন।[২৭] বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের উত্তরে মুজিবকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করে বললেন , শীঘ্রই তাঁর সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে। আই ওন্ট বি দেয়ার। মূল কথা ছিল এটাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে কোনোভাবেই শাসনতান্ত্রিক প্রধান করার কোনো প্রকার ইঙ্গিত প্রদান করেননি। ফলে ইয়াহিয়া খান বিমর্ষ হৃদয় নিয়ে করাচীর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করলেন।

ইয়াহিয়ার পাখি শিকার: নবতর চক্রান্ত

জানুয়ারি ১৯৭১। জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান। পাখি শিকারে নিদারুণ শখ। অত্যন্ত উৎফুল্লভাবে তিনি বিগত দশদিন ধরে অবিরাম পাতিহাঁস ও তিতির পাখি শিকারের আনুক্রমিক দৃশ্যাবলী উপভোগ করছেন। করাচী-লাহোর, লাহোর থেকে হায়দ্রাবাদ হয়ে সিন্ধুর লারকানায় এলেন। লারকানার জমিদার তনয় পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো অত্যন্ত জাঁকজমক ও উষ্ণতার সঙ্গে তাকে আপ্যায়িত করলেন। আলোচনা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্র কি হাতাছাড়া হবে? সামরিক বাহিনীর স্বার্থ কি অক্ষুণ্ন থাকবে? ভুট্টো বললেন, ক্ষমতা থেকে দূরে থাকার জন্য আমি নির্বাচন করিনি।[২৮] প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া হাসলেন অর্থপূর্ণভাবে। ইয়াহিয়ার সাথে উপস্থিত থাকলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল হামিদ। ভুট্টো দেখলেন, ইয়াহিয়া কোনোভাবেই মুজিবের হাতে ক্ষমতা না ছাড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দু'জনের সলাপরামর্শ হলো। সমঝোতা হলো। তৈরি হলো এক অলিখিত ব্লু-প্রিন্ট। ব্ল্যাক বাস্টার্ডদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া যাবে না।[২৯]

দরজা খোলা থাকবে

১৯৭১ সালের ২৭ জানুয়ারি। ৩২নং ধানমণ্ডি। জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এলেন। নিরাসক্ত। নির্লিপ্ত। ক্ষমতার অংশীদারিত্ব নয় বরং আলোচনা হলো ছ'দফা নিয়ে। শাসনতান্ত্রিক বিষয়দি নিয়ে। সামরিক চক্রকে হটানোর ফর্মুলা বা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শ কিছুই আলোচনার টেবিলে এলো না। ভুট্টো বললেন, তার পার্টি বিচ্ছিন্নতাবাদের এই পরিকল্পিত কর্মসূচি সমর্থন করতে পারে না।[৩০] মুখরক্ষার জন্য বলে গেলেন, 'আলোচনার দরজা খোলা রইল।' বঙ্গবন্ধু চক্রান্ত ও আঁতাত ধরে ফেললেন।

১০ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু বললেন, 'বাংলার মানুষ রক্ত দিতে শিখেছে। এবার বাঙালি বিশ্বে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে।' তিনি এই প্রেক্ষিতে বললেন, 'বাংলার মানুষকে বৃহত্তর আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

রেডিও পাকিস্তানের সম্প্রচারে যখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দেয়া হয় তখনো ঢাকার একটি হোটেলে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বাস্তবিকপক্ষে গোটা ঢাকা নগর ঐ ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পরেই কেবল তাঁরা এ ঘটনার কথা অবহিত হন। সরকারি অফিস, আদালত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প স্থাপনা ইত্যাদি থেকে লোকজন শোভাযাত্রা করে হয় পূর্বাণী হোটেলে কিংবা পল্টন ময়দানে পৌঁছায়। "ইয়াহিয়ার ঘোষণা, বাঙালিরা মানে না"- স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। নগরের বাস সার্ভিসের চলাচলে থেমে যায়, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা স্টেডিয়ামে এ সময় একটি আন্তর্জাতিক খেলা পরিত্যক্ত হয়।[৩১] পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাবিষ্ট জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। এ জনতা জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তাদের আস্থা পুনর্ব্যক্ত করে। ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী জানান যে পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দেয়ার আগে তিনি নিজে, ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং তোফায়েল আহমেদ এমএনএ পূর্বাণী হোটেলে শেখ মুজিবের সাথে মিলিত হন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁরা তিনজন কোনো কোনো ছাত্র ইউনিয়ন নেতার সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু সর্বসম্মত ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তাই ঐ নেতারা অনতিবিলম্বে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে শেখ মুজিবের পরামর্শ অনুযায়ী পল্টন ময়দানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যান। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে নূরে আলম সিদ্দিকী স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে "প্রতিটি আঘাতের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হেনে জবাব দেওয়া হবে।" তাঁদের সবাই "স্বাধীন বাংলা" প্রতিষ্ঠার আহ্বান জাননা। নূরে আলম সিদ্দিকি বলেন, এত তাড়াতাড়ি "স্বাধীন বাংলার" স্লোগান তোলার জন্য কোনো কোনো মহল থেকে তাঁদের তীব্র সমালোচনা করা হয়। আর তাতে করে শেখ মুজিবের ওপর চাপ বাড়ে।[৩২]

তবে এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না, শেখ মুজিবের প্রচ্ছন্ন অনুমোদন ছাড়া ছাত্ররা এটা করতে পারত না। প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে আওয়ামী লীগ চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়। শেখ মুজিব সাংবাদিকদের জানান যে, একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে তোষামোদ করার নীতিকে বিনাপ্রতিবাদে মেনে নেওয়া যায় না। তবে এ ধরনের অসন্তোষের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি প্রকাশের পূর্বে প্রাথমিক প্রতিবাদের পর সরকারের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা সময়ের দরকার ছিল। তাই শেখ মুজিব ইতোমধ্যে পরিস্থিতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন না ঘটলে আগামী কর্মসূচি কী হবে সে বিষয়ে তিনি ৭ মার্চ এক জনসভায় ঘোষণা দেয়ার অঙ্গীকার করেন। ইতোমধ্যে ঢাকা ও গোটা প্রদেশে যথাক্রমে ২ ও ৩ মার্চ হরতাল পালনের কথা বলা হয়। তিনি ঘোষণা করেন, অতঃপর যা কিছু ঘটবে তার পরিণতির জন্য তিনি জবাবদিহি হবেন না। পরের দিন কেবল ঢাকার জন্য হরতাল ডাকা হলেও তা গোটা পূর্ব পাকিস্তানে পালিত হয়।[৩৩] এতে সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, জনসমষ্টির অংশবিশেষ কিংবা আওয়ামী লীগের গোষ্ঠীবিশেষই শুধু নয় বরং পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সাথে একাত্ম রয়েছে।

১ ও ২ মার্চ কোনো কোনো স্থানে বিক্ষিপ্ত সহিংসতা ঘটে। তবে আরো বেশি সহিংসতা হবে বলেই আশঙ্কা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসানকে ঐ দিনই তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক সাহেবজাদা ইয়াকুবকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তিনি অনতিবিলম্বে সংবাদপত্রের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন যদিও তা আদৌ তেমন প্রতিপালিত হয়নি। মনে করা হয়ে থাকে যে, এ্যাডমিরাল আহসান মুজিবের সাথে সংঘাতে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ইয়াহিয়াকে, কেননা তা পাকিস্তানের জন্য বিপর্যয়কর হবে।

নেপথ্যে সশস্ত্রকরণ পরিকল্পনা

নাটকীয়ভাবে ৩ মার্চের অধিবেশ স্থগিত হলো। সারাবাংলা জেগে উঠল। গর্জে উঠল। ৭ মার্চ ঘোষিত হলো অসহযোগ ও স্বাধীনতার বজ্রবাণী। চলল অসহযোগ। অভূতপূর্ব। ৩ মার্চেও স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হলো। ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুকে সর্বাধিনায়ক ও জাতির পিতা অভিহিত করে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েমের লক্ষ্যে পল্টনের জনসভায় ইস্তেহার পাঠ করা হলো।[৩৪] সমগ্র বাংলায় আওয়াজ উঠল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো– বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' স্লোগান দেয়া হচ্ছিল, স্বাধীনতার এবং সশস্ত্র সংগ্রামের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩ মার্চ। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হলো।

গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতনে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশি পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ 'স্বাধীন জাতি' হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করতে শেষবারের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষক গোষ্ঠী সামরিক বাহিনীকে শেষ আশ্রয় হিসেবে ভরসা করেছে।

৫৪ হাজার ৫শত' ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। এজন্য তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। ১. স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। ২. অঞ্চলে-অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে। ৩. ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

একই সঙ্গে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে– ক. প্রতিটি গ্রাম, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে। খ. সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। গ. শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে ও এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে। ঘ. হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। ঙ. স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে রাখার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।[৩৫]

ছাত্রলীগ ও ডাকসু ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রেডিওতে প্রচারের দাবি জানায়। এদিন ছিল ৫ দিনব্যাপী হরতালের শেষ দিন।

৫ মার্চ। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বিবৃতিতে বলেন, 'আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র জনতাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে আমি তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।' তাজউদ্দীন বলেন, 'সেনাবাহিনীর এই নির্যাতনমূলক কাজের নিন্দা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই অথচ আমরা জানি বিদেশী হামলা থেকে দেশকে রক্ষার জন্যই এই সব অস্ত্র ব্যবহৃত হবার কথা। জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বলেন যে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি বিভিন্ন মহল থেকে প্রতি আহ্বান সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষেরও উচিত বাংলাদেশের নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর গণহত্যা বন্ধের দাবি তোলা।'

ঐদিন পিপিপির মুখপাত্র আবদুল হাফিজ পীরজাদা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুট্টোর মধ্যকার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা কালে বলেন, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্বল্পকালীন স্থগিত ঘোষণার জন্য পিপিপি অনুরোধ জানিয়েছিল এ কথা ঠিক, তবে ইচ্ছা ছিল এই সময়ের ছয় দফা প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা করে একটা সমঝোতায় পৌঁছে যাবে। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার অর্থ অধিবেশন বাতিল বা অন্য কিছু নয়। এটা সামান্য সময়ের বিলম্ব মাত্র। কিন্তু এর ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার কল্পনাও আমরা করিনি। আমরা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী নই। আওয়ামী লীগ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা ঠিক হয়নি। দেশের পরিস্থিতি যদি আরো খারাপ হয়, তবে যারা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তাদের ওপরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব গিয়ে পড়বে।'

অখণ্ডতা প্রসঙ্গে পীরজাদা বলেন, 'পাকিস্তান দুটি হবে না একটি থাকবে তা এখন সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের দেখার ব্যাপার। পিপিপি শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে আলাপ-আলোচনার জন্য আরো সময় চায়, কারণ এই দল মনে করে যে, আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা দেশের ঐক্য সংহতি রক্ষার প্রতিকূলে।'

৬ মার্চ। ৭১। গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা দেবেন। এই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ জনগণের প্রত্যাশাকে সামনে রেখে এবং আওয়ামী লীগের উগ্র স্বাধীনতাকামীরা বঙ্গবন্ধুকে চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার। ঐদিন রাতে আওয়ামী লীগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নেয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সভা গভীর রাতে মুলতবি হয়ে যায়। এই রাতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দীর্ঘক্ষণ টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলেন এবং বলেন আপনি তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি শীঘ্রই ঢাকা আসছি এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। সিদ্দিকী সালিক তার বইতে লিখেছেন, আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের প্রতি দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেবো। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে–যা আপনাকে 'ছয় দফা' থেকেও বেশি খুশি করবে। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না।[৩৬] ঐ রাতেই ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ পাঠান আওয়ামী লীগের (স্বাধীনতার) ঘোষণা বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো আওয়ামী লীগের পক্ষে দুজন ব্যক্তি শেখ সাহেবের নাম করে পূর্ব পাকিস্তানের জিওসির সঙ্গে দেখা করে বলেন, স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু খুব চাপের মধ্যে আছেন।[৩৭] তাকে গ্রেফতার করে সেফ কাস্টডিতে আনার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। জিওসি বলেন, শেখ মুজিবের মতো জনপ্রিয় নেতা কীভাবে এইসব চাপ মোকাবেলা করতে হয় তা তার জানা আছে। তাকে বলবেন এইসব স্বাধীনতাকামী উগ্রবাদীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা রেসকোর্সের পাশেই থাকব। তাকে বলে দেবেন তিনি পাকিস্তান সংহতির বিরুদ্ধে কথা বললে আমি ট্যাংক, আর্টিলারি এবং মেশিনগান দ্বারা সবাইকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। তখন কেউ শাসন করার জন্য থাকবে না, শাসিত হওয়ার জন্যও না।[৩৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াকুবের বরাত দিয়ে লে.জে কামাল মতিনউদ্দিন লিখেছেন, কড়াকড়িভাবে সামরিক শাসন দিলেও যে ধরনের হতাহত হতো তাতে জনসাধারণের সঙ্গে সেনাবাহিনীর একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থেকেই যেত। সে কারণে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত অকার্যকর হতো। তারপরেও যদি আমরা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতাম তাহলে হয়তো সাময়িকভাবে আমরা সাফল্য পেতাম কিন্তু সেটা হতো আমাদের ব্যর্থতা।[৩৯]

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে সরকারি প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে সিদ্দিকি সালিকের বিবরণ উল্লেখ্য। তিনি লিখেছেন: '৭ মার্চ পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মি: ফরল্যান্ড মুজিবের সঙ্গে দেখা করলেন। কিছুক্ষণ পর এক বাঙালি সাংবাদিক, নাম মি: রহমান, টেলিফোনে আমাকে বললেন, একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। মুজিব-ফরল্যান্ড বৈঠক সম্পর্কে জি ডাবলিউ চৌধুরী বলেছেন, 'রাষ্ট্রদূত ফরল্যান্ড মুজিবের কাছে আমেরিকার নীতিমালা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন। তিনি মুজিবকে জানিয়ে দেন বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনায় তিনি যেন ওয়াশিংটনের দিকে না তাকান।

তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন, ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা করেছেন সেখানে একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল না। কিন্তু তিনি অসাধারণ তেজদৃপ্ত কণ্ঠে যে আবেগময় যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন তা ছিল মন্ত্রমুগ্ধকর ও ক্ষুব্ধতায় ভরা। সমগ্র পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। যদিও উগ্রপন্থী ছাত্ররা তাকে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল, তিনি সরাসরি এড়িয়ে গেলেও স্বাধীনতার কথা বলেন। এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রায় পুরো দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সাংবাদিকদের জবাবে তিনি বলেন, একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা এখন নয়। তার ভাষণ এমন তেজদৃপ্ত ছিল যা পাথরকে ও বৃক্ষকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। তার বজ্রকণ্ঠে মনে হয়েছিল সমগ্র জনগণ উদ্দীপ্ত।

৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো রিপোর্ট পাঠিয়েছিল সেনাবাহিনীকে। যেক্ষেত্রে জনগণ ছিল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং অসহযোগিতামূলক। তিনি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। যার মূল দশটি পয়েন্ট ছিল: ১. বাঙালিরা সরকারকে কোন খাজনা কর দেবে না। ২. সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা হরতাল পালন করবে এবং অফিসে যাবে না। ৩. রেলওয়ে এবং বন্দর শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। ৪. রেডিও টেলিভিশন আওয়ামী লীগের নির্দেশনাবলি প্রচার করবে। সেনাবাহিনী কর্তৃক 'atrocities' প্রচার করতে হবে। ৫. শুধু স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ে টেলিফোন কাজ করবে। ৬. সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। ৭. পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাংক কোন টাকা পাঠাতে পারবে না। ৮. সমস্ত বিল্ডিং, দোকান ও পরিবহনে কালো পতাকা উড়বে। ৯. হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ১০. সংগ্রাম পরিষদ জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও মহল্লায় গঠিত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ মুজিবের ভাষণ দেয়ার কথা ছিল ২টা ৩০ মিনিটে (স্থানীয় সময়)। রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র নিজ উদ্যোগে সরাসরি তাঁর ভাষণ প্রচারের ব্যবস্থা সম্পন্ন করল। রেডিওর ঘোষকরা আগে থেকেই ইস্পাত দৃঢ় লাখ লাখ দর্শকের নজিরবিহীন উদ্দীপনার কথা প্রচার করতে শুরু করল।

সামরিক প্রশাসকদের দফতর এতে হস্তক্ষেপ করে এ 'বাজে' ব্যাপারটি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। "আমি বেতার কেন্দ্রে আদেশটি জানিয়ে দিলাম। আদেশটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফোনের অপর প্রান্তের বাঙালি বন্ধুটি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমরা যদি সাড়ে সাত কোটি জনগণের কণ্ঠকে প্রচার করতে না পারি তাহলে আমরা কাজই করব না'। এই কথার সাথে সাথে বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গেল।"[৪০]

বেতারের সকল কর্মচারী মুহূর্তের মধ্যেই ধর্মঘট শুরু করলেন। যে মুজিব ৩ মার্চের মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে ছাত্র নেতাদের দ্বারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের দৃশ্য দেখেছিলেন এবং সেদিন থেকে সেই পতাকা ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট ও গভর্নর হাউস ছাড়া সকল সরকারি বেসরকারি অফিস আদালতে শোভা পাচ্ছিল। উত্তেজনা ধীরে ধীরে কুণ্ডলী পাকিয়ে জমা হচ্ছিল। তিনি মঞ্চে আরোহণ করলেন। একটি ঘোষণার জন্য অপেক্ষমাণ বিশাল জনসমুদ্রের দিকে তাকালেন। মুজিব তাঁর স্বভাবসুলভ বজ্রকণ্ঠে শুরু করলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বর নিচুতে নামিয়ে আনলেন বক্তব্যের বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। তিনি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। কিন্তু ২৫ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের বিষয়ে চারটি শর্তারোপ করলেন। এগুলো হলো: (১) মার্শাল ল' তুলে নিতে হবে। (২) জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। (৩) সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। (৪) বাঙালি হত্যার কারণ খুঁজে বের করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

বক্তৃতার শেষ দিকে তিনি জনতাকে শান্ত এবং অহিংস থাকার উপদেশ দিলেন। যে জনতা সাগরের ঢেউয়ের প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে রেসকোর্স ভেঙ্গে পড়েছিল–ভাটার টানধরা জোয়ারের মতো তারা ঘরে ফিরে চলল তাদের ভেতরকার সে আগুন যেন থিতিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে সে আগুনকে ধাবিত করা যেত। আমাদের অনেকেরই আশংকা ছিল এরকমই। এ বক্তৃতা সামরিক আইন সদর দফতরে স্বস্তির বাতাস বইয়ে দিল। সদর দফতর থেকে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান যে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ।'[৪১]

৭ মার্চ টিক্কা খান যখন বিমানে ঢাকায় অবতরণের জন্য আসছিলেন তিনি দেখতে পেলেন বিশাল জনগণ উত্তেজিতভাবে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের ভাষণ শুনছেন। এমনকি তিনি এও দেখলেন যে, গোয়েন্দা সংস্থার একটি হেলিকপ্টার আকাশে উড়ছিল। সেই হেলিকপ্টারকে শাসানোর জন্য লাঠি ও দেশি অস্ত্র দেখিয়ে যাচ্ছিল। পরে অবশ্য গোয়েন্দা রিপোর্টে তিনি জেনেছেন হেলিকপ্টারকে লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছোড়া হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যার যা আছে তাই নিয়ে...

স্বাধীনতার স্লোগানকে কার্যে পরিণত করার জন্য কৌশল গ্রহণ করা অপরিহার্য ছিল। ত্বরিত ও প্রস্তুতিবিহীন সিদ্ধান্ত জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে অঙ্কুরেই শেষ করে দেবে। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে গড়ে ওঠা বাঙালির বিজয়কে অনিবার্য করে তুলতে হলে সরকারের সকল যন্ত্রকে অচল করে দিতে হবে, আন্দোলনকে গ্রামের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কৃষক শ্রমিককে, বাংলার গ্রাম ও শহরকে একই সাথে ও সূত্রে স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগঠিত করতে হবে। সেনাবাহিনী, ই.পি.আর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ বাহিনীকে আন্দোলন শক্তি হিসেবে দাঁড় করাতে হবে। সশস্ত্র গ্রুপ ও সেল গঠন করতে হবে। বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোগিতার ডাক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনকে সশস্ত্রকরণের প্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধু দৃঢ়দৃষ্টিসম্পন্ন সেনাপতির মতো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে কনভেনশনাল ওয়ারে জয়যুক্ত হওয়া যাবে না। স্বাধীনতা অর্জনে গেরিলা পদ্ধতি গ্রহণ করে বাংলার মাটি হতে পাকিস্তান বাহিনীকে উৎখাত করতে হবে। এই গেরিলা পদ্ধতির রূপরেখা তিনি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে, যার যা আছে তাই শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, রাস্তাঘাট বন্ধ করতে হবে, ভাতে ও পানিতে মারতে হবে, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। নির্বাচিত এম.এল-এ হিসেবে মঞ্চের অদূরে বসেছিলাম। ভাষণ শেষ করেন জয়বাংলা স্লোগানে।

স্বাধীনতার সংগ্রাম

সফলভাবে অসহযোগ আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। গ্রাম জেগে উঠল। জঙ্গি হলো। প্রত্যেক থানায় ছাত্র-যুবক দ্রুত অস্ত্র প্রশিক্ষণে নিয়োজিত হলো। যুদ্ধের কলাকৌশল, প্রশিক্ষণ চলল। দেশের সর্বত্র প্রায় প্রতিটি থানায় পুলিশের কাছে হতে অস্ত্র নিয়ে নেয়া হলো। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন নির্দেশ জারি করে বিকল্প সরকার চালাতে লাগলেন। সর্ব পেশা ও শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ জনগণ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো এগুতে লাগল। ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: 'বাঙালিদের স্বাধীনতার উদ্দীপনা কেউ দমাতে পারবে না।'

বঙ্গবন্ধু স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন

এই লক্ষ্যে ১৫টি নির্দেশনা জারি করেন। অফিস, আদালত, কোর্ট-কাচারী কীভাবে চলবে প্রশাসন যন্ত্র কীভাবে চলবে তারও দিক-নির্দেশনা দেন। সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি ব্যাংক-বীমা, শ্রমিক-সংস্থা, আইনজীবী, বেতার-টিভি সবকিছুই বঙ্গবন্ধুর আদেশে-নির্দেশে চলতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বাপর যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধু যে ৩৫টি নির্দেশ দিয়েছিলেন তার সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। পাশাপাশি সামরিক কর্তৃপক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১৫ নম্বর সামরিক আইন জারি করেন। তাজউদ্দীন আহমদ এর প্রতিবাদ করে বললেন, 'এইসব সামরিক ফরমান মানি না। আমরা আমাদের মতো চলবো।'

১৫ মার্চ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করেন। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্টকে 'অতিথি' হিসেবে উল্লেখ করে তার কর্মীদের উদ্দেশে বললেন, 'তার যেন কোন অপমান না হয়।' পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে 'অতিথি' বলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বুঝাতে চেয়েছিলেন তিনি একটি নতুন রাষ্ট্রে পদার্পণ করেছেন। যে নবরাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ', যার 'পতাকা' নির্ধারিত এবং দেশটির জাতীয় সঙ্গীতও বিদ্যমান। সর্বোপরি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনগণ এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সর্বাধিনায়ক ও রাষ্ট্রপতি পদে ৩ মার্চ বরণ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে আরো আলাপ-আলোচনার জন্যে ঢাকা এলেন। সেদিন "টাইম" সাময়িকী নিউ ইয়র্ক থেকে লিখলেন, আসন্ন বিভক্তির (পাকিস্তানকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণতকরণ) পশ্চাতে যে মানবটি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। গত সপ্তাহে ঢাকায় শেখ মুজিব 'টাইম' এর সংবাদদাতা ডন কগিনকে বলেন, বর্তমান পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে, সমঝোতার আর কোনো আশা নেই। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে পৃথক পৃথক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা বলেন এবং জানান যে তার অনুগামীরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর দিতে অস্বীকার করেছে, যা কিনা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। মনে হচ্ছে তিনি তাঁর ভাষায় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা' ঘোষণার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এর দুদিন আগে পূর্ব পাকিস্তানের এই নেতা পশ্চিম পাকিস্তানিদের সম্পর্কে বলেন, "আমি তাদেরকে পঙ্গু করে দেব এবং তাদেরকে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করব।" এধরনের একটি বিবৃতির পর সোজাসুজি স্বাধীনতা ঘোষণা আর অতি নাটকীয় কিছু নয়।[৪২]

১৭ মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। সেদিন বিদেশি সাংবাদিকরা ৫২তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালে তিনি বলেন, 'আমি জীবনে কখনো আমার জন্মদিন পালন করিনি। আপনারা আমার দেশের মানুষের অবস্থা জানেন, তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা তখন তারা মরে। যখন কেউ ইচ্ছা করে তখন তাঁদের মরতে হয়।' গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আবার বলেন, 'আমার আবার জন্মদিন কী, মৃত্যু দিবসই বা কী? আমার জীবনই বা কী? মৃত্যুদিন আর জন্মদিন অতি গৌণভাবে এখানে অতিবাহিত হয়। আমার জনগণই আমার জীবন।' ঘরোয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'সাত কোটি মানুষ যখন পাহাড়ের মতো আমার এবং আমার দলের পশ্চাতে একতাবদ্ধ হয়েছে তখন আমার চেয়ে সুখী মানুষ আর কে হতে পারে?' 'আমার জনগণের মন ভার হয়নি। তারা লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' তিনি বলেন, 'কি নেই আমার দেশে। পাট, চা ইত্যাদিসহ আমাদের যা প্রয়োজন বাংলাদেশে তা আছে।' কি নাই সে সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলে, তিনি বলেন 'স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার শুধু বাঙালিদের নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একঘন্টাব্যাপী আলোচনা হয়। আলোচনায় তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নেয়া এবং অবিলম্বে জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রস্তাব ছিল তিনি মন্ত্রিসভায় ভুট্টোর দলকে নেবেন কিনা? বঙ্গবন্ধু সরাসরি বললেন, প্রশ্নেই আসে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে আমি সরকার গঠন করব। এতে ইয়াহিয়া খান রাগান্বিত হয়ে ওঠেন এ কারণে যে ইয়াহিয়া খান সবসময় ভেবে এসেছেন অন্য সামরিক জেনারেলদের মতো পশ্চিম পাকিস্তান হলো তাদের আসল ঘাঁটি। সেই ঘাঁটি যাতে দুর্বল না হয় তার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা।

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর, মার্শাল 'ল প্রশাসকদের নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোপনীয় মিটিং করেন। সে মিটিংয়ে চিফ অফ জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল গুল হোসেন খান, আই.এস.আই.এর ডাইরেক্টর মেজর জেনারেল আখতার, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল গোলাম ওমর, গোয়েন্দা ব্যুরোর ডাইরেক্টর নাসির রিজভি, পুলিশের আই জি, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল এস.জি.এম.এম. পীরজাদা উক্ত মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা থেকে গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস.এম. আহসান, পূর্বাঞ্চলের কামান্ডার লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং ডেপুটি সামরিক প্রশাসক (সিভিল) মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান অংশগ্রহণ করেন। সভাটি মদ্যপানের মাধ্যমে 'স্বাস্থ্য রক্ষার' রীতি পালন করে উপমহাদেশের মানচিত্রের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেলগণ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেও তার না যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সাধারণভাবে এই ধারণা জেনারেলদের প্রভাবান্বিত করে যে, শেখ মুজিবের উপরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা দরকার যাতে তিনি তার উগ্রপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ করেন। ইয়াহিয়া খান বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে এবং ভুট্টোর উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত। জেনারেল আকবর ভুট্টোর ব্যাপারে মুজিবের মতো চাপ সৃষ্টি অপছন্দ করেন এবং তার অভিমত ছিল ভুট্টোর উপরে চাপ সৃষ্টি করলে তা পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিক, জুনিয়র অফিসার ডিজি, আই, এস, আই, ক্ষুব্ধ হবে। এসময় জেনারেল পীরজাদা বলেন, সামরিক শাসন কড়াকড়িভাবে কোন অংশেই দেয়া ঠিক হবে। ইয়াহিয়া খান এ সময় বলেন, তিনি উভয় সংকটে আছেন এবং কোন রাজনৈতিক নেতাই তাকে সহযোগিতা করছে না।[৪৩] আলোচনাকালে সাহেবজাদা ইয়াকুব বলেন, পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সংখ্যা স্বল্পতা রয়েছে। সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু তারা তাদের আনুগত্যে পরিবর্তন করেছে এবং নতুন সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। এদেরকে অবদমন করতে হলে অধিকসংখ্যক সেনাবাহিনী প্রয়োজন। যদি শক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহলে ভয়ানক ফলাফল দেখা দেবে। তিনি বলেন, মূলকথা হলো যদি পাকিস্তানের সঙ্গতি রক্ষা করতে হয় তাহলে অধিক হতাহত হবে এবং ঘৃণা ছড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়বে এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।[৪৪] যদিও আমরা অস্ত্রের সাহায্যে শক্তি প্রয়োগ করে আইন-শৃঙ্খলাকে নিয়োগ করতে যাই তাহলে আমাদের মূল লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, তখন আমাদের বিজয় হবে, আমাদের পরাজয়। জেনারেল ইয়াকুব প্রস্তাব করেন, ১. বর্তমান অবস্থার রাজনৈতিক সমাধান উত্তম হবে, ২. পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে বুঝানো উচিত অধিবেশনে তাদের যাওয়া উচিত, ৩. সেনাবাহিনী নয়, অধিবেশন স্থগিত হলে তা যেন রাজনীতিবিদদের ঘাড়ে চাপানো যায়, ৪. উভয় নেতার উপরে চাপ সৃষ্টি করা উচিত।

ইয়াহিয়া খান ১৫ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেন যে, ১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। ২. কেন্দ্রে এবং প্রদেশে দুটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। ৩. জাতীয় সংসদকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হবে। ৪. ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানকে অধিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। ৫. কোনো সামরিক ফরমান থাকবে না, থাকবে শুধু প্রোক্লেমেশন। এভাবে আওয়ামী লীগ এবং সামরিক প্রশাসকদের ভেতরে একটি সমঝোতা তৈরির দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু মার্চ ২০-২১ তারিখ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন অনির্ধারিতভাবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রোক্লেমেশনের আওতা থেকে মুক্ত করতে হবে। ইয়াহিয়া এবং তার সহকারীরা মনে করলেন এর অর্থ হলো মুজিব অখণ্ড পাকিস্তান রাখার পক্ষে আগ্রহী নয়।[৪৫]

দি বাস্টার্ড ইজ নট বিহেভিং

১৭ মার্চ। সন্ধ্যা ৭টা। প্রেসিডেন্ট হাউস। জেনারেল ইয়াহিয়া বলে উঠলেন: দি বাস্টার্ড (মুজিব) ইজ নট বিহেভিং। ইউ (টিক্কা খানকে) গেট রেডি।[৪৬]

রাত ১০টা। জেনারেল টিক্কা খান ফোন করলেন জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেনকে: খাদিম ইউ ক্যান গো এহেড। অপারেশন ব্লিৎস বাতিল। অপারেশন সার্চলাইট রচিত হলো।

সবুজ প্যাড ও একটি কাঠপেন্সিল

১৮ মার্চ সকাল আটটা। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। জিওসি অফিস। মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও রাও ফরমান আলী বেসিক অপারেশন প্ল্যান তৈরি করার জন্য মিলিত হলেন। ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে প্রণীত জেনারেল ইয়াকুবের নির্দেশে প্রণীত ব্লিৎস[৪৭] অপারেশন প্ল্যান বাতিল করা হলো। এর পরিবর্তে নতুন প্ল্যান তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কেননা, ইতোমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র দেশের বেসরকারি শাসনভার তাঁর হাতে তুলে নিতে সক্ষম হয়েছেন। সবুজ রঙের প্যাড। আর একটি সাধারণ কাঠপেন্সিল। জেনারেল ফরমান আলীর হাতে লিপিবদ্ধ হলো বাঙালি জাতি হত্যার খসড়া ব্লু-প্রিন্ট: অপারেশন সার্চ লাইট। জেনারেল খাদিম রাজা এর দ্বিতীয় ভাগ সম্পন্ন করলেন, যা সৈন্য সমাবেশ, সৈন্য পাঠানো ও উপকরণ বিতরণ সংক্রান্ত।

১৯ মার্চ আবারো জয়দেবপুরে বর্বর বাহিনীর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবৃতিতে বলেন, যারা মনে করেন, তাদের বন্দুকের বুলেট দিয়ে জনগণের সংগ্রাম বন্ধ করতে সক্ষম হবেন, তারা আহম্মকের স্বর্গে আছেন। ইয়াহিয়ার সাথে মুজিবের বৈঠকে ইয়াহিয়া মুজিবের কাছে 'জয়বাংলা'র ব্যাখ্যা জানতে চাইলে, মুজিব বলেন, শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সময়েও তিনি 'জয়বাংলা' উচ্চারণ করবেন।[৪৮]

শেখ মুজিব ইয়াহিয়াকে জানান যে, 'আগে দুই দেশের প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশনে বসবে। তারা দুটি পৃথক খসড়া সংবিধান প্রস্তাব করবে। পরে দুই অঞ্চলের জাতীয় পরিষদ সদস্যরা পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য গ্রহণযোগ্য পৃথক পৃথক শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তাব নিয়ে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে বসে এক ও অভিন্ন একটি সংবিধান রচনা করবে। এ প্রস্তাবে ইয়াহিয়ার দ্বিমত না থাকলেও তার সহযোগী লে. জে. পীরজাদার ঘোরতর আপত্তি থাকায় প্রস্তাবটি ইয়াহিয়া প্রত্যাখ্যান করলেন।

সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চার যুব নেতাদের ডেকে বলেন, 'কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তোরা ঐ হায়নাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবি তো? যুদ্ধের ব্যাপকতা ও নৃশংসতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলেও চার যুবনেতা সেদিন বঙ্গবন্ধুকে আশ্বস্ত করেছিলেন। সেদিন ঐ সমঝোতার পেছনে বা কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবের পেছনে কোনো ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, কৌশল বা গূঢ় রহস্য ছিল তা নিন্দুকের ভাষায় সমালোচনা না করে, সময় ও পরিস্থিতির গুরুত্ব, বাস্তবতা এবং গভীরতা উপলব্ধি করে সবলতা-দুর্বলতা নির্ণয় করতে গবেষকদের জরুরি কাজ বলে মনে করি।

২৩ মার্চ, পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিক দিবসে পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পাকিস্তানের পতাকা' পুড়িয়ে, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে, 'জয়বাংলা বাহিনীর চারটি প্লাটুন মার্চপাস্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকাকে অভিবাদন জানায় এবং পতাকা উত্তোলনের সময় ৭ মি.মি রাইফেল গুলির আওয়াজে পতাকাকে স্বাগত জানানো হয়। পরে 'জয়বাংলা বাহিনী' বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তাঁর হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়। বঙ্গবন্ধুর গাড়ি ও বাসভবনে বাংলাদেশের 'জাতীয় পতাকা' উত্তোলন করা হয়।

মূলত ১ থেকে ২৫ মার্চ '৭১-এর কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। শেখ মুজিব প্রকৃত অর্থে ছিলেন বাংলাদেশের ডিফ্যাক্টো সরকার প্রধান। তার নির্দেশে এবং তার নামেই বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সমাজ, জনগণ ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, মার্চের প্রতিটি ঘটনা ও কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত ছিল 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি এল এফ'। ২৩ মার্চ সম্পর্কে সিদ্দিকি সালিক লিখেছেন, 'আওয়ামী লীগ এই দিনটিকে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করল। তারা পাকিস্তানের পতাকা পোড়ালো, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লো এবং তার কুশপুত্তলিকা দাহ করল। অন্যদিকে তার স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ালো এবং জাঁকজমকের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবির প্রদর্শনী করল। রেডিও এবং টেলিভিশন 'নতুন জাতীয় সঙ্গীত' হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার বাংলা' গানটি বাজালো। এ শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্রদের তামাশা ছিল না। মুজিব নিজেই এর অংশীদার ছিলেন। সকালে তিনি তাঁর বাড়ির ছাদে (ডিফ্যাক্টো প্রেসিডেন্ট ভবন) বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের অনুমতি দেন। বাড়ির সামনে দিয়ে মার্চপাস্ট করে এগিয়ে যাওয়া ছাত্রদের সালাম গ্রহণ করেন। সারাশহর ছেয়ে যায় সবুজ ও লাল সূর্যের বৃত্ত রংয়ের পতাকায়। পাকিস্তানের পতাকা তখন মাত্র দুটি স্থানে দেখা গেলো। একটি উড়ছিল গভর্নর হাউসে ও অন্যটি সামরিক আইন সদর দফতরে।"[৪৯]

স্বাধীনতার বিকল্প পথ

১৯৭০ সালে নির্বাচনে শেখ মুজিব নির্বাচনে বিজয়ী হলেন। জেনারেল মুকিম লিখেছেন, ইসলামাবাদের শাসকচক্র তা ভাবেনি। ফলে, তারা যে চিন্তাভাবনা করে রেখেছিল নির্বাচন-পরবর্তী সময়ের জন্য তা পাল্টাতে হলো। আওয়ামী লীগ কিন্তু সবকিছুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এখানে তিনি একটি তথ্য দিয়েছেন যা কোথাও আগে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়নি। তিনি লিখেছেন, আওয়ামী লীগের সামরিক পরামর্শক কর্নেল ওসমানী একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করেছিলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে। এর তিনটি পর্যায় ছিল, প্রথম পর্যায়ঃ রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া, দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য দূর করা এবং সময়-সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করা। দ্বিতীয় পর্যায়ঃ প্রথম পর্যায় ব্যর্থ হলে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল। এ কারণে বাংলাদেশকে ৬টি সেক্টরে ভাগ করা হলো– ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা; চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা; কুমিল্লা নোয়াখালী ও সিলেট জেলা; খুলনা, যশোর ও বরিশাল জেলা; দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলা এবং রাজশাহী ও পাবনা জেলা। প্রতিটি সেক্টরের জন্য কমান্ডার ঠিক করা হলো। কমান্ডাররা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মারফত কাজ করবেন। কিন্তু লজিস্টি জোগাড়ের ভার থাকবে গণপ্রতিনিধিদের ওপর। তৃতীয় পর্যায়ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় ব্যর্থ হলে জনসাধারণ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার যার জেলার বিপরীতে ভারতীয় ভূখণ্ডে চলে যাবে এবং যাবার সময় পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করবে। বস্তুত দেশ ত্যাগের উদ্দেশ্য হবে, বাংলাদেশ ইস্যুর আন্তর্জাতিকীকরণ। এরপর শুরু হবে প্রতিরোধ ও গেরিলা যুদ্ধ।"

এ ধরনের ইঙ্গিত আরো অনেক করেছেন। আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী মনে করেন, যুদ্ধের জন্য আওয়ামী লীগ প্রস্তুত ছিল না। তারা পাকিস্তানের সঙ্গেই সবসময় থাকতে চেয়েছে। বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু জেনারেল মুকিমের তথ্য মেনে নিলে ঐ সব তত্ত্ব নাকচ হয়ে যায়। তবে মুকিমের তথ্যটি যে ষোল আনাই সঠিক এমনটি নয় এর মধ্যে কষ্ট-কল্পনা রয়েছে।

লে. জে ওয়াসিউদ্দিন এ সময় রাওয়ালপিন্ডিতে অফিসার ক্যুরিয়রের মাধ্যমে একটি সংবাদ পাঠিয়েছিলেন– ১. পাকিস্তানের এক অংশ থেকে অন্য অংশ প্লেন যেতে ভারত বাধা দেবে। ২. ভারত পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করবে যাতে পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তান বড় ধরনের সবাবেশ ঘটাতে না পারে।

ফজল মুকিমকে এসব তথ্য দিয়েছেন তিনজন বাঙালি অফিসার ব্রিগেডিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম আর মজুমদার, লে. কর্নেল এ এস বি ইয়াসিন ও সামছুল হাসান। মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, অন্যদের সম্পর্কে জানি না, তবে এটুকু জানি এম আর মজুমদার শুরু থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন।"[৫০]

ঢাকা এলেন ইয়াহিয়া খান। আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। এ বিবরণগুলো মোটামুটি একই রকম। সিদ্দিকের বইতেও তা পাওয়া যাবে। যেমন, প্রথম দিন আলাপের পরই বিমর্ষ হয়ে গেলেন ইয়াহিয়া। সালিকের মন্তব্য: "Amazingly he had (apparently) failed to see the snake in the grass."

রূপক অর্থে হয়তো এটি ব্যবহৃত কিন্তু 'সাপ' বলতে তো বাঙালিকেই বোঝাচ্ছে। এবং প্রশ্ন উঠতে পারে ইয়াহিয়া যদি এত অবুঝ হন, কিছুই না বোঝেন তা হলে প্রেসিডেন্ট ছিলেন কেন? কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা বৃথা। তারা ইয়াহিয়া, ভুট্টো বা সামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চাশা, দোষ– সেগুলো শুধু আড়াল করতেই চেয়েছেন। তবে মুজিব সম্পর্কে ইয়াহিয়ার যে উক্তি সিদ্দিকি লিখেছেন, সালিকও তাই উল্লেখ করেছেন–"The bastard is not behaving. You get ready." টিক্কা খান উঠে তখনই জিওসিকে জানালেন, সালিকের মতে, সেদিনই সেনা অ্যাকশনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

তিনি লিখেছেন, মার্চের ২৫ তারিখ পর্যন্ত সেনা এসেছে এটি ঠিক নয়।

তার ভাষায়– "I personally know that no additional troops were flown into Dacca from West Pakistan or from within East Pakistan during the twenty-five days of Mujib's de fecto rule." এটি নির্জলা মিথ্যা। অন্যান্য জেনারেলরাই লিখেছেন সিভিল বেশে সেনারা ঢাকা আসছিল। অপারেশন সার্চলাইট, জানাচ্ছেন সালিক, লিখেছেন ফরমান আলী, মার্চের ২০ তারিখ জেনারেল হামিদ ও টিক্কা খান তা দেখে সংশোধন করেন। সেনাকর্মকর্তারা তাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে কী ধরনের উচ্চাশা পোষণ করতেন তা বোঝা যাবে নিম্নোক্ত কথোপকথনে।

পরিকল্পনায় ছিল, বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করা হবে। জেনারেল হামিদ তাতে রাজি নয়, কারণ তাহলে বিশ্বের সেনা বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে।[৫১]

সংশোধিতরূপে বলা হলো, প্যারা মিলিটারিদের নিরস্ত্র করা হবে। পরিকল্পনায় ছিল, আলোচনার সময় যখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আসবে তখন তাদের গ্রেফতার করা হবে। ইয়াহিয়া তাতে রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন, 'গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক হতে চান না।'

সালিক যেহেতু তখন এদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন সেহেতু তার এ বিবরণ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তিনি লিখেছেন সেনা অভিযানের বিপরীতে জেনারেল ওসমানী প্রস্তুতি নিলেন, সেনা কর্মকর্তাদের প্রস্তুত থাকতে বললেন এবং পরিকল্পনা নিলেন তা আংশিক সত্য। এর অন্যতম কারণ তিনি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হবে এ বিষয়ে জানতেন ও তৈরি ছিলেন। এম. আর মজুমদার তিনি ২৪ তারিখে গ্রেফতার হয়ে যান। কারণ, ২৫ মার্চের পর প্রায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি সেনা-অফিসাররা বাধ্য হয়ে 'বিদ্রোহ' করেছে। কেবল ইপিআর বাহিনীর ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম, মেজর খালেদ মোশাররফ, শাফায়েত জামিল এ রকম কয়েকজন অফিসার ব্যতীত কেউই স্বেচ্ছায় প্রথমে যুদ্ধে অংশ নেয়নি। এমন কি জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনা অধিনায়কের হুকুমে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করা সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করতে যান। যখন তার ও তার বাহিনীর উপর আক্রমণ হয়েছে তখন কেবল 'বিদ্রোহ' করেছে।

এয়ার ভাইস মার্শাল আজগার খান লিখেছেন, "মার্চের প্রথম সপ্তাহে আমি ঢাকা গিয়েছিলাম। রওনা হওয়ার আগে ভুট্টোকে জানিয়েছিলাম ঢাকা যাচ্ছি। তিনি আমাকে করাচী হয়ে যেতে বললেন। করাচী গেলাম কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। ঢাকায় মুজিবের সঙ্গে আমার তিনটি মিটিং হয়েছে। মুজিব জানিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চিত যে, ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না এবং পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগ করবেন। তিনি বলছিলেন, পাকিস্তানের জন্য যখন তারা আন্দোলন করেন তখন ভুট্টো-ইয়াহিয়া কোথায় ছিল?" "বাঙালিদের তারা কখনও মানুষ মনে করেনি।" আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন তিনি। "মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তান যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি যাননি। কেন যাননি, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা তাঁর ও তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের ধারণা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান গেলে তাঁকে হত্যা করা হবে। তা হলে ভবিষ্যতটা কী? তিনি বললেন, ইয়াহিয়া খান প্রথমে ঢাকা আসবে, তারপর আসবেন এম. এম আহমদ এবং তারপর ভুট্টো। ইয়াহিয়া খান এরপর সামরিকবাহিনী লেলিয়ে দেবেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। যদি গ্রেফতার করা না হয় তাহলে, পাকিস্তানি বাহিনী অথবা তাঁর লোকেরাই তাঁকে হত্যা করবে। আশ্চর্য নয় কি তিনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই ঘটেছে।"[৫২]

২৪ তারিখে আওয়ামী লীগ পরিষ্কারভাবে সামরিক জান্তাকে বলে দেয় 'কনফেডারেশনের' বদলে পাকিস্তান রাষ্ট্র একটি 'ইউনিয়নে' পরিণত হবে এবং ভুট্টোকে তার পূর্বেকার কথা স্মরণ করে দিয়ে বলেন, 'ইধার হাম, উধার তুম'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভুট্টোকে এ কথাও বলেন যে, 'ওরা প্রথমে আমাকে ধ্বংস করবে তারপর তোমাকে।'

২৫ মার্চ রাতে। অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অপারেশন সার্চ লাইটে লক্ষণীয়ভাবে বলা হয়, আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের কর্মকাণ্ডকে বিদ্রোহ হিসেবে মনে করে তাদের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইপিআর বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হবে। রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের গ্রেফতার করতে হবে। রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে রাত একটায় আক্রমণ চালাতে হবে। মিসেস আনোয়ারা বেগমের বাড়ি ঘেরাও করতে হবে। অপারেশন সার্চ লাইটে যেসব ব্যক্তিদের অবস্থান এবং তাদের গ্রেফতারের জন্য বলা হয়েছিল তারা হলেন, ১. মুজিব ২. নজরুল ইসলাম ৩. তাজউদ্দীন ৪. ওসমানী ৫. সিরাজুল আলম ৬. মান্নান ৭. আতাউর রহমান ৮. প্রফেসর মোজাফফর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯. ওলি আহাদ ১০. মতিয়া চৌধুরী ১১. ব্যারিস্টার মওদুদ ১২. ফাইজুল হক ১৩. তোফায়েল ১৪. এন এ সিদ্দিকী ১৫. রউফ ১৬. মাখন এবং অন্য ছাত্রনেতাদের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মওলানা ভাসানীসহ বামপন্থী কোনো নেতা এই গ্রেফতারের তালিকায় উল্লিখিত ছিল না। ২৬ তারিখে ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী, পাকিস্তানের শত্রু এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য তাকে সামরিক আইনে দণ্ড প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট নিম্নোক্ত কথায় বিষয়টির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন

"এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর উপদেষ্টারা এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে কোনো সমঝোতায় আসবে না বরং কোনোক্রমে আমার কাছ থেকে এমন একটা ঘোষণা প্রকাশ করিয়ে নিতে চান যা কার্যত "জাতীয় পরিষদকে দুইটি পৃথক গণপরিষদে পরিণত করবে, ফেডারেশনের পরিবর্তে একটি কনফেডারেশনের জন্ম দিবে এবং সামরিক আইনের ক্ষমতা বিলোপ করে দেশে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁরা পৃথক 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, তার অর্থই হচ্ছে জাতির পিতা যে অর্থে পাকিস্তান তৈরি করেছিলেন তার সমাপ্তি টানা।"[৫৩]

AMARBOI.COM

টিকা

১. মুনতাসীর মামুন, পাকিস্তানি জেনারেলদের মন বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ। সময় প্রকাশন। ঢাকা
২. তার ভাষায়–"Depoliticization under military rule only added to Islamabad's arrogance, and strengthened its determination to rule without the slightest concession to the opposition from Bengali. It also blinded them to the moral and legal imperative of transferring to the Bengalis a due share of state power commensurate with their numerical strength." ইস্ট পাকিস্তান দি এন্ডগেম: অ্যান অলুকারস জার্নাল ১৯৬৯-১৯৭১, আব্দুল রহমান সিদ্দিকি, করাচী, পৃ-২৫।
৩. সিক্রেট অ্যাফিডেভিট অফ ইয়াহিয়া খান, পৃ-২৩।
৪. লেখকের কাছে প্রতীয়মান হয় মওলানা ভাসানীর এই বক্তব্য ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মনোভাব জানার জন্য। প্রকৃত অর্থে শত বিতর্কের মধ্যে তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতার অগ্রনায়ক।
৫. হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড।
৬. ইস্ট পাকিস্তান দি এন্ডগেম: অ্যান অলুকারস জার্নাল ১৯৬৯-১৯৭১, আব্দুল রহমান সিদ্দিকি, করাচী, পৃ–৩১।
৭. মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, হাসান আব্দুল কাইয়ুম সম্পাদিত, প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ-৫৫, ৫৬।
৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, পৃ-৩৪৫।
৯. ঐ, পৃ-৩৪৭, ৩৪৮।
১০. ঐ, পৃ-৩৪৯, ৩৫০।
১১. ঐ, পৃ-৩৫৫, ৩৫৬।
১২. ঐ, পৃ-৩৩৯, ৩৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩. Witness to Surrender– Siddiq Salik, page-1.
১৪. "I knew that there was a real need for this as Indian agents had implanted a phobia in his mind against the Pakistan Army."
১৫. "I must say that this was not a sincere stand although its logic could not be faulted."
১৬. The Separation of East Pakistan, Hasan Jahir, page-132.
১৭. Bangladesh Revolution and Aftermath, Talukdar Monirujjaman, page-89.
১৮. তার ভাষায়– "East Pakistan was not conquered by the Indian Army. On the otherhadn, it was taken over by the local population with their aid. The triumph of disgusted Pakistan over their own motherland."
১৯. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস, পৃ-৩৯।
২০. ঐ, পৃ-৪০।
২১. ঐ, পৃ-৪১।
২২. ঐ, পৃ৪২।
২৩. পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত হামিদুর রহমান কমিশন পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্বাঞ্চলে কেন পরাজিত হয়েছিল তাদের কার্যক্রম পদক্ষেপ সম্পর্কে ভুট্টো এ তদন্ত কমিটি গঠন করেন।
২৪. "Soldiers like myself sometime cannot see the finer points of political interaction. Frankly, I could not see it at all. May I say that I was dismayed with this attitude."
২৫. মুনতাসীর মামুন, পাকিস্তানি জেনারেলদের মন, পৃষ্ঠা–৪৩৬-৪৩৭।
২৬. সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানের হাইকমান্ড নামে পরিচিত হয়ে উঠেন।
২৭. Witness to surrender–Ibid, page-34.
২৮. The Dawn, 12 March, 71, Karachi.
২৯. Witness to Surrender–Ibid, page-39.
৩০. ঐ, পৃ-৩৬।
৩১. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পাকিস্তান ও দৈনিক পূর্বদেশ, ২ মার্চ ১৯৭১।
৩২. নূর-ই আলম সিদ্দিকি, "পহেলা থেকে পঁচিশে মার্চ", বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা বাংলাদেশে গণহত্যা, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ-১৬।
৩৩. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পাকিস্তান ও দৈনিক পূর্বদেশ, ২ ও ৩ মার্চ ১৯৭১।
৩৪. বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।
৩৫. কাজী আরেফ আহমেদ, বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র, পৃ-৯১, ৯২।
৩৬. "I assure you that your aspirations and commitments to the people can be fully honoured. I have a scheme in mind will more than satisfy your six points. I urge you not to take a hasty decision.
৩৭. Witness to Surrender– I bid, Siddiq Salik, page-52.
৩৮. ঐ, Siddiq Salik, page- 53.
৩৯. জেনারেল ইয়াকুব যেমনটি বলেছেন– "Our success would be our failure. The naked sword of martial law against the 60 million people of East Pakistan, Who had given their verdict in favor of a particular political party, would be suicidal. It would only be taken as an imperial act of revenge against a colony" opined the force commander. Tragedy of Errors, page-163.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪০. Siddiq Salik, Witness to Surrender, Ibid,.

৪১. ঐ, page- 53.

৪২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, (সপ্তম খণ্ড), পৃ-৪০২-৪০৩।

৪৩. "Yahya chose to consult his close aides of the next course of action. A meeting of governors and martial law administrators was held on February 22, at the President's House in Rawalpindi. Chief of the General Staff, Major General Gul Hasan Khan, Director General Inter Services Intelligence Directorate, Major General Muhammad Akber: Chairman National Security Council, Major General Ghulam Umar: Director of Intelligence Bureau Nasser Rizvi: Inespector General of Pollice, and the Principal Staff office, Lieutenant General S.G.M.N Peerzada attended. From Dacca came Governor, Vice Admiral S.M Ahsan: Commander Eastern Command Lieutenant General Sahibzada Yaqub Khan and Deputy Martial Law Administrator (civil affairs) Major General Rao Farman Ali Khan. The Metting began with the usual round of drinks followed by a discussion that would alter the map of the subcontinent once again. The foundation of a new country carved out of Pakistan was laid in the drawing room of the President's House that evening." Tragedy of Errors, East Pakistan crisis, Lt, Gen. (Retd) Kamal Matinuddin, page-161.

৪৪. Martial law "said Shahibzada Yaqub" is exercised through civil agencies. With shortage of troops that would be more so in East Pakistan. The civil administration had changed their loyalties and were now looking towards the rising sun. If their ambitions were suppressed there would certainly be trouble even if there were more forces available to Eastern Command" explained General Yaqub. He continued to emphasise that in the event of a stricter martial law the loyalties of the East Bengal Regiments and the East Pakistan Rifles would be put under severe strain. "One ugly incident could lead to very serious results" warned the head of the forces in East Pakistan Referring to the reaction from across the border sahibzada Yaqub pointed out that the Indian would exploit the situation to the full having already penetrated into the area. An Indian threat in such a situation would be disastrous as Eastern command would be torn between inward deployment to deal with internal security and outward defense to meet the external threat. The general went on to say "with draconian measures and reinforcements from west Pakistan we might, in the short term, retain a degree of control but not be in a position to do so for long"

The main point, however, was what was the effect desired? "If the aim was the integrity of Pakistan then it could hardly be achieved by such

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

measures as a strict application of martial law would mean casualties which in turn would spread hatred and resentment against the armed forces. Thus we would be achieving results quite the opposite of the political aim intended. Even if we succeed in bringing back law and order by force of arms we would have failed in the ultimate objective", said Yaqub. "Our success would be our failure. The naked sword of martial law against the 60 million people of East Pakistan, who had given their verdict in favour of a particular political party, would be suicidal. It would only be taken as an imperial act of revenge against a colony" opined the force commander. Tragedy of Errors, East Pakistan Crisis, Lt. Gen. (Retd) Kamal Matinuddin, page-163.

৪৫. On the night between March 20 and 21, there was a euphoria as all believed that an agreement for the transfer of power had been reached. An unscheduled visit by Mujib and Tajuddin Ahmed to the President's house on March 21, However watered down the optimism when he asked that the establishment of the federal cabinets be deleted from the proclamation. Yahya and his aides took this suggestion by mujib to mean that he was no longer interested in a united Pakistan. Kamal Hussein also had come with a draft which was different to the one which had been hammered out by the two teams a day earlier. Yahya had by now given up all hope for a political solution and was becoming more and more convinced that it was Mujib who is responsible for the impasse. After Mujib left he told General Tikka "The Bastard is not behaving. You get ready" Tragedy of Errors, East Pakistan Crisis, Lt, Gen. (Retd) Kamal matinuddin, page-189.

৪৬. Siddiq Salik, Witness to Surrender, page-62.

৪৭. ২৩ ফেব্রুয়ারিতে অপারেশন ব্লিৎস তৈরি হয়। পাকিস্তানি সেনা কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে শুধুমাত্র রাজনীতিবিদদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার ও কড়াকড়িভাবে সামরিক আইন প্রয়োগের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়েছিল।

৪৮. কাজী আরেফ আহমেদ, বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র, পৃ-১০৬।

৪৯. Siddiq Salik, Witness to Surrender, page-74.

৫০. মুনতাসীর মামুন, পাকিস্তানি জেনারেলদের মন বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ, পৃ-৪৩, ৪৪।

৫১. "It would destroy one of the finest armies in the world"

৫২. আসগর খান, জেনারেল ইন পলিটিকস।

৫৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, (সপ্তম খণ্ড), পৃ-৪১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : আট

শেখ মুজিব প্রথম থেকেই স্বাধীনতা চেয়েছেন

[অষ্টম অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে শেখ মুজিব প্রথম থেকেই যে স্বাধীনতা চেয়েছেন তার বিভিন্ন দিক। এ সম্পর্কে লে. জেনারেল আব্দুল মতিনের তথ্য বহুল 'ট্র্যাজেডি অফ এরোর' বইতে স্পষ্ট করে বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শেখ মুজিব সংগ্রাম শুরু করে ১৯৪৮ সালে থেকেই। এই অধ্যায়ে লেখা হয়েছে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নীতি হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন আজ হোক বা কাল হোক পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে গবেষক লেখক হাসান জহিরের লিখিত মন্তব্য 'অবস্থা এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল যার ফলে দুটি অংশ পৃথক হয়ে যায়'।

৬১ সালে তিনি গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বৈঠক করে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রস্তাব দেন। কমিউনিস্ট পার্টি তার দাবি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে নাকচ করেননি কিন্তু শেখ মুজিবের প্রস্তাব তখন গ্রহণ করেন নি। গোপন বৈঠকে শেখ মুজিবের শেষ কথা ছিল আমার মূল দাবি স্বাধীন পূর্ব বাংলা থেকে আমি সরে আসবো না। ৬৩ সালে লন্ডনে বঙ্গবন্ধু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রস্তাব দেন এবং বলেন এছাড়া বাঙালির মুক্তি নেই।

আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ২৪ অক্টোবর '৬৯ তিনি আবার লন্ডনে যান এবং ভারতের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হলে তিনি ভারতের সহযোগিতা চান। বঙ্গবন্ধু ৭০-এর নির্বাচনের পরপরই তার প্রতিনিধি হিসাবে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য চিত্তরঞ্জন সুতার এমপিকে ভারতে পাঠান। তিনি কোলকাতা রাজেন্দ্র রোডে একটি বাসা ভাড়া করেন। এর পর ডা. আবু হেনাকে পাঠিয়েছিলেন। ২১ জানুয়ারি ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চার যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদকে ডেকে নিয়ে বলেন 'তোমরা চারজন সশস্ত্র যুব শক্তিকে পরিচালনা করবে। তাজউদ্দীন সরকারের দায়িত্ব নেবে।' এ প্রসঙ্গে আই এস আই এর জেনারেল আকবর বলেছেন, আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এরকম একটি রিপোর্ট ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শেখ মুজিব সংগ্রাম শুরু করেন ১৯৪৮ সাল থেকেই।[১]

আব্দুল রহমান সিদ্দিকী তার বইতে অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের শাসকবর্গ ৬০ দশকের শেষের দিক থেকেই বলে আসছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দায় ভার বোঝা হয়ে উঠেছে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেলাই ভালো। কথাটা নতুন নয়। একেবারে প্রথম থেকেই এ ধারণা চলে আসছে। "আমি বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষা

গবেষণা করছি। বলা যায় এতে আমি খুব একটা আনন্দিত নই। আর একটা বড় কথা যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি তাকে দিয়েছিলেন জনাব সোহরাওয়ার্দী, কিরণ শংকর রায় ও এনামুল হাসান খান প্রমুখ। জিন্নাহ এ প্রস্তাবের জবাবে বলেছিলেন, বেশ তো, আমার কোন আপত্তি নেই। আর কলকাতা ছাড়া বাংলা? সে কথা আমি ভাবতেই পারি না। আপনারা তাহলে এগিয়ে যান। তবে হ্যাঁ, সেটি একটি মাত্র শর্তসাপেক্ষে। তা হলো আপনারা কখনো স্বাধীন ভারত ইউনিয়নের অংশ হবেন না। কাজেই ঐ অবধি তিনি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।"[২] কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনায় অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ সম্পর্কে এক অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

গণপরিষদের সদস্য প্রভাষচন্দ্র লাহেড়ী লিখেছেন, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তান সরকারের প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। তিনি মোহাম্মদ জিন্নাহর সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থে পদক্ষেপ নিলেই তা পরিপূর্ণভাবে অসম্মতি জানানো হতো। এমনকি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে বসে দুটি নীতি ফর্মুলেট করেন। '১. শীঘ্রই বা পরে হোক পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং নামমাত্র রুটিন ব্যবস্থা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদার করার প্রয়োজন নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নই হবে বিজ্ঞতার পরিচয়। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এমন কিছু মাথাব্যথার কারণ নেই। ২. মধ্যবিত্ত বিশেষ কর্মকাণ্ড হিন্দু সম্প্রদায় পাকিস্তানের প্রতি কখনো বন্ধুত্ব প্রমাণ করতে পারবে না। সেজন্য সর্বদিক থেকে (পূর্ব পাকিস্তানের) ধীরে ও ক্রমান্বয়ে এগুতে হবে। সেখানে নেতৃবৃন্দ বামপন্থী। অন্যদের নেতা হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু যে কোনো অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা শক্ত হাতে দমন করতে হবে।' প্রভাষচন্দ্র লাহেড়ী একথাগুলো লিখেছেন উপরোক্ত কেন্দ্র মন্ত্রীর কথা থেকে।[৩]

ঢাকা ডিভিশনের কমিশনার ছিলেন সৈয়দ আলমদার রাজা তার লিখিত 'Dacca's debacle' বইতে, পূর্ব পাকিস্তানে থাকাকালীন একজন সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা হিসেবে যা দেখেছেন তা লিখেছেন। তার পর্যবেক্ষণ ছিল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার ফর্মুলাসম্মত না হলে ক্ষমতা ছাড়বেন না। ভুট্টো বিরোধী দলে বসবেন না এবং শেখ মুজিব ছ'দফার প্রশ্নে একচুলও আপোস করবেন না। তিনি আরো লিখেছেন, 'ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে থাকুক সে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। তাদের প্ল্যান ছিল মুজিবের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলা। হাসান জহির অনুরূপভাবে লিখেছেন, 'অবস্থা এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল যার ফলে দুটি অংশ পৃথক হয়ে যায়।[৪] এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, কায়েদে আযম দীর্ঘ দিন জীবিত না থাকার ফলে এবং লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বিষয়টির উপর গুরুত্ব না দেয়ার ফলে বিষয়টি হয়ে দাঁড়িয়েছিল বেঙ্গল ও পাঞ্জাবের মধ্যে আঞ্চলিক 'যুদ্ধ'। পাঞ্জাবী নেতৃত্ব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবির কাছে নতি স্বীকার করেননি। যদিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঙ্গল ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বাঙালির প্রকৃত ও জনপ্রিয় নেতৃত্বকে কেন্দ্র থেকে হটিয়ে দেয়ার ফলে বাঙালিরা হয়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও আস্থাহীন। বাংলায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই শক্তিশালী ছিল। এসঙ্গে যখন সোহরাওয়ার্দীর মতো জনপ্রিয় নেতাকে কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করা হলো না এবং এর ফলে ঘৃণা ও বিভক্তি সৃষ্টি হলো। বাঙালিদের এই ঘৃণা, বঞ্চনা ও অবিশ্বাসকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেন শেখ মুজিব। প্রকৃত অর্থে আহমদ ফজলুর রহমান যেমনটি বলেছিলেন, তার অর্থ দাঁড়ায়, সরাসরি স্বাধীনতা কর্মসূচি পরিবর্তে ছ'দফাকেই স্বাধীনতার মোড়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিহাসে প্রমাণ করেছে বঙ্গবন্ধুর ছ'দফা ছিল প্রকৃত অর্থেই এক'দফা যার অর্থ স্বাধীনতা এবং যিনি তা বিশ্বাস করতেন।

বিশিষ্ট গবেষক আফসান চৌধুরী লিখেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রথম থেকেই আহমেদ ফজলুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, রুহুল কুদ্দুস, নাসির উদ্দীন, কামরুদ্দীন সমন্বয়ে ইনার গ্রুপ গঠনের কথা। আহমেদ ফজলুর রহমান বলেছেন ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান হলো আমরা এটা চাইনি। অর্থাৎ আমরা লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন চেয়েছিলাম। তিনি বলেছেন কিছু কিছু মিটিংয়ে শেখ মুজিব আসতেন। ভারতের সাথে আমি প্রথম যোগাযোগ করেছি। ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন মি. ঘোষ। তার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন। 'আমাদের যে পরিকল্পনা ছিল, সেজন্য দরকার ছিল আর্মস, আর্মস কীভাবে পাওয়া যায়, কার কাছে এ ব্যাপারে আমরা আলোচনা করতাম। শেখ সাহেব সব জানতেন।" সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন শেখ সাহেব অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে, মোজাফফর আহমদ, তোয়াহার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। স্বাধীনতার ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হতো। ইনার গ্রুপের প্রধান সংগঠক মোয়াজ্জেম চৌধুরী সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেছিলেন। মার্শাল ল'-এর মধ্যে আমরা ভারতে যাই। 'ভারত থেকে ফিরে এসে আমরা শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং তাকে বললাম তুমি ইন্ডিয়ায় চলে যাও। ওখান থেকে মুভমেন্ট করো। এখানে তোমাকে অ্যারেস্ট করবে। শেখ মুজিব আমাদের সাথে এগরি করল। তো আমরা ঢাকা থেকে শ্রীমঙ্গল গেলাম। রাতে খুব ঠাণ্ডা ছিল। আমরা ওখানে সাইদুল হাসানের বাসায় থেকে বর্ডার পার হলাম। খুব জঙ্গল ছিল। শেখ মুজিবের সঙ্গে ছিল তারেক চৌধুরী এবং আমীর হোসেন নামে একজন। আমি ওদের প্রায় এক মাইল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। আগরতলা ক্রস করে যখন গেল, তখন ওরা দেখল যে, ওদের যাওয়া সম্পর্কে আগে থেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি। এই দায়িত্ব ছিল নাসের সাহেবের। তিনি তা জানাতে পারেনি। ফলে আগরতলা থেকে শেখ মুজিবকে ফিরে আসতে হয়। ফিরে আসার সময় তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল এবং ফিরে এসেই তিনি ধরা পড়েন। আমাদের প্ল্যান ছিল শেখ মুজিব আগরতলা ক্রস করে দিল্লী যাবেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু আগরতলা থেকেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়। এর পর থেকে শেখ মুজিব ভারতে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মওলানা ভাসানীর ভূমিকা

'আসসালামু আলাইকুম' তথা পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা কাগমারী সম্মেলনেই মওলানা ভাসানী প্রথম বলেননি, এরও আগে ১৯৫৫ সালের ১৭ জুন শুক্রবার ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি একই ভাষায় সতর্কবাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন। তার বক্তব্যটি হলো– 'সে সময় পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচীতে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। এরপর ১৯৫৬ সালের ৭ ও ১৫ জানুয়ারি দুটি জনসভায় একুশ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্রের দাবি জানাতে গিয়েও মওলানা ভাসানী বলেছিলেন: 'নাহলে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা করতে হবে।' প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সে সময় মওলানা ভাসানীকে 'বিদেশের প্রতি অনুগত রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যায়িত করে শাস্তিবিধানের হুমকি দেন। সোহরাওয়ার্দী সেবার কথাটিকে 'ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে' মওলানা ভাসানীর 'বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনা' হিসেবে ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্টকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন: পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতাও অতীতে বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন।[৫]

মওলানা ভাসানী স্বায়ত্তশাসন জমিদারী উচ্ছেদ চুক্তি বাতিল ইত্যাদি দাবি পূরণ না হওয়ায় আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। মওলানা ভাসানীকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য আতাউর রহমান ও শেখ মুজিব অনুরোধ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু মওলানা ভাসানীর অস্বীকৃতি এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তাঁর ক্রমাগত তার চাপের ফলে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে বাধ্য হন। ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক পরিষদে বেসরকারিভাবে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মহিউদ্দিন আহমদ। তার পক্ষে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোজাফফর আহমদ এবং আসহাব উদ্দিন আহমদ। সবাইকে অবাক করে অত্যন্ত জোরালোভাবে এগিয়ে আসেন শেখ মুজিবুর রহমানও। বিরোধিতা তেমন কেউ করেননি। খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রশ্ন ছিল: 'আপনারা একেবারে স্বাধীন হতে চান? বিরোধী দলের নেতা আবু হোসেন সরকারও প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর বিনা বিরোধিতায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহিত হয় যে, মুদ্রা, পররাষ্ট্রনীতি ও দেশরক্ষা বিভাগ কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকি সকল বিষয় পূর্ব বাংলার হাতে প্রদান করতে হবে। প্রস্তাবটি কেন্দ্রকে জানানোর এবং স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য প্রাদেশিক সরকারকেও অনুরোধ করা হয়।[৬]

দেশের চৌহদ্দির বাইরেও এ সময়ে বৈষম্যের প্রশ্নে ব্যাপক তোলপাড় ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

ইংল্যান্ডে অধ্যয়নরত বামপন্থী ছাত্রদের একটি সচেতন গ্রুপ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গঠনের কথা প্রচার করেন। জাকারিয়া চৌধুরী এঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৭ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে ছিলেন। ১৯৬০ সালে সংবাদের তৎকালীন সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী লন্ডন গেলে তাঁরা ব্যাপক আলোচনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এঁদের প্রথম সভায় অংশগ্রহণ করেন শামসুল মোর্শেদ, সালাউদ্দিন আহমেদ ও ড. কবির। পরিকল্পনা মোতাবেক তাঁরা বৈষম্য বিষয়ক একটি বই লেখেন যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম ছিল অসুখী পূর্ব বাংলা। ড. কবির এর মূল বিষয় এবং ড. মনোয়ার হোসেন এর বিভিন্ন ছক ও সূচি তৈরি করেন। উত্তরসূরি নামক সংগঠন থেকে তারা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে প্রচারণা চালান। তাঁরা 'অসুখী পূর্ব বাংলা' শীর্ষক প্রচারপত্রে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দুর্গতির অন্যতম কারণ হলো একনায়ক শাসনের বিরূপতা।[৭]

শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রস্তাব

'৬১ সালের শেষার্ধ থেকে বেআইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয়। সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী এ ব্যাপারে দুই দলের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। আওয়ামী লীগ থেকে শেখ মুজিব ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টি থেকে মণিসিংহ ও খোকা রায় এসব গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনের প্রশ্নে কয়েক দফা কার্যক্রমের একটি খসড়া তাঁরা অনুমোদন করেন। ঠিক হয় যে, আইয়ুবের শাসনতন্ত্র জারি হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের দিয়ে প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত হবে এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেবে। আন্দোলনের রূপরেখা ও কর্মসূচিটি প্রণয়ন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। এতে, ১. পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন, ২. পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসন, ৩. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে সেখানকার জাতিসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসন, ৪. রাজবন্দিরে মুক্তি, ৫. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ৬. শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, ৭. কৃষকের খাজনা-ট্যাক্স হ্রাস, ৮. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন শীর্ষক ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের কথাও বলা হয়েছিল।

বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব কর্মসূচিতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বৈঠকে বলেন, "ওদের সাথে আমাদের আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আন্দোলনের প্রোগ্রামে ঐ দাবি রাখতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে একমত ছিল। তাঁরা মনে করতেন, "এই দাবির মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নটি নিহিত রহিয়াছে' এবং ভবিষ্যতে 'পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা আমরা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না।" কিন্তু বর্তমানে যেভাবে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলার' দাবি উঠিতেছে তাহা রাজনৈতিক দিক হইতে যুক্তিসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য নয়। তাছাড়া, বর্তমানে এইরূপ দাবি উত্থাপন করা আমরা অপরিপক্ক এবং অসময়োচিত মনে করি। বাঙালি ধনিক ও বুদ্ধিজীবীদের পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী উগ্র স্বদেশীপনা এবং একমাত্র নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের দিক হতে এই দাবিটি তুলিতেছেন। তাহারা ইহা অর্জনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তথা সমগ্র পাকিস্তানের জনতার প্রধান শত্রু ও শোষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতার আশা রাখেন। পূর্ব বাংলার জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের গঠনতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের প্রধান শক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইবে এখানকার শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষেরা। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি এখন একটি হঠকারী দাবি, তাই বর্তমানে আমরা পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করিব। কিন্তু যাহার স্বাধীন পূর্ববাংলা দাবি উত্থাপন করিবেন আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকিব। আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে যে, এই দাবির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ রহিয়াছে, যদিও বর্তমান অবস্থায় এই দাবি হঠকারী আমরা এই কথা তাহাদেরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বর্তমানে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন যে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ ইহা বুঝাইতে এখন তাহাদিগকে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি উত্থাপন হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিব।[৮] শেখ মুজিব সভায় বলেন, 'আপনাদের দাবি আমি মানি। কিন্তু আমার মূল দাবি 'স্বাধীন পূর্ববাংলা' থেকে আমি সরে আসব না।'

লন্ডনে শেখ মুজিবের প্রস্তাব

লন্ডনে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবের বাংলার স্বাধীনতা নিয়ে যে আলোচনা হয় তা তুলে ধরেছেন লন্ডনে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালি নূরুল ইসলাম। ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে জুরিখে চিকিৎসারত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক সংক্ষিপ্ত সফরে এলেন লন্ডনে। তখন তিনি সারাপাকিস্তানের জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অবিসংবাদিত নেতা। সে সময় তাঁর সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করার জন্য শেখ সাহেব এলেন লন্ডনে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব কেনসিংটন প্যালেস হোটেলে থাকলেন। শেখ সাহেব থাকলেন মান্নান সাহেবের ২৯ নং সেন্টমেরী এ্যাবোস ট্যারেসে। কয়েকদিন দুই নেতার মধ্যে চলল আলাপ-আলোচনা। এ সমস্ত আলাপে মন্নান সাহেব প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। দীর্ঘ কয়েক বছর রাজনৈতিক পার্টিসমূহকে নিষ্ক্রিয় রাখার পর তখন সবেমাত্র আইয়ুব খান এ সমস্ত পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করার অনুমতি দান করেছেন, তাই শেখ সাহেব আওয়ামী লীগকে পুনর্জীবিত করতে চান। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেন। একদিকে তিনি অসুস্থ, অন্যদিকে তাড়াহুড়া করে কিছু করার তিনি পক্ষপাতী নন। শেখ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বদ্ধপরিকর। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সারা পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনীতির উপর গুরুত্ব দেন। শেখ মুজিব বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতির সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির কোনো মিল নেই, ওদের সাথে কোন গণমুখী সমঝোতা হওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতি হচ্ছে নবাব, নাইট, আমির, উমরাহদের রাজনীতি। সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন রাজনৈতিক চেতনা নেই। পক্ষান্তরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি একেবারে বাংলার সাধারণ মানুষের রাজনীতি। তাই আর দেরি না করে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী তাদের স্বাধিকার আন্দোলনের ডাক দিতে হবে এবং সেই আন্দোলন অচিরেই গণআন্দোলনে পরিণত হবে। এ সমস্ত কথা জোর দিয়ে বলেন শেখ সাহেব। সোহরাওয়ার্দী সাহেব শুধু পূর্ব পাকিস্তানের উপর ভিত্তি করে আন্দোলন শুরু করতে নারাজ। তিনি বললেন, আন্দোলন হবে সারাপাকিস্তানভিত্তিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি করে একদিন মন্নান সাহেবের গ্রীন মাস্ক রেস্টুরেন্টের বেসমেন্টে খাওয়া দাওয়া করতে করতে ওস্তাদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব আর সাগরেদ শেখ সাহেবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে। মন্নান সাহেব পাশে বসে পরিবেশন করছেন খানা-পিনা, এক সময় শেখ সাহেব বেশ জোরেই বলে উঠলেন, স্যার আপনি হউন, আর মওলানা সাহেবই হউন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী, আপনারা কোনো অবস্থাতেই ইস্ট পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারবেন না। কারণ ওয়েস্ট পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তানকে গিলতে বসেছে। ইস্ট পাকিস্তানকে একদিন না একদিন আলাদা হতে হবে। এমনি গর্জে উঠলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব, Don't talk nonsense"! বাজে কথা বলো না। আর অগ্নিশর্মা চোখে চেয়ে রইলেন শেখ সাহেবের দিকে। শেখ সাহেব চুপ করে গেলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তোমাদের কি আছে যে আলাদা হয়ে যাবে। পারবে ওদের সাথে যুদ্ধ করে আলাদা হতে? শতকরা ৯৭টি ভোট পেয়েও দুই মাসের বেশি মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখতে পারলো না ১৯৫৪ সালে। এখন একেবারে আলাদা হয়ে যাবে। আর না হয় আলাদা হয়েই গেলে, তখন তোমার দেশের আর্থিক অবস্থা কি হবে? কোরিয়া বুমতো আর নেই যে পাটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় চালিয়ে দেবে দেশের অর্থনীতি। চলবে কি করে তোমাদের?

এবারে শেখ সাহেব আস্তে আস্তে মাথা তুলে বললেন, স্যার এখনও শতকরা ৯৭-৯৮টি বাঙালি আমাদের ডাকে সাড়া দেবে। তবে সে ডাক হবে স্বাধিকারের ডাক। আর স্বাধিকারের ডাকে দেখা দেবে গণআন্দোলন। আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারলে অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না। বাঁশের লাঠিই হবে যথেষ্ট। মন্নান সাহেবের দিকে তাকিয়ে শেখ সাহেব বলেন, আর স্যার, এই হাজার হাজার প্রবাসী বাঙালি যাদের আপনি পাসপোর্ট দিয়েছেন, যাদের পাসপোর্ট দিয়ে এদেশে পাঠিয়েছেন, তারা জোগাবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা, তারা গড়ে তুলবে বিশ্বজনমত বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবার চুপ করে রইলেন। একটু করে মুচকি হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, তুমি তৈরি করবে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। তারপর মন্নান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি মন্নান মিয়া, কি বলো তুমি? মন্নান সাহেব এমন মারাত্মক প্রশ্নে কি বললেন ভেবে পেলেন না। শুধু বললেন, আপনারা যা বলবেন তাই করব আমরা। আমরা দেশের মানুষের সাথে আছি, স্যার। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বললেন, হুঁ আচ্ছা দেখা যাবে।

সেদিন আলাপ ওখানেই শেষ হয়ে যায়। এরপর আরো কয়েক দফা আলাপ-আলোচনা হয়েছে উভয় নেতার মধ্যে। তারপর সোহরাওয়ার্দী সাহেব অসুস্থতার জন্য ফিরে গেলেন জুরিখে। সেখান থেকে বৈরুতের এক হোটেলে।

এদিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব জুরিখ চলে যাওয়ার পর শেখ সাহেব লন্ডনে থাকলেন আরো কয়েকদিন। সে সময় লন্ডনে 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। তার কথাবার্তায় যথাযথই বুঝতে পারা গেল যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া নিয়ে এখনই আন্দোলন শুরু করতে বদ্ধপরিকর। তবে নেতার (সোহরাওয়ার্দী সাহেবের) কাছ থেকে এ ব্যাপারে যে তিনি অনুমতি পাননি তার জন্য মর্মাহত দেখা গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে ফেরার দিন অনেকের সামনে মন্নান সাহেবকে জড়িয়ে ধরে আবেগময় কণ্ঠে শেখ সাহেব বললেন, "মন্নান সাহেব, শেখ মুজিব আর বাঁচতে চায় না। দেশের মানুষের স্বাধিকার আদায় না করে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এর চাইতে জালেমদের সাথে লড়াই করে মৃত্যুই শ্রেয়। এবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব। হয় তো আইয়ুবশাহীর হাতে মৃত্যু হবে। আমার ছেলেমেয়েদের দিকে একটু নজর রাখবেন।"[৯]

শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেয়া হবে

কর্নেল শওকত লিখেছেন, "১৯ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখের পত্রিকায় উল্লিখিত সংবাদ পড়ে আমার মনের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান[১০] বাঙালির চির আপোসহীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে চূড়ান্তভাবে অপসারণের এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি। কারণ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে পূর্বের চেয়ে স্পষ্টতরভাবে তুলে ধরেছেন। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রচণ্ডভাবে জাগ্রত হয়। বস্তুত বাঙালি জাতির ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য অব্যাহত রাখার আইয়ুব খানের বাসনার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন প্রকৃত বাধা। আইয়ুব খান হয় তো ভেবেছিলেন, মামলার নামের সঙ্গে আগরতলা শব্দটি যুক্ত করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্য অভিযুক্তদের ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে সুবিধা হবে এবং বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটবে। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মামলার অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভারত সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় মূলত ভারত কর্তৃক সরবরাহ করা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ দিয়ে বলপ্রয়োগ এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব থেকে পাকিস্তানকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে। আইয়ুব খানের পরিকল্পনার অবশ্য বিপরীত ফল হয়। প্রকৃতপক্ষে এ মামলাই পরবর্তীকালে তাঁর পতন ডেকে আনে। এ সম্পর্কে তার লিখিত বইটি পাঠ করলে আরো বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।"[১১]

লন্ডনে অবার শেখ মুজিব

এ কথা আজ প্রমাণিত যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে পূর্বেই যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত হয় সে সব দেশের জন্য পার্শ্ববর্তী দেশের সহযোগিতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সে লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের ২৪ অক্টোবর লন্ডন গমন করেন। লন্ডনে তার আগমন ও কার্যক্রম পর্যালোচনায় তিনটি দিক থেকে ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এক. লন্ডনে প্রবাসী বাঙালি, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য, নেতৃবৃন্দ এবং গণমাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ; দুই. যুক্তরাজ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উজ্জীবিত জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাঠামোয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিশালীকরণ; তিন. বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাধা সৃষ্টি করলে বহির্বিশ্বের, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া যাবে কি না তা নিশ্চিত হওয়া। এ সময় ভারত সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কন্যা ও বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঐ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে লন্ডন ছিলেন। এ সম্পর্কে ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের এক সভায় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সম্পর্কে অভিন্ন আরো একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে,

মুক্তিযুদ্ধের যে নেতারা এখনো বেঁচে আছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ সে সময় তাকে জানতেন। চিনতেন। নাম নাথ বাবু। তিনি ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর খুবই ঘনিষ্ঠ। বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য। '৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন আগরতলায় পুলিশের আইজি। তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে আগরতলায় এনে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রনাথ সিংহের সঙ্গে বৈঠক করানোর। তিনি শচীন্দ্রনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী গিয়ে মুজিবের সঙ্গে ভারতের শীর্ষ কর্তাদের একটি বৈঠক করানো হবে। তিনি বৈঠকের স্থান নির্বাচন করেন। সেই সময় লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী। লন্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যান তৎকালীন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনিই প্রথম লন্ডনে গিয়ে দুই নেতার বৈঠক স্থির করেন। স্থান ছিল লন্ডনের সাউদাম্পটন রোয়ে ড. তারাপদ বসুর বাড়িতে। তারাপদ বসু ইন্দিরার স্বামী ফিরোজ গান্ধী ও ইন্দিরার খুবই ঘনিষ্ঠ। ১৯৩৮ সালে তিনি লন্ডনে যান এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি সেই সময় থেকে আমৃত্যু লন্ডনেই কাটিয়েছেন। তার অফিস ছিল ফ্লিট স্ট্রিটের একটি গলিতে। সেই গলির নাম কারমালাই স্ট্রিট। লন্ডনেই তারাপদ বসুর বাড়িতে বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সে বৈঠকেই স্থির হয় পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান বেরিয়ে আসবে। তিনি দুই নেতার দূত হিসেবে কাজ করতেন। দিল্লীর বার্তা ঢাকায় আর ঢাকার বার্তা দিল্লীতে পৌঁছে দিতেন। ষাটের দশকের শেষ দিকে তিনি আগরতলা থেকে কলকাতায় ফিরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর জয়েন্ট ডিরেক্টর হন। তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে আলোচনা করাতে তিনি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা ওনার মৃত্যু রহস্য কি আপনারা জানতেন? সে সময় পত্রিকার পাতায় এ ধরনের ছোট একটি সংবাদ ছাপা হয়েছিল। সুখরঞ্জনগুপ্ত বাবু কর্তৃক এই তথ্যটি প্রদানের ফলে বঙ্গবন্ধু যে সর্বদিক থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সচেষ্ট ছিলেন তা স্পষ্ট হয়। এপ্রিল বা মে মাসে তারাপদ বসু গণভবনে গেলেন। বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কী তারাদা কইছিলাম না দ্যাশ স্বাধীন করুম!''[১২]

১৯৮৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'বঙ্গবন্ধু তাদের বলেছিলেন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে এবং সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে, সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। তিনি একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গাটির নাম রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা, সেখানে চিত্তরঞ্জন সুতার বঙ্গবন্ধুর রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে ছিলেন।' তৎকালিন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, '১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু লন্ডন গিয়েছিলেন। সফরটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক। সেখানে বসে তিনি এই স্বাধীনতার পরিকল্পনা রচনা করেন। পরিকল্পনা অনুসারে কথা ছিল আমরা মাসে পঁচিশজন ছেলে রিক্রুট করব এবং প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের একটি বিশেষ জায়গায় গেলে ট্রেনিং পাবো। আমরা চারজন রিক্রুটমেন্ট শুরু করি– সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও আমি।' তিনি বলেন, 'সত্তরের নির্বাচনের আগেও বঙ্গবন্ধু তার প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। নির্বাচনের পর পাঠান ডাক্তার আবু হেনাকে, প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হয়েছিলেন সিরাজগঞ্জ থেকে। আর আগে যিনি গিয়েছিলেন তিনি আমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। একাত্তরের যুদ্ধ শুরু হবার আগেই এই বাড়িটি নেয়া ছিল।'

টেপকৃত সাক্ষাৎকার ১৪ এপ্রিল ১৯৮৯।

১৯৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিব সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাককে নিয়ে আলোচনায় বসেন। এক পর্যায়ে তিনি শেখ মণি ও তোফায়েলকে সঙ্গে নিয়ে একসাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য কাজ করতে বলেন। সিরাজুল আলম ও আব্দুর রাজ্জাক একমত হলে তিনি শেখ মণি ও তোফায়েলকে ডেকে নেন। আন্দোলনের পূর্বাপর পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য পাকিস্তানি সামরিক শক্তির মোকাবেলার জন্য তাদের প্রস্তুত হতে বলেন। তিনি জঙ্গি কর্মীবাহিনী তৈরি করে লড়াইয়ের উপযুক্ত ছাত্র-যুবশক্তি গড়ার দায়িত্ব দিয়ে বলেন, 'লড়াই ছাড়া পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাঙালিকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। এভাবেই বি.এল.এফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স ও তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চার যুবনেতার নেতৃত্বে যুদ্ধকালীন গঠিত হয় 'মুজিব বাহিনী'।

২১ জানুয়ারি '৭১ শেখ মুজিব চার যুবনেতাদের বলেন, আমি না থাকলেও তাজউদ্দীনকে নিয়ে তোমরা সব ব্যবস্থা করো। তোমাদের জন্য অস্ত্র ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় তিনি চার নেতাকে বলেন, 'তোমরা চারজন সশস্ত্র যুবশক্তিকে পরিচালনা করবে। তাজউদ্দীন প্রবাসী সরকারের দায়িত্ব নেবে।' তিনি 'বিপ্লবী সরকার' গঠনের কথা বার বার বলে দেন। মুজিব ভাইয়ের নির্দেশ ছিল তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল, কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে একসাথে ভারতে গিয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করার। একইভাবে ২২ ফেব্রুয়ারি '৭১ সিরাজুল আলম খান, শেখ মণি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েলকে এবং ৪ রাজনৈতিক নেতাকে কলকাতার একটি ঠিকানা দিয়ে বলেন, 'এ ঠিকানায় গেলেই তোমরা অস্ত্র, ট্রেনিং ও অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা ও 'প্রবাসী সরকার' গঠনের সকল সাহায্য পাবে।

'৭১ সাল। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ। হঠাৎ করেই আব্দুর রাজ্জাকের আগমন। দুপুর হবে হবে। পাবনা জেলায় বেড়া থানা সদরে এসে আমাকে খুঁজে বের করেন। প্রথমে বুঝতে পারিনি কেন এসেছেন। ইছামতি নদী লাগোয়া প্রখ্যাত পাট ব্যবসায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাণ্ডিলাল বাবুর গদিঘর। লোকজন ছুটে এলো। কথা বলেন তাদের সঙ্গে। কথা শেষ করে ঘরের শেষ প্রান্তে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন: জয়পুরহাট, হিলি সীমান্তে যাবো। আমি বুঝে উঠতে পারিনি। হিলি সীমান্ত কেন? বলেন: দেশ স্বাধীন করতে হবে। প্রস্তুতি নিতে হবে। যুদ্ধ করেই আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে। নেতা (বঙ্গবন্ধু) তাই ভাবছেন। অস্ত্র, গোলাবারুদ আসার রুট সরেজমিনে দেখার জন্য গিয়েছিলেন। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে কিছু পিস্তল, একসপ্লেসিভ এলো। রাখা হলো বেড়ার মজিদ মোল্লা ও নগরবাড়ীর বৃন্দাবন বাবুর বাড়িতে।

গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট

আইএসআই প্রধান আকবর ঘোষণা করলেন, মুজিব এবং আওয়ামী লীগ ২৫ তারিখ জিরো আওয়ারে একটি ক্যুর পরিকল্পনা করেছিল। ইবিআর ও ইপিআরের সাহায্যে তারা চট্টগ্রাম বন্দর ও ঢাকা বিমানবন্দর দখল করার পরিকল্পনা করেছিল যাতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্যরা অবতরণ করতে না পারে। আর ভারত তো আছেই। সিদ্দিকি লিখেছেন, 'দি প্রেজেন্ট ক্রাইসিসি ইন পাকিস্তান' নামে সরকারি একটি বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল। আইএসআইয়ের মহাপরিচালকের ও সরকারি এই ভাষ্য হুবহু ছিল প্রায় একই রকম। দুটি অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সিদ্দিকী, যাতে বোঝা যাবে, সামরিক চক্র কীভাবে সবাইকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছিল। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে। ভারত কখনো পাকিস্তানের বাস্তবতাকে মেনে নেয়নি। সরদার বল্লভ ভাইয়ের মতো নেতারা পাকিস্তান ভেঙ্গে পুনরায় অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র গঠন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল আজীবন।[১৩]

সেক্সের জন্য তারা যাবে ঝিলাম?

১ সেপ্টেম্বর ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকি শেষবারের মতো ঢাকায় এলেন। নিয়াজিকে তিনি একইরকম দেখেছিলেন যিনি জওয়ানদের উৎসাহ দিতেন সবরকমের অসৈনিকসুলভ, অমানবিক কর্মকাণ্ডে। গতকালের তোমার স্কোর কি সেরা? প্রশ্ন রাখতেন সৈনিকের কাছে। সিদ্দিকি লেখেননি, কিন্তু শুনেছিলেন, পিআইয়ের এক কর্মকর্তা নিখোঁজ হওয়ার পর তার স্ত্রী স্বামীর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য নিয়াজীর কাছে গিয়েছিলেন এবং নিয়াজী তাকে ধর্ষণ করেছিলেন। সিদ্দিকি জানিয়েছেন, ধর্ষণকে নিয়াজী সমর্থন করেছেন। তার কথা ছিল, "সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে থাকছে, লড়াই করছে, মারা যাচ্ছে আর সেক্সের জন্য কি তারা ঝিলাম যাবে?[১৪] টিক্কা খানের মতো তার বক্তব্য ছিল, প্রতিটি ঘরে পাঞ্জাবী জন্মাবে।

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী জানাচ্ছেন, পীরজাদার সময়ে অপারেশন 'ব্লিৎজ কার্যকর হয়নি কারণ তার আগেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন তিনি ৫ মার্চ। উল্লেখ্য, জেনারেল ইয়াকুব সামরিক সমাধানের ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে পীরজাদাকে তিনি লিখেছিলেন যে, 'পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে এবং এর দায়দায়িত্ব বহন করবে কে?'[১৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ পর্যায়ে নিয়াজী আবার সঠিক তথ্য তুলে ধরছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় মানুষ ও বাঙালি কর্মচারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বাঙালিরা ঘৃণিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের কোনোরকম সাহয্যে না করতে বদ্ধপরিকর ছিল। "নিজের দেশেই আমরা অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম।" লিখেছেন নিয়াজী। ঢাকা ছাড়া দেশের বাকি অংশ ছিল মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে যাদের মনের জোর ছিল আকাশছোঁয়া এবং ছিল উদ্দাম।[১৬] পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্বিচার হত্যা, ধর্ষণে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। যার ভিত্তিভূমি দীর্ঘদিন বহু নেতা সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু নিরবছিন্নভাবে স্বাধীনতার জন্য কারাগারে, ফাঁসির মঞ্চে গিয়েছেন মহামানব শেখ মুজিবুর রহমান।

রাওয়ালপিন্ডি। সেনা সদর দফতর। ১১ ফেব্রুয়ারির গোপন বৈঠকে সামরিক জান্তা পূর্ববাংলায় হামলা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। সামরিক জান্তার ১১ ফেব্রুয়ারির গোপন বৈঠকে জান্তার সদস্যরা ছাড়া বাইরে ছিলেন মাত্র একজন। তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার উপপ্রধান এস. এ সউদ।

এস. এ সউদ হামলা পরিকল্পনাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। হামলা পরিকল্পনার প্রতি তিনি তার বিরক্ত ও অসমর্থনের কথা সেনা-সদর দফতর থেকে ফিরে এসেই প্রকাশ করেন গোয়েন্দা বিভাগের এক উচ্চপদস্থ বাঙালি কর্মকর্তার কাছে। বেলা গড়িয়ে তখন তিনটা। বাঙালি কর্মকর্তা সউদের কথা চুপচাপ শুনে যান কোনো মন্তব্য না করেই। এবং একদিন পর সেনা সদর দফতরে নেয়া জান্তার সিদ্ধান্তের সংবাদ জেনে গেলেন শেখ মুজিব। খবরে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন।

পরদিন সকালে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠতম ইনার সার্কেল এলেন তার ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িতে। শেখ মুজিবকে তখন ঘিরে বসেছিলেন নির্বাচনে বিজয়ী তার দলের নেতা এবং কর্মীরা। শেখ মুজিব ইনার সার্কেলকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে নিয়ে ঢুকলেন পাশের রুমে। এই ইনার সার্কেলটি ছাড়া শেখ মুজিবের ছিল আরো দুটি ইনার সার্কেল। প্রাক্তন সিএসপি রুহুল কুদ্দুস এবং প্রাক্তন সিএসপি আহমদ ফজলুর রহমানের কথা তার পার্টির উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা জানতেন। এই ইনার সার্কেলটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। দ্বিতীয় ইনার সার্কেল গড়ে ওঠে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে আসার পর। এই ইনার সার্কেলটি একক এবং একজন প্রয়াত সিএসপি, যিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তৃতীয় ইনার সার্কেলটি এবং তিনিও ছিলেন একক ব্যক্তি শেখ মুজিবের ছিলেন ঘনিষ্ঠতম। এই ইনার সার্কেলটি অপর দুই ইনার সার্কেলের সকল খবরাখবর রাখতেন। এই ইনার সর্কেল ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ মুজিবের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর রিয়ার এডমিরাল এস. এম আহসান ও পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সঙ্গে দু'দুটো করে মোট চারটে বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। চারটে বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয় গুলশানের একটি বাড়িতে।[১৭] জেনারেল ইয়াকুব শেখ মুজিবকে ওই আশ্বাসবাণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনাতে পেরেছিলেন এই কারণে যে তখনো তিনি জানতেন না ১১ ফেব্রুয়ারির জান্তার গোপন বৈঠকে তাকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। জানতেন না পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় কামণ্ডের অধিনায়ক আর থাকছেন না। অপরদিকে শেখ মুজিব ১১ ফেব্রুয়ারির ষড়যন্ত্রের আভাস দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারিতে বললেন: "ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত করার ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে।"

জেনারেল ইয়াকুবের কথায় শেখ মুজিব তৎক্ষণিকভাবে আশ্বস্ত হলেও দু'দিন পর নিশ্চিত হয়ে যান যে, সামরিক হামলা আসছে। তার 'র' সূত্র তাকে নিশ্চিত করে। এই 'র' সূত্র তার দ্বিতীয় ইনার সার্কেল, যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি আরো নিশ্চিত হয়ে যান ১৭ তারিখে ইয়াহিয়ার নিজের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া।

এবার ভিন্নদিকে মুখ ফেরালেন শেখ মুজিব। চার যুবনেতা সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে ডেকে বললেন, তাদেরকে ভারতে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেখানে তিনি সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাজউদ্দীন আহমদকেও তাদের সঙ্গে নিতে বললেন: "তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে বললেন যে, প্রথম কথা হলো স্বাধীনতার প্রশ্নে সংগ্রাম করতে হবে এবং সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে। আমি তোমাদের জন্যে সে ব্যবস্থা করে রেখেছি–আব্দুর রাজ্জাকের দেয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। এবং শেখ মুজিব চার যুব নেতাকে ভারতে গিয়ে যেখানে উঠতে বলেন, সেটা কোলকাতায় চিত্তরঞ্জন সুতারের নিবাস। আবদুর রাজ্জাক তার সাক্ষাৎকারে বলেন: "সেই জায়গাটা কোলকাতায়। ২১, রাজেন্দ্র রোড, যেখানে চিত্ত সুতার বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিব) প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন।" এখানে উল্লেখ করতেই হয় এবং এ তথ্য সকলের জানা যে, চিত্তরঞ্জন সুতার অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে চলে যান এবং ২১ নম্বর রাজেন্দ্র রোডে গিয়ে খুঁটি গেড়ে বসেন। শেখ মুজিব যেদিন চার যুবনেতাকে ডেকে ভারতে যাওয়ার কথা বলেন– আবদুর রাজ্জাক সে তারিখটি বলেছেন ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭১ কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে বলে প্রায় বিশ বছরের ব্যবধানে সঠিক তারিখটি তিনি নির্দেশ করতে সম্ভবত ভুল করেছেন। তারিখটি হবে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।[১৮]

একই দিনে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) এক প্রচারপত্রে বলে, 'মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন নয়, হরতাল-ধর্মঘট নয়– অস্ত্র হাতে লড়াই করুন। শত শত মানুষ হত্যার বদলা নিন। পূর্ব বাংলা মুক্ত করুন। জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন। ওই একই দিনে অর্থাৎ ৯ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং) "এই মুহূর্তের জরুরি কর্তব্য" বলে উপদেশ দান করে ছয় দফার মাধ্যমে "স্বাধীনতা" অর্জনের আহ্বান জানিয়ে এক প্রচারপত্রে বলেন: "কোন কোন নেতা 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধ্বনি তুলিয়া আজিকার গণসংগ্রামের উদ্দীপনা, সংকল্প ও প্রস্তুতিতে ভাঁটা আনিয়া দিতে চাহিতেছেন। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবিগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান (শেখ মুজিব) উত্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি আদায় করিতে পারিলে "স্বাধীন বাংলা" কায়েমের সংগ্রামে সুবিধা হইবে– ইহা উপলব্ধি করিয়া এই দাবির পেছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং ওই দাবিগুলি পূরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা–ইহা হইল এই মুহূর্তের জরুরি কর্তব্য।"[১৯]

টীকা

১. Mujib is reported to have said after the creation of Pakistan that "he had been working for a separate state of Bangladesh since 1968. In fact the struggle for independence according to him began from 1948. Tragedy of Errors, Page-132.

২. আবদুল রহমান সিদ্দিকি, ইস্ট পাকিস্তান দি এন্ডগেম, পৃ-২৬৬।

৩. The East Pakistan Hindu activist Prabhash C. Lahiry (1964) writes that from his perspective, Chaudhri Muhammad Ali, the first Secretary-Genaral of the Government of Pakistan who was very close to Jinnah, followed a policy whereby East pakistan from the beginning was treated "with caution-Central Minister with whom he, in his own words, " became exceptionally intimate", reports that this minister [most probably Jogendra nath Mandal, then Central Minister for Law who later fled to India] " thoroughly disapproved' but was "help less that Secretary-General Muhammad Ali supported by Prime Minister Liaquat was responsible for formulating the two policies–"(1) Sooner or later, East Pakistan is going to walk out of Pakistan. It is therefore useless straining to develop East Pakistan beyond a nominal routine measure. It would be wiser to develop that West, where necessary and possible without arousing suspicion, at the cost of the east. (2) The minorities particularly those of the middle-classes can never prove friendly to Pakistan. Every means should, therefore, be sought to get of them. But for obvious reasons, the process must be gradual and circumspect. The political leaders have mostly left. Others will find little support if their immediate followers coming from the middle-classes are squeezed out of employment prospects. This should be effectuated in the name of the poorer Muslim Community. This process must be slow, but if there are upheavals in any area on the part of the masses, the forces must not be allowed to get out of control. But no serious notice need be taken of the subsequent hue and cry, not of complaints by the minorities or their representatives." Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh, Page-326.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. Hasan Zaheer's The Separation of East Pakistan: The rise and realization of Bengali Muslim Nationalism, page-xvi.

৫. শাহ্ আহমদ রেজা, ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, পৃ-৭৫।

৬. ঐ, পৃ-৮০-৮১।

৭. আসাদুজ্জামান, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বাংলাদেশেল অভ্যুদয়, পৃ-৪৬।

৮. মোহম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ-৫৪, ৫৫।

৯. নূরুল ইসলাম, প্রবাসীর কথা, পৃ-৯৪৯-৯৫১।

১০. ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে আইয়ুব খান সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। তখন তিনি ছিলেন জেনারেল। কিন্তু দক্ষতা দখলের পর তিনি নিজেকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করেন। যে জেনারেল যুদ্ধের সময় এক বা একাধিক আর্মি সফলতার সঙ্গে কমান্ড করেন, সাধারণত তাঁকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করা হয়। আইয়ুব খানের ফিল্ড মার্শাল হওয়ার বিষয়টি এ রকম মনে হয়েছিল যে জনপ্রতিনিধিদের হাত থেকে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়লাভ করেছিল।

১১. কর্নেল শওকত আলী, সত্য মামলা আগরতলা, পৃ-১৪-১৫।

১২. সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত, বাংলাদেশ প্রতিদিন।

১৩. আবদুল রহমান সিদ্দিকি, ইস্ট পাকিস্তান দি এন্ডগেম, পৃ-২৫০। The Awami League's bid for secession was now under way. the armed forces have made a series of pre-emptive strikes, seized the initiative and saved the country. 2. The root cause of the Indo-Pakistan trouble is that India has never really accepted the fact of Pakistan. Leaders like Sardar Vallabhbhai Patel have been on record esiring the Re-unification of Bharat.

১৪. আবদুল রহমান সিদ্দিকি, ইস্ট পাকিস্তান দি এন্ডগেম, পৃ-২৫২। You can not expect a man to live, fight and die in East Pakistan and go to Jhelum for sex, would you? ঐ, পৃ-৩০৮।

১৬. ঐ, পৃ-৩১২।

১৭. মাসুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, পৃ-৬৬-৬৭।

১৮. ঐ, পৃ-৬৭-৬৮।

১৯. ঐ, পৃ-৭৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায়: নয়

স্বাধীনতা ঘোষণা

[নবম অধ্যায়ে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে যে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতিকে বিভাজিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে শুধুমাত্র তথ্য, উপাত্ত ও প্রকাশিত রিপোর্টিং-এর সূত্র নিয়ে এই অহেতুক বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বলতে চাই এক দশক পর উত্থাপিত এই বিতর্কের উৎস কোথায়? প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের পর পার্লামেন্টে এক শোকসভায় জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ১৯৮১ সালে। উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রি শাহ আজিজুর রহমান। শাহ আজিজুর রহমানের পরিচয় কী? যিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন লক্ষ লক্ষ বাঙালি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছেন, যখন মুক্তিবাহিনী চরম বৈরী অবস্থার ভিতরে মরণপন যুদ্ধে লিপ্ত, বাংলাদেশের স্বাধীনতার লাল সূর্য যখন উষালগ্নে তখন তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক জান্তার পক্ষ হয়ে জাতিসংঘে গমন করেন। এই স্বাধীনতাবিরোধী চিহ্নিত ব্যক্তিকে জিয়াউর রহমান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করার জন্য অত্যন্ত কৌশলে স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে জিয়ার নাম সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন। সেই থেকেই এই বিতর্ক।

বর্তমান অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রেরিত গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট, ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ কর্তৃক লিখিত লিপি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ২৬ তারিখে হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার তথ্য, পাকিস্তানের তৎকালীন পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল টিক্কা খানের সাক্ষাৎকার, পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিকের বক্তব্য এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বিভিন্ন চ্যানেলে প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত বাণী। এগুলো পর্যালোচনা করলে বিতর্কের অবকাশ থাকে না।

প্রকৃতঅর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। ৭ মার্চের পর থেকেই সমগ্র জাতি শত্রুর মোকাবেলার জন্য গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে প্রস্তুত হয়েছিল। পাকিস্তান সামরিক আক্রমণ করার সাথে সাথে জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সংগ্রামী ছাত্র-জনতা ২৫ মার্চ রাত থেকেই প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। কেউ ২৭ মার্চ ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করেনি। যে কোনো গবেষক সঠিকভাবে গবেষণা করলেই এই সত্যটি বেরিয়ে আসবে।]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে কেউ কেউ বিতর্ক উত্থাপনের অপচেষ্টা করেছেন। হতে পারেন তারা বিজ্ঞ, জ্ঞানী, ইতিহাসবিদ। কিংবা কেউ করেছেন তথ্যের অভাবে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে আশা করব এ অধ্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে তা নিরসিত হবে। প্রথমেই আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে একথা পাঠকদের সঙ্গে তুলে ধরতে চাই যারা

বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বা করেননি কিংবা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এসবই ইতিহাস-অন্তর্গত। যা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। এই অধ্যায়ে যে তথ্য তুলে ধরা হবে তাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে তথ্যগত ধারণা পরিদৃষ্ট হবে।

বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও পরবর্তীতে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক কে তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়। স্বাধীনতার দশ বছর পর পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শোক প্রস্তাবে তাকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কাজটি করেছিলেন, যিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে লবি করেছিলেন, চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজুর রহমান– যাকে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। একজন স্বাধীনতাবিরোধী প্রখ্যাত ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে জাতিকে বিভ্রান্ত করবে এটাই স্বাভাবিক। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণাটি তার দলের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে যারা তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাদেরকে দিয়ে না যাওয়াতে যে ফাঁক সৃষ্টি হয় তারই ফলে এই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য অন্বেষার চাইতে, ব্যক্তি, দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। বিএনপি সরকার প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক হিসেবে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়। যদিও জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকতে এই দাবি করেননি। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায়ে (রিট পিটিশন নং ২৫৭৭/২০০৯/ড. এম এ সালাম বনাম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মন্ত্রী পরিষদ সচিব ও অন্যান্য) স্বীকৃত হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যা তৎকালীন ইপিআরের ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়।[১]

সে রাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি প্রথম প্রকাশ করেন লন্ডনভিত্তিক দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ ও সানডে টেলিগ্রাফের সাউথ এশিয়ান করেসপনডেন্ট, নিবেদিত সাংবাদিক ডেভিড লোসাক। সে সময়ের বহুল প্রশংসিত তথ্য সম্বলিত "পাকিস্তান ক্রাইসিস" বইটি তিনি সমাপ্ত করেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১-এ। বইটিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, "শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে। কোনো এক গুপ্ত রেডিও হতে ইথার তরঙ্গে পাকিস্তান রেডিওর কাছাকাছি প্রচারিত হয়েছিল।" পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিকী সালিক তার বহুল আলোচিত 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইতে বঙ্গবন্ধুর এ স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারণা সম্পর্কে উল্লিখিত ডেভিড লোসাকের বইটি হতে উদ্ধৃতি দেন।

টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টের মাধ্যমে ইংরেজিতে রচিত ঘোষণাটি দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। দৈনিক আজাদী পত্রিকা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণাটি পেয়ে যায়। টেলিপ্রিন্টারের পাওয়া ঘোষণাটি, বাংলায় অনুবাদ করে আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র হতে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা আবদুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদান করেন ২৬ মার্চ দুপুরে। দুপুরের প্রথম ঘোষণার পর চট্টগ্রামের কালুরঘাটে বেলাল মোহাম্মদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্র থেকে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে প্রথম ঘোষণাটি পাঠ করেন "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে বলছি।" তার পরপর কয়েকজন স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা ঘোষণা দেন। ২৭ মার্চ বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। অবশ্য ঐ সন্ধ্যায় প্রথমে তিনি নিজেকে অস্থায়ী সরকারের প্রধান হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। তার ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ. আর মল্লিক সাথে সাথে টেলিফোনে জিয়াকে বলেন, এটা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক যুদ্ধ বা বিদ্রোহ নয়। এটা স্বাধীনতা যুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে– তার নামেই আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করছি।[২] এ. কে খানও অনুরূপ মতামত জিয়াকে জানান, বঙ্গবন্ধুর নামে ঘোষণা দিতে। মেজর জিয়া বিষয়টি তাৎক্ষণিক অনুধাবন করে ভাষণটি সংশোধন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষ হতেই স্বাধীনতার ঘোষণা বারবার প্রচারিত হয়। কালুরঘাট থেকে প্রচারিত টেপ এই কথাই রেকর্ড করেছিল। কারণ বঙ্গবন্ধু ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা ও স্বাধীনতার বৈধ ঘোষক। ওয়্যারলেস মারফত যে তিনি সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা পাঠান তাও উল্লিখিত তথ্য হতে জানা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো তিনি কেন দলের নেতৃবৃন্দের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা লিখিত বা টেপ করে দিতে রাজি হননি। দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে ঘোষণা সম্পর্কে পূর্বাভাস পর্যন্ত দেননি বা তাকে এ সম্পর্কে কোনো কিছু জানালেন না। টেপ রেকর্ডারেও কোনো নির্দেশ দিতে রাজি হলেন না। আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবার আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেশবাসী ও বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে দেবার কথা ছিল এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তাতে তিনি সাড়া দিলেন না। ২৫ মার্চ রাতে তাঁর বাসভবনে তাজউদ্দীন আহমদ যে লিখিত স্বাধীনতার ঘোষণা খসড়াটি নিয়ে আসেন তাতেও স্বাক্ষরদানে অপারগতা জানালেন রাষ্ট্রদ্রোহিতা এড়ানোর জন্য। ব্যাপারটি বিস্ময়কর। সারাজীবন যে মানুষটি স্বাধীনতার কথা বলে এসেছেন যথাসময়ে তিনি স্বাধীনতা দেবেন না, বা দেননি এটা অবিশ্বাস্য।

অথচ সে রাতে পাকিস্তান বাহিনী যে ক্র্যাক ডাউন করবে তা তিনি জানতেন। চারদিক থেকেই তখন এ সম্পর্কে ভয়াবহ খবর আসছিল। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলে এই আশঙ্কা প্রায়ই সকলে করছিল। বঙ্গবন্ধুকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বা স্বাধীনতা ঘোষণায় রাজি করাতে না পেরে তাজউদ্দীন আহমেদ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তে ও ভগ্ন হৃদয়ে বাড়ি ফিরেন। 'মুজিব ভাই' ছাড়া তিনিও ঘর থেকে বের হবেন না একথা বলে তিনি সে রাতে বাসায় থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম জোর না করলে এবং তাকে সে রাতে উঠিয়ে না নিলে তাজউদ্দীন আহমেদ বন্দি হতেন বা সম্ভবত নিহত হতেন। ফলে সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধকে ঠেলে দেয়া হতো এক অনিশ্চিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে। সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয় কঠিন ও জটিল হয়ে দাঁড়াত। উল্লেখ্য, গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল পরিকল্পক মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর লেখা বই How Pakistan Got Divided-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়েব সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে এই চরম বাঙালি ও হিন্দু বিদ্বেষী যুদ্ধাপরাধী জেনারেল বঙ্গবন্ধুর যতটা না সমালোচক ছিলেন, তার চাইতেও কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে। তিনিও ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদের প্রধান শত্রু। তাজউদ্দীন আহমদ সে রাতে ধরা পড়লে তাঁকে যে বাঁচিয়ে রাখা হতো না, তা বলা বাহুল্য।[৩]

বঙ্গবন্ধু যে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট ডকুমেন্ট যা দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী হেনরী কিসিঞ্জার নিক্সন বরাবর ২৬ তারিখে একটি মেমোরেন্ডাম পাঠান।[৪]

হেনরি কিসিঞ্জার ২৬ মার্চের বিকল তিনটায় জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে একটি মিটিং আহ্বান করেন। মিটিংয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য অগ্রসর হয়েছে। আমাদের দূতাবাস বিশ্বাস করে সামরিক বাহিনী সম্ভবত অধিকতর শক্তি নিয়ে ঢাকা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থন হবে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তারা এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সমর্থ হবেন না। এজন্য অবিলম্বে আমাদের জন্য দুটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ও বেসরকারি নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং ২. শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা থাকবে কীনা? উক্ত আলোচনা বৈঠকে মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক শান্তিরক্ষা ভূমিকা এবং পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত বন্ধের বিষয়ে আলোচনা হয়, ২. পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেমনভাবে সাড়া দিতে পারে। আমাদের কনসাল জেনারেলকে ওয়াশিংটনে এ ধরনের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ না চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তাদের মতামত ছিল, বিষয়টি হয়তো কয়েকদিনের জন্য অস্পষ্ট থাকবে। যদি সামরিক বাহিনী শহরগুলোতে প্রতিরোধ ভেঙ্গে তারা স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে, অন্যথা আমাদের সম্পর্কে দুই অংশেই সাড়া থাকবে। উক্ত মিটিং হেনরী কিসিঞ্জারের এক প্রশ্নের জবাবে সিআই-এ প্রধান রিচার্ড হেলমস বলেন, 'শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।' হেনরী কিসিঞ্জার তাঁকে বলেন, 'শেখ মুজিব কি জীবিত বা মৃত?' সিআইএ প্রধান বলেন, তিনি বন্দি এবং জীবিত। কিসিঞ্জার হাফ ছেড়ে বলেন, 'জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব আরো ভয়ংকর।'[৫]

অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিন সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরে টহল দিচ্ছিল। সিলোানের পাশ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সে সময় উক্ত নৌবহর থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার মেসেজটি হাই-ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল যা সপ্তম নৌবাহিনীর শক্তিশালী নেটওয়ার্কে ধরা পড়ে। সে সময়ও বিশ্বব্যাপী মার্কিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে তারা তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ওয়্যার মেসেজ রিসিভ করতে সক্ষম ছিল, একথা সিআইএ প্রধান রিচার্ড হেলমস বহু ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর পাঠানো মেসেজটি তারা রিসিভ করেন ২৬ মার্চ ১৪.৩০ মিনিটে। এটি প্রস্তুত করেন মেজর জন. বি. হান্ট এবং প্রকাশ করেন জন. জে. প্যাভেলি। যিনি ইউএস নেভীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। হোয়াইট হাউসের সিসিয়েশন রুম এটি গ্রহণ করে ২৬ তারিখ ৩.৫৫ মিনিটে। রিপোর্টটি ছিল ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি অপারেশনাল ইন্টেলিজেন্স ডিভিটন ডি আই-২, ডি আই এ স্পট রিপোর্ট। বিষয়: সিভিল ওয়ার ইন পাকিস্তান। রেফারেন্স: ১. অদ্য শেখ মুজিবুর রহমান দেশটির দুই অংশের মধ্যে পূর্বাংশকে গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে যখন ঘোষণা করেন তখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে ঢাকাতে এবং দেশটির পূর্বাংশে যেখানে ১০ হাজার আধা-সামরিক বাহিনী পুলিশ ও প্রাইভেট নাগরিকগণ যা সংখ্যা প্রায় ২৩ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু করে। সমুদ্র এবং আকাশ পথে সেনাবাহিনীকে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং ইসলামাবাদের দৃঢ় ইচ্ছা অনুসারে পাকিস্তানের সামরিক আইন শক্তি প্রয়োগে উক্ত পাকিস্তান ইউনিয়নের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। সম্ভবত তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে কারণ তাদের লজেস্টিক সাপোর্টের অসুবিধা রয়েছে কিন্তু তা ব্যাপক জীবননাশ ও ক্ষতিসাধনের পূর্বে নয়। ২. ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছে পাকিস্তানের এই গৃহযুদ্ধ তাদের দিকে টেনে নেবে না। যদিও পূর্ব পাকিস্তান তাদের সাহায্য চায়। কিন্তু তাদের ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে না যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জ্বর তাদের সীমান্ত অতিক্রম করে। ৩. শেখ মুজিবুর রহমান যদি ইচ্ছা করত তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারত কিন্তু পর-রাষ্ট্রের বিষয়ে তার কমই আগ্রহ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের নিষ্ঠুর দমন শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বৈপ্লবিক হুমকির পথে নিয়ে যেতে পারে যা হবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে। এই সংকট ও সমস্যাদি মার্কিনীদের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই দৃশ্যমান হবে এবং উভয়পক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সুবিধা মতো বলিরপাঁঠা হিসেবে দেখবে।

এই রিপোর্টটি তাদের নিজস্ব ১৬টি সংস্থা ছাড়াও কলম্বো, কাবুল, কাঠমন্ডু, ব্যাংকক, রেঙ্গুন, তেহরান, রোম, ম্যানিলা, খার্তুম দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়।[৬]

এই রিপোর্টকে কেউ বানোয়াট বা নিজস্ব ভাষ্য হিসেবে বিবেচনা করলে তা হবে পাগলামির তুল্য। কোনো কোনো গ্রন্থে সে যে কারো লিখিত হোক কিংবা উপসেনাপ্রধান বা সেক্টর কমান্ডার যা-ই লিখুন না কেন, বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এ সম্পর্কে বিতর্কের আর কোনো অবকাশ থাকে না।

বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন আহমদের কাছে তার আগ বাড়ানো চিরকুটে কিছু লেখেননি কিংবা তাদের এ সম্পর্কে রেকর্ড করেননি– তার অর্থ এই নয় যে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা দেননি বা মেসেজ পাঠাননি। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যমতে দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য কমপক্ষে ৪টি ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেল প্রস্তুত করেছিলেন এবং ব্যবহার করেছিলেন। এখানে কয়েকটি চ্যানেল-এর কথা তুলে ধরা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে জড়িত বা সে সম্পর্কে যারা আলোকপাত করতে পারবেন তাদের অনেকে বেঁচে নেই বা ইতিহাসে তাদের নাম ও কর্ম উল্লিখিত হয়নি। আওয়ামী লীগ দলের নেতৃবৃন্দের অগোচরে বঙ্গবন্ধু প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তার প্রমাণ হলো শহীদ ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হককে তিনি ট্রান্সমিটার জোগাড় করতে বলেছিলেন। ট্রান্সমিটার বানানোর পারদর্শিতার জন্য পাকিস্তান সরকার তাকে তমঘা-এ-ইমতিয়াজ খেতাবে ভূষিত করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি খুলনা থেকে ট্রান্সমিটার এনেছিলেন এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের কাছে সে বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন ২৫ মার্চ মধ্যাহ্নে। পাকিস্তান আর্মি ২৯ মার্চ সকালে নূরুল হককে তাঁর মহাখালির ওয়্যারলেস কলোনির বাসভবন হতে চিরতরে তুলে নিয়ে যায়। তারা তাঁর পুরো বাড়ি সার্চ করে ট্রান্সমিটারের সন্ধানে স্বাধীনতার ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশরূপে উল্লেখ করেন, তা আগেই রেকর্ড করা ছিল বলে সাংবাদিক লোসাক মনে করেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন (২৫ ও ২৬ এপ্রিল ২০১৪) যে বঙ্গবন্ধুর মতোই ভরাট গলার অধিকারী ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হক হয়তো বঙ্গবন্ধুর হয়ে রেডিওতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, যা অসম্ভব নয়।[৭] কিন্তু টিক্কা খান বলেছেন, স্বাধীনতা ঘোষণার কণ্ঠস্বর ছিল বঙ্গবন্ধুর যা তিনি ভালোভাবেই জানেন।

খ. লেখক স্বয়ং হাজী গোলাম মোরশেদের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছিলেন ১৯৯২ সালে মার্চ মাসে। তিনি পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন। সেদিন তিনি যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন ২৫ মার্চ রাত ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে একটি টেলিফোন আসে। ফোন কলটি রিসিভ করেন তাঁর পার্সোনাল এইড হাজী গোলাম মোরশেদ। বঙ্গবন্ধুর সাথে সে রাতে তিনিও গ্রেফতার হন এবং পাকিস্তান আর্মি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। ফোন কলটি ছিল এরূপ– বলদা গার্ডেন থেকে বলছি। মেসেজ পাঠানো হয়ে গিয়েছে, মেশিন নিয়ে কী করব?' বঙ্গবন্ধু হাজী গোলাম মোরশেদের মাধ্যমে উত্তর দিলেন, 'মেশিনটা ভেঙ্গে চলে যেতে বল।'[৮]

গ. আহমেদ সেলিম রচিত 'Blood Beaten Track" পুস্তকে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে তিনি নিম্নলিখিত ঘটনা বর্ণনা করেন:

এক সাংবাদিক টিক্কা খানকে জিজ্ঞাস করেছিলেন, "আপনি শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করেছিলেন কেন?" টিক্কা খান জবাব দিয়েছিলেন, "আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি তিন ব্যান্ড রেডিও নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলেছিল, 'স্যার শুনুন। শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন এবং আমি নিজে রেডিওর এক বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে সেই স্বাধীনতার ঘোষণা শুনি। আমি তার কণ্ঠস্বর চিনি। তাই তাঁকে গ্রেফতার করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।"

প্রায় একই রকম ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করেন মুসা সাদিক তার লিখিত 'মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম' পুস্তকে। ১৯৮৮ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সার্ক রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে তিনি তখন সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সাথে

ইসলামাবাদে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে তিনি জেনারেল টিক্কা খানের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তার নিম্নলিখিত প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নরূপ।

প্রশ্ন: স্যার আপনি কেন ধানমণ্ডির বাসা থেকে ২৬ মার্চ শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করেছিলেন?

উত্তর: জেনারেল টিক্কা: "মেরে কডনে দেড়াতে হুয়ে এক থ্রি ব্যান্ড রেডিও লা কর দিয়া আওর কাঁহা স্যার, সুনিয়ে, শেখ সাব আজাদী কা এলান কর রাহে হেঁয়। আওর মাইনে খোদ শেখ সাব কো রেডিও পর এক ফ্রিকোয়েন্সীছে Independence কা এলান করতে হুয়া সুনা। জিসকো বাগাওয়াত কাঁহা যা সেকতা হেঁয়। চুঁকে ম্যাঁয়ে শেখ সাব কি আওয়াজ আচিছ তেরা পেহছান তা থা। And I had no option but to arrest him" (আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি থ্রি ব্যান্ড রেডিও এনে বললো স্যার শুনুন, শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন। আমি নিজে রেডিওতে শেখ সাহেবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুনলাম, কারণ শেখ সাহেবের কণ্ঠস্বর আমি ভালো করেই চিনতাম। যে ঘোষণা তখন দেশদ্রোহিতার শামিল ছিল। সেক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করা ছাড়া আমার আর কোনো বিকল্প ছিল না।)"[৯]

ঘ. সিদ্দিকি সালিক তার বইতে লিখেছেন, ২৬ মার্চ নরকের দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন প্রথম গুলির শব্দ শোনা গেল তখন রেডিও পাকিস্তানের ওয়েব লেন্থের কাছাকাছি শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল। এটা যথাযথ হতে পারে এবং মনে হলো এটি একটি পূর্ব রেকর্ড করা মেসেজ। যেখানে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।[১০] সিদ্দিকি সালিক আরো লিখেছেন, ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you are and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'[১১]

ঙ. বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাংবাদিক আতাউস সামাদ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "২৫ মার্চ রাত পাকিস্তান আর্মি আক্রমণের যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে সেই সংবাদ দেয়ার জন্য তিনি ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে দেখা করতে যান। এর আগেই তিনি সাংবাদিক হিসেবে জানতেন ভুট্টো সাহেব বলেছেন, 'তুম উধার ম্যায় ইধার' তখনই শেখ সাহেব পরিষ্কার হয়ে গেছেন সংগ্রাম করেই অধিকার আদায় করতে হবে। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। সেজন্য শেখ সাহেব বললেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো' ঘটনাটি প্ল্যান মতোই অগ্রসর হল। যে কারণে চট্টগ্রাম, যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া দেশের সর্বত্র স্থানীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে ও সহযোগিতায় যে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে উঠেছিল সামরিক বাহিনীর লোকজন তাদের সাহায্য নিয়ে প্রতি আক্রমণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহণ করেন। আতাউস সামাদ এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন, 'আপনি একটা কিছু করুন। 'আমি যখন ঘুরছি দরজার দিকে, তখন উনি আমার দিকে ফিরে মাথা নিচু করে, উনি তো বেশ লম্বা ছিলেন, তাই আমার দিকে মাথা নিচু করে বললেন, যাতে আমি শুনতে পাই। বললেন, "আই হ্যাভ গিভেন ইউ ইনডিপেনডেন্স। নাউ গো অ্যান্ড প্রিজার্ভ ইট।" আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি, এখন যাও সেটা রক্ষা করো।"'[১২]

এই কথাটির মধ্যে ব্যাপক তাৎপর্য ছিল। যারা বলেন, বঙ্গবন্ধু কাগজের টুকরায় স্বাধীনতার কথা লেখেননি তাদের উপলব্ধি করা উচিত নিশ্চয়ই পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এমন একটি ব্যবস্থা করেছিলেন যার মাধ্যমে যথাসময়ে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হবে। আতাউস সামাদ দেখা করেছিলেন রাত আটটায়। রাত আটটায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। তাহলে তিনি কি করে বললেন, আমি স্বাধীনতা দিচ্ছি তোমরা তা রক্ষা করো। এ কথার অর্থ হলো এই যে, স্বাধীনতা ঘোষণা তিনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চ্যানেলে আগেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এবং এমনও হতে পারে যেমনটি টিক্কা খান বলেছেন বা সিদ্দিকি সালিক বলেছেন, পূর্বেই টেপ করেছিলেন।

চ. বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছেন, তিনি চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতারা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত হন[১৩] এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত সশস্ত্র বাহিনীর কাছে তা পৌঁছে দেন। ঢাকার ইপিআর পিলখানা তখন বেলুচ রেজিমেন্ট দখল করে নিয়েছে। পিলখানার ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠানোর যে পরিকল্পনা ছিল তা বাতিল হয়ে যায়। সেজন্য তিনি চট্টগ্রামে ঘোষণাটি প্রেরণ করেন। এটার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন ড. মঞ্জুলা আনোয়ার।[১৪] তিনি একজন ছাত্রকে দিয়ে ঘোষণাটি প্রচার করার জন্য আগ্রাবাদ রেডিও স্টেশনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি পায়নি। পরবর্তীতে আগ্রাবাদ থেকে প্রথম বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান। কালুরঘাট বেতার থেকে ২৬ মার্চ আবুল কাশেম সন্দীপ, যিনি ফটিকছড়ি কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন। তিনি প্রথমবার পাঠ করেন ৭টা ৩০ মিনিটে এবং দ্বিতীয়বার পাঠ করেন ৭টা ৪৫ মিনিটে। অবশ্য আব্দুল হান্নান পাঠ করেছিলেন বেলা ২টার সময়।

জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন ২৭ মার্চ ৭.৪৫ মিনিটে।[১৫] কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রের সম্প্রচার ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সম্প্রতি তথ্যে দেখা যাচ্ছে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করা একটি জাপানী জাহাজ ধারণ করে এবং পরবর্তীতে রেডিও অস্ট্রেলিয়া থেকে তা প্রচার করা হয় এবং তারপরে বিবিসি লন্ডন থেকে প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে জার্মান রেডিওর সঙ্গে জিয়াউর রহমান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'তিনি ২৭ তারিখে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেছিলেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেই সংকটময় দিনে পাঁচ দিন পর্যন্ত সম্প্রচার চালু ছিল।

বর্তমান জরিপে দেখা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সারাবিশ্বে সম্প্রচারিত হয় এবং বঙ্গবন্ধুর অরিজিনাল মেসেজটি কলকাতায় ধারণ করা হয় যা কালুরঘাট থেকে ২৬ মার্চ প্রচারিত করা হয়েছিল। প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকাগুলো পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, কীভাবে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল এবং তা কীভাবে বিশ্বের গণমাধ্যমে রিপোর্ট হয়েছিল।[১৬]

স্বাধীনতার প্রশ্নে জেনারেল ইয়াহিয়া খান

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ পরিকল্পনা করেছিল চট্টগ্রাম বন্দর ও ঢাকা বিমানবন্দর দখল করে আমাকে ও আমার সহকর্মীদের গ্রেফতার করবে যা আজ প্রমাণিত। কিন্তু শেখ মুজিব জানতেন না পাকিস্তান সেনাবাহিনী অত্যন্ত ক্ষীপ্র গতিতে অভিযান চালাতে সক্ষম।[১৭] ইয়াহিয়া খান বলেন, "তিনি শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এতে আগ্রহী ছিলেন না। শেখ মুজিব দুটি পার্লামেন্ট, দুটি সংবিধান ও ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। শেখ মুজিব তাকে বলেন, তাঁর হাতে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা দিতে হবে যাতে পূর্বাংশের বিচ্ছিন্নতাকে তিনি বৈধতা দান করতে পারেন। যখন এটা করতে ব্যর্থ হলেন তখন তিনি ভায়োলেন্সে চলে গেলেন যা আমি বাধাগ্রস্ত করি। আমি যখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত নেতাদের শেখ মুজিবকে অখণ্ড পাকিস্তানের আওতায় পার্লামেন্টে কাজ করার প্রস্তাব দিয়ে তাদেরকে শেখ মুজিবের কাছে পাঠাই, শেখ মুজিব তাদের নিরাশ করেন। তারা ব্যর্থ হয়ে চলে আসেন।[১৮]

ইয়াহিয়া খানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের আওতায় থাকতে ইচ্ছুক না এবং অখণ্ড পাকিস্তানকে ভাঙার জন্য উগ্রপন্থীরা তৎপর হয়ে উঠেছে সেক্ষেত্রে আমাকেই শক্তি প্রয়োগের দিকেই অগ্রসর হতে হয়। বহুদিন থেকেই আওয়ামী লীগ প্রত্যেকটি এলাকায় ট্রেনিং শুরু করেছিল, সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছিল, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছিল এবং বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে তা মজুদ করছিল। জগন্নাথ হলে মর্টার ও রিকোয়েললেস রাইফেল জমা করেছিল। ২৫ মার্চ রাতে যা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। রাস্তায় ব্যারিকেড সরাতে ৩ ঘন্টা সময় লেগেছিল। এগুলো সবই ছিল পরিকল্পিত। আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট কায়দায় আক্রমণ করে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল এবং প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর ছিল যা আজ পরিষ্কার। সকল তথ্য উপাত্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ২৬ মার্চ জিরো আওয়ারে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করবে। প্রথমেই চট্টগ্রাম ও ঢাকা দখলে নেবে। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে ১৬ ব্যাটেলিয়ান সৈন্যের মধ্যে ১২ ব্যাটেলিয়ান ছিল। যার অধিকাংশই ভারতের অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। ইপিআর, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও সহায়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিগুলো মর্টার, রিকোয়েললেস রাইফেলস ও ভারি এবং হালকা মেশিনগান নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে যখন সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেল তখন সেনাবাহিনীকে তিনি তাদের কর্তব্য পালনে নির্দেশ দেন এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃ–প্রতিষ্ঠার আদেশ জারি করেন।[১৯]

ইয়াহিয়া খানকে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন, বর্তমান সংকট আজ হোক বা কাল হোক অখণ্ড বাংলাদেশের দিকে চলে যাবে কিনা? তার উত্তরে ইয়াহিয়া বলেন, "তারা দুইবার গণরায় দিয়েছে, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের সময় বাংলা ভাগ হয়েছে এবং হিন্দুদের শোষণ থেকে অব্যাহতির জন্য ১৯৪৭ সালে প্রতিনিধি নির্বাচন করে ভারত বিভক্ত করেছে।[২০] ইয়াহিয়া খানের এই উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল এবছর তারা আর একবার বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য একটি সূত্র বলছে, বঙ্গবন্ধু একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন করে গণমাধ্যমে ভাষণ দিয়েছেন।[২১]

২৬ তারিখের মার্কিন গোপন নথি থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সৈন্য সংখ্যা বন্দর ও বিমানে সৈন্য প্রেরণ ও বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা সম্পর্কে যে তথ্য লিখিত আছে তা থেকে অবগত হওয়া যায়।[২২] বাঙালি সশস্ত্রবাহিনী ও জনগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। যদিও সম্মুখ যুদ্ধে পেরে উঠছিল না। তবে তাদের প্রেরণা জোগাচ্ছে শেখ মুজিব।

AMARBOI.COM

জিয়াউর রহমানের বিদ্রোহ

চট্টগ্রামে যুদ্ধরত ইপিআর ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামকে ২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে এসে ভাষণ দেয়ার জন্য অনেকেই অনুরোধ করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি যুদ্ধ কমান্ডে ছিলেন সেহেতু তিনি রণাঙ্গন ফেলে কালুরঘাটে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। বেতার কর্মীদের ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে গমন করেন। প্রথম ভাষণে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ও সর্বাধিনায়ক উল্লেখ করে যে ঐতিহাসিক মহাভ্রান্তি করেছিলেন, পরক্ষণেই তিনি তা শুধরে নেন এবং মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। জিয়ার প্রথম ভাষণটি দ্রুত পরিবর্তন করে দ্বিতীয় ভাষণটি শুদ্ধরূপে দেয়ার ফলে ঐতিহাসিকভাবে কয়েকটি বিষয় থেকে জাতি নিষ্কৃতি পায়। সচেতন পাঠক মাত্রই অবগত আছেন ৭০ সালে নাইজেরিয়ার একটি প্রদেশ বায়াফ্রাকে স্বাধীন করার জন্য জেনারেল ওজুকু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জেনারেল ওজুকু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণাকে 'বিদ্রোহ' হিসেবে আখ্যায়িত করে কেন্দ্রীয় সরকার জেনারেল প্রেসিডেন্ট গাউন কঠোর হস্তে তা দমন করেন। এ সময় বায়াফ্রার বিদ্রোহী নেতা ওজুকু প্রতিবেশী দেশ আইভরিকোস্টে আশ্রয় নেন এই ভেবে যে সেখান থেকে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। কিন্তু পরবর্তীতে আইভরিকোস্টের সরকার তাকে এই শর্তে আশ্রয় দেয় যে, তিনি সেখান থেকে কোনো সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবেন না। এ সময় বায়াফ্রায় অবস্থানরত বিদ্রোহীরা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, লুটতরাজে লিপ্ত হয়। বিদ্রোহে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ লাখ লোক নিহত হয়। চারদিকে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এটা ছিল 'সেনা-বিদ্রোহ'। সেজন্য পৃথিবীর কোনো দেশ তাদের সহযোগিতা করেননি।[২৩]

জিয়াউর রহমান 'সেনাবিদ্রোহ'-এর ঘোষণা দিয়েছিলেন। যার পরিণতি দাঁড়াত ইতিহাস নির্ধারিত বায়াফ্রার মতো। জিয়াউর রহমান নিজেই বলেছেন সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে যাওয়ার পথে যখন জানতে পারলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সশস্ত্রবাহিনীকে আক্রমণ করেছে এবং তাকেও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং ই পি আর সি-তে ব্যাপক বাঙালি সৈন্যদের হত্যা করেছে তখন তিনি তার অধিনায়ক রশিদ জানজুয়াকে বন্দি করেন। এবং তাকে হত্যা করেন। ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা সদস্যদের মার্চ-এপ্রিল মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলির নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের হাতে তেমন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তাদের একটি বিরাট অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করে। আধুনিক, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও জনবলের অপ্রতুলতা এই ইউনিটের পক্ষে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছিল কঠিন। ফলে পাক বাহিনীর হামলার আশংকায় জিয়াউর রহমান ২৬ মার্চ সকাল সাতটায় তার সঙ্গে থাকা মাত্র দু'শর মতো সৈন্য নিয়ে পটিয়ায় গমন করেন এবং ঐ সময় ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন রফিকের ভাষ্যমতে জানা যায়, জিয়াউর রহমান ঐ সময় চট্টগ্রাম থেকে রিট্রিট না করে তার সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করলে বাংলাদেশের যুদ্ধ-ইতিহাসের চিত্র হতো ভিন্ন।

পরের দিন ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ও বেতার কর্মীদের অনুরোধে কালুরঘাট বেতারে এসে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণাকে যারা অস্বীকার করতে চাই তাদের একটি কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, যদিও তার ভাষণ দেবার বৈধ অধিকার ছিল না তবুও বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তার স্বাধীনতা ঘোষণাটিতে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সে কথাটি স্পষ্টভাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে এবং থাকবে। জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো সাংবিধানিক, আইনিক বৈধতা ছিল না ঠিক কিন্তু ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় এক বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তার স্বাধীনতা ঘোষণা ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্টতায় সংলগ্ন রয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মহান মুক্তিযুদ্ধে কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আগে তেমন কেউ স্বউদ্যোগে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। যখন আক্রান্ত হয়েছেন কেবল তখন মাত্র তারা বিদ্রোহ করেছেন।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ২৬ মার্চ পেয়েছিলেন তেমনি ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ অনুরূপ একটি ঘোষণার কথা দীর্ঘ ২৫ বছর পর হলেও স্বহস্তে স্বাক্ষরিত একটি লিপিতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকা

১. হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। রায়টি দিয়েছিলেন ২১ জুন ২০০৯ সালে বিচারপতি এ.বি.এম খায়রুল হক ও বিচারপতি জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমেদ।

২. লেখকের সঙ্গে ড. এ. আর মল্লিকের কথোপকথন।

৩. আলোচনায় চূড়ান্ত পর্যায়ে তাজউদ্দীন আহমেদ সামরিক জান্তার পক্ষে যারা আলোচনায় অংশ নেন, তাদের দৃঢ়তার সঙ্গে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। সামরিক জান্তা মনে করতেন বঙ্গবন্ধুর চেয়ে তাজউদ্দীন পাকিস্তান বিরোধী এবং বাম ঘেঁষা নেতা। শারমিন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা, পৃ-১৪৭-১৪৯।

৪. স্থান: ওয়াশিংটন। সূত্র: ন্যাশনাল আরকাইভস, নিক্সন প্রেসিডেন্সিয়াল ম্যাটেরিয়ালস, এন.এস.সি ফাইলস, বক্স-৬২৫, কান্ট্রি ফাইলস, মিডিলিস্ট, পাকিস্তান, ভলিউম ৪, পহেলা মার্চ ৭১- ১৫। সিক্রেট: নডিস। সেন্ট ফর এ ইনফরমেশন। এ হ্যান্ড রিটেন নোটেশন অন দি মেমোরেনডাম ইনডিকেটস দি প্রেসিডেন্ট সোইট।

৫. Minutes of Washington Special Actions Group Metting, Washington, March 26, 1971, 3:03-3:32 pm. দ্রষ্টব্য। উক্ত মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন হেনরি এ কিসিঞ্জার এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার সম্পর্কে উক্ত মিটিংয়ে রিপোর্ট করেন সি আই এর মি, রিচার্ড হেলমস।

৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, ডি আই-২, ডি আই এ স্পট রিপোর্ট। তারিখ: ২৬ মার্চ ৭১। বিষয়: সিভিল ওয়ার ইন পাকিস্তান।

৭. তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা, শারমিন আহমদ, পৃ-১৪৭-১৪৯।

৮. হাজী গোলাম মুর্শেদ পরবর্তীকালে এরশাদ আমলে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করেন।

৯. সাবেক সচিব, মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট লেখক। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়, পৃ-২১৩-২১৪।

১০. David Loshak, Pakistan Crisis, London p-98-99.

১১. Bangladesh documents, vol-1, p-286.

১২. বাংলাদেশ ৭১, আফসান চৌধুরী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ-৩৫০।

১৩. ওয়ারলেস অপারেটারগণ অনেকেই ছিলেন বাঙালি। তাদের মধ্যে নাম উল্লেখ করা যায়।

১৪. The declaration of independence was proclaimed on 26 March 1971 during the beginning of the Bangladesh Liberation War, as the Pakistan Army launched military operations against the people of East Pakistan. The declaration was issued by Sheikh Mujibur Rahman on midnight 26 March, prior to his arrest by the Pakistan Army. Mujib's proclamation was relayed to Bengali nationalist forces in Chittagong via wireless telegrams. Between 26 and 27 March, Awami League leader M A Hannan and Major Ziaur Rahman, the commander of the defecting East Bengal Regiment of the Pakistan Army, broadcast the declaration on the Free Bengal Radio Station in Chittagong. Zia's double-announcements, on behalf of Mujib, were transmitted by foreign ships in Chittagong Port to international media outlets around the world, as news of Bangladesh's independence

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

spread across the globe. A telegram containing the text of Sheikh Mujib's message reached the Mukti Bahini in Chittagong. The message was translated to Bengali by Dr. Manjula Anwar. The students failed to secure permission from higher authorities to broadcast the message from the nearby Agrabad Station of Radio Pakistan. They crossed Kalurghat Bridge into an area controlled by an East Bengal Regiment under Major Ziaur Rahman. Bengali soldiers guarded the station as engineers prepared for transmission. M.A. Hannan, a local Awami League leader and Abul Kashem Sandeep, Vice President of Fatiksori College declared independence of Bangladesh on behalf of Sheikh Mujib respectively at 2 PM and 7:30 PM on March 26.[6] At 7:45 PM on 27 March 1971, Major Ziaur Rahman broadcast announcement of the declaration of independence on behalf of Sheikh Mujibur Rahman.

১৫. This is the Free Bengal Radio Station. I, Major Ziaur Rahman, at the direction of our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, do hereby declare that the independent People's Republic of Bangladesh has been established. At his direction, In the name of Sheikh Mujibur Rahman, I call upon all Bengalees to rise up against the attack of the West Pakistani Army. We shall fight to the last to free our motherland. Victory is, by the Grace of Allah, ours. Joy Bangla!

The Kalurghat Radio Station's transmission capability was limited, but the message was picked up by a Japanese ship anchored in Chittagong port. It was then re-transmitted by Radio Australia[11][page needed] and later by the British Broadcasting Corporation.

১৬. March 26, 1971: The declaration from Kalurghat. a survey of leading English Languae newspapers from around the flashed around the world on news wires on the evening of March 26, 1971. World shows that the world came to know about the independence of Bangladesh from Sheikh Mujibur Rahman's original message received in Calcutta on the morning of March 26 and from broadcasts from Swadhin Bangla Betar Kendro on the evening of March 26. The following English newspapers were surveyed to examine how Bangladesh's declaration of independence was reported in the world press in March, 1971: The Statesman and The Times of India from India; Buenos Aires Herald from Argentina: The Age, The Sydney Morning Herald from Australia; The Guardian from Burma; The Globe and Mail from Canada; Hongkong Standard from Hongkong; The Jakarta Times from Indonesia; Asahi Evening News from Japan; The Rising Nepal from Nepal; The Manila Times from the Philippines; The Straits Times from Singapure; the Pretoria News from South Africa; The Bangkok Post from Thailand; The Daily Telegraph, The Guradian; The Times of London from the United Kingdom; and Baltimore Sun, The Boston Globe, Chicago Tribune, Christian Science Monitor, Los Angeles Times, The New Work Times, The Philadelphia Inquirer, San Francisco Chronicle and The Washington Post from the United States.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭. The President said that the plan of the defunct. Awami League and its collaborators to capture the port of Chittagong and Dacca airport and to "arrest me and my colleagues" was established now. He said, "But Sheikh Mujib forgot that he was facing a hard hitting, swift moving army." বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, (সপ্তম খণ্ড), page-67 ।

১৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, (সপ্তম খণ্ড), page-69 ।

১৯. Having exhausted all avenues of peaceful transfer of power, the president called upon the armed Forces to "do their duty and fully restore the authority of their government. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, (সপ্তম খণ্ড), page-367-368 ।

২০. Q: What do you think of the present crisis in East Pakistan leading, sooner or later, to the formation a Greater Bengel?
Answer: Twice the people of East Bengal have given their verdict on this point-first in 1905 when they forced Lord Curzon to partition Bengal to escape the exploitation of Bengali Hindu and finally in 1947 when they decided through their elected representatives to break away from west Bengal to become part of Pakistan. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, (সপ্তম খণ্ড), Page-371 ।

২১. Widespread fighting between West Pakistani troops and Bengalis; rumors spread that Sheikh Mujib had gone under-ground with Awami League leaders.
In a broadcast to the nation, from Karachi, Yahya Khan charge Sheikh Mujibur Rahman with treason, bans awami League, and orders Army to restore authority of centeral government in East Pakistan.
"Voice of Independent Bangladesh" radio station broadcasts unilateral declaration of independence, saying Sheikh Mujib has declared sovereign independent Bangladesh.
Bhutto departs Dacca for West wing. সূত্র: Department of State, Research study, Bureau of Intelligence and research.

২২. It is unclear what caused the collapse of the talks.
Dr. Kissinger: Yesterday it looked as though an agreement were in sight.
Mr. Helms: Yes, an agreement appeared near on March 24. The breakdown may have been because of Mujibur Rahman insistence on the immediate lifting of marital law.
A clandestine radio broadcast has Mujibur Rahman declaring the independence of Bangladesh. There are 20.000 loyal West Pakistani troops in East Pakistan. There are also 5,000 East Pakistani regulars and 13,000 East Pakistani paramilitary troops, but their loyalty is doubtful. We cannot confirm Indian press reports that a large number of Pakistani troops landed by ship. Six c-130s carrying troops were supposed to be going from Karachi to Dacca today. It will take them a long time, since they have to go via Ceylon.
There are 700 potential U.S evacuees in Dacca and 60 or 70 in Chittagong. There has been repuest for evacuation yet.

২৩. Martin Gilbert, Challenge to Civilization, Harper Colins Publishers, page-417.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায়: দশ

জন্মেই জটিলতা

[দশম অধ্যায়ে সরকার গঠনে জন্মেই জটিলতার যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিশেষ করে গণপরিষদের সদস্যবৃন্দের নানা মতভেদ থাকলেও তা নিরসন করতে সমর্থ হয়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ও জাতীয় সংসদের হুইপ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে অতিদ্রুত দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠন এবং ভারতের মাটিতে আশ্রয়, যুদ্ধ পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস পান। ১০ এপ্রিল ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম স্বাধীনতার সনদ রচনা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। সংগ্রামের ধারাবহিকতায় 'হাইকমান্ড' গঠিত হয়েছিল। সে অনুসারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, তার অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ 'হাইকমান্ড' নেতাদের নিয়ে ১০ তারিখে গঠিত সরকার ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে।
বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের চার নেতৃত্ব বাংলাদেশ সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করে বিপ্লবী পরিষদ গঠনের পক্ষে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যান। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এই বিরোধীতার অবসান হয়নি। এই চার যুবনেতা মুজিব বাহিনী গঠন করেন যা ছিল উন্নত ট্রেনিং ও অস্ত্রেসজ্জিত গেরিলা বাহিনী।
এই অধ্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যুদ্ধকালীন সময়ে গণপরিষদের অধিবেশন। এই অধিবেশন এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয় যখন মার্কিন চক্রান্ত একটি পর্যায়ে চলে এসেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতরে ব্যাপকভাবে প্রচার হয়েছে যে 'স্বাধীনতা চাও না বঙ্গবন্ধুকে চাও'। এর মূল হোতা খন্দকার মোশতাকচক্র। উক্ত অধিবেশনে শপথ গ্রহণ করা হয়, বিভ্রান্তি নয়, ঐক্য। মুজিব বাহিনীর মধ্যেও প্রশিক্ষণ ও সিলেবাস নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সেখানে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তব্য দেয়া হতো তা নিয়ে ভারত সরকারের আপত্তি ছিল। এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিয়ে অনেক সময় সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আমরা লক্ষ্য করব, মুজিব বাহিনীর প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ সদস্য জাসদে ও গণবাহিনীতে যোগদান করেন। একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে যেখানে প্রয়োজন ছিল শৃংঙ্খলাবদ্ধভাবে সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করা তার বিপরীতে তারা যে সমস্ত হটকারী ও নাশকতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে তার ফলে প্রতিবিপ্লবীদের হাত শক্তিশালী হয়।]

নয়াদিল্লী। ৩ এপ্রিল, ১৯৭১। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাসভবনের তাঁর সরকারী বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম দেখা করতে গেলেন। তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম প্রশ্নটি ছিল, 'হয়ার ইজ শেখ মুজিব'? তাজউদ্দীন সাহেব নিজেও জানতেন না

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কোথায়! তারপরেও অত্যন্ত কৌশলে জবাব দিলেন, বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠিত হয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছি।

জনাব তাজউদ্দীন আহমদ যে আকস্মিকভাবে কথাটি বলেছেন এমনটি নয়। এর পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, বিএসএফ-এর প্রধান রুস্তমজী, এবং মুখ্য সচিব জাঁদরেল বুরোক্রাট পি. এন. হাস্কারের সঙ্গে সরকার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। পি. এন হাস্কার সরকার গঠনের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকার গঠন ছিল একটি অতি আবশ্যকীয় শর্ত। সে লক্ষ্যে তাজউদ্দীন আহমদ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সরকার গঠনের বিষয়টি নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন না। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে বিষয়টি অবহিত করলে তাঁর মানসপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষিতে সরকার গঠনের বিষয়টি উদিত হয়। কিন্তু কীভাবে সরকার গঠনের প্রাথমিক সনদ রচনা করা যায় তা ভাবতে গিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণাপত্রের আলোকে বাংলাদেশের সরকার গঠনের শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি রচনায় হাত দেন। বিষয়টি আরো জরুরি হয়ে পড়ে দিল্লী থেকে যখন তারা কলকাতায় ফিরে আসেন।

পরিস্থিতি ছিল জটিল। হাজার হাজার শরণার্থী সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে। তাদের আশ্রয়, খাদ্য বলতে কিছু নেই। ছিন্নমূল মানুষেরা তাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। তরুণেরা এসেছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উন্মাদনা নিয়ে। তারা চায় অস্ত্র। চারদিকে এক জটিল অবস্থা। জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। সরকার গঠনের বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে বিভক্তি। সরকার গঠনে ভিন্নমত থাকলে স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিল আপোসহীন ও একমত।

স্বাধীনতা ঘোষিত হলেও স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপায়ণের আবশ্যকীয় শর্ত– সরকার গঠন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ হতে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রকাশ্য ঘোষণা না থাকলেও সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় 'হাইকমান্ড'[১] গঠিত হয়েছিল। ৮ এপ্রিল দিল্লী হতে তাজউদ্দীন আহমদ কলকাতায় ফিরে এলে ভবানীপুর এলাকার রাজেন্দ্র রোডের এক বাড়িতে তাকে ছেঁকে ধরা হয়। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম দিল্লী-যাত্রা ও তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহের আনুপর্বিক কর্মধারার খুঁটিনাটি বর্ণনা–উপস্থিত যুবনেতা এবং বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত আওয়ামী নেতৃত্বের কাছে অগ্রহণযোগ্য না হলেও আপত্তির মূল পয়েন্টটি ছিল তাজউদ্দীনের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিষয়টি বলতে গেলে ঐ বৈঠক আপত্তি, অভিযোগ এবং পারস্পরিক অবস্থানের টানাটানি ভেতরেই পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীনকে খন্দকার মোশতাক কোনোক্রমেই মেনে নেয়নি। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম কর্তৃক খসড়াকৃত ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার সনদ বিখ্যাত আইনজীবী অশোক সেন দেখলেন এবং যা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের চার নেতৃত্বে শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ বাংলাদেশ সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করে বিপ্লবী পরিষদ গঠনের পক্ষে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যান। ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের প্রস্তাবিত বেতার ভাষণ যুবনেতাদের তীব্র চাপের সম্মুখীন হয়। আনুষ্ঠানিক সরকার গঠন, নির্দেশাবলী, সামরিক জোন ও কমান্ড গঠন সম্পর্কিত ভাষণটি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া উচিত বলে তারা দাবি তোলেন। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ঐ চার যুবনেতার দ্বারা, গেরিলাবাহিনীর সদস্য রিক্রুট এবং মুজিববাহিনী গঠনের ক্ষমতা সম্প্রসারণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের বাধা দেয়া সত্ত্বেও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তা অনুমোদন করেন।

১০ এপ্রিল স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে উপস্থিত করা হয়। অন্যদিকে সামরিক অধিনায়কগণ যার যার অবস্থানে ক্ষুদে 'নৃপতি' বনে যান। তাদের মধ্যে এ বোধটি কাজ করছিল এভাবে যে, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এড়িয়ে তারাই যুদ্ধ ও সরকার পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবেন। বিশেষ করে মেজর জিয়াউর রহমানের মনোভাব ছিল বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা। যদিও খালেদ মোশাররফের মতামত ছিল ভিন্ন। যুদ্ধের প্রাথমিক উন্মাদনা ক্রমশ হ্রাস পেলে তারা এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেন যে, রাজনৈতিক নেতৃত্বে আইনানুগ সরকার গঠন জরুরি এবং তাদের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য পোষণ করেই স্বাধীনতার লক্ষ্যে 'যুদ্ধ' করতে হবে।

১০ এপ্রিল ১৯৭১ সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের মুক্তাঞ্চলে এই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ করেন মুজিবনগর। শপথ অনুষ্ঠানের পরপরই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে এই স্থানটিকে বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী মুজিবনগর হিসেবে উল্লেখ করায় মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এই সরকার মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিত। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে সরকার পরিচালিত হতে থাকে কলকাতার থিয়েটার রোডের এক বাড়ি থেকে। যেহেতু পাকিস্তান সরকার প্রথম থেকেই বলে আসছিল ভারত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহযোগিতা করছে, সেটাকে আড়াল করার জন্য এই সরকারের কর্মকাণ্ড ও নথিপত্র মুজিবনগর সরকারের নামেই পরিচালিত হতে থাকে। বাংলাদেশ সরকার নিজেকে কখনই প্রবাসী হিসেবে স্বীকার করেনি। শপথ অনুষ্ঠানের পরে ভারত সরকারের স্বীকৃতি চেয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্বপ্রথম যে পত্র এবং সংশ্লিষ্ট আইনানুগ দলিলাদি প্রেরণ করেন তার ঠিকানা ছিল মুজিবনগর।

বাংলাদেশে মাটিতে বসে প্রতিবেশী ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা প্রাপ্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করা দুরূহ ছিল বলেই বঙ্গবন্ধু বৃটেনে এ-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পূর্বেই সম্পন্ন করেন। তার ফলশ্রুতিতে জনাব তাজউদ্দীন আহমদের পক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সহজ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা থেকে প্রেরিত মার্কিন টপ সিক্রেট টেলিগ্রামে উল্লিখিত হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দিল্লীতে ৪ এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারি বাসভবনে তাজউদ্দীন আহমদের সাক্ষাৎ হয়। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক উপকরণ, সহযোগিতা এবং সংশ্লিষ্ট সাহায্যাদি প্রয়োজন। পি.এন. হাকসার, কে. রুস্তমজী ও গোলক মজুমদার প্রমুখ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ সরকার গঠন প্রসঙ্গে তাজউদ্দীনের কাছে জানতে চান। সেজন্য তাজউদ্দীন সরকার গঠনের বিষয়ে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর তাজউদ্দীন আহমেদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। কারণ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উপস্থাপন এবং ২৬ মার্চেই শেখ মুজিব হাইকমান্ডারদের নিয়ে সরকার গঠন করেছিলেন বলে ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়েছিলেন। এই অবস্থায় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ মুজিবনগরে গৃহীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয় "বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রধান করেন।" উক্ত ঘোষণায় আরো বলা হয় "বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে," "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন, এবং রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক" এবং অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। নির্বাহী, আইন প্রণয়ন, করারোপ, অর্থব্যয়ন এবং বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্য সকল কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার ঘোষণায় জাতিসংঘ সনদ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। এই ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্য ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করলে কয়েকটি মূল বিষয় বেরিয়ে আসবে। এক. স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; দুই. গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা ও সামরিক বাহিনীকে জোরদার করা; তিন. কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং পাকিস্তানে কর্তব্যরত কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্যে নিয়ে আসা; চার. জনগণের সরকার গঠনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠামোতে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের আস্থা গ্রহণ এবং দায়িত্ব প্রদান; পাঁচ. সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত মোকাবেলা করে বন্দি মুজিবের মুক্তি ত্বরান্বিত করা। এই লক্ষ্যে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ অবরোধ করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সকল রকমের অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে এক সুখী সমৃদ্ধ, সুন্দর সমাজতান্ত্রিক ও শোষণহীন সমাজ কায়েমে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনাব তাজউদ্দীন আহমদের প্রথম সরকারি নির্দেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁর প্রথম সরকারি নির্দেশ হলো:

"স্বাধীন বাংলাদেশ আর তার সাড়ে সাত কোটি সন্তান আজ চূড়ান্ত সংগ্রামে নিয়োজিত। এ সংগ্রামের সফলতার ওপর নির্ভর করছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির, আপনার, আমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ। আমাদের সংগ্রামে জয়লাভ করতেই হবে এবং আমরা যে জয়লাভ করব তা অবধারিত।

মনে রাখবেন আমরা এ যুদ্ধ চাইনি। বাঙালির মহান নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করতে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি, শোষকশ্রেণী ও রক্তপিপাসু পশুশক্তির মুখপাত্র ইয়াহিয়া-হামিদ-টিক্কা সে পথে পা না বাড়িয়ে বাঙালির পাট বেচা টাকায় গড়ে তোলা সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে। তারা নির্বিচারে খুন করছে আমাদের সন্তানদের, মা-বাপদের; ইজ্জত নষ্ট করছে মা-বোনদের, আর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম। তাই আমরা আজ পাল্টা হামলায় নিয়োজিত হয়েছি। গঠন করা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। এ সরকারের প্রধানতম লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে শত্রু কবল হতে মুক্ত করা। বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রামে ধর্ম, মত, শ্রেণী বা দল নেই। বাংলার মাটি, পানি ও আলো বাতাসে লালিত-পালিত প্রতিটি মানুষের একমাত্র পরিচয় আমরা বাঙালি। আমাদের শত্রুপক্ষ আমাদের সেইভাবেই গ্রহণ করেছে। তাই তারা যখন কোথাও গুলি চালায়, শহর পোড়ায় বা গ্রাম ধ্বংস করে, তখন তারা আমাদের ধর্ম দেখে না, মতাদর্শ দেখে না-বাঙালি হিসেবেই আমাদেরকে মারে।

জুন-জুলাই মাসে বাংলাদেশ প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রশাসনের তরফ হতে স্পষ্টতই প্রচারিত হতে থাকে। তাদের ভাষায় রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন। রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে নীতিগত প্রেক্ষিতে ৬ জুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম চারদফা প্রস্তাব পেশ করেন। জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে ১. বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আটক জনপ্রতিনিধিদের মুক্তি, ২. পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর প্রত্যাবর্তন ৩. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি, ৪. বাংলাদেশ হতে অপহৃত সম্পদ ফেরত এবং পূর্ণ ক্ষতিপূরণ। মার্কিনীদের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক ফর্মুলা নাকচ হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণপরিষদের যুদ্ধকালীন অধিবেশন

১৯৭১ সালের ২০ জুন কলকাতায় ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরের যুগ্মসচিব অশোক রায় যথাশীঘ্র বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে অনুরোধ করেন এবং অনাপত্তি না থাকলে ২৯ জুন নাগাদ মেঘালয় রাজ্যের তুরায় এই অধিবেশনের আয়োজন করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন। সময়ের স্বল্পতা ও যোগাযোগের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে গণপরিষদের এই অধিবেশন ৬ ও ৭ জুলাই শিলিগুড়ির বাগডোগরায় অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্য হয়। দেশের অভ্যন্তরে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির ফললাভের আগেই নানা কারণে সন্দেহ, বিভক্তি, বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ জনপ্রতিনিধিদের সম্মুখীন হওয়া প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তথা মন্ত্রিসভার জন্য সুখপ্রদ ছিল না। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত প্রায় ৩১০ জন প্রতিনিধির এই অধিবেশনে নীতিগত, ব্যক্তিগত, পারস্পরিক, আঞ্চলিক অভিযোগ ও অপপ্রচারের স্রোতধারাই ছিল অধিক প্রবল। যুদ্ধ পরিচালনায় ত্রুটি-বিচ্যুতিও নিঃসন্দেহে ছিল সমালোচনার যোগ্য। এসব অভাব-অভিযোগ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অবলম্বন করে কয়েকটি গ্রুপ উপদলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মন্ত্রিসভার ব্যর্থতাকে সামনে এনেছিল, যার টার্গেট ছিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। লক্ষ্য ছিল তাদের পদত্যাগ। আওয়ামী লীগের ভেতরে একটি গ্রুপ যারা মোশতাকের সঙ্গে ছিল এবং মোশতাক চক্রের বাইরে মিজান চৌধুরী, জহুরুল ইসলামের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের যোগ্যতা এবং তার ক্ষমতা গ্রহণের বৈধতা নিয়ে নানা ধরনের প্রচারণা চলতে থাকে। কর্নেল ওসমানীর বিরুদ্ধেও জিয়ার নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর একাংশ এই মর্মে প্রচারণা চালাতে থাকে যে, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় তিনি অদক্ষ ও অক্ষম। প্রচারণা ছিল মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভারতের মৌলিক অনীহা। কূটনৈতিক স্বীকৃতির প্রশ্নে তাদের নানা অজুহাত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বীকৃতি লাভ করবে কিনা তা-ও ছিল সন্দেহজনক আলোচ্য বিষয়। এসবের পেছনে খন্দকার মোশতাক চক্র সূক্ষ্মভাবে প্রচার চালাচ্ছিল। প্রচার চালানো হয় যে 'স্বাধীনতা চাও না বঙ্গবন্ধুকে চাও?' ৬ জুলাই গণপরিষদে বিভিন্ন বক্তা জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি, অস্ত্র সংকট, শরণার্থী সমস্যা এবং ভারতের স্বীকৃতি প্রদান সম্পর্কিত বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে তুলে ধরেন। দিনাজপুরের সর্বজনাব আব্দুর রহিম, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মোজাফ্‌ফর হোসেন, আমজাদ হোসেন, মোতাহার হোসেন তালুকদার, শাহ মাহাতাব এম.এন.পি, আবেদ আলী, শামসুল হক চৌধুরী, সিদ্দিকি হোসেন, আবুল হোসেন, তফিজ উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল হাদি, আব্দুর রব বগা মিয়া, তালেব আলী, খোরশেদ আলম, হাসান আলী, ময়েজ উদ্দিন প্রমুখ জনপ্রতিনিধির একজোট হয়ে মুজিবনগর সরকারের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভার বাইরে মিজান চৌধুরী গণপরিষদের অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের পদত্যাগ দাবি করেন এই বলে যে, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রধানমন্ত্রী হলে গঠনতন্ত্র মোতাবেক তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে বহাল থাকতে পারেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না এবং মুক্তিযুদ্ধ ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বিষয়গত ও বস্তুগত দুর্বলতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এ সময়ে মঞ্চে হট্টগোল দেখা দেয় কিন্তু পরিষদ সদস্যদের হস্তক্ষেপে তা প্রশমিত হয়।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে গণপরিষদ সদস্যদের মতামত, সরকারের প্রতি তাদের আস্থা পরীক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জন বিষয়ে তাদের প্রকৃত মনোভাব অবগত হওয়া ছিল জরুরি। ইন্দিরা গান্ধীর আসন্ন বিদেশ সফর, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরে নড়বড়ে অবস্থা, সেনাকাঠামোয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক উপ-নির্বাচন ও রিফিউজি প্রত্যাবর্তনের পদক্ষেপ এবং আওয়ামী নেতৃত্বের উপদলীয় কোন্দল, কতিপয় গণপরিষদ সদস্যের পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন ও আত্মসমর্পণ ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি করেছিল। এ খবরও ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান হতে '৭০-এর নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। ভারত সরকারের কাছে এমনও প্রমাণ ছিল যে, সামরিক বাহিনীর, এমনকি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কতিপয় সদস্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনফেডারেশন গঠনের কূটনৈতিক তৎপরতা তখনও অব্যাহত ছিল। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কার্যকর সামরিক ও রাজনৈতিক সর্বোপরি কূটনৈতিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতকে সর্বদিক নতুন করে ঝালাই করে নিতে হয়।

জাতীয় পরিষদের ১১০ জন ও প্রাদেশিক পরিষদের আনুমানিক ২০০ জন সংসদ সদস্য সেদিন গণপরিষদ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। শপথ নেয়া হয়, 'শত্রুকে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে চিরদিনের মতো পরাস্ত করেই স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আত্মসমালোচনা করে বলেন, 'আমরা যদি ভুল করে করে থাকি তবে দেশ স্বাধীন হলে আপনারা আমাদের বিচার করবেন এবং আপনাদের রায় মাথা পেতে নেব।' 'পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।' অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, "আপনাদেরকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি আমাদের নীতি ও আদর্শ থেকে কোনদিন বিচ্যুতি দেখেন, আপনারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু বাংলার এই সংকট মুহূর্তে, জাতির স্বাধীনতার এই ক্রান্তিলগ্নে যেখানে শত শহীদের রক্তে ইতিহাস লেখা হয়েছে, আর যেখানে হাজার হাজার সৈনিক বন প্রান্তরে ইতিহাস লিখে চলেছে, সেই মুহূর্তে আর একবার আপনারা আস্থা স্থাপন করুন।" তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধু গ্রেফার হওয়ার মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু যদি গ্রেফার হন, তবে স্বাধীনতা ঘোষণা তিনি করেই যাবেন। আর এই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে।" বিভিন্ন প্রচারণার জবাবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, 'ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের জন্য যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার ফল সঞ্চারের জন্য ৩-৪ মাস সময় প্রয়োজন, এর জন্য অধৈর্য হয়ে পড়লে চলবে না।' তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। গণপরিষদে প্রকাশ্যে আলোচনা ও পরবর্তীতে স্থির হয় সাবেক নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটি নয়, বরং সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটিকেই অতঃপর দলের বৈধ নেতৃত্ব হিসেবে গণ্য করা হবে।

বিভ্রান্তি ও অনৈক্য সৃষ্টির নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান এবং মন্ত্রিসভার সমর্থনে সর্বসম্মত আস্থা জ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃঢ় প্রত্যয় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সার্বিক অর্থে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণপরিষদ অধিবেশনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এই অধিবেশনের এক সপ্তাহের মধ্যে সেক্টর কমান্ডারগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য ও শপথ গ্রহণ করেন। শুরু হয় নব উদ্যমে যুদ্ধজয়ের গৌরবগাথা।

অনেকেই বলে থাকেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের একটি গোপন চুক্তি হয়। কথাটি গুজব ও অসত্য। সে সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। অক্টোবর মাস ছিল বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মাস। ইন্দিরা গান্ধী তাজউদ্দীনকে দিল্লী ডেকে পাঠান এবং একটি চুক্তি সম্পাদনের কথা বলেন। হাকসার তখন উপস্থিত ছিলেন। তাজউদ্দীন বলেন, ভারতের নির্দেশে যে কোনো প্রকার চুক্তি সম্পাদন করতে আমরা সম্মত। কিন্তু সারাবিশ্বের মানুষই বলবে, যেহেতু ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে এই চুক্তিটা সেই কারণে চাপ প্রয়োগ করে করিয়ে নিয়েছে। তাজউদ্দীনের এই কথার পর হাকসার স্বীকার করেন যে, না কোন চুক্তি ভারতের বুকে সম্পাদন হতে পারে না। ইন্দিরা গান্ধী বললেন, ঠিক আছে স্বাধীনতার পরে চুক্তি সম্পাদিত হবে। সফরের কথা উল্লেখ করে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, এই সফরে শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন। কিন্তু যদি আলোচনায় সুফল পাওয়া না যায় তখন ফিরে এসেই পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে ইন্দিরা গান্ধী এই প্রথম সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এই আলোচনার কথা তাজউদ্দীন শুধু কামরুজ্জামানকে বলেছিলেন, অন্যান্য কোনো প্রধান সদস্যের কাছে পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। সংগত কারণে একথা গোপন রাখার প্রয়োজন ছিল। দিল্লীতে তাজউদ্দীন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ইন্দিরা গান্ধীর কাছে 'র'-এর সমর্থনপুষ্ট হয়ে মুজিব বাহিনী যে উৎপাতের সৃষ্টি করেছে, তার উল্লেখ করেন। ইন্দিরা গান্ধী এই অবস্থায় দ্রুত সমাধানের জন্য ডি.পি ধরকে আদেশ দেন। ডি.পি.ধর মুজিব বাহিনীকে বাংলাদেশের কমান্ডের আওতায় আনার জন্য মেজর জেনারেল বিএন সরকারকে নিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তাজউদ্দীন ও জেনারেল, ওসমানী যোগদান করেন কিন্তু মুজিব বাহিনীর পক্ষে তোফায়েল সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি আমন্ত্রণ পত্র পাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত ছিলেন না এবং ভারতের সামরিক বাহিনীর পক্ষে মেজর জেনারেল সরকার এবং ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।[২]

দিল্লীতে দু'দিন ডি.পি ধরের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করার পর তাজউদ্দীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতায় ফিরে আসেন। তাজউদ্দীন তখনও গভীরভাবে চিন্তা করছেন মুক্তিযোদ্ধাদের (মুজিব বাহিনীসহ) একটি জাতীয় কমান্ড ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে এবং যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে।

২০ অক্টোবর কলকাতায় আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠক শুরু হয়। ২০-২০ অক্টোবর বৈঠক চলার পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি আমন্ত্রণে দিল্লী যাওয়ার কারণে সভা মুলতবি করা হয়। ২৭ ও ২৮ তারিখে মুলতবি সভা শুরু হয়। আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভা ঘন ঘন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত বলে অনেকেই বক্তব্য রাখলেন। এই সভায় আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত এবং উপদলীয় সংঘাত সম্পর্কে অনেকেই আলোচনা করেন। তাছাড়া মুজিব বাহিনী গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা হয়। তাজউদ্দীন বলেন বাংলাদেশ সরকার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই মুজিব বাহিনীর নেতারা স্বাধীনতা যুদ্ধের চরম ক্ষতি করেছে। তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনারা সবাই অবহিত আছেন। ক্রমাগত এই কয়টি মাস এরা যেভাবে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাতে ঘন ঘন কার্যকরী পরিষদের সভার আয়োজন করা
আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাতে ঘন ঘন কার্যকরী পরিষদের সভার আয়োজন করা
আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরপর যারা বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলরদের মধ্যে তাজউদ্দীনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন, তারা নিশ্চুপ হয়ে যান, সভায় তাজউদ্দীনের কার্যক্রমের উপর কোনো সমালোচনা না করে, তাকে সমর্থন করেন। ২৭ এবং ২৮ অক্টোবরের আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের উপর আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ কতদূর সম্প্রসারিত করা যায়, তা নির্ধারণের দায়িত্ব কামরুজ্জামানের এক উপকমিটির হাতে অর্পিত হয়।[৩]

মুজিব বাহিনী

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বাধীনে সমগ্র বাঙালি জাতি ও মুক্তিবাহিনীর অকুতোভয় যোদ্ধারা যখন জীবনবাজি রেখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কামান আর মেশিন গানের মুখোমুখি যুদ্ধে রত; তখন গেরিলা যুদ্ধের বিশেষজ্ঞ জেনারেল ওবান অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অজ্ঞাতে উত্তর ভারতের দেরাদুনের কাছাকাছি তানদুয়ায় গড়ে তুলতে থাকে মুজিব বাহিনী।

যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ও মুক্তিবাহিনীর সহায়তাদান সংক্রান্ত বিষয়ে ভারত সরকার তিনিটি কমিটি গঠন করে। একটি রাজনৈতিক এবং অপর দুটি সামরিক। ভারত সরকার এবং অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করে রাজনৈতিক কমিটি। এ কমিটির প্রধান করা হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্লানিং কমিশনের চেয়ারম্যান ডি. পি ধরকে। অপরদিকে যুদ্ধ প্রস্তুতি সংক্রান্ত যুদ্ধ-কাউন্সিলের প্রধান করা হয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশকে। ডি. পি ধরকে যুদ্ধ কাউন্সিলেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জেনারেল মানেকশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবাহিনী উপপ্রধানকে চেয়ারম্যান করে আরেকটি কমিটি তৈরি করেন। সেটা যুগ্ম গোয়েন্দা কমিটি প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনটি শাখার গোয়েন্দা বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত হয় এই কমিটি। কিন্তু জেনারেল শ্যাম মানেকশই থাকেন চূড়ান্ত নির্দেশদানের অধিকর্তা। যুগ্ম গোয়েন্দা কমিটি যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী তরুণদের নিয়ে মুজিবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জেনারেল শ্যাম মানেকশ নিজেই থাকেন এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে।

তাজউদ্দীন আহমদ হঠাৎ করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আওয়ামী লীগের চার যুবনেতা। তাদের বিক্ষুব্ধতার সুযোগ নেয়া হলো। যদিও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আগে থেকেই, অন্যভাবে।

জেনারেল উবান তার যাবতীয় নিষ্ঠা প্রয়োগে গড়ে তুলতে থাকেন মুজিব বাহিনী এবং তিনি এর গঠন প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকেন সরাসরি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশর কাছে। যেহেতু মেজর জেনারেল উবান মুজিব বাহিনীর ব্যাপারে দায়ী ছিলেন সরাসরি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ এবং 'র'-র ডিরেক্টর আর, এন কাওয়ের কাছে। অবশ্যি জেনারেল উবান তাকে 'র'-এর ডিরেক্টর হিসেবে উলেখ করেননি তার "ফ্যানটমস অব টিটাগাং: ফিপথ আর্মি ইন বাংলাদেশ" বইয়ের কোথাও। জাবাবদিহি মাত্র দুজনের কাছে করতে হতো বলেই তিনি নির্দ্বিধায় ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড-অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার অজ্ঞাতে তার বাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেদের পাঠাতে শুরু করেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। এতে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডে তৈরি হয়ে যায় দ্বৈত অধিনায়কত্ব। জেনারেল অরোরার কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবার কথা নয়। তিনি সেনাবাহিনী সদর দফতরে চাপ প্রয়োগ শুরু করেন মুজিব বাহিনীকে তার অধিনায়কত্বে ছেড়ে দিতে। তার অনবরত চাপে ডাইরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে কে সিং মুজিব বাহিনীর তাৎপর্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন।

অপরদিকে তাজউদ্দীন আহমদ যখন মুজিব বাহিনীর অস্তিত্বের কথা জানতে পারেন, তখন তিনিও জেনারেল শ্যাম মানেকশকে অনুরোধ জানান এই বাহিনীকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বাধীনে ছেড়ে দিতে। জেনারেল মানেকশ তাকে জানান যে, সেনাবাহিনীর বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনে তৈরি করা হয়েছে এই বাহিনী। কিন্তু কী সে দায়িত্ব সে সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদকে তিনি কী বলেছিলেন, তা জানা যায় না। মুজিব বাহিনী সংগঠক জেনারেল উবান তার "ফ্যানটমস অব চিটাগাং: ফিপথ আর্মি ইন বাংলাদেশ" গ্রন্থেও সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেননি। মুজিবের রাজনীতির নামে সে বাহিনী পরিচালিত হবে উগ্র স্বাধীনতা বিরোধী সৈনিক বামপন্থী নির্মূলে। তবে মুজিব বাহিনী তৈরি করে 'র' যা করতে চেয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে ঘটে যায় উল্টোটি। কারণ, খোদ মুজিব বাহিনীর ভেতরেই সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও বামপন্থী চিন্তাধারার অনুবর্তী ছিল শতকরা আশিভাগ।

মুজিব বাহিনী কাদের নিয়ে গঠিত হয়, কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়, এ সবই এসেছে জেনারেল উবানের "ফ্যানটমস অব চিটাগং: ফিপথ আর্মি ইন বাংলাদেশ"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থে। আব্দুর রাজ্জাক সাক্ষাৎকারে বলেন: "জায়গা মতো যেয়ে দেখি যে, শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমেদ। সে জায়গাটা কলকাতায়; ২১ নম্বর রাজেন্দ্র রোড; যেখানে চিত্তরঞ্জন সুতার বঙ্গবন্ধু রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ করলেন। সেই আলাপের প্রেক্ষিতে একজন অফিসার আসেন। জেনারেল উবানই এসেছিলেন।" সাক্ষাৎকারটি ঘটে ১৯৭১ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে এবং চূড়ান্ত হয়ে যায় মুজিব বাহিনী তৈরির প্রক্রিয়া। আব্দুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকারেই আমরা দেখতে পাব চিত্তরঞ্জন সুতার এই চারজনকে তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রী হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ করেন। যুবনেতা চতুষ্টয় মনে করতেন– যেহেতু আওয়ামী লীগের ভেতর ছাত্রলীগের তরুণরাই যোদ্ধা। আর তাদের নেতৃত্বে আছেন তারাই,–সেহেতু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেবার কথা তাদেরই। মাঝখান দিয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করে তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হয়ে নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেবেন, এ তাদের মোটেই কাম্য ছিল না। যুবনেতা চতুষ্টয় চিত্তরঞ্জন সুতারের এই আশ্বাসের প্রেক্ষিতেই তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রিত্বের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে যুদ্ধ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব তোলেন। তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করবে যুদ্ধ কাউন্সিল। কেননা, তাদের মতে, মুক্তিবাহিনীতে ঢুকে যাচ্ছে এমন সব লোক, যারা যুদ্ধে অনাগ্রহী এবং পাকিস্তানপন্থী। অপরদিকে জেনারেল উবানের ভাষ্য অনুযায়ী বামপন্থী ও নকশালপন্থী নৈরাজ্যিকরা। বিকল্প হিসেবে নিজেদের নেতৃত্বে একটি সমান্তরাল বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নামলেন।

জেনারেল উবানের সঙ্গে চার যুব নেতার সাক্ষাতের দু'সপ্তাহের মাথায় মুজিব বাহিনীর প্রথম দলটি ভারতীয় মিলিটারি একাডেমি শহর দেরাদুন থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে পাহাড় শীর্ষের শহর তানদুয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। প্রশিক্ষণ শুরু হয় ১৯৭১ সালের মে মাসের ২১ তারিখে। আরেকটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয় মেঘালয়ের তুরার কাছাকাছি হাফলংয়ে। মাত্র একটি দলের ট্রেনিং শেষে এ ক্যাম্পটি তুলে দেয়া হয়। তানদুয়ার ট্রেনিং ক্যাম্পের মূল পরিকল্পক ও পরিচালক ছিলেন মেজর জেনারেল উবান। প্রথম দলটি, যার সংখ্যা ছিল ২৫০, তাদের ট্রেনিং দেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসাররা। ট্রেনিং শেষে এদের ভেতর থেকে ৮জনকে করা হয় প্রশিক্ষক[৪] পরে প্রশিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হয়। করা হয় বায়ান্নো। এরাই হাজারো মুজিব বাহিনী সদস্যকে প্রশিক্ষণ দান করেন। ট্রেনিং প্রদান বন্ধ হয়ে যায় ২০ নভেম্বর, ১৯৭১। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনায় ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার। আর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রধান হাসানুল হক ইনুর উর্ধ্বতন ছিলেন একজন ভারতীয় কর্নেল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অন্য ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মেজর মালহোত্রা।

মুজিব বাহিনীর অপারেশন পরিচালনার জন্য চার যুবনেতা বাংলাদেশকে চারটি সেক্টরে ভাগ করে নেন। বৃহত্তর রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর নিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টর, এর দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মনিরুল ইসলাম ওরফে মার্শাল মনি। বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদপুর, বরিশাল এবং পটুয়াখালী নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টর, এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট এবং ঢাকা জেলার কিছু অংশ নিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টর। শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন এই সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। আর কেন্দ্রীয় সেক্টর ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল এবং ঢাকা জেলার কিছু অংশ নিয়ে। সদর দফতর ছিল মেঘালয়ের ডালুতে। এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন সৈয়দ আহমদ।

চার যুব নেতা সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদের ওপর ছিল মুজিব বাহিনীর কর্মী সংগ্রহের দায়িত্ব। ছাত্রলীগ কর্মী এবং শেখ মুজিবের কট্টর অনুসারী ছাড়া বাইরের কাউকে মুজিব বাহিনীতে নেয়ার ব্যাপারে তারা ছিলেন বিরোধী। মুজিব বাহিনীর জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং ব্যয় নির্বাহে আর্থিক সহায়তার সমন্বয় বিধান করতেন জেনারেল উবান। তার মাধ্যমেই অস্ত্রশস্ত্র এবং বাজেট অনুযায়ী অর্থ সরাসরি পেতেন চার যুবনেতা। চার যুবনেতা পেতেন জেনারেলের মর্যাদা। যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনে পেতেন হেলিকপ্টার।[৫]

তানদুয়ার ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ। প্রশিক্ষণে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বক্তব্যে না দিতে ভারতীয় কর্নেল নিয়োগ করেন। প্রশিক্ষকরা দাবি তোলেন যে, সরাসরি দিল্লী থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তারা সামরিক প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি রাজনৈতিক বক্তৃতাও চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কর্নেলের অনবরত চাপ অব্যাহত থাকে। প্রশিক্ষকরা বলেন, দিল্লী থেকে রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি যতদিন না আসছে ততদিন ট্রেনিং বন্ধ থাকবে। এ খবর দিল্লীতে পৌঁছাতে তানদুয়ায় ছুটে এলেন জেনারেল উবান। চার যুবনেতাও এলেন তার সঙ্গে। অচলাবস্থার নিরসন ঘটল। ট্রেনিং প্রদান আবার শুরু হয়। রাজনৈতিক বক্তৃতাও চলতে থাকে। প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণদান বন্ধ রাখেন মাত্র তিনদিন। ২০ নভেম্বর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হলেও প্রশিক্ষকদের ১ ডিসেম্বর আগে তানদুয়া থেকে ছাড়া হয় না।[৬]

১৩ আগস্ট মাসে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা শুরু করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামার কোনো পরিকল্পনা তাদের ছিল না। দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। আবদুর রাজ্জাক ও হাসানুল হক ইনু ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা ধাপে ধাপে এগোবার পরিকল্পনা নেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি থানায় একজন কমান্ডারের অধীনে দশজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজিব বাহিনী সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমান্ড গঠন করা হয়। এছাড়া ছিল একজন রাজনৈতিক কমান্ডার। রাজনৈতিক মটিভেশন দানই ছিল তার কাজ। একই পদ্ধতিতে গঠন করা হয় জেলা কমান্ড। জেলাতেও ছিল রাজনৈতিক কমান্ডার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থানা কমান্ড ও জেলা কমান্ড গঠিত হলেও যুদ্ধ বলতে যা বোঝায়, তা করেনি মুজিব বাহিনীর সদস্যরা। আবদুর রাজ্জাক বলেন, "আমরা জনগণের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করছি। কিছু কিছু রাজাকারও খতম হচ্ছে। কিন্তু মূল জায়গাটা মানে পাকিস্তান আর্মির সামনে না পড়লে যুদ্ধ করছি না। দু'চার জায়গায় সামনে পড়ে গেছি, যুদ্ধ হয়েছে। আমরা তো লড়াই শুরুই করিনি। পাঁচ বছরের প্রথম বছর কী করব, তৃতীয় এবং চতুর্থ বছরে কী করব, তারপর সরকার তৈরি করব-এই ছিল আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমরা যদি সফল হতাম তাহলে কোন আগাছা থাকতো না। সমাজদেহ থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতাম। প্রতিবিপ্লবীদের থাকতে হতো না। হয় মটিভেট হয়ে এদিকে আসতে হতো, নইলে নিশ্চিহ্ন হতে হতো।"[৭]

এরই মধ্যে উগ্র চীনপন্থীদের স্বউদ্যেগে ট্রেনিং চলছিল। যুবনেতারা অভিযোগ করেন, কিছু এলাকা তরুণরা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এম এল-এর এক গ্রুপের নেতা ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা। তার তাত্ত্বিক দিক ছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এ যুদ্ধ ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা পরিচালিত। এই গ্রুপ রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী জেলা হতে দশ হাজার লাল গেরিলা সংগ্রহ করেন যারা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি এলাকা মুক্ত করবে।[৮] মুজিব বাহিনীর চার নেতা জেনারেল বলেন, আমাদের দেশের রুশপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিকে আমরা জানি এবং বুঝি। এরা শুধু কাগজেই আছে। এবং আবার সক্রিয় করা হয়েছে। কিন্তু চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি কেন?

জেনারেল ওবান অবাক হয়ে গেলেন। মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ও দেশের প্রশাসনে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যিনি বাংলাদেশে চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবেন। যুবনেতাদের মতামত মিঃ আর এন কাওকে বলতে তিনি ওবানকে অবাক করে দিয়ে জানান যে, মওলানা ভাসানীর নকশালীরা বাস্তবিকই ট্রেনিং পাচ্ছে কোথাও কোথাও।

মি. কাও বললেন: "বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করিনি। তারা ভাসানীর অনুসারীদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি বড় রকমের শক্তি বলে মনে করেন। তাদের পরামর্শ আমরা উপেক্ষা করি কীভাবে। আপনার যুব নেতাদের গিয়ে বলুন, এদেরকে তারা যদি পছন্দ নাও করেন তবু সহ্য করতে হবে। আমরা তাদেরকে (মুজিব বাহিনী) সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি অঙ্গ হিসেবে সমর্থন দেব-স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ নয়। আমাদের সঙ্গে তারা একমত না হলে আমাদের করার কিছুই থাকবে না। এতে তারা যেখানে খুশি যেতে পারে অথবা যা খুশি বলতে পারে, তাতে আমাদের কিছু আসবে যাবে না। কর্তৃপক্ষ তাদেরই সাহায্য করছে যারা বাংলাদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আর এদের সুপারিশ করেছে তাদেরই অস্থায়ী সরকার।[৯]

জেনারেল ওবানের সামনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল তা হলো, মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর দায়িত্ব নির্ধারণ সম্পর্কিত? তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার সঙ্গে কথাও বলেন। তিনি জানান, মুক্তিবাহিনী সীমান্তের বিশ মাইল পর্যন্ত আক্রমণ হানার দায়িত্বে থাকবে আর মুজিব বাহিনী যাবে অভ্যন্তরে। যুব নেতারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাই চাইছিলেন। কিন্তু জেনারেল অরোরা চাইছিলেন তারা তার অধিনায়কত্বে থাকবে। অন্যদিকে যুবনেতারা এই প্রশ্নে তার সাথে একমত ছিলেন না। আরেকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ছিল। সেটা বাংলাদেশের ভেতরে অনুপ্রবেশের পদ্ধতি সংক্রান্ত। মুজিব বাহিনীর ছেলেরা যে সকল এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করত যে সব পথ দিয়ে যাতায়াত করত এবং তাদের আস্তানা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা। সীমান্তে তাদের অনুপ্রবেশ এলাকা সম্পর্কে জানতে দেয়ার কোনো আপত্তি ছিল না যুবনেতাদের। কেননা, সেখানে অবস্থানরত সেনাবাহিনী ইউনিটকে তাদের অনুপ্রবেশ অনুমতি দানের জন্য আগেভাগেই জানান দেয়া যেত। কিন্তু তাদের অনুপ্রবেশ করিডর, আস্তানা এবং পরিকল্পনা কোনো কিছুই প্রকাশ করতে রাজি ছিলেন না তারা। কেননা, মুক্তিবাহিনী নেতাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তির বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তারা সন্দেহ পোষণ করতেন এবং তারা ছিল তাদের রাজনৈতিক শত্রু। সেনাবাহিনী স্থাপনাকেও ওইসব তথ্য তারা দিতে চান না। কারণ, মুক্তিবাহিনী তাদের অধিনায়কত্বে রয়েছে। তারা নিশ্চয়ই মুক্তিবাহিনীর কাছে সকল তথ্য পাচার করে দেবে।

বড় ধরনের ঝামেলা কাটিয়ে একটি আপোসমূলক সমাধান হলো। মুজিব বাহিনীর নেতারা শুধু তাদের অনুপ্রবেশ এলাকা সম্পর্কে স্থানীয় সেনা ইউনিট কমান্ডারকে জানাবেন এবং তিনি তাদেরকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেবেন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে. কে সিং (ডাইরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশন্স) সেনাবাহিনী প্রধানের পক্ষ থেকে মুজিব বাহিনীর অধিনায়কত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট নোট পাঠালেন জেনারেল অরোরার কাছে। এই বাহিনীর ওপর কী ধরনের কাজের অর্পিত দায়িত্ব, তাও উল্লেখ করলেন। নোট প্রদান সত্ত্বেও বিতর্ক অব্যাহত থাকে।[১০]

জুলাই মাসে পেড়ালী গ্রামে আবদুল হকের চৈনিক গ্রুপ নেমে পড়ে শ্রেণী শত্রু খতমের নামে সাধারণ মানুষ হত্যায়। তাদের হত্যাকাণ্ড রোধের আবেদন নিয়ে ছুটে আসে স্থানীয় অধিবাসীরা। তাই মুক্তি ও মুজিববাহিনী যৌথ প্রতিরোধ বাহিনীকে নামতে হয় শ্রেণীশত্রু খতমকারীদের বিরুদ্ধে। অক্টোবর মাসে সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষায় তাদের উৎখাতে সফল অভিযান চালানো হয়। তারা আত্মসমর্পণ করে এবং তাদেরকে এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়।"[১১]

আবদুর রাজ্জাক বরাবরই সিরাজুল আলম খান ও শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বাভিলাষী দ্বন্দ্বের মাঝে দাঁড়িয়ে মুজিব বাহিনী এবং ছাত্রলীগের পরস্পর বিরোধী দুই গ্রুপের ভেতর সেতুবন হিসেবে কাজ করে এসেছেন। পল্টন ময়দানে সিরাজুল আলম খান গ্রুপের সম্মেলনে মুজিব বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যোগ দেয়। পল্টন-সম্মেলনে মুজিব বাহিনীর বেশিরভাগ অংশ কেন যোগদান করল? আবদুর রাজ্জাককেই আবার স্মরণ করতে হয়: "তখন এমন অবস্থা হয়েছে,– যুদ্ধ ফেরতা তরুণদের রক্ত টগবগ করছে। আর সেভাবে তো বিপ্লবী সরকার হয়নি– একটা সাধারণ পার্লামেন্টারি সরকার। সেখানেও কিছু গোলমাল শুরু হয়েছে। তখন ওই ছেলেদেরকে বোঝানো সহজ হয়েছে যে, এদেরকে দিয়ে হবে না। ছেলেরা কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যন্ত সাচ্চা মনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সমাজ বিপ্লব করার জন্য তৈরি হয়েছিল।"[১২]

ভারত সরকার শেখ মুজিব ও বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্ভাব্য যে কোনো প্রতিরোধ আন্দোলনে এবং জনগণ যদি সামরিক স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে ভারত যোগ্য প্রতিবেশীর ভূমিকা পালন করবে বলে আশ্বস্ত করে। ১৯৭০-এর আগস্টে যে ট্রেনিং শুরু হওয়ার কথা ছিল তারই সূত্র ধরে '৭১-এ বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট–বি. এল. এফ'কে ভারত যাবার আগেই কার্যকর করা হয়। বি.এল.এফ মুজিব বাহিনী নামে পরিবর্তিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মেজর জেনারেল সুজন সিং ওবানের সহায়তায় 'জনযুদ্ধের কৌশল' অবলম্বন করে বি.এল.এফ. সদস্যদের 'গেরিলা ট্রেনিং' দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

'মাউন্টেন বাহিনী' নামে আরো একটি বিশেষ বাহিনী জেনারেল ওবানের নেতৃত্বে গঠন করা হয়। তারা মিজোরামের দেমাগ্রীতে অবস্থান নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে।[১৩]

মুজিব বাহিনীর অন্যতম নেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক পশ্চিমবাংলার বালুরঘাটে স্থাপিত কুরমাইল ক্যাম্পে আসতেন মুজিব বাহিনীর সদস্য রিক্রুটদের নেয়ার জন্য। তিনি কখনো একটি বা দুটি ট্রাক নিয়ে আসতেন। কুরমাইল ক্যাম্পে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের রিক্রুট করার জন্য স্থায়ীভাবে থাকতে দিয়েছিলাম বগুড়ার মুস্তাফিজুর রহমান পটল যিনি ৭ নভেম্বর ৭৫ সালে এম.পি হোস্টেলে শহীদ হন। আর একজন ছিলেন বগুড়া ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সামাদ যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দুষ্কৃতদের হাতে নিহত হন। আব্দুর রাজ্জাক মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং ইত্যাদি নিয়ে লেখকের সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি স্বল্প সময় অবস্থান করতেন। একবার আমাকে বললেন যে, যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে দেশ স্বাধীন হলেও, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরেকটি সামাজিক বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়বে। সে লক্ষ্যে বাছাই করে মুজিব বাহিনী গঠন করা হচ্ছে।

তবে লেখকের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে সে সময় মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর মধ্যে এক অপ্রকাশিত দ্বন্দ্ব ছিল। কোথাও কোথাও মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের কাছে থেকে মুজিব বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে– এসব সংবাদ আসছিল। মুজিব বাহিনীর হাতে ছিল উন্নত ধরনের অস্ত্র। তাদের সেভাবেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মুজিব বাহিনীর প্রায় ৬০ ভাগ সদস্য জাসদে ও গণবাহিনীতে যোগদান করে। যেখানে সময়ের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ স্থিতিশীলতা ও শৃংখলাবদ্ধ সহযোগিতা দরকার- তার বিপরীতে তাদের হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তির হাতকে শক্তিশালী করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকা

১. হাইকমান্ড নামে পরিচিত হয়েছিল সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান।
২. মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক তাজউদ্দীন আহমদ, বদরুদ্দিন আহমদ, পৃ- ৭৯।
৩. ঐ, পৃ- ৭৮।
৪. হাসানুল হক ইনুকে করা হয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রধান। প্রশিক্ষকরা হলেন শরীফ নূরুল আম্বিয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হক, রফিকুজ্জামান, মাসুদ আহমদ রুমী, সৈয়দ আহমদ ফারুক, তৌফিক আহমদ ও মোহনলাল সোম।
৫. মাসুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, পৃ-৯৪-১০০।
৬. ঐ, পৃ-১০২।
৭. ঐ, পৃ-১০৪।
৮. Talukdar Maniruzzaman, Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, Bangladesh Books International Ltd, Page-52.
৯. মাসুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, পৃ ১১৬-১১৮।
১০. ঐ, পৃ-১২০, ১২১।
১১. ঐ, পৃ-১২৯-১৩০।
১২. ঐ, পৃ-১৪৩-১৪৪।
১৩. বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র, কাজী আরেফ আহমেদ, পৃ-৭২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায়: এগারো

জনযুদ্ধই মূল ভিত্তি

[বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধের ভিত্তি ছিল জনগণ, বর্তমান অধ্যায়ে সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বাংলাদেশের সেনাসদস্যগণ পাকিস্তানের সেনা কাঠামোর আওতায় গড়ে উঠেছিল এবং তাদের মন মানসিকতা অভিজ্ঞতা ছিল সম্মুখ-সমরের। তারা পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার শপথ নিয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে বাঙালি সেনা-কর্মকর্তাদের পক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ছিল রীতিমতোভাবে মানসিক দ্বন্দ্বের। ২৫ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনী অকস্মাৎ আক্রমণ শুরু করে, বন্দি ও হত্যা করে। এই অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে বাঙালি সেনা-কর্মকর্তাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম চট্টগ্রামে ইপিআর বাহিনীর অধিনায়ক মেজর রফিকুল ইসলাম। তিনি প্রথমেই পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং সফলতা অর্জন করেন। ভারতে আগত ট্রেনিং-এর জন্য বাছাইয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপর। মার্কিন পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ঐ সময় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ হাজার। তার মধ্যে যুদ্ধের সক্ষমতা ছিল মাত্র সাড়ে তিন হাজারের। এর পাশাপাশি গেরিলা যুদ্ধের জন্য ব্যাপক ট্রেনিং শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত গেরিলাদের সংখ্যা দেড় লক্ষ থেকে পৌনে দুই লাখে দাঁড়ায়। গেরিলাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল। তারা বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ও ঘাঁটি গড়ে তোলে। যখন তখন সুবিধামতো অবস্থায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের নাস্তানাবুদ করে তোলে।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানের সেনাপ্রধান লে. জে. এ এ কে নিয়াজী দেখতে পেলেন সেনাবাহিনীর যাতায়ত পথ প্রায় রুদ্ধ। ব্রিজ ভেঙে ফেলা হয়েছে। জলযানের উপরে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু হয়েছে। এসব পর্যবেক্ষণ করে তিনি মন্তব্য করেন, 'গেরিলাদের দুঃসাহসিক আক্রমণে তার চোখ অন্ধ, কান বধির হয়ে গেছে।' কিন্তু বাংলাদেশের জনযুদ্ধকে সামরিক যুদ্ধ হিসাবে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে শুধুমাত্র সেনা অফিসাররা নিজেদের কৃতিত্ব হিসাবে প্রচার করেছে, এমনকি তারা নিজেরাই সশস্ত্র দিবস ঘটা করে পালন করে। এতে তারা প্রমাণ করতে চায় অন্য কেউ নয়, না মুজিব বাহিনী না গেরিলা বাহিনী, না আঞ্চলিক বাহিনী কেউ যুদ্ধ করেনি এ যুদ্ধ যেন শুধুমাত্র তারাই করেছে। এই ধরনের ভ্রান্তি নিরসন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে জনযুদ্ধ সেই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।]

"বাঙালি সেনাবাহিনী হয়তো নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করত"

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নৃশংসতা ও শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। ব্যাপক গণহত্যা এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশার সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও নীতি নির্ধারকদের অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, ক. সামরিক খ. রাজনৈতিক গ. কূটনৈতিক ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে এই

সকল ফ্রন্টেই তাদের দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত টগবগে আবেগ আচ্ছন্ন অথচ বাংলাদেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে দৃঢ়প্রত্যয়ী তরুণ গেরিলা ট্রেনিংয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সামরিক বিজয় ব্যতীত ভারতের উপর চাপিয়ে দেয়া শরণার্থীদের বিরাট বোঝা অপসারণের অন্য কোনো বিকল্প নেই একথা বুঝতে ভারতের বিলম্ব হয়নি। সে লক্ষ্যে ভারত তার সমর পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের ট্রেনিং এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের নীতি গ্রহণ করে। একই সঙ্গে সিক্রেট ডিপ্লোম্যাসির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

নিয়মিত বাহিনীর সেনাসদস্যগণ পাকিস্তানি সেনা কাঠামোর আওতায় গড়ে ওঠা তাদের মন মানসিকতা ও অভিজ্ঞতা ছিল সম্মুখ সমরের। তাছাড়া গেরিলা যুদ্ধ করার জন্য যে রাজনৈতিক মটিভেশন অপরিহার্য তা ছিল অনেকাংশে অনুপস্থিত। ২৫ মার্চ অকস্মাৎ তাদের উপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আক্রমণ না করলে কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা অধিনায়কগণ তাদের নিরস্ত্র ও হত্যা না করলে তাদের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ। লক্ষণীয়, ২৫ মার্চের পূর্বে কোথাও কোনো বাঙালি সেনা অধিনায়ক বিদ্রোহ করেনি। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে না। সেজন্য জেনারেল ওসমানী মুক্তিবাহিনীর গঠন প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাংবাদিক খুশবান্ত সিংয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "পাকিস্তান সেনাবাহিনী যদি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে তাদের এ্যাকশন সীমাবদ্ধ রাখতো বাঙালি সেনাবাহিনী ও ইপিআর বাহিনী হয়তো নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করত। কিন্তু যখন সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো যে, পাকিস্তানিরা বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সেনা সদস্যদেরও হত্যা করছে কেবল তখনই আমরা বিদ্রোহ করি এবং এক দেহে একাত্ম হই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এভাবে মুক্তিবাহিনী তৈরি করেছে।"

একটু পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে, পাকিস্তানি সেনা কাঠামোর আওতায় গড়ে ওঠা বাঙালি সেনাবাহিনী প্রথম দিকে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেছে। পিচ ব্যাটেলে দাঁড়িয়ে গেছে। যদিও তাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, বিমান বা পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ছিল না। তারা আক্রমণমূলক ভূমিকা থেকে পিছু হটে শেষ পর্যন্ত এপ্রিল মাসের মধ্যেই ভারত সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছে। শক্তিশালী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এক্ষেত্রে ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম ছিল। যেহেতু তারা জনগণের পাশাপাশি ছিল সেজন্য জন আকাঙ্ক্ষায় উদীপ্ত হয়ে তাদের কিছু অংশ সরাসরি নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে আর কিছু অংশ অনিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে থেকে তাদের প্রাথমিক ট্রেনিং দিয়েছে গেরিলা যুদ্ধে এবং শেষ পর্যায়ে সম্মুখ সমরের অগ্রভাগে থেকেছে। সেনা অফিসারদের মধ্যে যে ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়– বরং মেজর খালেদ মোশাররফ ঢাকা-ময়মনসিংহ এলাকায় পরিকল্পিতভাবে গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবার পাশাপাশি গেরিলা যুদ্ধেও বিশেষভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বাঙালি সেনা অধিনায়কগণ পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বপ্রণোদিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি। যখন আক্রান্ত হয়েছে তখন 'বিদ্রোহ' করেছে, করেছে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম, মেজর শফিউল্লাহর মতো ব্যতিক্রম সেনা কর্মকর্তাদের সংখ্যা নগণ্য। অনেক সেনা অফিসার প্রায় দু'মাস পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাজ করেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রথম দিকের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়। প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশ সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমে অথবা তাদের পাশ কাটিয়ে অধিকাংশ নতুন ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দেশে পাঠানো শুরু হয়। দেশের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের উপযোগী কোনো সম্পূরক সংগঠন ছিল না। তবে গ্রুপে গ্রুপে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার মতো 'অটোমেটিক' কমান্ড ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায়। একক কমান্ডের নির্দেশে সব গ্রুপেই কাজ করেছে এমনটি বলা যাবে না। যার, যা আছে তাই নিয়ে তারা শত্রু নিধনে জীবনবাজি রেখেছিল। একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দেশের অভ্যন্তরে তারা নিজেরাই সংগঠিত হয় এবং ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি করে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে। প্রাথমিকভাবে গেরিলা যুদ্ধে যেমনটি হয়ে থাকে।

শক্তিক্ষয় ও দখলদার সৈন্যদের হয়রানি করার জন্য গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যথোপযুক্ত রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং, পরিকল্পনা ও কমান্ড ব্যবস্থার অধীনে গেরিলা গ্রুপগুলো জনগণের সহায়তায়, আশ্রয়ে বিভিন্নভাবে যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিল তার ফলে পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের সহযোগী আলবদর, রাজাকারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় সমর বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে পাকিস্তানি সৈন্যদের দুর্বল ও পরিশ্রান্ত করার কৌশল চূড়ান্ত বিজয়ের পথ। বাস্তবক্ষেত্রে প্রথম দিকে ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ছিল চার সপ্তাহের। পরে তা কমিয়ে তিন সপ্তাহ করা হয়।

'৭১-এর মার্চের শেষভাগে গৃহীত মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাদানের ব্যাপারে ভারতের সিদ্ধান্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক পরে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ২৯ জুলাই পার্লামেন্ট প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে তিনি বলেন, সমবেদনা ও সহযোগিতার অঙ্গীকারের একটি সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে এই পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে এবং সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে আমরা এটা বাস্তবায়িত করছি এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সমর্থনদানের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু আমরা করছি।[১]

দীর্ঘ প্রায় চার দশক পর আজ দৃশ্যমান হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জনযুদ্ধের সফলতাকে সামরিক বাহিনী এককভাবে কব্জা করে নিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালন করে প্রতিবছর তা তুলে ধরা হয়। যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী ও গেরিলাদের সংখ্যানুপাত তুলে ধরা যেতে পারে। নিয়মিত বাহিনী এবং গেরিলা বাহিনী সংখ্যা কত?

১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' একটি অসামান্য বই লিখেছেন, সেই বইতে সামরিক বাহিনী (নিয়মিত বাহিনী) এবং গেরিলা যোদ্ধাদের (অনিয়মিত বাহিনী) একটি হিসেব দিয়েছেন, এখানে তা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ নম্বর সেক্টর: সৈন্যসংখ্যা ছিল ২ হাজার। গেরিলাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ হাজার।

২ নম্বর সেক্টর: সমগ্র সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিল প্রায় ৬ হাজার এবং গেরিলা ছিল ২৯ হাজার।

৩ নম্বর সেক্টর: গেরিলা সদস্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। এস ফোর্স গঠনের পর মেজর সফিউল্লাহকে এস ফোর্স কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। এটি ছিল ব্যাটিলিয়ান পর্যায়ের।

৪ নম্বর সেক্টর: সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ হাজার এবং গেরিলা ছিল ৯ হাজার।

৫ নম্বর সেক্টর: নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮শ' এবং গেরিলা ছিল ৫ হাজার।

৬ নম্বর সেক্টর: সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২ হাজার এবং গেরিলা ছিল ৯ হাজার।

৭ নম্বর সেক্টর: সৈন্যসংখ্যা প্রায় ২ হাজার এবং গেরিলা সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার।

৮ নম্বর সেক্টর: সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ হাজার। গেরিলা ২৫ হাজার।

৯ নম্বর সেক্টর: গেরিলা ছিল প্রায় ২০ হাজার। সৈন্য ছিল এক ব্যাটিলিয়নের মতো।

১০ নম্বর সেক্টর: এই সেক্টরের কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। শুধু নৌ-বাহিনীর কমান্ডোদের নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের সদস্যদের শত্রুপক্ষের নৌ-যান ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। নৌ-অভিযান শেষ হওয়ার পর কমান্ডোরা আবার তাদের মূল সেক্টর অর্থাৎ ১০ নম্বর সেক্টরে ফিরে আসত।

১১ নম্বর সেক্টর: এখানে নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা ছিল ১২০০ এবং গেরিলার সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ হাজার।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮,০০০ এবং গেরিলাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখ ৭৪ হাজার। তাছাড়াও কাদেরিয়া বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী এবং মীর্জা আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক বা স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা গেরিলা বাহিনীর সংখ্যা কম করে হলেও দাঁড়াবে আরো ৪৫ হাজার। তাছাড়া মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষিত সংখ্যা ছিল ৭ হাজার। সর্বমোট গেরিলাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ২৭ হাজার। তবে এই সংখ্যাটি যে একেবারেই সর্বাংশে তথ্যগতভাবে নির্ভুল এমনটি দাবি করা যায় না। কেননা জেড ফোর্স, কে ফোর্স, এস ফোর্সের ব্রিগেডগুলো যৌথ কমান্ড ভেঙে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এদের সংখ্যা নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে অথবা গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে কিনা তার কোনো স্পষ্ট পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। জনগণের যুদ্ধ। দেশপ্রেমিক প্রতিটি বাঙালি এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এটা শুধু এককভাবে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে অন্য একটি সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ ছিল না। এটা ছিল বাঙালির মুক্তির ও স্বাধীনতার যুদ্ধ। অস্তিত্বের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে এবং রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। এই যুদ্ধ ছিল বিশেষভাবে রাজনৈতিক যুদ্ধ। সামরিক-বেসামরিক সকলেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কী ধরনের কী মানসম্পন্ন সহায়তা দেয়া হয়েছিল, বিভিন্ন প্রমাণিক গ্রন্থে সেটা লিপিবদ্ধ আছে। গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা সিদ্দিকি সালিক তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে, ১,০০,০০০ গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ৩০.০০০ জন সাধারণ প্রথাসিদ্ধ কায়দায় যুদ্ধ করবে এবং বাকি ৭০.০০০ যুদ্ধ করবে গেরিলা কায়দায়। রবার্ট জ্যাকসন লিখেছেন যে, মে মাসের শুরু থেকে সামরিক বাহিনীর কমান্ড গঠন, প্রশিক্ষণ ও সশস্ত্রীকরণ আরম্ভ হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলাযুদ্ধ চালাবার জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে প্রচ্ছন্নভাবে সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়। মুক্তিবাহিনীর অভিযানকে সিদ্দিকি সালিক সংক্ষেপে তিনটি পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। জুন ও জুলাই মাসে মুক্তিবাহিনী লড়াই করেছে মূলত সীমান্ত অঞ্চলে, যেখানে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য ভারতীয় বাহিনী আশেপাশেই ছিল। সেই পর্যায়ে তাদের মূল সাফল্যের মধ্যে ছিল ছোটখাটো ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া, পাকিস্তানিদের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এর পরের দুই মাসে তারা ঢাকা পর্যন্ত পাকিস্তানি সাঁজোয়া বহরের ওপরে অ্যামবুশ করা থেকে শুরু করে পুলিশ স্টেশন ঘেরাও করা, গুরুত্বপূর্ণ ফরমেশনসমূহ উড়িয়ে দেয়া, নৌযান ডুবিয়ে দেয়া, ইত্যাদি। অক্টোবর ও নভেম্বর ভারতীয় সৈন্য ও আর্টিলারির সহায়তায় সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে তারা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং শহরগুলোতে পাকিস্তানিদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তিনি বলেছেন যে, এই সময়েই ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানি অবস্থানের কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থানে ব্রিজহেড তৈরি করে, যা পরবর্তীতে যুদ্ধের সময়ে সুবিধাজনকভাবে তারা ব্যবহার করে।

১৯৭১ সালের মে মাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ সৃষ্টির জন ভারত 'বিদ্রোহীদের' রিক্রুট এবং তাদের ট্রেনিং দিয়ে চলছে। লন্ডন টাইমসের একজন প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের একটি রিক্রুটিং সেন্টার পরিদর্শন করেছেন। ১৯৭১ সালের ১৮ জুন তারিখে প্রেরিত এক রিপোর্টে তিনি বলেন যে,. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ দাবি করেন যে তথাকথিত বাংলাদেশ বাহিনীর সব ট্রেনিং কেন্দ্রই বাংলাদেশের কোথাও অবস্থিত রয়েছে। কিন্তু টাইমসের প্রতিনিধি যখন জানতে চান যে এগুলোকে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঠিক কোন বিশেষ জায়গায় অবস্থিত? তখন উত্তরে বলা হয় যে, এটি একটি সামরিক গোপনীয় তথ্য। লন্ডন টাইমসের প্রতিনিধি আরও জানায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে এ রকম প্রায় শ' খানেক ট্রেনিং কেন্দ্র রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, রিক্রুটিং পয়েন্টগুলো এমন সব জায়গায় অবস্থিত, যেগুলো বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যে এগুলো উদ্বাস্তুদের রেজিস্ট্রেশন অফিস। লন্ডন টাইমসের প্রতিনিধির খবর অনুসারে যাদের রিক্রুটিং সেন্টারে যোগদানের জন্য আনা হয় তাদের শপথ নিতে হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমৃত্যু যুদ্ধ করতে হবে। লন্ডনে বৃটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানে প্রকাশিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক খবরে বলা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব সশস্ত্র বিদ্রোহীর সম্প্রতি সীমান্তের ওপারে চলে গেছে, ভারতীয়রা প্রকাশ্যভাবে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে, এসব বিদ্রোহীর মধ্যে রয়েছে, সামরিক বাহিনীর লোক এবং অন্যান্যরা। গার্ডিয়ান প্রতিনিধি একটি বর্ডার ক্রসিং পয়েন্টে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর অবস্থানের পাশে তাঁবু খাটানো একটি শিবিরে রাইফেলধারী সশস্ত্র ব্যক্তিদের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

লাগোসের নাইজেরিয়ার পত্রিকায় মে মাসের সংখ্যায় বলা হয়েছে, ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর দুটি রিলিফ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অনুপ্রবেশকারীদের এসব কেন্দ্রর মধ্যে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়। তিন চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণে শুধু মৌলিক বিষয়গুলোই মোটামুটিভাবে শেখানো হয়। এছাড়াও নিম্ন ও মধ্যম পর্যায়ের অধিনায়ক তৈরির ওপরেও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এহেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিরামহীন স্রোতের শরণার্থীর আগমন ভারতের জন্য সৃষ্টি করে জাতীয় বিপর্যয়ের মতো এক একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। বিপর্যয় থেকে নিষ্কৃতীর একমাত্র পথ হলো তাদের নিরাপত্তা সহকারে স্বদেশে ফেরত পাঠানো।

বাংলাদেশ সংকটের উপযুক্ত সমাধান অন্বেষণকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ সংগ্রাম যাতে সম্পূর্ণভাবে না থেমে যায়, এ মর্মে ন্যূনতম ব্যবস্থা হিসেবে ছাত্র-যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিংদানের প্রয়োজন ভারতের কর্তৃপক্ষ মহলে স্বীকৃত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয় ৩০ এপ্রিল। ৯ মে তাদের হাতে ন্যস্ত হয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু বাংলাদেশের তরুণদের সশস্ত্র ট্রেনিংদানের দায়িত্ব। এপ্রিল মাসে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) বিক্ষিপ্তভাবে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যে সীমিত সাহায্য করে চলেছিল তার উন্নতি ঘটে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত চার সপ্তাহ মেয়াদি এই ট্রেনিং কার্যক্রমের মান উঁচু পর্যায়ের ছিল না, শেখানো হতো সাধারণ হালকা যন্ত্র ও বিস্ফোরকের ব্যবহার।

১২ মার্চ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনীকে পাকিস্তান বাহিনী ধাওয়া করে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেয়। দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্রই সামরিক সন্ত্রাস। তাদের সহযোগী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের উদ্যোগে গঠিত 'শান্তি কমিটির' তৎপরতার ফলে স্বাধীনতা সমর্থকের নিরাপদে বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যে সব বিদ্রোহী সেনা পাকিস্তানি আক্রমণের মুখে স্বজন-পরিজন ফেলে ভারতে এসেছিল অস্ত্রশস্ত্রের আশায়, তারাও প্রত্যাশিত সামরিক উপকরণ না পাওয়ায় পাল্টা অভিযান শুরু দূরে থাক, তাদের অবস্থা ছিল অসহনীয়। গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র যা পাওয়া যেত তা প্রয়োজন ও প্রত্যাশার তুলনায় নিতান্ত কম। তদুপরি দেশের ভেতর থেকে দখলদার সেনাবাহিনীর ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধির সংবাদে মনোবল বজায় রাখা ছিল সত্যই কঠিন। তবু মে-জুনে এসে এই হতাশা ও বিপর্যয় অবস্থা কাটতে থাকে। ট্রেনিং কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হয় গেরিলা যোদ্ধাদের প্রকৃত প্রস্তুতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দিকে রিক্রুটিং সীমাবদ্ধ ছিল কেবল আওয়ামী লীগ দলীয় যুবকদের মধ্যে। নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এ সিদ্ধান্ত ছিল যথার্থ। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে আগ্রহীদের বিরাট সংখ্যার অনুপাতে ট্রেনিংয়ের সুযোগ ছিল অপ্রতুল। ট্রেনিং-পূর্ব তরুণদের একত্রিত রাখা এবং তাদের মনোবল ও দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় 'যুবশিবির' ও 'অভ্যর্থনা শিবির' সৃষ্টি হয়। এসব শিবিরে ভর্তি করার জন্য যে স্ক্রিনিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, কেবল সে সব তরুণরাই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা শনাক্তকৃত হবার পর ক্যাম্পে ভর্তির অনুমতি পেত। এসব ক্যাম্পে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত তরুণদের ভর্তি করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের নির্দেশাবলী যাই থাক না কেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত। মুজিবনগর থেকে পাঠানো ঐ সব নির্দেশাবলি কাগজে—কলমেই থেকে যেত। জনপ্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ছাড়াও, প্রত্যেক ক্যাম্পে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বারুদ বিশেষজ্ঞ একজন ট্রেনার নিযুক্ত করা হয়। ট্রেনিংয়ের জন্য বাছাই করা তরুণদের রাজনৈতিক বিশ্বাস, কর্মক্ষমতা, অগ্রগতি সম্পর্কে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট পেতেন। মানসিক দুশ্চিন্তা বহুলাংশে হ্রাস পেত। অবশ্য পরে, আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, সামগ্রিক সমস্যার চাপে ভারত সরকারের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যখন পরিবর্তন ঘটে। গঠিত হয় সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের অবস্থান অপেক্ষাকৃত সবল হয়, তখন বাংলাদেশের প্রগতিশীল তরুণদের সম্পর্কে এই বিধি নিষেধ বহুলাংশে অপসারিত হয়।

আওয়ামী লীগের তুলনামূলক বিরাটত্বের দরুন গেরিলা বাহিনীতেও আওয়ামী লীগপন্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। যে প্রক্রিয়ায় এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে রিক্রুটিং করা হতো, এর প্রয়োজন ও আবশ্যকতা ছিল। প্রথমত, গেরিলা ট্রেনিংয়ে মনোনয়নের ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ করার যে বিধান ছিল সেই সুপারিশের অপব্যবহার খুব একটা ঘটেনি। এদের স্থানীয় রাজনীতির সুবিধার্থে অধিক সংখ্যায় কেবল নিজ নিজ এলাকার তরুণদের মুক্তিবাহিনীতে ঢোকাবার ঝোঁক ছিল। অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীর দৈহিক যোগ্যতা, সংগ্রামী স্পৃহা এবং চারিত্রিক গুণাগুণ শিথিলভাবে বিচার করা হলেও তাদের মনোবল, আদর্শগত সহমর্মিতা বিচার করা হতো নিবিড়ভাবেই।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানেচ্ছু অপর রাজনৈতিক ছাত্র-যুবকদের রিক্রুটিং ছিল সীমাবদ্ধ। ফলে তাদের মনে ছিল প্রবল ক্ষোভ ও হতাশা। দেশের ভেতরে পাকিস্তানি নির্যাতন যতই গ্রাম-গ্রামান্তরে পৌঁছেছে এবং বিশেষভাবে তরুণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে, ততই প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্র-যুবক ট্রেনিং লাভের আশায় ভারতে এসে ভিড় করেছে, মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছে সাধারণ শরণার্থী শিবিরে অথবা অননুমোদিত ক্যাম্পের অবর্ণনীয় দুর্দশার পরিবেশ। মার্চ-এপ্রিলের পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞের মুখে বিভিন্ন দল, মত ও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপক্ষে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তার প্রেক্ষিতে রিক্রুট ও ট্রেনিংয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রে তরুণদের একতা কখনই বিনষ্ট হয়নি। সেপ্টেম্বরে রিক্রুটিংয়ের ক্ষেত্রে দলীয় বৈষম্যের নীতি অনেকখানি হ্রাস পেলেও সার্বিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল।[২]

গেরিলা বাহিনী নিঃশেষ হচ্ছে না এবং দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং নাশকতা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে শক্তিশালী পাকিস্তান বাহিনীর কাছে তারা দৃশ্যমান। তারা দক্ষ, কর্মক্ষম এবং ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত। তারা পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে অবস্থিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বকে জানান দিয়েছে তারা সক্রিয়। বিদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ ও নিরাপত্তার অভাবে বৃটিশ শিপিং লাইন বন্দরে আসা বন্ধ করেছে। গেরিলারা শুধু তাই নয় ১৫৭টি বড় ধরনের সড়ক ও রেলওয়ে ব্রীজ ধ্বংস করেছে।

সড়ক ও রেলপথে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জলপথেও গেরিলাবাহিনী উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৭ অক্টোবর '৭১ নিউ ইয়র্ক টাইমস বাঙালি গেরিলাদের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসাসূচক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলেছে, ভিয়েতনামের যা করতে ছয়মাস লেগেছিল, সে বিবেচনায় বাংলাদেশের গেরিলা যোদ্ধাদের শুরুটা উল্লেখযোগ্যই বলতে হবে।

রেল সড়ক যোগাযোগ বিপর্যস্ত হলে পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ একটি হেলিকপ্টার বাহিনী ব্যবহার এবং পেট্রোল বোট ব্যবহার করছে যেগুলো তারা পূর্ববাংলায় ঘূর্ণিঝড়ের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য পেয়েছিল। এগুলোর সাহায্যে যোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা দুর্বল হয়ে পড়ে। হেলিকপ্টার বাহিনী দ্বারা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা ব্যয়বহুল। আর্থিক অনটন দেখা দেয়। যেখানে গেরিলারা সক্রিয়ভাবে শত্রুসেনাদের উপর কৌশলগত যুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছে সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, নৌ-বহরের বিরুদ্ধে চালনা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে গেরিলারা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে ঠেলে দিতে বাধ্য করেছে। যদিও দখলদার সরকারকে দেশের অধিকাংশ জেলা এবং থানায় প্রশাসনিক কর্তৃত্বে নাজুক হয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজ বন্ধ। গেরিলারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল এতটা ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছে যে, বর্ধিত বেতন ও পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে পাকিস্তান সামরিক সরকারকে এখন সৈনিকদের মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্ররোচিত করতে হচ্ছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে গেরিলাদের আক্রমণে ৩ হাজার রাজাকার পাকিস্তানের পক্ষে ছেড়ে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ৩ হাজার পূর্ব পাঞ্জাব রেঞ্জার সীমান্তে প্রহরায় এখন আর কার্যকর ভূমিকা রাখতে প্রায় অক্ষম। সেজন্য অন্তর্ঘাত দমনের কাজ করছে পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনী। কিন্তু অন্তর্ঘাত দমন প্রক্রিয়া সহজ নয়। এটি হলো আত্মরক্ষার একটি কৌশল মাত্র। বলতে গেলে পাকিস্তান বাহিনী এখন সীমান্তের দিকে ঘাঁটি গেড়েছে এবং আক্রমণের মানসিকতা পরিত্যাগ করে নিজেদের আত্মরক্ষার কাজেই নিয়োজিত করেছে। সে লক্ষ্যে তারা সুরক্ষিত অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছে।

আইন শৃঙ্খলা ও প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছে। ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর মধ্যে এসব দেখে শুনে অধিক বিষণ্ণতা ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিবাহিনী একের পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক আঘাত হেনে চলেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামনে বাড়তে অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছে। নৈতিকভাবে হতোদ্যমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় অনিবার্য। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ অথবা আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের মতো মুক্তিবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল বিজয় সুনিশ্চিত।

দেশব্যাপী গেরিলা নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল। রাজধানীর চারপাশে ওঁৎ পেতে থাকত ত্রিশ হাজার গেরিলা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেরিলাদের কর্মকাণ্ডে শক্তিশালী পাকিস্তান সামরিক বাহিনী রাতের বেলায় ইঁদুরের মতো গর্তে ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। চারদিকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু আতঙ্ক। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে পূর্বাঞ্চলীয় পাকিস্তান সেনাপ্রধান লে. জে. এ.এ.কে নিয়াজী ছিল উদভ্রান্ত। 'দুঃসাহসিক গেরিলাদের আক্রমণে তার চোখ অন্ধ ও কান বধির হয়ে গিয়েছিল।'[৩] এটাই ছিল নিয়াজীর ভাষ্য।

পাকবাহিনী গেরিলাযুদ্ধ শুরু করতে চেয়েছিল

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই পাকিস্তান সামরিক বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশের জন্য তিনটি পর্যায়ে সামরিক পরিকল্পনা তৈরি করে।

২৫ মার্চ থেকে প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পাকিস্তানি সামরিক পরিকল্পনা মূল কথা ছিল সমগ্র প্রদেশ দখল কর। স্বাধীনতাকামী মনে হলে তাকে শেষ করে দাও। নির্বিচারে নির্দ্বিধায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে: মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ শুরু হলে পাকিস্তান সামরিক পরিকল্পনার পরিবর্তন হলো। তারা কাউন্টার ইনসারজেন্সির জন্য গঠন করল বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ ও বাহিনী। পাকিস্তান সমর্থক বাঙালিদেরকে নিয়ে গঠন করল রাজাকার বাহিনী, আলবদর, আলশামস বাহিনী। ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস ই.পি.সি.এ.এফ বাহিনী গঠিত হলো প্রধানত অবাঙালিদেরকে নিয়ে।

জেনারেল নিয়াজী তার পরিকল্পনার কথা বলেছেন এভাবে, 'ভারতীয় ভূখণ্ডে পাল্টা কাযকর্র ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি কয়েকটি নাজুক স্থান বাছাই করে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে সে জন্য অনুমতি দেয়া হয়নি। অক্টোবর ১৯৭১ পর্যন্ত আমি ভারতীয় ভূখণ্ডে গেরিলা আক্রমণ চালানো ও সীমিত কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের মতো অবস্থায় ছিলাম।

ভারত যখন পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে বেষ্টনী গড়ে তুলেছিল তখন আমাকে অন্তত সীমান্তের ওপারে কমান্ডো ও গেরিলা পাঠানোর অনুমতি দেয়ার জন্য ইসলামাবাদের নিকট জানিয়েছিলাম। শত্রুর উপর চাপ সৃষ্টি করা আর শত্রু সমাবেশকে বিলম্বিত করা এবং মোতায়েনকৃত সৈন্য প্রত্যাহারে তাকে বাধ্য করা আর সেতু কালভার্টগুলো উড়িয়ে দেয়া এবং দুশমনদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে যথোচিত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আমি বরাবর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম।'

এই গেরিলা ও কমান্ডো অপারেশন করার জন্য রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী ও অবাঙালিদের নিয়ে ই.পি.সি.এ.এফ বাহিনী গঠন করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই সাথে তাদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত, পূর্ণমাত্রায় সমর্থন সহযোগিতা করার জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে গঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি। এসব শান্তি কমিটি ও পাকিস্তান গেরিলাবাহিনীদের নানা দায়িত্ব দেয়া হলো। মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের খুঁজে বের করা, গেরিলাদের সাহায্যকারী ও আশ্রয় দাতাদের উপর অত্যাচার চালানো। তাদের নামধাম সেনাবাহিনীকে সরবরাহ করা। রেলব্রিজ, শিল্প, অফিস আদালত পাহারা দেয়। আলবদর বাহিনীর পাহারা দেবার দায়িত্ব ছিল না।

তৃতীয় পর্যায়ে ছিল সরাসরি আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ সংক্রান্ত। পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সেই সময় পাকিস্তান সামরিক বিশারদগণ পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ডার ও শাসক জেনারেল নিয়াজীর বিবেচনার জন্য কয়েকটি সমর পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছিল।

গেরিলাদের সাফল্য সম্পর্কে মেজর জেনারেল ডি. কে পালিডের মূল্যায়ন অবশ্য কিছুটা ক্রিটিক্যাল। যদিও সাম্প্রতিকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ এবং সাফল্যের খবর বাংলাদেশ যুদ্ধের প্রথমাবস্থার মতো অতিরঞ্জিত নয়, তথাপি সংবাদপত্রসমূহ অবাস্তবভাবে আশাবাদী। ঐ দেশে কী ধরনের সামরিক অভিযান চলছে তার সঙ্গে এদের কারো পরিচয় নেই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায়ই মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্বাধীন মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি হবার খবর থাকে। বাংলাদেশ সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সদস্য দাবি করেছেন যে গেরিলারা প্রতিমাসে পাঁচ হাজার পাকিস্তানি সৈনিককে হত্যা করছে। পাকিস্তানকে নাকি প্রতিমাসে দেড় শ' কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এই সমস্ত আশাব্যঞ্জক খবরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরাজয় অত্যাসন্ন এবং মুক্তিবাহিনী স্বীয় শক্তিতেই বিজয় অর্জনে সক্ষম। এই সমস্ত অবাস্তব খবরের কারণ হচ্ছে, যদিও এখন আমরা মুক্তিবাহিনীর শক্তি, সংগঠন ও কৌশল সম্পর্কে কিছুটা জানি, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। যেহেতু পাহাড়ের অন্যদিক থেকে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। গেরিলাদের সফলতার কাহিনী শুনে এটাই মনে হতে পারে যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে এবং তারা ভীতি ও পরাজয়ের অনিবার্যতাকে মেনে রেখে হারার জন্যেই যুদ্ধ করে যাচ্ছে। এটা সত্য নয়। ১৪ মার্চে যখন শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শাসন নিজের হাতে তুলে নেয়ার কথা ঘোষণা করেন, পূর্ব বাংলায় তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান ছিল এরকম চৌদ্দটি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন সমন্বিত চারটি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড নিয়ে গঠিত চৌদ্দতম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন। একটি হালকা ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট। তিনটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট। অন্যভাবে বলা যায় এই পদাতিক ডিভিশনে পদাতিক সৈন্যের কিছু কমতি নেই, কিন্তু কম আছে গোলাবন্দুকের পরিমাণ। যাই হোক এই চৌদ্দটি ব্যাটেলিয়ানের পাঁচটি নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, যাতে সবাই বাঙালি। বাহিনীর এই অংশটি অনুগত থাকেনি। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, এদের সবাই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। উর্ধ্বতন অফিসারদের হত্যা করার পর, অনেককে নিরস্ত্র করা হয় এবং বহুজনকে বন্দি করা হয়। এর ফলে এই বাঙালি রেজিমেন্টের একটি অংশই যা একটি কোম্পানির বেশি হবে না– মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দ নম্বর ডিভিশন ছাড়া আর ছিল তিন হাজার রাজাকার (যাদের সবাই বাঙালি) এবং তিন হাজার পূর্ব পাঞ্জাব রেঞ্জার (বাঙালি ও পাকিস্তানি সমন্বয়ে গঠিত)– যাদের ভূমিকা আমাদের বিএসএফ-এর মতো। এই অনিয়মিত বাহিনীর অধিকাংশ বাঙালিই পালিয়ে যায় এবং যেখানেই নিজেরা সংগঠিত হতে পেরেছে এরা বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। শেখের সাথে আলোচনার ভান করার সময়ই ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সমাবেশের আদেশ দেন। এপ্রিলের শেষাশেষি তিনি বাংলাদেশে উনচল্লিশটি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ান এবং ছ'টি আর্টিলারি রেজিমেন্ট নিয়োজিত করেন। সংখ্যার দিক দিয়ে এটা চার ডিভিশনের সমান। যদিও অস্ত্র ও গোলাবারুদ আপেক্ষিকভাবে কম। এই বিশাল শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আসতে চেয়েছে মুক্তিবাহিনী। এর জন্যে মূল্যও কম দিতে হয়নি তাদেরকে।

সংঘাতের প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানিদের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট– ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর এবং উত্তরে রংপুরে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা। এর সাথে সাথে সীমান্তবর্তী শহরগুলোকে আয়ত্তে রাখা যাতে মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন না করতে পারে। মুক্তিবাহিনী কয়েকটি শহর যেমন– কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দুটি শহরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুনঃদখল করে। সিলেট এবং ময়মনসিংহ নিয়ে তাদের কিছু সমস্যা হয়েছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি উড়িয়ে দেয়ার ফলে পাকিস্তানিদের অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে এক মাসেরও বেশি সময় লেগেছিল। নিয়মিত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি তিন হাজার পাকিস্তানি রেঞ্জারকেও নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু এরা অন্তর্ঘাত দমনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিল এমনটি ধরে নেওয়া ভুল। রেঞ্জারদের মোতায়েন করা হয়েছে সীমান্ত প্রহরায়। এ কাজের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয়নি। কারণ সীমান্তে নিয়মিত সেনাবাহিনীর লোকও রাখা হয়েছে। 'অন্তর্ঘাত দমনের' কাজ করছে পাকিস্তান নিয়মিত সেনাবাহিনী। এখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কৌশল হচ্ছে বাংলাদেশের সমস্ত শহরাঞ্চলে এবং ক্যান্টনমেন্টগুলিতে পুরোপুরি কর্তৃত্ব বজায় রাখা এবং বিপজ্জনক সীমান্ত এলাকায় প্রহরা চৌকি চালু রাখা। গোপনসূত্র থেকে খবর পাওয়ামাত্র এই সমস্ত শক্ত ঘাঁটি থেকে সীমান্তে বা মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটিগুলোতে সৈন্য পাঠানো হচ্ছে। এটা অন্তর্ঘাত দমন প্রক্রিয়া নয়। আত্মরক্ষার একটি কৌশল। যা হোক, পাকিস্তান সরকারের লক্ষ্য যদি হয় সারা দেশে সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা, তা হলে বলা যেতে পারে সে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। সামরিক দিক থেকে এটা একটি শক্ত অবস্থান হলেও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা কৌশল এই বৃত্তের প্রান্তসীমাতেই আঘাত আনতে সক্ষম। এদেরকে হটাতে হলে এবং তথাকথিত মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করতে হলে সম্মুখ যুদ্ধের প্রয়োজন। এপ্রিল-মে মাসে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি থেকে এটা বোঝা গেছে যে, এই জাতীয় আক্রমণের জন্যে তারা এখনো প্রস্তুত নয়।

এটাও ধরে নেয়া খুব বাস্তব সম্মত নয় যে, কৌশলগত দিক থেকে পাকিস্তানি সামরিক আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা বিপর্যয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মুখীন। এটা সত্য যে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সেক্টরে রেল ও সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। যা হোক, পাকিস্তান একটি হেলিকপ্টার বাহিনী ব্যবহার করছে এবং অনেক পেট্রোল বোট যেগুলো তার পূর্ব বাংলায় ঘূর্ণিঝড়ের সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্যে পেয়েছিল। এগুলোর সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। যেহেতু সেনাবাহিনী একটি প্রলম্বিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের রক্ষণ ব্যয় স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি। আর্থিক অনটন কিছুটা হয়তো হয়েছে। কিন্তু সমর সম্ভার নিঃশেষ হয়ে গেছে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। মুক্তিবাহিনী বীরোচিত প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সামরিক সাফল্যের যে অবাস্তব চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে তার একটি বাস্তব বিবরণ দেয়া প্রয়োজন। মুক্তিবাহিনীর প্রধান কাজ হচ্ছে প্রতিরোধ। এদের কাছ থেকে সামরিক বিজয় আশা করা সঙ্গত নয়। অপর পক্ষ যেখানেই গেরিলার এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজে অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে– সীমান্তে ঢাকা ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে, নৌবহরের বিরুদ্ধে, চালনা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে তারা শত্রুকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে সরে যেতে বাধ্য করেছে। তারা দখলদার সরকারকে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা থেকে বিরত করেছে এবং তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মনোবল এতটা ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছে যে বর্ধিত বেতন ও পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে সরকারকে এখন সৈনিকদের মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে প্ররোচিত করতে হচ্ছে। কিন্তু এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান ঠিক হবে না যে মুক্তিবাহিনী অচিরেই একটি সামরিক বিজয় ছিনিয়ে আনতে যাচ্ছে। হিন্দুস্তান টাইম্‌স (নয়াদিল্লী)[৪]

লে. জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজী তাঁর বইতে লিখেছেন, ২৫ মার্চের সামরিক অভিযানের পর পুলিশ, রাইফেলস, আনসার, ইস্টবেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন, নেভী, এয়ারফোর্স পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরাই পরবর্তীকালে মুক্তিবাহিনী নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে। তিনি লিখেছেন, আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক সংকটকালে গোপনে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং বামপন্থীরাও একই ধারায় অগ্রসর হয়। ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন সেনাবাহিনীর সকলেই বিপুল সংখ্যায় মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। এবং ভারত সীমান্তের কাছাকাছি ৫৯টি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করে এবং তাদেরকে উপকরণ সহায়তা করে। এদেরকে মৌলিক অস্ত্রশস্ত্র প্রশিক্ষণ, গেরিলা যুদ্ধের কলা-কৌশল, বিস্ফোরক, মাইন পুঁতে রাখা এবং গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে নাশকতা ও ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টির কলা-কৌশল শিখানো হয়। তারা নৌপথে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে এবং প্রায় তিনশ জন নৌ-সেনাকে আগরতলা থেকে কোচিংয়ে পাঠানো হয়। যেখানে তারা আন্ডার ওয়াটার নাশকতার প্রশিক্ষণ নেয়। তাছাড়াও আরো তিনশকে পলাশীর নিকট পশ্চিম বাংলার ভৈরব নদীতে ফগম্যান তৈরির জন্য প্রশিক্ষিত গ্রহণ করে ইন্ডিয়ান নেভী অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান নেভীর সাবমেরিন এবং প্রশিক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফগম্যানরা এসে মুক্তিবাহিনী সঙ্গে যোগ দেয়। দেরাদুন লক্ষ্মৌতে আট সদস্যের রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ দল আর্টিলারি এবং সিগনেল ট্রেনিং প্রদান করে। তরুণ বাঙালি শিক্ষিত ছাত্রদের ভেতর থেকে কমান্ড ট্রাকচার ঠিক করার জন্য ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমির মাধ্যমে ৬শ' জনকে ট্রেনিং দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, মুক্তিবাহিনী বেদায় এলাকায় বিমান ঘাঁটি স্থাপন করে। তাদেরকে ভারত সরকার দুটো বিমান দিয়ে সাহায্য করে।

জুনের শেষ দিকে ৭০ হাজার যুবককে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যারা বাংলাদেশের ভেতরে অক্টোবর মাসেই ঢুকে পড়ে। এবং নভেম্বর শেষ দিকে আরো ৩০ হাজার যুবক ছোট অস্ত্র, মর্টার, গ্রেনেড, স্টেনগান এস.এল.আর এবং বিস্ফোরক নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তারা অতর্কিত গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর যোগাযোগের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে ফেলে। সবচেয়ে বড় বিজয় ছিল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবলকে ভেঙে ফেলা।

এ সম্পর্কে ক্যাপ্টেন এস.কে.খান লিখেছেন– "মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষ্যে উন্নীত করার পরিকল্পনায় ত্রিশ হাজার নিয়মিত এবং ৭০ হাজার অনিয়মিত অর্থাৎ গেরিলা বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ টগবগে তরুণদের, যারা জীবনবাজি রেখে দক্ষ গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করা ছিল জরুরি। পরবর্তী পর্যায়ে আরো ব্যাপকভাবে গেরিলাদের ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিল যারা দেশের অভ্যন্তরে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সাহায্য পেয়েছিল, সহযোগিতা, আশ্রয়, খাদ্য পেয়েছিল, শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষ থেকে। গেরিলার ৬২ হাজার গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন গ্রামে তারা অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। জনগণ তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ ধামাচাপা দিয়ে দেশ স্বাধীন করা লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছিল। কারণ বাংলাদেশের গেরিলাবাহিনী ছিল "one of the most highly educated armed forces" গেরিলাদের অপারেশন দ্রুততম সঙ্গে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলছিল। জনযুদ্ধ সম্পর্কে লিন বিয়াসো যে বিখ্যাত থিসিস লিখেছেন, "জনযুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক" যা বাংলাদেশের গেরিলারা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের নেতৃত্বে দিয়েছে কমুনিস্ট নয় এমপি ব্যক্তিরা। উন্নত অস্ত্রশস্ত্র হাতে পাওয়ার পর গেরিলা ও পাকিস্তানি সৈন্যদের হতাহতের অনুপাত ছিল ১:৪ এবং সেপ্টেম্বরে এ অনুপাত ছিল ১:১৫। অক্টোবরের মধ্যে ২৫ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগী বাহিনী গেরিলাদের হাতে হতাহত হয়েছিল।" এ সময় সানডে টেলিগ্রাফ-এ প্রকাশিত সংবাদটি ছিল, বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণ গেরিলাযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ফেলে আসা অস্ত্র ডিপো দখল করে উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাফিরা করছিল। এমনকি, গেরিলারা চট্টগ্রাম বন্দরের চারপাশ ঘিরে ছিল। যার ফলে প্রতিদিন যে ৬০০ টন রসদ গোলাবারুদ অপরিহার্য ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। এসব ঘটনাবলি ব্যাপকভাবে দেশি-বিদেশি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের দিকে মোড় নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতেরবেলায় মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব

ঢাকা থেকে মার্কিন সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক'-এর বিশেষ প্রতিনিধি সিনিয়র সম্পাদক আর নো দ্য বোরচা গ্রাফ বাংলাদেশের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা খুবই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্ববাসীর কাছে তা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা বিশেষভাবে তুলে ধরতে। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর এখন মুক্তিবাহিনীর সুদৃঢ় কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে। পাকিস্তানে এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের পথে। সারাবাংলাদেশে এখন ১ লাখের উপর গেরিলা সৈন্য পাকিস্তানি সেনাদের খতম করবার কাজে নিয়োজিত। চরম আঘাত হেনে শত্রুকে ধরাশায়ী করবার প্রস্তুতি চলছে সর্বত্র। ঘরে ঘরে আজ সত্যই দুর্গ গড়ে উঠেছে। যুদ্ধ করছে তারা পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। জয়ের চরম লগ্ন এগিয়ে আসছে।

সাংবাদিক বোরচা লিখেছেন, "আমি ও লন্ডন ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাংবাদিক ক্লার হোলিং ঢাকা থেকে ৫ মাইল দূরে মুক্ত অঞ্চলে গিয়েছিলাম। স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সদর দফতরে আমরা দেখতে গেলাম, যোদ্ধারা প্রকাশ্যেই তাদের আস্তানার চার ধারে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করছে। ওদের কোনো ভয় নেই পাকিস্তান ফৌজের জন্য। প্রত্যেকেই ওরা পরস্পরের সাথে কথা বলছিল সাধারণ কণ্ঠস্বরে। গেরিলা নেতা আবদুল মান্নান আমাদের বলেন, জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা তাই ভয় পাই না। পাক ফৌজ আসছে এই খবর পৌঁছে যায় আমাদের কাছে। যথাসময়ে জনসাধারণ আমাদের হুঁশিয়ার করে দেয় পাক ফৌজের আগমন সম্পর্কে। আমরা কেউই এখন পাক ফৌজের কোন আক্রমণের আশংকা করছি না। মান্নানের বয়স ৪৩ বছর। এক সময় সরকারি চাকুরে ছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি এই মুক্ত এলাকার ১৫০০০ লোকের শাসন পরিচালক ও গেরিলা নেতা। মান্নান বলেন, 'পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এখানে আসবার সাহস নেই। আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গায় যেতে পারি। দিনের আলোতেই যেতে পারি।"

সন্ধ্যায় মান্নানের সাথে ভাত খেতে খেতে আমাদের আরো অনেক কথা হয়। মান্নান বলেন, কদিন আগে আমরা এক ট্রাক পাকিস্তান ফৌজকে খতম করেছি। ১৯জন সৈন্য ছিল ট্রাকে। আমাদের ডুবরিরা ক্যাপ্টেন কে. এম. সাজাহানের নেতৃত্বে দুটি পাকিস্তান সামরিক জলযান ডুবিয়ে দিয়েছি। ২৫ বছর বয়সের কমান্ডো নেতা কথার মধ্যে পাকিস্তান ফৌজকে বিদ্রুপ করে বলে ওঠেন, 'ওরা কাপুরুষ। ওদের মত ভীতু সৈনিকের কথা কল্পনা করা যায় না। আমরা যদি নদীর এপার থেকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করি তবে ওরা নদীর অপর পারে গিয়ে আশ্রয় নিতে চায়। আর তখনই ওরা গিয়ে পড়ে নদীর অপর পারে লুকিয়ে থাকা আমাদের অন্য গেরিলাদের হাতে। সব খতম হয় ওরা। গর্ব করে বলেন, "কদিন আগে ওরা ৩১জন পাক ফৌজ ও রাজাকারকে জ্যান্ত ধরে ফেলেন এবং পরে তাদের গুলি করে মারেন। শত্রু সৈন্যকে বন্দি করে রাখবার মত কোন সংগতি নেই আমাদের। তাই গুলি করে মারতে হয় আমাদের যুদ্ধবন্দিদের। তবু রাখতাম যদি ওরা আমাদের ধৃত বন্ধুদের অমনভাবে গুলি করে হত্যা না করত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মান্নান আমাদের বুঝিয়ে বলেন, "গত নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলাম আমরা। কিন্তু ইয়াহিয়া সেই ভোটের বিজয়কে করে পদদলিত। সামরিক বাহিনী আমাদের উপর চালায় অত্যাচার। আমরা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। শত্রুর অত্যাচার আমাদের করে তুলেছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা যুদ্ধ করছি পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন জাতি, একটি নতুন দেশ গড়বার জন্য।" নিউজ উইকের খ্যাতনামা সাংবাদিক আরো লিখেছেন: "পাকিস্তান সেনাবাহিনী এক সময় গোলাবারুদ ও অস্ত্রে গেরিলাদের চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এখন এই শক্তি ক্ষয়ের পথে। তারা আর এদিক থেকে গেরিলাদের চাইতে উচ্চমানসম্পন্ন নয়। বিশেষ করে পাকিস্তানের ভরসা ছিল, আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাবে। তাই তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের ঘাটতি হবে না। কিন্তু আমেরিকার সামরিক সাহায্য বন্ধ করায় পাকিস্তানের রণসজ্জায় দারুণ আঘাত লেগেছে।

বাংলাদেশে এখন সব সরকারি কর্মচারী, গ্রামের মোড়ল, সকলেই গোপনে সাহায্য করছে মুক্তিবাহিনীকে। কমপক্ষে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায়ই চলে যায় গেরিলাদের অধিকারে। এখন খেয়াঘাটে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কদাচিৎ পাকিস্তান ফৌজ চোখে পড়ে। শহরগুলোর বাইরে সাধারণত পাকিস্তান-ফৌজরা এখন খুব টহল দিয়ে বেড়ায় না।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নানা অত্যাচারের কাহিনী আমি শুনেছি। একটি গ্রামে ১০ বছরের একটি মেয়ের উপর বলৎকার করে ১২জন পাকিস্তান সৈন্য। তারপর তাকে হত্যা করে। এক গ্রামে সৈন্যরা গিয়ে দু'জন যুবতী মেয়ে দাবি করে। গ্রামবাসী জানায় ফৌজি বড় কর্তাকে। দুজন ফৌজকে ধরে নিয়ে যাবার আদেশ হয়। পরদিন সেনাবাহিনীর লোক এসে পুড়িয়ে দেয় সারা গ্রামটাকেই। ৩৮ জন নিহত হয় এই ফৌজি হামলায়।

যেখানেই আমি গিয়েছি মুক্তিবাহিনীর লোক ও সমর্থকরা সর্বত্রই বলছে, শেষ চূড়ান্ত বিজয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। একটা নদীর খেয়াঘাটে দেখতে পেলাম একজন পাকিস্তান সামরিক কর্মচারী একজন সাধারণ লোককে ছড়ি দিয়ে পেটাচ্ছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে, মারা বন্ধ করেন অফিসারটি। পরে সেই মার খাওয়া লোকটি আমাকে বলেছিল: রোজ রোজ এমনি অনেক ঘটনাই ঘটে। কিন্তু প্রতিশোধের দিন আসছে। আর সেদিনটা ওদের পক্ষে হবে ভয়ঙ্কর।"[৫]

"আমার কাছে স্বাধীনতার যুদ্ধের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে সাধারণ মানুষের শৌর্যবীর্য। তাদের সাহস আমাকে সবচাইতে বেশি অবাক করেছে। বাঙালিদের আগে ভীতু বাঙালি, অসামরিক জাতি বলে মনে করা হতো। কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিদের নতুন জীবন দিয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর যারা বাঙালি অফিসার ছিল তারা এসে আমাকে বলেছিল, 'তোমাদের এ যুদ্ধ আমাদের জাতে তুলে দিয়েছে। শিখ রাজপুতও এখন অবাক চোখে দেখে আর ভাবে, আরে বাঙালি তো খুব সাংঘাতিক জাতি।'

আমরাও অবাক হয়ে গিয়েছি এই দেখে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাহীন এসব সাহসী ছেলেরা একমাস ট্রেনিং দেয়ার পর কিভাবে দুঃসাহসিক যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিল। যেখানে কোনো ট্রেইন্ড সোলজার যেতে সাহস করে না, তার অবলীলায় সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবেশ করত। অবলীলায় বাঙ্কারের কাছে গিয়ে গ্রেনেড ছুড়ে মারত। এরা তো কোনো বেতনভোগী যোদ্ধা ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ এক বিচিত্র ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধ যারা দেখেনি তাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন যে, বাঙালি কত দুঃসাহসী জাতি হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির গৌরব।[৬]

টীকা

১. "This parliament had unanimously adopted a resolution pledging sympathy and support, and we are pursuing that resolution in the best possible manner and we are doing everything possible to lend support to the freedom fighters."

২. মুক্তিযুদ্ধে উপেক্ষিত গেরিলা, পৃ- ৬০-৬৬।

৩. মুক্তিযুদ্ধে উপেক্ষিত গেরিলা, পৃ- ১০২-১০৩।

৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ. ২১৯-২২১।

৫. নিউজ উইক, নভেম্বর ২২, ১৯৭১। গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৯ম খণ্ড, হাসিনা আহমেদ।

৬. মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম, পৃ-১৪৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : বারো

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখলেন: কুরমাইল দি বেস্ট ক্যাম্প

[একাদশ অধ্যায়ে জনযুদ্ধের মূল ভিত্তি হিসেবে গেরিলা যুদ্ধের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে তারই একটি ছায়াচিত্র। অনেকেই বলে থাকেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ ও রাজনীতিবিদরা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় না থেকে তারা নিজেরা বিলাস বৈভবের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় দিন কাটিয়েছেন। একথাটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও একেবারে অসত্য নয়। এ সম্পর্কে ফারুক আজিজের 'স্প্রিং ৭১' বইতে ও মুশতারী শফির বইটিতে যৎসামান্য উদাহরণ পাওয়া যায়। এগুলো ছিল নগণ্য ঘটনা। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধীরা অতিসামান্য ব্যক্তিগত ঘটনাকে নিয়ে হৈ চৈ করে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির লক্ষ্যে এই ধরনের প্রচারণা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে জনপ্রতিনিধিরা ভারত সীমান্ত ব্যাপী প্রায় দু'শর মতো যুব ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন। সেখানে যুবকদের আশ্রয় দেয়া হতো, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অনেক ক্যাম্পে সশস্ত্রভাবে আগত তরুণদের ট্রেনিংও দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় গেরিলা যুদ্ধের কলা-কৌশল ও ট্যাকটিকেল দিক এবং আদর্শগত মটিভেশন চালানো হয়েছে। এ ধরনের ক্যাম্পগুলোর মধ্যে এই অধ্যায়ে একটি মাত্র ক্যাম্পের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।]

১৭ এপ্রিল। মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান। বৈদ্যনাথতলা। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, আজ থেকে এ জায়াগার নাম মুজিবনগর। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাজধানী। বিশ্ব জেনে গেল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে সরকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক। তার অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যবর্গ ছিলেন এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও এ. এইচ. এম, কামারুজ্জামান। পাকিস্তান জাতীয় সংসদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত গণ-পরিষদ সম্মিলিতভাবে 'স্বাধীনতার সনদ' প্রণীত ও গৃহীত হয় ১০ এপ্রিল। ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিক শপথ। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশকে পাকিস্তান সামরিক হানাদার মুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করে।

১৮ এপ্রিল। এম. মনসুর আলীর সাথে কথা বললাম আমি ও সিরাজগঞ্জের সৈয়দ হায়দার আলী এম.পি.এ। দেশের ভেতরে প্রাথমিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রুপগুলোকে নিয়ে প্রয়োজনে দেশের ভেতরে থেকে অথবা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে এসে উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করব। হিলি আসার কারণ হলো ৫ এপ্রিলে হিলি দিয়ে জনাব এম. মনসুর আলীর সঙ্গী হিসেবে

কলকাতায় এসেছিলাম। আসলে প্রতিরোধ যুদ্ধে পাবনায় পাকিস্তান সেনাদের পরাজয়ের পর পাবনার ডি.সি. নূরুল কাদের খান এবং পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. আমজাদ হোসেনের এম.এন.এ-র অনুরোধে বগুড়ায় আড়িয়াবাজার ঘাটিতে যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল তার থেকে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করে পাবনায় নিয়ে আসার বার্তা পাই। সেই মোতাবেক আমি একটি ট্রাকে এস.এম. আমির আলী, জাহাঙ্গীর আলম মজনু, আবদুস সবুর, (জোড়দাহ) সুজাউদ্দিন, জানে আলম জানু, আবদুস সাত্তার, জয়নালসহ কয়েকজনকে নিয়ে বগুড়ায় গিয়ে গাজীউল হক, হাসান আলী খান, ডা. জাহিদুর রহমান, আমানুল্লাহ ভাই প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাবনা মুক্ত হওয়ার খবর দিয়ে এবং বগুড়ার সার্বিক অবস্থা দেখে ফিরে আসছিলাম। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা প্রয়োজন যে, মার্চের শেষ সপ্তাহে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার নেতৃত্বে আবদুল মজিদ মোল্লা, গুলজার হোসেন, সামছুল হক টুকু ও এস এম আমির আলী, আমিনুল ইসলাম পটল সহকারে বেড়া থানার ওসির নিকট থেকে থানার সকল অস্ত্র ও স্থানীয় লোকজন যাদের নিকট অন্যান্য অস্ত্র ছিল তা নিয়ে নেয়া হয়। এবং সেই অস্ত্র দিয়ে ট্রেনিং শুরু হয়। সেই ট্রেনিং অবস্থায় আরো অস্ত্র সংগ্রহের নিমিত্তে বগুড়ায় এসেছিলাম। বলাবাহুল্য, কিছু গুলি ব্যতীত বগুড়া থেকে অন্য কোনো অস্ত্র সাহায্য পাইনি। তবে শুনেছি, বগুড়া শহর থেকে এক মাইল দূরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৩ ব্রিগেডের এমুনেশন ডিপো ছিল। সেখান থেকে উত্তর জনপদে গোলাবারুদ সরবরাহ করা হতো। ১ এপ্রিল আড়িয়াবাজার পাকিস্তান সেনাদের ক্যাম্প দখলে আক্রমণ করা হয়। হাজার হাজার লোক সমবেত হল ক্যাম্পের চারপাশে। যার যা আছে তাই নিয়ে সবাই চলে এসেছে। বন্দুক, লাঠি, খুন্তি, বর্শা, কোচ। আকাশ কাঁপানো জয়বাংলা স্লোগান। পাকিস্তানি সেনারা বাঙ্কারের ভেতরে। সুবিধাজনক পজিশনে। গোলাগুলিতে কাজ হচ্ছে না। প্রচণ্ড দখিনা বাতাস বইছে। সাধারণ একটি মেয়ের অসাধারণ বুদ্ধিতে গ্রামের কতিপয় কিশোরী একসাথে হামাগুঁড়ি দিয়ে বাঙ্কারের কাছে গিয়ে কুলাতে রাখা মরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে দিল। আর যায় কোথায়! কিছুক্ষণের ভেতরে দেখা গেল সাদা পতাকা হাতে তারা বেরিয়ে আসছে। মরিচের গুঁড়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে হেরে শক্তিশালী পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করল। চাইনিজ রাইফেলসহ ৫৮টি ট্রাক ভর্তি অস্ত্র পাওয়া গেল। সেই কিশোরী মেয়েরা এখন কোথায়?

পাবনা ফেরার পথে চান্দাইকোনা দেখলাম একটি জীপ আসছে। জীপে দাঁড়িয়ে আছে বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ। জীপ থেমে গেল। আমি ট্রাক থেকে নেমে পড়লাম। জীপের কাছে যেতেই দেখলাম আমাদের প্রিয়নেতা এম. মনসুর আলী। মনসুর ভাই বললেন, আমার সাথে চলো। জীপে ওঠো। বেদনাহত চিত্তে আমিরদের ছেড়ে দিয়ে জীপে উঠলাম। মনসুর ভাইকে সাথে নিয়ে প্রথমে বগুড়া, তারপর জয়পুরহাট। আবুল হাসনাত এম.পি এ সাহেবের বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে ড. মফিজ উদ্দিন এম.এন.এ. সাহেবসহ একত্রে হিলি বর্ডার অতিক্রম করলাম। হিলি সীমান্তে এলে মনসুর ভাইকে বললাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ছেলেরা তো এলাকায় রয়েছে, ওদের কাছে চলে যাই। তিনি বললেন, না। চলো আমার সঙ্গে। ট্রেনে একই সাথে একই কক্ষে কলকাতা পৌঁছলাম। এবং ড. মফিজ সাহেবের এক বন্ধুর বাসায় একই কামরায় মনসুর আলী ও আমি একত্রে ছিলাম। নানা অবস্থার মধ্যে কীভাবে সরকার গঠিত হল, সেখানে কার কী ভূমিকা ছিল এ সম্পর্কে তিনি বেদনার্ত চিত্তে অকপটে বলতেন। *'বাংলাদেশের স্বাধীনতা: যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ'* বইতে উল্লিখিত হয়েছে এসব তথ্য।

১৭ এপ্রিল গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে এম. মনসুর আলী ও তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলোচনা শেষে পাবনায় ফেরার জন্য চেনা পথ হিলি জয়পুরহাট বগুড়ার পথকে নিরাপদ মনে করে হিলিতে চলে এলাম। বর্ডার সিল। ওপারে পাকিস্তান বাহিনী দখল করে নিয়েছে। হিলিতে এসেই সংকটের আবর্তে জড়িয়ে গেলাম। বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আনোয়ার প্রায় এক/দেড় শ' সৈন্য ও অস্ত্রসহ একটি গুদাম ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। বিষণ্ণ, ক্লান্ত সৈনিকদের নিয়ে তিনি মহাঅসুবিধায়। তাদের খাবার নেই। থাকার ব্যবস্থা নেই। রেশন নেই। এমতাবস্থায় সাধারণ সৈন্যরা ছিল বিমর্ষ, রণক্লান্ত এবং হতাশাজনিত উত্তেজনায় আকীর্ণ। এই অবস্থায় কী করা যায় এই ভেবে প্রথমে গেলাম বালুরঘাটে এস.ডি.ও এবং ডি.এস.পির সঙ্গে দেখা করতে, সহযোগিতা চাইতে। প্রশাসন থেকে কিছু অর্থ পাওয়া গেল। স্থানীয় এম.এল.এ কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। চাল, ডাল, তৈজসপত্র দিয়ে সাহায্য করলেন রাধা বল্লভ বস্ত্রালয়ের মালিক।

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে সীমান্তে তাড়িত ই.পি.আর. সেনা সদস্য ও পুলিশ আনসারদের সংগঠিত করার কাজ শুরু হলো। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বালুরঘাট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় কামারপাড়ার কুরমাইল নামক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমরা আশ্রয় খুঁজে পাই। মূলত সেই দুঃসময়ে ক্যাপ্টেন আনোয়ারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আন্তরিক ও সৌহাদ্যপূর্ণ। ক্যাম্প স্থাপনের পরপরই বানের জলের মতো বগুড়া, দিনাজপুর, জয়পুরহাটের টগবগে তরুণেরা দলে দলে ক্যাম্পে ভিড় জমাতে থাকে। বলতে গেলে বেসরকারি পর্যায়ে সেটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম ক্যাম্প, যেখান থেকে একাধারে যুবকদের ট্রেনিং দেয়া হতো এবং গেরিলা কায়দায় হিলি, জয়পুরহাট, বগুড়া ও ফুলবাড়ী এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপারেশন চালানো হতো। স্বাভাবিকভাবেই কিছু সময় সামরিক নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আনোয়ার।

সেদিনের কথা আজো ভুলবার নয়। আকাশে মেঘ ছিল না। দিনটি ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল। ক্যাপ্টেন আনোয়ারের সঙ্গে একটি উইলি হুডখোলা জীপ। তিনি বললেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে মিটিংয়ে আপনার ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেই সময় সৈয়দ হায়দার আলী তার ফ্যামিলিকে আনার জন্য অন্যত্র ছিলেন। বালুরঘাটের রাস্তা ধরে শহর থেকে বেশকিছু দূরে একটি নির্জন পরিত্যক্ত স্থান দেখে মনে হলো কোনো এক সময় যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত বিমানঘাঁটি। তার পাশেই একটা পরিত্যক্ত অথচ হঠাৎ করে ঘষে মেজে তোলা একটি দোতলা ভবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যার ওপরে রক্ষিত ছিল বিমান ওঠানামার নির্দেশক যন্ত্রপাতি। আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছানোর পরপরই সাদা পোশাকে একজন চৌকস সুঠাম দেহের অধিকারী ব্যক্তি আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ভবন অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম খাপ খোলা তলোয়ারের মতো সামরিক পোশাকে এক শিখকে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এসে হাত বাড়ালেন। করমর্দন করলাম। ক্যাপ্টেন আনোয়ার তাকে যথারীতি স্যালুট দিলেন। এ পর্যায়ে নির্বাচিত এম.এন.এ হিসেবে যখন ক্যাপ্টেন আনোয়ার আমার নাম বললেন, তখন সাথে সাথে তিনি সামরিক ভঙ্গিতে সটান দাঁড়িয়ে গেলেন।

আমার না বসা পর্যন্ত চেয়ারে বসলেন না। আমরা এক টেবিলে বসলাম। তিনি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। জনগণের মনোভাব, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মন-মানসিকতা এবং সর্বোপরি তরুণদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টি জানতে চাইলেন। এ সম্পর্কে ক্যাপ্টেন আনোয়ার সামরিক অবস্থা ও অসুবিধার এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। যে লোকটিকে নিয়ে আমি কথা বলছি তিনি আর কেউ নন, তিনি ছিলেন ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের লে. জে. জগজিৎ সিং আরোরা। যুদ্ধরীতি ও পদ্ধতির প্রসঙ্গ আসতেই বিনম্র চিত্তে তিনি বললেন, "আপনাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে আপনাদের দেশ স্বাধীন করতে হবে তা বলে গেছেন। দিয়ে গেছেন দিকনির্দেশনা। যে নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন, সেই পথে আপনাদের অগ্রসর হতে হবে, শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। শত্রুকে পরাস্ত করতে হবে। এবং স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।" "আপনারা আপনাদের নেতার ৭ মার্চের ভাষণ যদি গভীরভাবে পাঠ, অনুধাবন এবং বিশ্লেষণ করেন তাহলেই আপনাদের যুদ্ধরীতি ও পদ্ধতি কী হবে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। স্পষ্টতই তিনি গেরিলা যুদ্ধের কথাই বলে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। বলেছেন, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর। বলেছেন, গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি। ভাতে মারবো। পানিতে মারবো। বলেছেন, স্বাধীনতার কথা। মুক্তির কথা। অগাধ শ্রদ্ধায় জেনারেল অরোরা বলেন, আপনারা এমন এক মহান নেতা পেয়েছেন যিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনে এবং অসহযোগ আন্দোলনকে সশস্ত্রকরণের চূড়ান্ত পথ ও পদ্ধতির নির্দেশ করে গেছেন। জাতিকে প্রস্তুত করেছেন। তিনি বলেন, গেরিলা যুদ্ধের কিংবদীন্ত মাও, চে গুয়েভারা, জেনারেল গিয়াপ, কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো যেভাবে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন আপনাদেরকে তেমনি নিজস্ব ভৌগোলিক বিশিষ্টতা, জনগণের ঐতিহ্যগত ও লালিত চেতনার সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করেই নিজস্ব গেরিলা পদ্ধতির পথ ও কৌশল গ্রহণ করতে হবে। কারণ নিজস্ব ভৌগোলিক বিশিষ্টতায় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মতবাদ অন্যদেশের প্রচলিত থিউরি থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। সেই বাধ্যতার ভিন্নতাকে স্বীকার করে নতুন পথে আপনাদের পদযাত্রা, যদিও দুরূহ ও প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা; তবুও সামগ্রিক শ্রম, সাধনা এবং কমিটমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের জাতি স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম।

সেদিন তার কথায় সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছিলাম। বস্তুত গেরিলা যুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেক ঘরকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্ভেদ্য করে গড়ে তুলবার সীমাহীন সাধনা। সরল সাধারণ নিরলস জীবন প্রাত্যহিকীর বিড়ম্বনা যেখানে ভিড় জমায়, তবু এরই নেপথ্যে গহন অন্তঃসলিলার মতো সে এমন একধারা ফেনিল সশব্দতার ভেঙে পরা নয়, হাওয়ার প্রবল টানে আর উচ্ছ্বাসের দাম্ভিকতায় সরল ঘোষণা নেই, নীরব নিঃশব্দ বিচিত্র সম্ভারের এই লক্ষ্যপূর্ণ একমুখিনতা; যুদ্ধরীতির ইতিহাসে এক অনন্য প্রক্রিয়া, সংগ্রামের ধারাপাতে অন্য নাম, অন্য নামতা। কোলাহল নেই, আড়ম্বর নেই, জমকালো সম্ভার নেই, নেই আয়োজনের অসীম ব্যাপকতা, শুধুই আকস্মিকতা। আক্রমণে শত্রু হনন, ত্রাস সৃষ্টি, তারপর চটপট সরে পড়া, অন্যদিকে হানাদার বাহিনীর বৃথাই বিনিদ্র রজনীর প্রতীক্ষা। গেরিলাদের ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তাদের কাছে পাওয়া যায় না, হাওয়ার সাথে মিশে থাকে তারা, জনতার অরণ্যে ওৎপাতা বাঘের মতো লুকিয়ে থাকে তারা, বুঝবার উপায় নেই, ধরার সাধ্য নেই, সন্দেহের অবকাশ নেই অসতর্ক মুহূর্তে শিকারের উপর সহসা ঝাঁপিয়ে পড়া, মরণ ছোবল। এ এক যুদ্ধরীতির বিস্ময়, যা অতীতের ত্যাগ ও রক্তের অনুশীলনে গড়ে উঠেছে, বহু দেশপ্রেমিকের হৃদয়ের উত্তাপ আর যন্ত্রণা নিয়ে। গেরিলাযুদ্ধের ইতিহাস আর কাহিনী, রূপান্তর তার পটভূমিকা শতাব্দীর সীমানায় প্রসারিত।

২৩ এপ্রিল ক্যাপ্টেন আনোয়ার তাঁর সঙ্গীয় সেনা সদস্যদের নিয়ে গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা করলেন। ইতোমধ্যেই পাঁচবিবি, বাংলাহিলি, দিনাজপুরের ফুলবাড়ি, বগুড়া থেকে শ'দুই তরুণ ক্যাম্পে এসে যোগ দিয়েছে। আমি ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে বললাম, আগে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদের ব্যবস্থা করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে ঐদিন হিলি স্টেশনে একটি মালবাহী ট্রেন এসে থামল। জানতে পারলাম উক্ত ট্রেনে পাকিস্তান বাহিনীর জন্য আটা-চাল-ডাল ফুলবাড়ীর দিকে যাচ্ছে। হিলি স্টেশনটি এমন যে, রেললাইনের এ পাশে ভারত ও অন্য পাশে বাংলাদেশ। ক্যাপ্টেন আনোয়ারের নেতৃত্বে অর্ধশত সৈন্য ও ছেলেদের নিয়ে কয়েকটি বগির সীল গালা ভেঙ্গে কয়েকশ বস্তা চাল-ডাল-আটা-গম নিয়ে আসা হলো। বলা বাহুল্য, ক্যাপ্টেন আনোয়ার অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কিছু সৈন্যদের আক্রমণ হলে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রাখলেন এবং আনীত বস্তাগুলো ভারতীয় হিলি স্টেশনে জমা করা হলো। নিজেরাও অংশ নিয়েছিলাম। যেহেতু আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন রাকসুর ভিপি ও শিক্ষক ছিলাম এবং নির্বাচিত এম.এন.এ সেহেতু ছাত্রদের যা বলা হতো অবলীলাক্রমে বিনা আপত্তিতে তাই শুনত। ছেলেদের বললাম বস্তা মাথায় নেবে না। দুহাত পেছনে দিয়ে পিঠে করে বস্তা আনতে হবে। আমার সাধারণ জ্ঞানে অনুমিত হয়েছিল যে, পাক বাহিনীর সৈন্যরা গুলি করলে পিঠে চাল-আটার বস্তায় লাগবে। শরীরে লাগবে না। এভাবে রসদের বিশেষ করে খাদ্যের এক বিরাট ভাণ্ডার আমরা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলাম। পাশাপাশি ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর ঐ এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্নেল মুখার্জির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক সংগ্রহ করা হয়। প্রথম দিকে ই.পি.আর. এর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞগণ ছেলেদের বিস্ফোরক ট্রেনিং, গ্রেনেড ছোড়া এবং অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এপ্রিল মসের ২৬ তারিখে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী, মেজর সাফায়াত জামিল, ক্যাপ্টেন নূরুন্নবী খান এবং তোফায়েল আহমদ ক্যাম্পে আকস্মিকভাবে এসে হাজির হলেন। মেজর সাফায়াত জামিল ক্যাম্পে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও আমাকে নিয়ে আমাদের অস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ, গুদাম ঘর পরিদর্শন করলেন। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ক্যাপ্টেন আনোয়ার তার সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র এবং যতদূর সম্ভব রসদ সামগ্রী নিয়ে তুরা পাহাড়ের অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও তার সেনাবাহিনী চলে যাওয়ায় আমি যেন অসহায় হয়ে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে দেখতে পেলাম, মে মাসের ৩য় সপ্তাহেই বিস্ফোরক, হ্যান্ড গ্রেনেড ও প্রাথমিক অস্ত্র চালানোর জন্য বিএসএফ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ আসলেন। ক্যাপ্টেন আনোয়ার তার সেনাবাহিনী নিয়ে চলে যাওয়ার পর বেশ কিছু ই.পি.আর সদস্য কুরমাইল ক্যাম্পে এসে যোগদান করেন। এ সম্পর্কে সুবেদার মেজর রব হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দলিলপত্র'* এর দশম খণ্ডে লিখেছেন, "Prof. Abu Sayeed M.N.A of Pabna opened two youth camps to train guerillas for future fight." প্রকৃত অর্থে আমি দুটি ক্যাম্প পরিচালনা করিনি। একটি ক্যাম্পের দুটি অংশ ছিল। একটি ছিল রিক্রুটিং ক্যাম্প এবং অন্যটি অপারেশন ক্যাম্প। সুবেদার মেজর রব সাহেব অপারেশন ক্যাম্পে আমাদের সক্রিয়ভাবে ট্রেনিং দেবার ক্ষেত্রে বেশকিছু দিন নিয়োজিত ছিলেন। সে কারণে তিনি সম্ভবত একটি ক্যাম্পকে দুটি ক্যাম্প হিসেবে মনে করেছেন। ঐ সময় ই.পি.আর-এর হাওয়ালদার মেজর বেল্লাল হোসেন ও জোয়ান ফেরদৌস ট্রেনিংয়ের কার্যক্রম চালিয়ে যান।

মে মাসের শেষের দিকে বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যাপকভাবে ক্যাম্পে প্রশিক্ষণার্থীদের চাপ সৃষ্টি হয়। পাবনা এলাকা থেকে, বিশেষ করে আমার নির্বাচনী এলাকার মধ্যে সাঁথিয়া ও বেড়া থানা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই যারা বিভিন্ন এলাকায় ট্রেনিং নিচ্ছিলেন তারা প্রতিরোধ যুদ্ধে টিকতে না পেরে বিপর্যস্ত অবস্থায় ক্যাম্পে এসে হাজির হন। এদের মধ্যে যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তাদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আশা করছি আগামীতে সে সমস্ত বীর সন্তানদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যতদূর মনে পড়ে, এস এম আমির আলী, জাহাঙ্গীর আলম মজনু, আবদুস সাত্তার, আব্দুল লতিফ, আলাউদ্দিন, হারুন-অর-রশিদ হকু, বেলায়েত হোসেন, চাদ আলী, সুজা উদ্দিন, শহীদ আবদুল খালেক, আবদুল লতিফ তুষ্টু, শুকুর আলী, ফরহাদ হোসেন, মাস্টার মোজাহার, আবদুস সবুর, জানে আলম জানু, মোফাখখারুল ইসলাম, শাজাহান আলী, মতিউর রহমান লাল, ইসহাক আলী, আবদুর রশিদ ভদ্র, সাকের আলী, আসকার আলী প্রমুখ তরুণ প্রশিক্ষণার্থী এসে উপস্থিত হন। এদের সঙ্গে অনেকেই দেশের অভ্যন্তরে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন যাদেরকে কুরমাইল ক্যাম্প থেকে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে, পাহাড়-জনপথ-জলপথ ভেঙ্গে রৌমারি থেকে পদ্ম-যমুনা বিধৌত এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাকায় অস্ত্র সরবরাহ করা হতো। মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। এদের নেতৃত্বে ছিলেন যুদ্ধকালীন কমান্ডার এস এম আমির আলী। সিরাজগঞ্জ এলাকার লতিফ মির্জার সঙ্গে একত্রে আমির আলীকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। লতিফ মির্জা তিনবার ক্যাম্পে এসে অস্ত্র নিয়ে সেদিন প্রাথমিক ট্রেনিং নিয়েছেন। এখানে আরো বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, সাঁথিয়া উপজেলার নিজাম উদ্দিনের নেতৃত্বে ফজলু (তেঁতুলিয়া), সনটু (তেঁতুলিয়া), মুজিবর হাজি (বৃহস্পতিপুর), আবদুল কাদের, নূরুল ইসলাম, মুজিবর রহমান এরা তিনজনই বানিয়াবহু গ্রামে তরুণ-যুবক যুদ্ধে মুজিবর শহীদ হন। এছাড়া রেজাউল করিম, আলতাফ হোসেন, লোকমান হোসেন, আবদুল লতিফ, আবদুর রউফ, আফসার ও হাবিবুল্লাহ (আতাইকুলা), আফতাব ও ছালাম (গাঙ্গিয়াহাটি), কুদ্দুছ, গলাকাটা শাজাহান, সাইফুল (কাবারিখোলা), ছালাম (মেহেদিনগর), মমতাজ আলী চতুর, আনছার আলী, আবু সোমা, মোহাম্মদ আলী, গোলাম মোর্শেদ, আবু হানিফ (শশদিয়া), ওহাব (খয়েরবাড়ি), সোহরাব (পিয়াদহ), জহরুল হক প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার প্রবল আগ্রহে শেষের দিকে ক্যাম্পে আসে সামছুল হক টুকু, আবু শামীম ও বাঘা। এদের মধ্যে সামছুল হক টুকু ও বাঘা মুজিব বাহিনীর ট্রেনিংয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আবু শামীম ডাক্তারী পড়তেন। সেজন্য ক্যাম্পে চিকিৎসা দিতেন। আবু শামীম কুরমাইল ক্যাম্পে বিস্ফোরক ট্রেনিং সম্পন্ন করেন। মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা নিয়ে এসেছিলেন মাঝ বয়সের বৃশালিখার সোহরাব হোসেন। তিনি এসেই বললেন, মামা যুদ্ধে যে জয়লাভ করবে তার প্রমাণ কি? আমি তাকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করে বুঝানোর পর জিজ্ঞেস করলাম আর কি প্রমাণ চান? সোহরাব মামা বললেন, অস্ত্র কত আছে দেখতে চাই। আমি অন্যত্র মাটির নিচে বিরাট বাঙ্কারে রাখা যেসব অস্ত্র ছিল তা দেখাতেই তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। অস্ত্র দেখে বললেন, এত অস্ত্র! তাহলে দেশ স্বাধীন হবে। তাকে পনের দিনের ট্রেনিং দিয়ে দুটি স্টেইনগান দিয়ে দেশের ভেতরে পাঠানো হয়। তাকে দেশের ভেতরে পথ দেখিয়ে দেয় ক্যাম্পের সর্বক্ষণিক কর্মবীর তাহেজ উদ্দিন সরকার। যিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও পাকিস্তান বাহিনীর বিভিন্ন অবস্থান আমাদের এনে দিতেন। সেই মোতাবেক আমাদের গেরিলা বাহিনী আক্রমণ চালাত এবং পাকিস্তান বাহিনীর সমস্ত পরিকল্পনা ধ্বংস করে দিত। দেশে এসে সোহরাব মামা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের এক উৎসাহী যুবক হিসেবে কর্মতৎপরতা শুরু করেন। তার সাথে যোগ দেন আবদুল মজিদ মোল্লা। যমুনার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল থেকে শুরু করে চলনবিল, ফরিদপুরের ডেমরা হয়ে সোনাতলা বিল হয়ে সুজানগর গাজনা বিল পর্যন্ত ছিল এদের যুদ্ধ তৎপরতা। বিচ্ছিন্ন যুদ্ধে বহু মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছেন। শহীদ হয়েছেন অনেকেই সম্মুখ যুদ্ধে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা বেড়া ও সাঁথিয়া থানা আক্রমণ করে থানা দখল করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন মিন্টু, জয়গুরু, আবদুল আওয়াল, আবদুল খালেক, নজরুল ইসলাম, টগর এদের অবদান ও আত্মত্যাগ আজও ইতিহাসে লিখিত হয়নি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সর্বদা জড়িত ছিলেন আবদুল মজিদ মোল্লা, সাঁথিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুটিপাড়ার আকবর মিয়া, ডা. মোজাফ্ফর, আবদুস সোবহান, আমানুল্লাহ মাস্টার, আবদুর রহিম, আব্দুর রহমান, আবদুল হামিদ প্রমুখ।

ধুলাউরির শহীদ ডা. আবদুল আওয়ালের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা ২৭ নভেম্বর আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐদিন রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী রাজাকারদের সহায়তায় ঐ বাড়ি আক্রমণ করে এবং ডা. আবদুল আওয়াল, নয়ন খলিফা, গফুর খলিফা, ছামাদ খলিফা, জহরুল ফকির, আবু ফকির, রশিদ ফকির, তোরাব বিশ্বাস প্রমুখ তাদের আক্রমণে শাহাদাৎবরণ করেন। শাহাদাৎবরণ করেন ঐদিন ঐ সময় মুক্তিযোদ্ধা দারা-চাঁদ।

দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও স্থান পরিবর্তনে গোপনে সাহায্য করতেন নৌকার মাঝি এবং খেটে খাওয়া মানুষ। মুক্তিযুদ্ধে আমার মা সায়েদাতুন নেছার অবদানের কথা উল্লেখ না করলে আমার 'পাপ' হবে। তিনি একদিকে যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতেন, অন্যদিকে তেমনি তার নিকট আমি যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাতাম তা তিনি গোপনে সংরক্ষণ করতেন। ক্যাম্প থেকে আমার পাঠানো চিঠি ও তালিকা মোতাবেক তিনি আমির আলী ও অন্যদের হাতে অস্ত্র ও গুলি তুলে দিতেন। মা কোনোদিন অভুক্ত বা আধপেটা খেয়েছেন, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুড়ি বা চাল-ডাল কম পরিমাণ হলেও সংগ্রহ করে রাখতেন। কখন যে আসবে ওরা। ওদের জন্য কোরান খতম দিতেন। নফল নামাজ পড়তেন।

বিভিন্ন সময়ে গেরিলা যুদ্ধে কুরমাইল ক্যাম্প থেকে পাঠানো বহু মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। কুরমাইল ক্যাম্পের প্রাঙ্গণে ১১ শহীদকে কবর দেয়া হয়েছে। কুরমাইল ক্যাম্প থেকে প্রথম ব্যাচে গেরিলা দল পাঠানো হয় খোকনের নেতৃত্বে। খোকন ও তার দল রাজাকার ও পাকিস্তান বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং প্রায় গোটা দলসহ শহীদ হন। এরকম বেদনাময় বহু স্মৃতি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ক্যাম্প কুরমাইলকে জড়িয়ে আছে।

এই ক্যাম্পে প্রতিমাসে জননায়ক আবদুর রাজ্জাক আসতেন। বাছাই করে শিক্ষিত যুব ছেলেদের মুজিব বাহিনীর জন্য নিয়ে যেতেন। পরবর্তীকালে লক্ষ্য করেছি মুজিব বাহিনীর ছেলেরা দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। অনেক সময় স্থানীয় কমান্ড নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হয়, যা দুঃখজনক। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করতে হয় রফিকুল ইসলাম বকুল, ইকবাল হোসেন, জহুরুল হক বিশু অর্থাৎ পাবনার অধিকাংশ ছাত্রলীগের ছেলেরা মুজিববাহিনীতে যোগদান করে। কেবল পাবনার লালু মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করতে তৎপর ছিল। সেজন্য বকুলদের সঙ্গে লালুর এ নিয়ে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ফলে একসময় লালু কেচুয়াডাঙ্গা ক্যাম্প থেকে কুরমাইল ক্যাম্পে চলে আসে।

কুরমাইল ক্যাম্পে ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাজেশ্বর রাও আগস্টের শেষ দিকে এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশ যে স্বাধীন হবেই এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র যে পরাজিত হবে, এ সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তাঁকে ক্যাম্প থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী অধ্যাপক এনায়েতুর রহিম প্রায় দশদিন কুরমাইল ক্যাম্পে অবস্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত বই '*বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার এণ্ড দ্যা নিক্সন হোয়াইট হাউস ১৯৭১*' শীর্ষক বইতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। ড. এ আর মল্লিক আমাদের চাহিদা মোতাবেক তার সুযোগ্য পুত্র ফারুক মল্লিকের মাধ্যমে একটি পাওয়ারফুল বাইনোকুলার আমাকে প্রদান করেন। যার মাধ্যমে উঁচু টাওয়ার থেকে সাত কিলোমিটার পর্যন্ত শত্রুদের অবস্থান জানতে পারতাম।

কুরমাইল ক্যাম্প সম্পর্কে '*আমরা স্বাধীন হলাম*' গ্রন্থের লেখক এবং ক্যাম্পগুলোর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কো-অর্ডিনেটর কাজী সামসুজ্জামান লিখেছেন– "মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সব মুক্তিযুদ্ধ শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই কুরমাইল ক্যাম্প। এই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন পাবনা থেকে নির্বাচিত এমএনএ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। এই ক্যাম্পটি দুভাগে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল অপারেশন ক্যাম্প এবং অন্যটি যুব অভ্যর্থনা শিবির। প্রায় দুই হাজার (সাড়ে তিন হাজার) যুবক এখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। এদের মধ্যে থেকেই প্রাক্তন পুলিশ, ই.পি.আর. আনসার এবং ছাত্রলীগের সদস্যদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল অপারেশন ক্যাম্প। এই অপারেশন ক্যাম্পের প্রধান কাজ ছিল পার্বতীপুর-হিলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে রেল চলাচল ব্যাহত করা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় (বাংলাদেশ) বসবাসরত জনসাধারণের জানমাল রক্ষা করা। আমরা যখন ঐ ক্যাম্পে পৌঁছলাম তখন দুপুর হয়ে গেছে। ঘুরে ঘুরে ক্যাম্পের খবরাখবর নিলাম। ক্যাম্পের প্রশাসন বিশেষ করে ক্যাম্পের নিজস্ব হাসপাতাল সত্যিই আমাদের মুগ্ধ করেছিল। ক্যাম্পে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ আমাদেরকে ক্যাম্পের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানালেন। ঐ ক্যাম্পের অপারেশন টিমের অনেক কৃতিত্বের কাহিনী শোনানেল। ক্যাম্পের অসুবিধার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানালেন যে ভারি অস্ত্র না পাওয়ার ফলে কেবল রাইফেল দিয়ে দুর্ধর্ষ পাক সেনাদের মোকাবেলা করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। তিনি ফিরে গিয়ে আমাকে বাংলাদেশ সরকারের সাথে ভারী অস্ত্র দেয়া সম্পর্কে আলাপ করে এই বিষয় বিহিত করার জন্য অনুরোধ জানালেন।"

তিনি আরো লিখেছেন, "বেলা ৪টার দিকে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। একটু আগে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাঘাট পিচ্ছিল। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে কয়েক গজ আসার পর দেখতে পেলাম ৮-৯ যুবক ক্যাম্পের দিকে আসছে। প্রত্যেকের কাছে রাইফেল। দলটিকে পথেই থামিয়ে তাদের সাথে আলাপ শুরু করলাম। শুরুতেই তারা জানালেন যে, ভোর ৫টার সময় তার অপারেশনে রেরিয়েছিল। গত রাতে ২জন লোক হিলি থেকে খবর নিয়ে আসে যে, বগুড়া থেকে পার্বতীপুর হয়ে ট্রেনে প্রচুর পাকিস্তান সেনা দিনাজপুর আসছে। যে দু যুবক খবর নিয়ে এসেছিল তারা ছিল রাজাকার বাহিনীর সদস্য। দিনে তারা পাক সেনাদের সাথে থাকা আর রাতে থাকত মুক্তিবাহিনীর সাথে। এই খবর পেয়ে তারা ভোরে রওনা হয়ে যায় এবং বেলা ১১টার দিকে তাদের মাইনের আঘাতে ট্রেনের দুটি বগি ধ্বংস করে ফিরছে। ছেলেদের কথা শুনে বুকটা আনন্দে ভরে উঠল। প্রত্যেকের হাতে দুটো করে টাকা দিয়ে মোটরসাইকেলে উঠতেই পেছনে তাকিয়ে দেখি ছেলেরা আমাদের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসছে। কারণ যতদূর মনে হলো টাকাগুলো পেয়ে তারা খুশি হয়েছে ভীষণভাবে।"

বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান জুন মাসে এক সপ্তাহব্যাপী উত্তরবঙ্গের ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করে তদানীন্তন সরকারের নিকট একটি লিখিত রিপোর্ট দেন। সেখানে কুরমাইল ক্যাম্প সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> On 13.6.71, "we visited what may be termed the best camp: Kurmail, Present strength 700. Of these about 400 participated in guard of honor and listened to the Ministers inspiring speech, drenched in heavy rain. Already 1000 have been sent for training (228+300+400). Trainer EPR. No ration. They procured rice from other side. Operations being conducted from here. Rifles 7-8 hundred. Captain explosives trainer. Major Trainer. Active work by Prof. Abu Sayeed, M.N.A camp in Charge." রিপোর্টে তিনি আরো বলেন, "The total number of transit training camps including operation units of East Bengal forces will not be much larger than 40. In most of these the present strength is around 200, accommodation, restriction imposed by availability of ration etc. Including the trainees that have been sent for higher training the number will be larger, in one camp as much 1700 (Kurmail, Dinajpur). The total number of trainees available at the moment will be thus about 10,000 or so."[১]

মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান বাংলাদেশ সরকারকে এ সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। রিপোর্টে বলেন, "আমি যে সব ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্যাম্প হলো কুরমাইল ক্যাম্প। ১৩ই জুন ক্যাম্পে অবস্থিত ৭০০ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও ৪০০ ছেলে গার্ড অব অনারে অংশগ্রহণ করে। তারা মন্ত্রী মহোদয়ের উদ্দীপক ভাষণ শ্রবণ করেন। এ পর্যন্ত ঐ ক্যাম্প থেকে ৯২৮ জনকে উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। এরা নিজেরাই রেশন সংগ্রহ করে। সরকার থেকে এদের রেশন দেয়া হয় না। এখানে বিস্ফোরক প্রশিক্ষণ দেয় ক্যাপ্টেন ও মেজর। অস্ত্র রয়েছে ৭০০-৮০০। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ সক্রিয়ভাবে ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন।"

অন্য রিপোর্টে বলা হয়েছে, "ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ট্রেনিং ক্যাম্প পশ্চিমবঙ্গে ৪০টির বেশি নয়। এসব ক্যাম্পে থাকা, খাওয়ার তেমন ব্যবস্থা নেই। প্রশিক্ষণার্থীও কম। কোথাও ৪০ জনের নিচে। উল্লেখ করা যেতে পারে, কুরমাইল ক্যাম্প থেকে কেবল ১৭০০ যুবককে এ পর্যন্ত ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত বরাবর স্থাপিত ক্যাম্পের প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা দশ হাজারের মতো।"[২]

সার্বক্ষণিকভাবে ক্যাম্পটির পরিচালনায় থাকতেন ইলিয়াস, জয়পুরহাটের কাফেজ উদ্দিন, পাবনার ফেরু মিয়া, মফিজ উদ্দিন মাস্টার, আমজাদ হোসেন এবং সার্বক্ষণিক ট্রেনিং দিতেন ভারতের ক্যাপ্টেন ক্ষোধ, সুবেদার বিল্লাল ও ইব্রাহিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমুখ। কুরমাইল ক্যাম্প। সামনে সবুজ চত্বর। শিমুল গাছে রক্ত-ফুল। বৃষ্টি ভেজা বট গাছের শিহরিত পত্রপল্লব। পুকুরে নিটোল জল। পাশে সারি সারি মুক্তিযোদ্ধাদের কবরের পাশে প্রার্থনারত বৃক্ষসারি। ভোরের পাখিরা কি তেমনি করে ডেকে ওঠে, কম্পিত শাখায় বাতাস দোলা দেয়! সামনে শালবন। বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত। ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় এখানো মনে হয়, রাত জাগা গেরিলারা দলে দলে ফিরে আসছে রণক্লান্ত, অথচ বিজয়ের প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত। কখন যেন গলা ছেড়ে সমবেত কণ্ঠে বলে উঠবেঃ জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হৃদয়-স্মৃতি। আনন্দে। বেদনায়। রক্তক্ষরণে।

টীকা

১. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দলিল পত্র'* তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১।
২. ঐ, পৃ. ৬০-৬১।

AMARBOI.COM

অধ্যায়ঃ তেরো

ত্রিভুজ ষড়যন্ত্র

মার্কিন-মোশতাক-মওদুদ

[এই অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জাতীয়ভাবে যে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হয়েছিল তাকে বলা যেতে পারে ত্রিভূজ ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র জাতীয় হলেও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি। তারা অস্ত্র, অর্থ ও কূটনৈতিকভাবে স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছে। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল খন্দকার মোশতাক, ব্যারিস্টার মওদুদ ও মাহবুব আলম চাষী এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রমুখ। মোশতাকের নির্দেশে জহিরুল কাইয়ুম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোলকাতার প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগযোগ করে নানাভাবে সমঝোতার প্রস্তাব দেন।
এর পাশাপাশি নথিপত্র ঘেটে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদকে বহির্বিশ্ব প্রচার অনুষদের সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি দেন। কারণ হিসেবে দেখা যায় ব্যারিস্টার মওদুদ ব্যক্তিগতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কমন্সসভার সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে আড়ালে রেখেই এ কার্যক্রম চলতো। যুদ্ধরত একটি দেশে আন্তর্জাতিক প্রচারের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর অজ্ঞাতে হবে এটা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আরো পর্যবেক্ষণ করেন যে, মাহবুব আলম চাষী ও জনাব মওদুদ আহমদ একত্রে কাজ করতেন এবং মোশতাকের সঙ্গে তাদের যোগযোগ ছিল ষড়যন্ত্রমূলক।
বিষয়টি আমাকে বিস্মিত করেছে। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এ ধরণের কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তা ধারণা করা কঠিন। তবে এই বইয়ের পরিশিষ্টে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী বরাবর যে পত্র লিখেছেন সেটা পড়ে যে কারো মনে হতে পারে পত্রটি যেন তার ঐ সব কর্মের সাফাই। ষড়যন্ত্রের আর একটি দিক হলো স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র আকস্মিকভাবে ধর্মঘট দু'দিন বন্ধ থাকার ঘটনা, যা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।]

এককালীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এনায়েতুর রহিম যিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্টাডিলীভ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছিলেন, তিনি জুলাই '৭১-এর শেষের দিকে আকস্মিকভাবে বালুরঘাট কুরমাইল ক্যাম্পে আগমন করেন। তিনি প্রায় দশ-বারোটি দিন ক্যাম্পে অবস্থান করেন। ক্যাম্প ইনচার্জের দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক আবু সাইয়িদ এমএনএ। জনাব অধ্যাপক এনায়েতুর রহমান কলকাতা থেকে শুনে এসেছিলেন 'স্বাধীনতা চাও না বঙ্গবন্ধু চাও' এই ধরনের একটি লিফলেট মুক্তিযুদ্ধদের ভেতরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বিভক্তি দেখা দিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় থাকায় তিনি উক্ত ষড়যন্ত্রের বিষয়টি খোলাখুলি আলোচনা করেন। বলেন এ সম্পর্কে

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে কিনা? তার কথার প্রেক্ষিতে আমি এবং আমার সঙ্গে শাহাজাদপুর থেকে নির্বাচিত এমপিএ আব্দুর রহমান তীব্র ক্ষোভের সাথে বলি, 'ঐসব ষড়যন্ত্র-ফড়যন্ত্র বুঝি না' এবং এ নিয়ে যারা রণাঙ্গনে আছেন তাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কলকাতায় কী চক্রান্ত হচ্ছে তার ধার আমরা ধারি না। আমরা যুদ্ধ করছি দেশ স্বাধীনের জন্য, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। এসব কথার ধার ধারি না। এখানে প্রায় তিন হাজার গেরিলা আছে তারা ট্রেনিং নিচ্ছে, যুদ্ধ করছে। জীবন দিচ্ছে। আমি ক্যাম্পের পুকুর পাড়ের কয়েকটি কবর দেখালাম এবং মোনাজাত করলাম। মোনাজাত শেষে তাঁকে আরো বললাম, মুজিবনগরের মোশতাক চক্রের ষড়যন্ত্র বা আমলারা ওখানে বসে বস্তায় বস্তায় যে কাগজ নষ্ট করে যে ধরনের নির্দেশনামা জারি করেছে তার তোয়াক্কা আমরা করি না। মুজিবনগর সরকারের অধীনে ও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা যুদ্ধ করছি এবং দেশে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে কেউ নিরস্ত্র করতে পারবে না। তিনি অন্য সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেও কথা বলেন। তার লিখিত 'বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার এন্ড দি নিক্সন হোয়াই হাউস ১৯৭১' বইতে এ সম্পর্কে লিখেছেন।[১]

বাংলাদেশ সরকারের জন্য যে-দ্বন্দ্বটি সবচেয়ে বেশি দুর্ভাবনা সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে,[২] পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের পক্ষ হয়ে তাঁর সমর্থকগণ মার্কিনীদের সাথে আলাদাভাবে যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া। মুজিবনগর সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে এই ঘটনা জানাজানি হবার পর খন্দকার মোশতাককে তার কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়। এ বক্তব্য কেবিনেট সচিব হোসেন তৌফিক ইমাম ও খন্দকার আসাদুজ্জামানের। এ প্রসঙ্গে হোসেন তৌফিক ইমাম বলেন, "বাংলাদেশ থেকে যে প্রতিনিধিদল বিদেশে যাবার কথা ছিল, তার নেতৃত্ব দেয়ার কথা স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদের। এরা রওনা হবার কিছুদিন আগেই আমরা বিভিন্ন গোপন সূত্রে খবর পেলাম খন্দকার মোশতাক এবং প্রতিনিধি আমাদের এখান থেকে যাচ্ছেন তারা পাকিস্তান থেকে যে দল যাবে তার নেতৃত্ব দেবেন শাহ আজিজুর রহমান। তাদের সঙ্গে ওখানে গিয়ে মিলিত হবেন এবং একটি আপোস ফর্মুলা করে একটা মিত্রসংঘ জাতীয় কিছু করবেন। এটি কিন্তু তখনই একবারে মূলোচ্ছেদ করা হয়। খন্দকার মোশতাককে আর যেতে দেয়া হয়নি। বাংলাদেশ থেকে কোনো প্রতিনিধিদল গেলেও এবং মীমাংসার আর কোনো প্রশ্নও ওঠেনি। কারণ আমরা জানতাম যে এখানে যুদ্ধ ছাড়া এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।[৩]

খন্দকার মোশতাকের অনুপস্থিতিতে ভিন্নভাবে এ বিষয়টি কখনো মন্ত্রিপরিষদে আলাপ হয়নি। আমরা জানি, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে শুনেছি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে শুনেছি এরকম ষড়যন্ত্র হতে যাচ্ছিল, এবং এটিকে এভাবে ঠেকানো হলো। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা কখনো হয়নি।[৪]

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের দলিল থেকে জানা যায় যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য কাজী জহিরুল কাইয়ুম মার্কিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু পাক-ভারত যুদ্ধের পরিণতিতে বহু মানুষ মারা যাবে, ক্ষয়ক্ষতি হবে, তিনি খন্দকার মোশতাকের পক্ষ হয়ে পাকিস্তানের সাথে আলোচনার জন্যে একটি সমঝোতা প্রস্তাব পেশ করতে চান। এ প্রস্তাবের মধ্যে অবশ্য একটি দিক ছিল যে, যে সমাধান হোক না কেন শেখ মুজিবকে অবশ্যই এর সঙ্গে জড়িত রাখতে হবে। এ ধরনের একটি আলোচনার প্রস্তাব মার্কিনীদের হাত হয়ে ইয়াহিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং তিনি আলোচনা করতে রাজি হয়েছিলেন।[৫] পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দিল্লীতে যখন এই বিষয়ে আলোচনা হয় তখন তিনি বলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো আপোস করা হবে না।[৬]

এক পর্যায়ে এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দূতাবাসের এক কর্মকর্তার আলাপ হয় এবং সেখানে খন্দকার মোশতাক বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পাকিস্তানের উপর তাদের প্রভাব খাটিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা।[৭] আমীর-উল ইসলাম তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে খন্দকার মোশতাক তাঁকে বলেছিলেন, "হয় স্বাধীনতা, না হয় শেখ মুজিব, দুটোর একটা বেছে নিতে হবে। তিনি এটা শুনে খুব মর্মাহত হন।" এ সম্পর্কে একটি লিফলেট বিলি করা হয়েছিল। সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এটা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সবাই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই লিফলেটের মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র সরকার ও দলের অভ্যন্তরে সক্রিয় ছিল।[৮] "মোশতাক সাহেব তার পরিবার নিয়ে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। দেখা করা করার জন্য সেখানে গিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সেখানে আরো কিছু লোক তার সাথে গল্প গুজবে ব্যস্ত ছিলেন। সবাই চলে যাবার পর আমার ডাক পড়ল। মোশতাক ম্যাকব্রাইডের লেখা মতামত না পড়েই একটা মন্তব্য করেন। তার এই বক্তব্য আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। তিনি বলেন, "You must decide, whether you want Sheikh Mujib or Independence. You can't have both," আমি এ কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে উত্তর দিলাম, "We want both, Sheikh without Independence or Independence without Sheikh, both are incomplete."

দলিল মতে মার্কিনীদের সাথে আলাপকালে কাইয়ুম বলেছিলেন মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বামদের হাতে চলে যাচ্ছে এবং যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বামরাই ক্ষমতায় আসতে পারে। এমন ভাবনা অনেকেরই ছিল এবং মুজিব বাহিনীর একটা অংশ বাম ভাবনা প্রভাবিত ছিল। তাছাড়া চীনাপন্থী বামরাও বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় ছিল। যদিও তারা প্রতিপক্ষ অবস্থায় ছিল না, দীর্ঘ যুদ্ধ হলে কে ক্ষমতায় থাকবে এটা নিয়ে দুর্ভাবনা হতে পারে ডানপন্থীদের। মার্কিনীরা বামদের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিল। বাম শক্তি সম্পর্কে মার্কিন সরকারি মহলে যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খন্দকার মোশতাকের সাথে আলাপের পর অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর সাথেও আলাপ করতে আগ্রহী হয়। তবে তাজউদ্দীন আহমদ মার্কিনীদের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগাযোগ করতে রাজি হন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৌশল গ্রহণ করে বলেন, মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাকে ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করতে হবে। মার্কিন দলিলেও এ সম্পর্কে শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে কোনো সমঝোতা বা আলাপ প্রস্তাবের উল্লেখ নেই।[৯]

ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে পাকিস্তানের সরকারের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়োজন হবে না। রাজনৈতিক সমঝোতার বিষয়টি পাকিস্তানকে জানানোর জন্য রাষ্ট্রদূত যোসেফ ফারল্যান্ডকে ওয়াশিংটন বলেছিল, তিনি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কথাটি উত্থাপন করেন। আশ্চর্যজনকভাবে সত্য যে, কথাটি উত্থাপিত হলে ইয়াহিয়া খানের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক এবং তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে তার সরকারের বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। এমনকি তিনি ফারল্যান্ডের অনুরোধ গ্রহণপূর্বক মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে গোপনে আলোচনায় সম্মত হন।[১০] কিন্তু মুজিবনগর সরকারের দৃঢ় স্টান্ড ছিল যে কোনো আলোচনা হোক না কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে শর্তহীনভাবে মুক্তি দিতে হবে। স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে।

২৩ সেপ্টেম্বর জহুরুল কাইয়ুম একজন সংবাদ বাহককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল এর কাছে প্রেরণ করে বলেন, ভারত সরকার এই যোগাযোগ সম্পর্কে জেনেছে এবং এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ২০ অক্টোবর বাংলাদেশের কূটনীতিবিদ হোসেন আলী কলকাতার মার্কিন কনসালের কাছে বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের উপরে শেখ মুজিবের মুক্তি ও অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি উত্থাপন করেন। এরপর বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থগিত হয়ে যায়।[১১]

২৭ সেপ্টেম্বর জো সিসকো সরাসরি ভারতের মি. জ্যায়ের সঙ্গে প্রস্তাব করেন ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধির সঙ্গে শর্তহীনভাবে আলোচনা করা। যা নেতিবাচক সাড়া পায়। ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলকাতাস্থ কনসালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, এসব আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রভাব বিস্তার না করে, মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে এবং যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত। ১৬ অক্টোবর জহুরুল কাইয়ুম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কনসাল জেনারেলের সঙ্গে বৈঠকে অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, ভারত এতে আপত্তি দিয়েছে। এভাবে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধান আলোচনা ভেস্তে যায়।[১২]

মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি দু'জনের বক্তব্যের ব্যবধান থেকে এটা উপলব্ধি হয় যে, সরকারের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বেশ প্রকট। প্রধানমন্ত্রী যেখানে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সব সম্ভাবনাকে বাতিল করে শুধু যুদ্ধের মাধ্যমে সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অন্তরায় ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুজিবগনর সরকার সামরিক বিজয়ের উপর গুরুত্ব দেন। ১৯৭১ সালের ৩০ জুন স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন বলেন, "Freedom fighteras would give a befitting reply on the battle field to Gen. Yaya Khan's audacity" [১৩]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সহযোগিতার বিষয়ে জনাব জহিরুল কাইয়ুম মার্কিন কনসালকে বলেন যে, "He and many others is the Awami League would walkout from the Bangladesh Government rather than 'Sellout to India.' Furthermore in his anti-Indian vituperation he added, 'We do not want the Indian army in our country any more than we want the Pak army."[১৪] ভারতে অবস্থান করে এবং ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা পাবার পরেও আওয়ামী লীগের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির এ ধরনের বক্তব্য অন্তর্দলীয় কোন্দলকে উস্কে দেয়া ছাড়াও শত্রুপক্ষকে অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে কারও কোনো সংশয় ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিশ্বস্ত বন্ধু। [১৫] এ সত্ত্বেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা খন্দকার মোশতাক বা তাঁর প্রতিনিধি কেন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রাখতেন তা অনুমেয়। যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। জহিরুল কাইয়ুম কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের এক দূতাবাস কর্মকর্তাকে দেয়া বক্তব্যে এমন ধারণা পাওয়া যায়।[১৬] কাইয়ুম বলেন যে, পাকিস্তানের সাথে একটা আপোসরফা করার ব্যাপারে মোশতাকের প্রতিনিধি হিসেবে কাইউম যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৯ আগস্ট মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তার সাথে অন্য এক বৈঠকে কাইয়ুম বলেন যে, "Mujib's life is more valuable than independence."[১৭] কিন্তু তখন বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবের মুক্তি ও স্বাধীনতা এই দুটো আদায়ের ব্যাপারেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। জহিরুল কাইয়ুম এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে বলেন যে, "If Mujib is alive there is hope for compromise, if he is killed there is no hope." [১৮]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের রাজনৈতিক কর্মকর্তা পলোঅফের সাথে ৯০ মিনিটব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকের সময় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হোসেন আলীকে ঘরের বাইরে রাখা হয়। বৈঠককালে মোশতাক যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানের প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে বলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আরও বলেন যে, "I know Yahya, I know him to be a good man and I think he knows that I am a good man." [১৯] ইয়াহিয়া খানের প্রতি মোশতাকের এ উচ্চ ধারণা স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ক্ষেত্রকে জটিল করে তোলে।

১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর মোশতাকের প্রতিনিধি জহিরুল কাইয়ুম আকস্মিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল অফিসের এক কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতে ভারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় কীভাবে কাজ করছে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। তখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি ডি.পি. ধরের সাথে মোশতাকের আলাপ-আলোচনার প্রসঙ্গও স্থান পায়। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মোশতাকের যোগাযোগকে ডি.পি. ধর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বাঘাতকতা বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু মোশতাক সব অভিযোগ অস্বীকার করেন বলে কাইয়ুমের সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। জহিরুল কাইয়ুমের উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন কনসাল অফিস উল্লেখ করে যে, 'He (Zahirul Qaiyum) and his group in Awami League did not intend to be dictated to by GOI (Government of India) and in addition he had threatened to walkout on BDG (Bangladesh Government) along with some 43 supporters and go to pakistan rather than 'Sell out' to India."[২০] *মুজিবনগর সরকারের মধ্যে* একাধিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল এবং সেটার আন্তর্জাতিক মাত্রাও ছিল। খন্দকার মোশতাক পাকিস্তানের সাথে শর্ত সাপেক্ষে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন এমন প্রামাণ্য দলিল হেনরি কিসিঞ্জারের লিখিত বইতে পরিস্ফুট। জহিরুল কাইয়ুম মার্কিনীদের বলেন, তিনি মোশতাকের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা করতে এসেছেন। তিনি পাকিস্তানদের সাথে আলোচনার বিষয়টি জহিরুল কাইয়ুম সম্ভবত উপস্থিত করেন এবং সেভাবেই মার্কিনীরা ইয়াহিয়া খানকে জানায়। তিনি যে মোশতাক সমর্থিত একজন, এটা প্রমাণিত। কিন্তু অপর সমর্থক মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ও খন্দকার মোশতাক কখনো শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তেমন উল্লেখ নেই। প্রস্তাবের বিষয়বস্তু যাই থাকুক, যোগাযোগ যে করা হয় এবং সেটা যে মুজিবনগর সরকারকে না জানিয়ে করা হয়, সেটার প্রমাণ মার্কিন দলিলে রয়েছে। যেটা মুজিবনগর সরকারের ভেতরের দ্বন্দ্বের বিষয়টি প্রমাণ করে এবং কেউ যদি মনে করে, একে ষড়যন্ত্রের বিবরণ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, এটা ভারত সরকারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, পরিকল্পনা ও কৌশলের বাইরে ছিল না। যারা ভারতীয় রাষ্ট্রের মূলধারার সাথে ছিল তারাই এই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। যেমন এন.কে. ঝায়ের পরামর্শে কিসিঞ্জারকে বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে ভারত সরকারের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বলা হয় যা কিছু আলোচনা হোক না কেন তা ভারত সরকার কে জানিয়ে বা তার সম্মতি নিয়ে করতে হবে।

জহিরুল কাইয়ুমের এ বক্তব্যে আরও পরিষ্কার হয় যে, তারা মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভারতের সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তখন পর্যন্ত ছিল অবাস্তব। ভারতের সাথে পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে আদর্শগত মিল থাকায় মুজিবনগর সরকার ভারতের সাহায্য কামনা করে। কিন্তু খন্দকার মোশতাক, কাইয়ুম ও অন্যান্য কিছু নেতা ভারতে অবস্থান করে ভারতীয় সহায়তার বিরোধিতা করেন। এটা প্রকারান্তরে বাংলাদেশ বিরোধিতার শামিল বলে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে মনে করা হয়। এ সব কারণে সরকারের অভ্যন্তরে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খন্দকার মোশতাক যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি কয়েকবার যুক্তরাষ্ট্র গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মার্কিন সরকার তাকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রটোকল দিতে অস্বীকৃতি জানায়।[২১] যুক্তরাষ্ট্র খন্দকার মোশতাককে লন্ডন বা প্যারিসে গিয়ে পাকিস্তানের সাথে কথা বলার জন্য পরামর্শ দেয়।[২২] মোশতাক পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য শেখ মুজিবের মুক্তি চাইতেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

খন্দকার মোশতাকের পাকিস্তান সম্পৃক্ততার বিষয়টি মুজিবনগর সরকারের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে মোশতাক জনাব মাহবুবুল আলম চাষীকে নিয়োগ দেন। এ নিয়োগ মোশতাকের পছন্দের। কিন্তু মাহবুবুল আলম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বাঙালি অফিসারদের মধ্যে কট্টর পাকিস্তানপন্থী ছিলেন।[২৩] পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোশতাক মাহবুবুল আলম চাষীকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। এজন্য পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী তাকে এ পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে আব্দুল ফতেহকে পররাষ্ট্র সচিব নিয়োগ দেন। খন্দকার মোশতাক অত্যন্ত চতুরতায় তাঁর মিশনকে সফল করতে অনুগত ব্যক্তিদেরকে তিনি মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগে অনেকটা সফলকামও হন। কুমিল্লা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত এম.এন.এ. তাহের উদ্দিন ঠাকুরের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পান। এ মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা ছিলেন আব্দুল মান্নান এম.এন.এ.।[২৪] ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে আব্দুল মান্নান সরকারি কাজে কলকাতার বাইরে গেলে তাহের উদ্দিন ঠাকুর বেতার কেন্দ্রের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি বৈঠক ডাকেন। তাহের ঠাকুর বেতার স্টুডিওতেই অবস্থান করতেন। আব্দুল মান্নান কলকাতায় ফিরে এসে তার এ কর্মকাণ্ড পছন্দ করেননি। তখন ঠাকুর পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ হাইকমিশন ভবনে মোশতাকের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন।[২৫] এর কিছুদিন পরই বেতারকর্মীরা বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৩ দিনের এ ধর্মঘট এক 'গোপন মহলের' প্রচেষ্টায় হয়েছিল বলে এম.আর. আকতার মুকুল উল্লেখ করেছেন।[২৬] এই "গোপন মহল" কারা তা সহজেই বোধগম্য। তাহের উদ্দিন ঠাকুর স্টুডিও থেকে চলে গিয়ে পার্ক সার্কাসে অবস্থান নিলেও তিনি সুকৌশলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। যেখানে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ নিজেদের জীবন দিয়ে দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিল সেখানে ধর্মঘট করার মতো অনভিপ্রেত ও হঠকারী কর্মকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধকেই বিপদগ্রস্ত করার নামান্তর।

উপর্যুক্ত কারণে তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ১৬ ডিসেম্বরের পরে খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে আব্দুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। এতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তুঙ্গে ওঠে। এ প্রসঙ্গে নূরুল কাদেরের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ও মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের অনেক কাজই প্রশ্নাতীত ছিল না। এমনকি তাদের কর্মকাণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার মতো অবস্থায়ও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিবের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড প্রধানমন্ত্রীর নজর এড়ায়নি। বিচক্ষণ ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সময়মতো যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। তা না হলে বাংলাদেশের ইতিহাস হয়তো বর্তমানে অন্যভাবে লেখা হতো।[২৭]

২৩ জুন '৭১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন বরাবর একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। উক্ত টেলিগ্রামে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে গভীরভাবে আহত ও মর্মাহত। টেলিগ্রামে তিনি উল্লেখ করেন, পাকিস্তানে এই অস্ত্র ও ত্রাণকার্য সরবরাহ গণহত্যার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। "একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবেদন জানাচ্ছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই এই গণহত্যার গণউদ্দেশ্য এবং মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানাচ্ছি।"

এর অভ্যন্তরে যেসব বিষয়াদি ছিল কোনোটাই তৎকালীন প্রধান বাস্তবতার বাইরে ছিল না। সেই বাস্তবতা ছিল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করা, সেটা ঢাকা দখল করা হোক অথবা স্বাধীন দেশ ফিরে পাওয়া হোক–দুটোই ছিল একই বাস্তবতার দুই দিক। এতে ভারত সরকার সফল হয়েছিল এবং মুজিবনগর সরকারের রাজনীতির এই উদ্দেশ্য সফল হয়।"

ব্যারিস্টার মওদুদ আউট

ষড়যন্ত্র শুধু এ পর্যায়ে থেমে থাকেনি। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বহির্বিশ্ব প্রচার উপ-বিভাগের সদস্য ছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কমনসভার সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার যোগাযোগের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন অবগত ছিলেন না। যুদ্ধরত একটি দেশে আন্তর্জাতিক প্রচারের বিষয় প্রধানমন্ত্রীর অজ্ঞাতে হবে এটা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন তার প্রেরিত চিঠিপত্রে বিদেশনীতি ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হন। প্রধানমন্ত্রী পর্যবেক্ষণ করেন যে, মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে মওদুদ একত্রে কাজ করছেন এবং একই সঙ্গে কলকাতা মিশনের প্রধান হোসেন আলীর দিকেও হাত বাড়িছেন। কিন্তু ব্যারিস্টার মওদুদকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সরকারি পদ ও দায়িত্ব দেয়া হয়নি। পররাষ্ট্রসচিব থেকে জানানো হয়েছে উক্ত মন্ত্রণালয়ে তাকে যথাযথভাবেই স্থান দেয়া যাচ্ছে না। একথা শুনে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে জুলাই মাসের শেষের দিকে দেখা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার কাজের প্রশংসা করেন এবং বলেন, ভিন্ন কোয়ার্টার থেকে অফিসিয়ালি তাকে দায়িত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে বাধা আছে। তিনি খন্দকার মোশতাক তাকে স্বেচ্ছামূলকভাবে কাজ করার পূর্বে যেমনটি করেছেন তেমনভাবেই করার জন্য বলেন। আগস্ট মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাকে যৎসামান্য সম্মানি দেন। ব্যারিস্টার মওদুদ লিখেছেন, "অবস্থা এমনভাবে দাঁড়ায় যে, মানসিকভাবে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপমানবোধ করতে থাকি এবং উপলব্ধি করতে পারি আমাকে কার্যকরভাবে কাজ করতে দেয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি পুনরায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে দেখা করি এবং তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তার সঙ্গে আমি বিষয়টি আলোচনা করি একপর্যায়ে তিনি সবকথা না শুনে বলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কিন্তু যতদূর জানা যায় প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করেননি।"

ব্যারিস্টার মওদুদের এসব বক্তব্যে হলো সাফাই গাওয়ার মতো। প্রকৃতপক্ষে সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের নিকট নিশ্চয়ই এমন কোনো কার্যপ্রমাণ ছিল যে ব্যারিস্টার মওদুদ নেপথ্যে মাহবুবুল আলম চাষী ও খন্দকর মোশতাকের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে হয়তো প্রতীয়মান হয়েছে বাংলাদেশকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ষড়যন্ত্র করে চলেছে সম্ভবত মোশতাক চক্রের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিল। সেজন্য তাকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখেন।

টীকা

১. "The present author (Enayet), then residing in the United States on a study leave from his teaching position at Rajshahi University, visited Mujibnagar and spent some time with the Mukti Bahini on the Balurghat front in July-August 1971. (Two former Rajshahi University students, Abu Sayeed, M.N.A and Abdur Rahman, M.P.A, where in charge of the Balurghat camp where I had experienced the real sound and fury of the liberation war, page-15.

২. জহিরুল কাইয়ুম বামবিরোধী বা মার্কিনঘেঁষা। খন্দকার মোশতাক এদের নেতা।" দলিল মতে মার্কিনীদের সাথে আলাপকালে কাইয়ুম বলেছেন যে মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বামদের হাতে চলে যাচ্ছে এবং যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বামরাই ক্ষমতায় আসবে।

৩. আফসান চৌধুরী ৪র্থ খণ্ড, বাংলাদেশ ৭১, হোসেন তৌফিক ইমাম, এই গ্রন্থের সাক্ষাৎকার অধ্যায়, পৃ. ৪০৭।

৪. আফসান চৌধুরী ৪র্থ খণ্ড, বাংলাদেশ ৭১, আসাদুজ্জামান ও হোসেন তৌফিক ইমাম, এই গ্রন্থের সাক্ষাৎকার অধ্যায়, পৃ. ৪১৪ ও ৪০৭।

৫. Congressional Record, December, 9, 1971, P. 45735 এখানে কিসিঞ্জার নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি বলেছেন, "We established contact with the Bangladesh people in Calcutta, and during August, September and October of this year, no fewer than eight such contacts took place. We approached President Yahya Khan three times in order to begin negotiations with the Bangladesh people in Calcutta. The Government of Pakistan accepted."

৬. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol-XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 177, দেখুন "On August 8 the Political Counselor of the Embassy in New Delhi met with M. Alam,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"Foreign Secretary" of the Bangladesh movement. Alam requested a meeting with Ambassador Keating but accepted an informal meeting with the Political Counselor when informed that Keating's official position precluded him meeting with a Bangladesh representative. The thrust of Alam's remarks was that the goal of total independence for Bangladesh was firmly established, and he urged the United States to support that goal. (Telegram 12698 from New Delhi, August 9: National Archives, RG 59, Central Files 1970-73, POL 23-9 PAK."

৭. ৫৪. Henry Kissinger, White House Years, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, Page- 872 দেখুন, "The Next day (28 September 1971) the Bangladesh "foreign minister" finally met with our Consul in Calcutta; he said talks were useless unless the United States used its influence to bring about Bengali "desires," which included full independence, freedom for Mujib, US aid and normal relations."

৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র: পঞ্চদশ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, পৃষ্ঠা- ১৫৭-১৫৮ ।

৯. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol-XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 225, দেখুন "Telegram from the Department of State to the Consulate General in Calcutta, Washington, September 21, 1971দেখুন, "Printed from an unsigned copy. A week after receiving this instruction, the Consulate General indicated that it was "Stymied" in its efforts to arrange a meeting with Islam. The only channel to Islam remeined through Qaiyum. Qaiyum sent a message that Islam was still keen to talk to a political officer but was seeking permission from the Indian Government to do so. (Telegram 2570 from Calcutta, September 28, ibid.)"

১০. Henry Kissinger-White House years, Page-870, "Yahya's reaction was surprisingly favorable. Recognizing that he had trepped himself, he was grouping for a way out. He welcomed out contracts in Calcutta, asking only to be kept informed. He even accepted Farland's suggestion that we use our good offices to arrange secret contacts between his government and the Bengali exiles."

১১. Henry Kissinger-White House years, Page-873, "On October 20 senior Bangladesh Official, Hossain Ali, told our consul that his organization was not interested in passing messages to Yahya; the "obvious solution" was Mujib's release and immediate independence for Bangladesh. By the end of October, the Indian press was publicly warning against Bengali negotiations with

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"foreign representatives." In short, the effort to encourage negotiations between the Government of Pakistan and the Bangladesh Government in extile was finished."

১২. Henry Kissinger-White House years, Page-870, খন্দকার মোশতাক সম্পর্কে কিসিঞ্জার বলেছেন, "He even accepted Farland's suggestion that we use our good offices to arrange secret contrasts between the two governments and the Begali exiles."

১৩. The Times of India, New Delhi, July 2, 1971.

১৪. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol-XI, South Asia Crisis, 1971, Page-157.

১৫. Henry Kissinger, White House Years, Page- 856 দেখুন, "One proposal, for example, was all-out support for Yahya. এবং The White House's main plank was to ensure the Security and integrity of Pakistan."

১৬. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol-XI, South Asia Crisis, 1971, Page: 157, "Vast majority believe that US is the only country that can save the situation in East Bengal." See page 53-54.

১৭. Enayetur Rahim an Joyce L. Rahim, Bangladesh Liberation War and Nixons White House, op-cit p.11.

১৮. Enayetur Rahim an Joyce L. Rahim, Bangladesh Liberation War and Nixons White House, 1971, op-cit p.182.

১৯. Enayetur Rahim an Joyce L. Rahim, Bangladesh Liberation War and Nixons White House, 1971, op-cit p-224-225.

২০. Enayetur Rahim an Joyce L. Rahim, Bangladesh Liberation War and Nixons White House, op-cit p.411.

২১. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol-XI, South Asia Crisis, 1971, Page-198.

২২. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol-XI, South Asia Crisis, 1971, Page-19.

২৩. শামসুল হুদা চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধে মুজিব নগর, বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা- ২৪৪ ।

২৪. মোহাম্মদ নূরুল কাদের, একাত্তর আমার, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ-৬৬ ।

২৫. এম.আর. আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৩৯১, পৃ. ১৪২ ।

২৬. এম.আর. আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৩৯১, পৃ. ১৪২ ।

২৭. মোহাম্মদ নূরুল কাদের, একাত্তর আমার, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ-৭১ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : চৌদ্দ

মুক্তিযুদ্ধের জনপ্রতিনিধিরা অবহেলিত

[একাদশ অধ্যায়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে যে গেরিলাদের অবিস্মরণীয় অবদান ছিল তার যথাযথ মূল্যায়ন, মর্যাদা বা সম্মান দেয়া হয়নি। তেমনিভাবে চতুর্দশ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জনপ্রতিনিধিদের এখন পর্যন্ত মূল্যায়ন করা হয়নি। তাদের সুনির্দিষ্ট আইনিকাঠামোর মাধ্যমে যথাযথভাবে সম্মান জানানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অথচ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সরকার গঠন করেন এবং দেশ-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের অবহেলা করে বা বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হতে পারে না। যুদ্ধপ্রশিক্ষণে, যুদ্ধক্ষেত্রে বা রণাঙ্গণে প্রায় সর্বত্রই জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে জনপ্রতিনিধিরা যদি মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যথার্থ ভূমিকা পালন না করত তাহলে জেনারেল টিক্কা খান ৮৮ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সামরিক আইনে বিচার করে দন্ডাদেশ দেয়ার কথা কেন ঘোষণা করেছিলেন? সেক্ষেত্রে তুলনা হিসেবে নয়, ইতিহাসের সত্যকে তুলে ধরার জন্য এ প্রশ্ন উঠতেই পারে একমাত্র মুক্তিবাহিনীর সেনাপ্রধান জেনারেল ওসমানী ব্যতিত অন্যকোন সামরিক অধিনায়কদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক জান্তার পক্ষ হতে কোনো অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে কী ধরণের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনীত হয়েছিল সাধারণ নথিপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সকল কৃতিত্বই তারা করায়ত্ত করে বসে আছে। অন্যদিকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অবহেলার অন্ধকারে ফেলে রাখা হয়েছে। কত জন জনপ্রতিনিধি খেতাব বা পদক পেয়েছেন? স্বাধীনতা পুরস্কার কিংবা বিশেষ কোন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কিনা তা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা উচিত। অন্যদিকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সামরিক কর্তৃপক্ষ জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।]

গ্রামের সাহসী যুবকদের সংগঠিত করেছেন '৭১ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। প্রশিক্ষণ পেয়ে গ্রামের শান্ত নিরীহ যুবকটি হয়ে উঠেছে দুঃসাহসিক যোদ্ধা। জীবন দিয়েছেন। রক্ত দিয়েছেন। তাঁদের জন্য লেখা হবে না কোনো গৌরব গাথা। বিজন পথে, জঙ্গলে, নদীর পারে, ধান ক্ষেতে কিংবা বিস্মৃতির কাদা মাটিতে নীরব কোলাহলে তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁদের জন্য নেই কোনো চিহ্নিত কবর। নামফলক। কিংবা স্মৃতিসৌধ। সাহসী সেই যোদ্ধাদের আত্মবলিদানের ফলশ্রুতিতে কতিপয় নামধারী আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি তাদের প্রাপ্য পদক, খেতাব, সম্মান এবং মর্যাদা। তাঁদের গৌরবময় কৃতকর্মকে লুণ্ঠন করে অনেকেই ভূষিত হয়েছেন নানা রাষ্ট্রীয় খেতাবে, নির্লজ্জতার মেডেলে। যদিও তাঁদের অনেকেই গর্জিত কামানের সুদূরে অথবা যুদ্ধফ্রন্ট থেকে তাদের দূরতম অনুপস্থিতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই গণযুদ্ধ। এ যুদ্ধ সামরিক যুদ্ধ নয়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে জনগণের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ বাঙালি জাতির অস্তিত্বের লড়াই। পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাত্র ৪ হাজার বাঙালি সেনা অফিসার নিয়ে গড়ে ওঠে নিয়মিত বাহিনী। পাকিস্তানি সেনা কাঠামোয় গড়ে ওঠা অফিসারদের কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত অধিকাংশ সেনাকর্মকর্তাদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছে আত্মরক্ষার জন্য, যেমন জেনারেল ওসমানী বলেছেন, এদের উপর 'আক্রমণ' না হলে সম্ভবত এরা 'নিরপেক্ষই' থাকতেন। মুক্তিযুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক যুদ্ধ আর এরা ছিলেন রাজনীতি থেকে যোজন দূরে।

অথচ অনিয়মিত বাহিনী যারা গেরিলাযোদ্ধা তাঁরা এসেছেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, জীবন যুদ্ধে লড়তে গিয়ে শিখেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতির অস্তিত্ব, বাঁচা মরার প্রশ্ন এবং বেকারত্ব, দারিদ্র্য, শাসন ও শোষণের চক্রকে ছিন্ন ভিন্ন করার প্রতিজ্ঞা। তারা এসেছেন বঙ্গবন্ধুর ডাকে, তাঁর প্রেরণায়, নির্দেশে ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে। এদের সংখ্যা অগণিত। শত্রু হননের পদচারণায় বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদ ছিল কম্পিত। তাঁদের আকস্মাৎ আক্রমণে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ছিল ভীতসন্ত্রস্ত। পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান জেনারেল নিয়াজী বলেছেন, "গেরিলারা আমার চোখ অন্ধ ও কান বধির করে ফেলেছে।"

ঈমান মাঝি শত্রুর খালে ঢুকিয়ে দিয়েছে নৌকা, বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান জয়গুরু, গ্রামের শিক্ষকের ছেলে মিন্টু, টগবগে খালেক সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করে কেমন করে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে তার ইতিহাস কেউ লিখবে না। খেতাব পাবে না। পদক পাবে না। বীরত্বের সনদ পাবে না। হাজারো গেরিলার আত্মবলিদানের মহিমায় তাঁদের জন্য কোনো বিশেষ দিবস নেই। কেন নেই? মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে সামরিক অধিনায়করা মুক্তিযুদ্ধকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছে। জনযুদ্ধকে সামরিক যুদ্ধের তকমা এঁটে দিতে চেয়েছে। করেছেও। খেতাব দেয়ার তকমা দেয়ার দায়িত্ব ছিল তাঁদের। জনযুদ্ধের নায়ক দুঃসাহসিক গেরিলারা আজ রাষ্ট্রে, সমাজে ও পরিবারে অবহেলিত, অবাঞ্ছিত ও মর্যাদাহীন। একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের দেশপ্রেমিক বরেণ্য সংগঠক ইতিহাসে তাঁরাও কি চিরকাল উপেক্ষিত থাকবেন? ইদানীং ভিনদেশী যুদ্ধবীরদের খেতাব দেয়া হচ্ছে। ভালো কথা। তাই বলে দেশীয় মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক তারা কি অনাগত কাল ধরে অপাঙক্তেয় থাকবে?

'৭০ সালের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যারা জাতীয় অস্তিত্বের ভয়াবহ ক্রান্তিলগ্নে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার' অমূল্য দলিল অনুমোদনের ঐতিহাসিক দায় গ্রহণ করেছিলেন। গঠন করেছিলেন গণ-পরিষদ ও স্বাধীনতার সনদ। অনুমোদন করেছিলেন রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং মুজিবনগর সরকার। আবার তারাই ছুটে গিয়েছেন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিবেশী ভারতীয় সীমান্তের কয়েক হাজার মাইলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রাম থেকে আসা যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহিত ও সংগঠিত করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূলত সেদিন কয়েক শ' ক্যাম্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রায় সাড়ে তিন শ' গণপরিষদ সদস্য। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের আকাঙ্ক্ষায় ছুটে আসা হাজারো যুবক যারা পেয়েছে আশ্রয়, খাদ্য, ন্যূনতম চিকিৎসা, সর্বোপরি শত্রু হননের জন্য গেরিলা প্রশিক্ষণ। সীমান্তজুড়ে এই ক্যাম্পগুলো ছিল মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিভূমি। তার সংগঠক ছিলেন জনপ্রতিনিধি ও রাজনীতিবিদরা। প্রায় সকলেই আজ অবহেলিত উপেক্ষিত ও মর্যাদাহীন। যাঁরা নিয়মিত বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তাদের ভাগ্যে বীরউত্তম জাতীয় নানা ধরনের খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। পেয়েছেন স্বাধীনতা খেতাব। গ্রাম-গঞ্জে, নগরে-প্রান্তরে যারা যুদ্ধ করেছে এইসব কনভেনশনাল বাহিনীর অধিকর্তাদের পক্ষে এসব দুঃসাহসিক অকুতোভয় গ্রামীণ যোদ্ধাদের গৌরবময় যুদ্ধকীর্তি অজ্ঞাত বিধায় এদের ভাগ্যে জোটেনি রাষ্ট্রীয় সম্মানের বরমাল্য।

লড়াইয়ের মাঠে প্রত্যক্ষভাবে সাংগঠনিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য যে শতাধিক জনপ্রতিনিধিদের পাকিস্তান সামরিক ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল, যাঁদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল, আত্ম-পরিবারকে হত্যা করা হয়েছিল সে কষ্টকর অথচ গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস কোনোদিনও রাষ্ট্র বা সরকার জানতে চায়নি। গবেষণা হয়নি কীভাবে গ্রামে-গঞ্জে, প্রান্তরে জনযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। রাতের আঁধারে অথবা ঘন বৃষ্টির অস্বচ্ছ অন্তরালে শত্রু হননের নিদারুণ প্রত্যয়ে নিজের জীবনকে করেছে উৎসর্গ, তাদের পেছনে জনগণের প্রতিনিধিদের প্রতিনিয়ত বেদনা-বিধুর মুহূর্তগুলো, প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ঘটনাবলি, কীভাবে গেরিলাদের আত্মজ-অভিভাবকত্বে রক্তাক্ত যুদ্ধস্মৃতি তাদেরকে একাত্ম করেছিল, এক দেহ ও সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল সে ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণই থেকে যাবে যদি এই ভিত্তিভূমির অসম সময়ের দুঃসাহসিক সারথিদের কীর্তিময় ভূমিকা জাতীয় মর্যাদার অভিধায় অভিসিক্ত না হয়।

এদের রাষ্ট্রীয় সম্মান বা পদক দেয়া হয়নি কেন?

১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের যে সকল সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা ধরনের অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে মুক্তিযুদ্ধে তারা যথার্থভাবে অংশগ্রহণ করেননি। বিভিন্নভাবে রণাঙ্গন থেকে দূরে থেকে তারা বিলাসী জীবন-যাপন করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ভিন্নতর। সিংহভাগ এম.এন.এ ও এম.পিগণ অর্থাৎ গণপরিষদ সদস্যবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকেই যে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন সামন্যতম গবেষণায় তা বেরিয়ে আসবে। অচেনা ও অজানা জায়গায় নিদ্রাহীন দিন যাপনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দীর্ঘ ৯ মাস তাদের অধিকাংশ দারা পুত্র পরিবার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। শুধু পরিবার কেন, নিজের সুখ-সুবিধার দিকেও তাকাবার অবসর পাননি। সরকার গঠন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সনদ অনুমোদন ও মুজিবনগরের সরকার গঠনে অনেকে অংশগ্রহণ না করতে পারলেও সাবারই দৃপ্ত শপথ ছিল বাংলাদেশকে স্বাধীন করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ শরণার্থীদের দেখাশোনা করেছেন, কেউ বা চিকিৎসা পরিচালনা করেছেন। অনেকেই সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ফলে অধিকাংশ জনপ্রতিনিধিদের ঘরবাড়িতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার দোসররা অগ্নিসংযোগ করেছে। আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করেছে। ব্যক্তিগতভাবে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে লেখকের ও তার আপনজনদের ভাই চাচা মামা তাদের প্রত্যেকের বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয়া হয়। আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করা হয়। ৮০ বছরের বৃদ্ধ মা আশ্রয়হীন হয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছিন্নমূল মানুষের মতো ছুটে বেড়িয়েছে। সেদিন আতঙ্ক, ভয়ের কারণে অনেকেই তাদের পরিজনদের ঠাঁই দেয়নি। খাদ্য নেই। আশ্রায় নেই। অর্থ নেই। এই অবস্থায় বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনজনদেরকে গুরুত্ব না দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনকেই ধ্যান ও জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি।

সেদিন যদি গণপরিষদের এসব সম্মানিত সদস্য ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতেন তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে তা হতো এক ভয়াঙ্কর সর্বনাশা কাণ্ড। স্বাধীনতার সংগঠকদের দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন উপেক্ষা করা হয়েছে তাদের আশ্রয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধাদের। এদের যথাযথ সম্মান আজও দেয়া হয়নি।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করেই বলা যেতে পারে লেখকের নির্বাচনী এলাকা পাবনা জেলার বেড়া, সাঁথিয়া ও সুজানগর এলাকার এক বিস্তীর্ণ জনপদ নিয়ে। মুক্তিযোদ্ধা, গণপরিষদ সদস্য ও গেরিলা যোদ্ধাদের বাড়িঘর ধ্বংস আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করা হয়েছে, পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে আটক করে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে মানুষ অবলোকন করেছে পাবনা জেলার বেড়া থানার অন্তর্গত উপসেনাপ্রধানের বাড়িতে বা তার নিকটতম আত্মজনের বাড়ি ধ্বংস করেনি বা তাদের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে এ সংবাদ পাওয়া যায়নি। যা আজও অজ্ঞাত। গণপরিষদের সদস্যবৃন্দের যদি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা না থাকত তাহলে পাকিস্তান সামরিক জান্তা সামরিক ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা-খুন ও ধর্ষণের অভিযোগে কেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল? শুধু তাই নয়, বেসামরিক প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এমনকি বরেণ্য শিক্ষকদের কারাদণ্ডে বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। আজ যারা মহান মুক্তিযুদ্ধের বড় বড় খেতাব ও পদবি নিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে সুবিধা ও সম্মান গ্রহণ করে থাকেন স্বাভাবিকভাবেই তারা সম্মানিত ব্যক্তি এবং গর্ব ও অহংকারের পাত্র।

প্রশ্ন উঠতেই পারে যারা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেছেন সেই সংগঠকদের এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে কেন সম্মান প্রদান করা হয়নি? দেয়া হয়নি স্বাধীনতার গৌরবজনক বিশেষ পদক। সেদিন যাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক জান্তা মামলা দায়ের করেছিল, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করেছিল, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল, ইতিহাসে আজও যারা অপাঙক্তেয় তাদের নাম পরিচয় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। সেদিন যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল সেই মহান ব্যক্তিদের নাম ঠিকানা তুলে ধরে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই– গণপরিষদের সংগঠক ও বীর গেরিলা যোদ্ধাদের নামে কেন পদক দেয়া হয়নি? এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কারণে এই অধ্যায়ে তাদের স্বর্ণোজ্জ্বল নামগুলো লিখে রেখে যেতে চাই।

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা লে. জে. টিক্কা খান ঢাকা, বাকেরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের পাঁচ ব্যক্তিকে '৭১ সালের ২৬ এপ্রিল সকাল ৮ ঘটিকায় ঢাকাস্থ দ্বিতীয় রাজধানীতে এক নম্বর সেক্টরের সামরিক আইনের সাব-এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে হাজির হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সামরিক আইনবিধি ও সামরিক আদেশ অনুযায়ী আনীত কতিপয় অভিযোগের জবাবদানের জন্য তাদের হাজির হতে নির্দেশ হয়েছে। তারা হাজির হতে ব্যর্থ হলে এম এল আর -৪০ অনুযায়ী তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হবে।

এসব নাম পরিশিষ্টে উল্লেখ করাই রীতি। কেননা এদের উত্তরাধিকার ও নতুন প্রজন্ম যেন এদের নগণ্য মনে না করেন। সেজন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহকর্মী হিসেবে ইতিহাসে এদের অমরকীর্তি অক্ষয় এবং যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে এবং তাদের মহান ত্যাগ তিতিক্ষা ও আদর্শ চিরঞ্জীব হয়ে থাক এই লক্ষ্যে বইটির অন্তর্গর্ভে স্বর্ণোজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাক সেই দায়বদ্ধতা থেকেই এই মহান ব্যক্তিদের নাম লিপিবদ্ধ করতে আমার বিবেক আমাকে তাড়া করেছে। দেশে দেশে যারা এভাবে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদান করেছেন ইতিহাসে তাদের নাম এবং ফলক চিরকাল দৃশ্যমান হয়ে থাকে। রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থা করেছে। তাদের নাম-ঠিকানা উল্লেখ হয়তো অনেকের কাছে বিসদৃশ মনে হতে পারে কিন্তু আমার বিবেচনায় তাদের নাম, তাদের ত্যাগ, আদর্শের প্রতি আনুগত্য সোনার বাংলা গড়ার দৃষ্টান্ত সৃষ্টির উপদান হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। কোনো দিন কোনো কালে যদি কোনো গবেষক কিংবা ইতিহাসবিদ এসব জনপ্রতিনিধির মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করতে চান সে লক্ষ্যে নামগুলো লিপিবদ্ধ হলো। আশা করি পাঠকেরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টি বিবেচনায় নেবেন।

এখানে আরো একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্নটি সঠিক কিংবা বেঠিক আজও তা আমি জানি না। তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে যখন এ পর্যন্ত কোনো ইতিহাস, তথ্য বা লেখনীতে এমন নাম পাওয়া যায়নি যারা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক, অথবা সেক্টর কমান্ডার কিংবা সাব সেক্টর কমান্ডার তাদের নামে পাকিস্তান সামরিক জান্তা কোনো মামলা দায়ের করেছিল কিনা? করে থাকলে তা প্রকাশ করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। এমনকি আমার ব্যক্তিগতভাবে জানা আছে আমার বাড়ি থেকে একই নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান এ কে খন্দকার তার বাড়িতে কোনোদিন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কোনো লোক হানা দিয়েছিল কিনা কিংবা তার বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল কিনা আমার মনোজগতে এই প্রশ্নটি রয়ে গেছে অথচ প্রায় প্রতিটি জনপ্রতিনিধির বাড়ি-ঘর দগ্ধ হয়েছে। আত্মীয়-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে কিংবা রাজাকার আলবদরদের অত্যাচারে গ্রাম-ছাড়া করা হয়েছে, কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধকে সামরিক যুদ্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান, বিশেষ দিবস পালন করেন, পদক বা খেতাবে ভূষিত হয়ে আলোকোজ্জ্বল পাদ-প্রদীপের সামনে গর্ব ঔদ্ধত্য মস্তকে অভ্রভেদি হয়ে উঠেছেন তাদের কাছে আমার এ বিনীত প্রশ্ন থেকেই যাবে। তাদের দায়িত্ব এ বিষয়টি পরিষ্কার করা।

কেবল ইতিহাস পর্যালোচনায় তাদের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে একজনের গর্বিত নাম, তিনি হলেন, সেনাবাহিনী প্রধান এম.এ.জি ওসমানী। জেনারেল ওসমানীকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ ঢাকা, ১৩ মে। 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক যে আদেশ দেন নিচে তা দেয়া হলো:-১। ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আমি 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে. জে টিক্কা খান এস.পি.কে.পি এস সি আপনি কর্নেল এম.এ. জি ওসমানীকে আপনার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ১২৩, ১৩১ ও ১৩২ নম্বর ধারা এবং ১০ ও ১৪ নম্বর সামরিক আইনবিধি অনুযায়ী আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যে ১৯৭১ সালের ২০ মে সকাল আটটার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীস্থ ১ নম্বর সেক্টরের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হতে আদেশ দিচ্ছি। ২। যদি আপনি উপরের উল্লেখ মতো হাজির হতে ব্যর্থ হন তা হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী আপনার বিচার করা হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কার্যরত, কর্মরত কতজন সহকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী অংশ নিয়েছিলেন তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব থাকলে আজকে সরকারি চাকুরেদের মধ্যে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ নিয়ে মিথ্যাচার করার সুযোগ থাকত না। যারা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সেজে ভুয়া সনদ নিয়েছেন তারা শুধু নিজেদের অপমান করেননি গোটা মুক্তিযুদ্ধকে কলঙ্কিত করেছেন। ব্যক্তির স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের সনদকে ব্যবহার করেছেন, এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে?

প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় 'বাজেভাবে' সময় কাটিয়েছে। তারা আরাম আয়েশ করেছে। হোটেলে ফুর্তি করেছে। রণাঙ্গনে যায়নি। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। এসব অভিযোগ সর্বাংশে সঠিক নয়। তাদের জবাবে নিচের ক্যাম্পগুলো কারা পরিচালনা করেছে তার একটি তালিকা এখানে উদ্ধৃত করা হলো। বিজন জঙ্গলে, খোলা মাঠে বা কোনো সুবিধাবঞ্চিত স্থানে ক্যাম্পগুলো স্থাপিত হয়েছিল। যা প্রায়শই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টার্গেটের আওতার মধ্যে। সে সব স্থানে বসেই এসব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা আগত হাজার হাজার ছেলের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করেছে। ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের এই ক্যাম্পগুলোই ছিল ভিত্তিমূল। ১৯৭০ সালের নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ (এম.এন.এ) এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের (এম.পি.এ) সদস্যগণের অধিকাংশ সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অনেকেই শর্ট সামরিক ট্রেনিং নেন। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই নেতৃবৃন্দের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই স্বাধীন বাংলার নিয়মানুগ, বৈধ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছিল। চরম দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝেও এই সকল রাজনৈতিক নেতৃত্ব অতুলনীয় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারত সীমান্তের দুর্গম ও জনমানব বসতিযোগ্য নয় এমন স্থানে পরিচালনা করছিলেন যুব ক্যাম্প ও ট্রেনিং ক্যাম্প। শত অসুবিধা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র যুবককে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন অহর্নিশ।

নিচে যুব-ক্যাম্প ও ট্রেনিং ক্যাম্প পরিচালনায় যে সব এম.এন.এ ও এম.পি.এ নিয়োজিত ছিলেন তাদের মধ্যে–

১. সিঙ্গাবাদ (মালদা), খালেদ আলী মিয়া এম.এন.এ, আমজাদ হোসেন এম.পি.এ ২. বাঙালিপুর (মোহরতীপুর), মোঃ বায়তুল্লাহ এম.এন.এ রাজশাহী, মোঃ আবদুল জলিল (আওয়ামী লীগ নেতা) ৩. ডালিম গাঁ (পঃ দিনাজপুর), এস.এম. ইউসুফ এম.পি.এ, ৪. গাঙ্গরামপুর (পঃ দিনাজপুর), শাহ মাহাতাব এম.এন.পি ৫. কাটলা (প. দিনাজপুর), খতিবুর রহমান এম.পি.এ ৬. মালন (পঃ দিনাজপুর), আজিজুর রহমান এম.এন.এ, একরাম-উল হক এম.পি.এ ৭. প্রাণ সাগর (পঃ দিনাজপুর), আব্দুর রহিম এম.পি.এ, আবেদ আলী, এডভোকেট ৮. কুসমুণ্ডী (বাটেশ্বরী), মোসেদ আলী এম.এন.এ, এস.এ.বারী এটি, (ন্যাপ নেতা) ৯. মালঞ্চ (কুরমাইল), অধ্যাপক আবু সাইয়িদ এম.এন.এ ১০. ত্রিমুহনী (বালুরঘাট), মোজাফফর হোসেন এম.পি.এ ১১. মাহীনগর (বালুর ঘাট), মোকলেসুর রহমান, ১২. পেরিলা (মালদা), আবদুস সালাম এম.পি.এ, ১৩. জলংগী (মালদা), আবদুস সালাম এম.পি.এ, ১৪. শেখ পাড়া (মালদা), জিল্লুর রহমান এম.পি.এ ১৫. লালগোলা (মালদা), রিয়াজউদ্দিন আহমদ এম.পি.এ ১৬. দেওয়ানগঞ্জ (কুচবিহার), আফসার আলী এম.এন.এ, আবদুর রহমান চৌধুরী এম.পি.এ ১৭. হলদী বাড়ি (জলপাইগুড়ি), আশরাফুল ইসলাম এম.পি.এ ১৮. ওকেরা বাড়ি (জলপাইগুড়ি), আবুল হোসেন এম.পি.এ ১৯. কুচবিহার, গোলাম হাবিব, আবদুর রহমান এম.পি.এ ২০. দিনহাটা (কুচবিহার), মোতাহার হোসেন তালুকদার এম.পি.এ ২১. চৌমারী (কুচবিহার), মোজাহার চৌধুরী এম.পি.এ, আবদুল হাকিম এম.পি.এ ২২. সাহেবগঞ্জ (কুচবিহার), মোজাহার চৌধুরী এম.পি.এ, আবদুল হাকিম এম.পি.এ ২৩. চৌধুরী হাট (কুচবিহার), শামসুল হক চৌধুরী এম.পি.এ, মোজাহার চৌধুরী এম.পি.এ ২৪. নাজির হাট (কুচবিহার), শামসুল হক চৌধুরী এম.পি.এ ২৫. ঝাউকাটি (কুচবিহার), মো মজিবুর রহমান, শামসুল হক চৌধুরী এম.পি.এ ২৬. শীতালকুঠি (দহগ্রাম), সিদ্দিকি হোসেন এম.এন.এ ২৭. শাহিদ কর্নার (দিনহাটা), আহমদ তফিজউদ্দিন এম.এন.এ ২৮. দহগ্রাম (কুচবিহার), সিদ্দিকুির রহমান এম.পি.এ ২৯. বামুনহাট (কুচবিহার), এ. হাকিম এম.পি.এ ৩০. মরণতলী (মানকারচর), ড. মফিজুর রহমান এম.পি.এ, নূরুল ইসলাম ৩১. খোচাবাড়ি (কুচবিহার), ওয়ালিউর রহমান এম.পি.এ ৩২. গিতালদহ (কুচবিহার), আবুল হোসেন এম.পি.এ ৩৩. সিতাল (কুচবিহার), হামিদুর রহমান এম.পি.এ ৩৪. নাগের গিধরী (কুচবিহার), করিমুদ্দীন আহমেদ এম.পি.এ ৩৫. মানকের চর (কুচবিহার),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহেরুল ইসলাম এম.পি.এ ৩৬. রানাঘাট (নদীয়া), আসাদুজ্জামান এম.পি.এ, জে.কে.এম.এ আজিজ ৩৭. কচুয়াডাঙ্গা (নদীয়া), তফিজুদ্দিন আহমেদ এম.পি.এ, ৩৮. বেতাই (নদীয়া), মোঃ ছহিউদ্দিন এম.পি.এ ৩৯. করিমপুর (নদীয়া), ইসমাঈল হোসেন এম.পি.এ গোলাম কিবরিয়া এম.পি.এ, আব্দুর রউফ এম.পি.এ ৪০. শিকারপুর (নদীয়া) আজিজুর রহমান আক্কাস এম.এন.এ ৪১. কল্যাণী (নদীয়া), হেদায়েত হোসেন এম.পি.এ ৪২. ডোমপুকুর (নদীয়া), ইউনুস আলী এম.পি.এ ৪৩. তাকিপুর (বারসাত), নূরুল ইসলাম মঞ্জুর এম.পি.এ, ৪৪. জয়বাংলা-১ (হাবড়া) শ্রমিক, আঃ মান্নান এম.এন.এ ৪৫. নৈহাটি (বারসাত), এ. লতিফ খান এম.পি.এ ৪৬. হাসনাবাদ, এ গফুর এম.এন.এ, নূরুল ইসলাম এম. পি. এ ৪৭. হিঙ্গলগঞ্জ, মির্জা আফজাল হোসেন ৪৮. হাকিমপুর, কেরামত আলী, মুশাররফ হোসেন ৪৯. তেতরা, খয়বর হোসেন এম.পি.এ ৫০. আমলানী, সউগাতুল আলমগীর এম.এন.এ ৫১. ধলতিতা, সৈয়দ কামাল বখত এম.পি.এ ৫২. নীলগঞ্জ, ফণীভূষণ মজুমদার এম.পি.এ ৫৩. কল্যাণগড়, এ.কে.এম. ইসমাইল মিয়া এম.পি.এ ৫৪. পানিহাটি, শিবুপ্রসাদ ঘোষ ৫৫. জয় বাংলা-২ বগা, অধ্যাপক আবু সুফিয়ান ৫৬. কাদিরহাট (দমদমের কাছে), নজির আহমদ তালুকদার এম.পি.এ, আমজাদ হোসেন ৫৭. ভোলাঘাট (আদমপুর মালদা), হামিদুর রহমান এম.পি.এ ৫৮. ডাওকী, মি. সুধীর বিশ্বাস ও মাহমুদ চৌধুরী ৫৯. শিলা (ডাওকী), আবদুল হক, এম. এন.এ, মানিক মিয়া ৬০. বালাট (ডাওকী), আব্দুল হামিদ এম.পি.এ ৬১. বারসারা (ডাওকী), আব্দুল হামিদ এম.পি.এ, ৬২. ঢালিখোলা (বনগাঁ), সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এম.পি.এ, এ জোহা, এম, এন,এ ৬৩. ঘোষপুর (বনগাঁ), মোমিনউদ্দিন আহমেদ এম.পি.এ, হামিদউজ্জামান এম.পি.এ ৬৪. চাপাবাড়িয়া, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর এম.এন.এ ৬৫. চানপাড়া, মতিউর রহমান এম.পি.এ ৬৬. পল্টা, মোঃ আবু সুফিয়ান ৬৭. মাজদিয়া (কুষ্টিয়া সীমান্ত), আবুল ইসলাম এম.পি.এ ৬৮. লালগোলা, আবদুল হাদী এম.পি.এ ৬৯. কচুয়া ডাঙ্গা, এ রব (বগা মিয়া) এম.পি.এ ৭০. বকিমপুর, আজিজুল হক এম.পি.এ ৭১. সেলুনিয়া (ত্রিপুরা), শহিউদ্দিন ইস্কান্দা এম.পি.এ ৭২. বেলতলী, আবদুর রহমান, শ্রমিক নেতা ৭৩. ছোটখোলা, সিরাজউদ্দিন, আবদুল কুদ্দুস (ছাত্রলীগ নেতা) ৭৪. রাজানগর, খাজা আহমদ, এম.এন.এ, তালেব আলী এম.পি.এ ৭৫. পানাতোলা, বিসমিল্লাহ মিয়া, মোঃ হানিফ এম.এন.এ ৭৬. কাঠালিয়া, জালাল উদ্দিন এম.পি.এ, ৭৭. শ্রীনগর, ক্যাপ. সুজাত আলী এম.এন.এ ৭৮. মেলাগড়, রাজা মি্‌ এম.পি.এ ৭৯. হারিনা (ত্রিপাড়া), প্রঃ খোরশেদ আলম এম.এন.এ ৮০. নরসিংগড়, এম.এ. হান্নান এম.পি.এ, মান্নান এম.পি.এ ৮১. মোহনপুর, দেওয়ান আবদুল আব্বাস এম.পি.এ ৮২. গোকুল নগর, সফিরউদ্দিন এম.পি.এ, ৮৩. তুরা (মেঘালয়), শামসুল হক এম.পি.এ ৮৪. শিলং, আবদুল মোনতাকিম চৌধুরী এম.এন.এ ৮৫. ডালু (মেঘালয়), রফিকউদ্দিন ভূইয়া এম,এন.এ ৮৬. সুভাষ পল্লী (কুচবিহার), টিপু বিশ্বাস (রাজনৈতিক কর্মী) ৮৭. মাচাং পানি (তুরা), অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এম.সি.কলেজ, ময়মনসিংহ ৮৮. নাচুয়াপাড়া, কুদরতউল্লাহ মণ্ডল এম.পি.এ ৮৯. শিববাড়ী, হাতেম আলী খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম.পি.এ ৯০. উদয়পুর, আবদুল্লাহ হারুন এম.পি.এ ৯১. বাঘামারা, এ.মজিদ (তারা মিয়া) এম.পি.এ ৯২. শিলচর, সাইদুর রহমান ৯৩. আলম বাজার, ঐ ৯৪. পল্টনা, ক্যাপ্টেন সুজাত আলী এম.এন.এ ৯৫. মহেন্দ্রগঞ্জ, করিমুজ্জামান তালুকদার, এম.পি.এ, আবদুল লতিফ সিদ্দিকি এম.পি.এ ৯৬. বংড়া, আনিসুর রহমান, আওয়ামী লীগ কর্মী ৯৭. ছাইমরা, মোস্তফা শহীদ এম.এন.এ ৯৮. বড় খাসিয়া, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর এম.এন.এ ৯৯. খেয়ালী, আব্বাস আলী খাঁ, এম.পি.এ ১০০. তাকি (বনগাঁ), প্রফেসর এম.এ রউফ।

গেরিলা বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে এই ক্যাম্পগুলো অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। এখানে প্রথমে তারা পেয়েছে আশ্রয়, খাদ্য ও নিরাপত্তা। এখান থেকেই তাদের প্রাথমিক শারীরিক ট্রেনিং শুরু হয়েছে। অনেক ক্যাম্পেই গেরিলা ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি অপারেশনাল ক্যাম্প হিসেবে কাজ করেছে। এ সম্পর্কে কাজী সামসুজ্জামান লিখেছেন–"মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সব মুক্তিযুদ্ধ শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই কুরমাইল ক্যাম্প। এই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন পাবনা থেকে নির্বাচিত এমএনএ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। এই ক্যাম্পটি দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল অপারেশন ক্যাম্প এবং অন্যটি যুব অভ্যর্থনা শিবির। প্রায় দুই হাজার যুবক এখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। এদের মধ্যে থেকেই প্রাক্তন পুলিশ, ই.পি.আর, আনসার এবং ছাত্রলীগের সদস্যদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল অপারেশন ক্যাম্প। এই অপারেশন ক্যাম্পের প্রধান কাজ ছিল পার্বতীপুর-হিলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে রেল চলাচল ব্যাহত করা এবং পাকবাহিনীর হাত থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জানমাল রক্ষা করা। আমরা যখন ঐ ক্যাম্পে পৌঁছালাম তখন দুপুর হয়ে গেছে। ঘুরে ঘুরে ক্যাম্পের খবরাখবর নিলাম। ক্যাম্পের প্রশাসন বিশেষ করে ক্যাম্পের নিজস্ব হাসপাতাল সত্যিই আমাদের মুগ্ধ করেছিল।" এ সম্পর্কে স্বাধীন বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান এক সপ্তাহব্যাপী উত্তরবঙ্গের ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করে একটি লিখিত রিপোর্টের একাংশে বলেছেন–"Islampur which we visited on 12th is a mixed force-student camp. A,M. EPR-110 and S-100. Camp in Charge Fazlul Mia finds his authority questioned by the BSF-EPR clique. He is afraid to stay in the camp site. Trainees complain they have to tend to cows, kitchen 2 mile from camp. Money inflow from across the border reported. But there is provision for the increase in strength upto 500. Raigunj (Malone) was visited same day, where there are two camps 1 mile apart. Azizur Rahman in charge of both camps whose composition is M 54, EPR 61 and TS 10 for the operation camp, and S 125 for the other one which consists mostly of Hindu College students (60%) space short.

On 13.71 "we visited what may be termed the best camp: **Kurmail**. present strength 700. Of these about 400 participated in guard of honour and listened to the ministers inspiring speech,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

drenched in heavey rain. Already 1000 have been sent for training (228+300+400). Trainer EPR. No ration, Active work by Prof. Abu syeed, camp in Charge.

Bangalipur is 7 miles from Kurmail. Here we saw 143, 73 having joined the Rajiganj army camp. Another 89 will return soom. 4 grenades, 16 rifles and 3 stens in stock. Camp in Charge Md. Jalil. They submitted reposition. A general conclusion may be reached from the experience in visiting these camps. Wherever he force and students gave been segregated good results have been observed.

The Following suggestions may be made from the experience of the tour.

1. The EPR, BSF and the students training camps should be all segregated.

2. A uniform better ration should be given to the trainees with immediate effect.

3. The Central office of the BDMSS Samiti should immediately take steps regarding Coochbehar. The situation in that district calls for quick action."

এখানে পর্যবেক্ষণ করা যাবে যে সমস্ত ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সেই সকল ক্যাম্পেই বাংলাদেশ থেকে আগত তরুণরা আস্তানা খুঁজে নিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান কর্তৃক মুজিবনগর সরকারের কাছে পেশ করা রিপোর্টটি তার প্রকৃষ্ট প্রকাশ।

AMARBOI.COM

অধ্যায়: পনেরো

বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব

[পঞ্চদশ অধ্যায়ে মূলত মুক্তিযুদ্ধের উপসেনাপ্রধান এ কে খন্দকার লিখিত বইয়ে জাতির সামনে যে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ব্যখ্যা প্রদান করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ সত্যের মুখোমুখি বইটির সকল অধ্যায়গুলো পর্যালোচনা করলে সচেতন পাঠক মাত্রই দেখতে পাবেন যে রাজনীতিবিদদের কারণেই বাংলাদেশ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়েছে। তাদের ত্যাগ তিতীক্ষা অবদানকে অবমূল্যায়ণ করে কিংবা ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা দিলে অল্প ক্ষয়ক্ষতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হতো এই ধরনের মন্তব্য বইটিকে অর্বাচীন বিতর্কের ভিতরে ঠেলে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে ২৫ মার্চের পরেও যিনি কর্মরত ছিলেন তিনি কি করে দুই বার বর্ডার থেকে ফিরে এসে পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরি করেছেন। তাকে পাকিস্তানিরা সন্দেহ করেনি কেন?]

সম্প্রতি প্রশ্ন উঠানো হয়েছে, স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়াই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এ ধরনের একটি আচমকা-যুক্তিহীন ও ইতিহাস বিবর্জিত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা না থাকলেও যেহেতু প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এ কে খন্দকারের লিখিত বই থেকে, সেজন্য এর প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো উত্থাপন ঐতিহাসিক কারণেই জরুরি। তবে এ প্রসঙ্গে তার উত্থাপিত মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে সবিনয়ে সংক্ষিপ্তভাবে ঐতিহাসিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। কেননা এর ফলশ্রুতিতে দেশ ও জাতির ভ্রান্তি নিরসনে যেমন নতুন মাত্রা যোগ হবে তেমনি সবচেয়ে উপকৃত হতে পারি আমি স্বয়ং।

১. মার্কিন গোপন দলিলে লিখিত আছে, 'মুজিব ও ইয়াহিয়া খান ২৩ মার্চ একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল অবিলম্বে বাংলাদেশের প্রাদেশিক সরকার গঠিত হবে এবং কেন্দ্রের হাতে কেবল দেশ রক্ষা, বিদেশনীতি এবং অর্থ সীমিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে'। কিসিঞ্জার সিআইএ'র প্রধান রিচার্ড হেলমসকে জিজ্ঞাসা করেন শেখ মুজিব গ্রেফতার হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে? তিনি বলেন বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের যে অত্যুঙ্গ জনপ্রিয়তা ও আবেগ রয়েছে তার ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে যার পরিসমাপ্তি ঘটবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাধ্যমে। কিসিঞ্জার বলেন, পরিস্থিতি যাই হোক আমরা পাকিস্তানের পক্ষে থাকব। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা, স্টেটস ডিপার্টমেন্ট সকলেই অবগত ছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো ছাড় দেবেন না।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নিরীহ বাঙালির উপর যে আক্রমণ করবে এ কথা বঙ্গবন্ধুর অজানা ছিল না। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঐদিন রাজনৈতিক সমঝোতার ঘোষণা না দিয়েই ছদ্মবেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি সামরিক বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দেন। এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধু অবগত ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে গবেষণায় দেখা যায় বঙ্গবন্ধু বেশ কয়েকটি চ্যানেল প্রস্তুত করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স ও অন্যান্য স্থানে রক্ষিত ওয়্যারলেস, গুলিস্তানস্থ টিএ্যান্ডটি ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ও টেলিফোন অফিস হতে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ঘোষণা প্রেরণের ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বিভিন্ন চ্যানেলে প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা সমগ্র দেশে পৌঁছে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে এই ঘোষণা বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এমনকি ১৫ মার্চ মার্কিন গোপন নথির এক তথ্যে বলা হচ্ছে, 'মুজিব দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন'। ২৬ মার্চ হেনরি কিসিঞ্জারের জবাবে সিআইএ প্রধান তাকে জানান যে, A clandestine radio broadcast has Mujibur Rahman declaring the independence of Bangladesh'

২. গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রাপ্ত শেষ ব্যক্তি হিসেবে দাবিদার বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রয়াত আতাউস সামাদ তার বইতে লিখেছেন, সামরিক বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলাতে বঙ্গবন্ধু মাথা নিচু করে যাতে তিনি শুনতে পান সেভাবেই বললেন, "আই হ্যাভ গিভেন ইউ ইনডিপেন্ডেন্ট। নাউ গো এন্ড প্রিজার্ভ ইট"। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বেলাল মোহাম্মদ বলেছেন, "২৫ মার্চ দিবাগত রাতে তারবার্তা আকারে বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে যে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে চট্টগ্রাম শহরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা মাইকিং করে প্রচার করা হয়। ঘোষণা সম্পর্কে সাইক্লোস্টাইল হ্যান্ডবিল বিতরণ করা হয়। ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার আলোকে লিখিত বক্তব্য আগ্রাবাদ বেতারে প্রচার করেন। যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

৩. বইটিতে প্রশ্নাকারে বিশদভাবে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা না দেয়ার ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধে সময়ক্ষেপণ হয়েছে এবং বহুলোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। বাঙালি সেনাকর্মকর্তাদের সুসংগঠিত করা হয়নি।

আমি তখন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য। বঙ্গবন্ধু সব নেতাকে ৭ মার্চের পরেই এলাকায় যাওয়ার ও সর্বত্র সার্বিক প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেন। তখনই সারাদেশে ট্রেনিং শুরু হয়। থানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। নিকটবর্তী ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। মার্কিন গোপন দলিলে বলা হয়েছে ২৫ মার্চ ৫০০০ বাঙালি সৈন্য এবং তার বিপরীতে ২০ হাজার পাকিস্তানি নিয়মিত সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করেছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদবাহিনী সব মিলিয়ে আরো ১৩ হাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ছিল। কিন্তু ইপিআর বাহিনীর যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী বাহিনী তার অধিকাংশ ইউনিটে কমান্ডিং অফিসার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মকর্তরা। সে সেনাবাহিনীর মনোভাব সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তিবাহিনীর সেনাপ্রধান জেনারেল ওসমানী বলেছেন, "পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যদি শুধু ছাত্র-যুবক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখত তাহলে বাঙালি সেনা অফিসাররা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত কিনা সন্দেহ। যখন তাদের ওপর আক্রমণ শুরু হলো তখন কেবল তারা রাতারাতি মুক্তিবাহিনী হিসেবে এগিয়ে এলেন।"

একটানা ১৯৫১-১৯৬৯ অর্থাৎ ১৮ বছর ধরে পাকিস্তানে কর্মরত বিমান বাহিনীর চৌকস ও মেধাবী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে এ. কে. খন্দকার বাংলাদেশে এসে অতি সহজে কর্মরত বাঙালি সেনাসদস্যগণের যে মনোভাব ছিল তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। কারণ ৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বের ঘটনাবলি সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা সীমিত হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। আগরতলা মামলার অভিজ্ঞতা তার চিন্তা-চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। সেসময় বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের উপর নানা ধরনের মানসিক চাপ ও পেশাগত অমর্যাদাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং বাঙালি সেনা অফিসারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। যার ফলে তারা নিজেরাই একে অন্যের সঙ্গে মন খুলে কথা বা সম্পর্ক রাখতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেকারণে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক চটজলদি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ বিভিন্ন গ্রুপে ও কমান্ডে বিভক্ত বাঙালি সামরিক সেনা কর্মকর্তাদের প্রতি দেয়া যথার্থ হতো কিনা তারও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কেননা আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সেনাবাহিনীর নিদারুণ-নির্যাতন তাদের মনে জ্বলজ্বল করছিল। তাছাড়া তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত কিনা সেটাও বিবেচ্য। চট্টগ্রামে ইপিআরের ক্যাপ্টেন রফিক, ক্যাপ্টেন সাফায়াত জামিল, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফসহ দু-চারজন ব্যতিক্রম ব্যতীত অধিকাংশ সেনাছাউনিতে বাঙালি সেনা-কর্মকর্তা পাকিস্তানিদের দ্বারা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা অস্ত্র তুলে নেননি। তারা নির্দেশ পেলেও একসাথে যুদ্ধে এগিয়ে এসে খন্দকার সাহেবের মতে 'রাতারাতি দেশ স্বাধীন করতে পারতেন' কিনা সন্দেহ। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি দেখা একরকম, যেমনটি দেখেছেন এ কে খন্দকার। কিন্তু সার্বিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ তার লিখিত পুস্তকে অনুপস্থিত থাকায় তার লেখা সম্পূর্ণ পটভূমিকে স্পর্শ করেনি।

৪. আহমেদ সালিম রচিত 'ব্লাড বিটেন ট্র্যাক' পুস্তকে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে লিখেছেন, 'জেনারেল টিক্কা খানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গ্রেফতার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে টিক্কা খান জবাব দেন, "আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি তিন ব্যান্ড রেডিও নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলেছিল, 'স্যার, শুনুন শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন' এবং আমি নিজে রেডিওর এক বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে সেই স্বাধীনতার ঘোষণা শুনি। আমি তার কণ্ঠের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম তাই তাঁকে গ্রেফতার করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশ স্বাধীন করার অভিযোগে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করেছিলেন। ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রদত্ত বেতার টিভির বক্তৃতায় তার প্রমাণ বিধৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. স্বাধীনতা ঘোষিত না হলে কিসের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে তিনি শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত বঙ্গবন্ধুর নিকট উত্থাপিত 'এক টুকরো কাগজে লেখা' পাঠ করেননি বলে খন্দকার সাহেব এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেননি। বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন সাহেবকে বলেছিলেন, এই চিরকুটে ঘোষণার দরকার হবে না। মনি, সিরাজুল আলম কলকাতা থেকে ঘুরে এসেছে। চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে কথা বলে এসেছে। সে-ই তোদের ব্যবস্থা করে দেবে।" সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু এক নম্বর আসামি ছিলেন। সে অভিজ্ঞতা তার মনে ক্রিয়াশীল ছিল। সেজন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে তাঁর পরিকল্পনায় ছিল জনযুদ্ধ। ৭ মার্চ তিনি ঐ জনযুদ্ধের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৬. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যেমন জাতীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে হয়েছে, তেমনি জাতিসংঘ স্বীকৃত একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত হলে জাতিসংঘের চার্টার অনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমুন্নত থাকে না। সেজন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নিরীহ বাঙালিদের ওপর আক্রমণ শুরু করলে বঙ্গবন্ধু যথারীতি স্বাধীনতার ঘোষণা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৭. তাজউদ্দীন আহমেদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ভারত সীমান্তে পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছে তারা আশ্চর্য হলেন, যখন দেখলেন অপরিচিত দুজন লোক তাদের স্যালুট দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তাদের পরিচয় তারা বি. এস. এফ.-এর লোক। তাদের ওপর ইনস্ট্রাকশন ছিল বি. এস. এফ.-এর প্রধান রুস্তমজীর নিকট নিয়ে যাওয়া। তিনি অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছেন। রুস্তমজীর জীপে তারা উঠে বসলেন। রুস্তমজীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, কলকাতা না গিয়ে সোজা দিল্লী চলে যান, 'ইন্দিরাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন'। সাক্ষাতে কয়েকদিন বিলম্ব হয়। এর মধ্যে পিএন হাক্সার, কাউলসহ নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে দুজনের আলোচনা হয়। তেসরা এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধী সরকার গঠনের কথা জিজ্ঞাসা করলে তাজউদ্দীন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে তাঁকে প্রেসিডেন্ট করে ইতোমধ্যে সরকার গঠন করা হয়েছে। সেই আলোচনায় কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত: ক) সীমান্তের কাছাকাছি রণাঙ্গন নির্ধারণ। খ) ভারতে বসেই কূটনৈতিক তৎপরতা ও সরকারের কার্যপরিচালনার সুবিধাদি প্রদান। গ) অস্ত্র সাহায্য। ঘ) একটি শক্তিশালী বেতারযন্ত্র।

৮. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বলেই তার ভিত্তিতে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম স্বাধীনতার খসড়া সনদ রচনা করেন যা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মূলত 'প্রোক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্স' হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক দলিল। অন্যকথায় 'জেনেসিস অব দ্য কনস্টিটিউশন'। যা সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদে চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ও সাংবিধানিকভাবে অনুমোদিত। স্বাধীনতার সনদ আইনানুগভাবে অনুমোদন করেন জাতীয় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ। এই সনদের ভিত্তিতেই ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে আইনানুগ সরকার শপথ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই সরকারের অধীনেই জেনারেল ওসমানী সেনাপ্রধান ও এ কে খন্দকার উপসেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পান ও দায়িত্ব পালন করেন।

৯. ১৯৭২ সালে ১০ এপ্রিল গণপরিষদে উদ্বোধনী ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, '২৫ মার্চ আমাদের আক্রমণ করল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছে দেয়া হোক যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলাম।' এই প্রেক্ষিতে ঐ দিন পার্লামেন্টের প্রস্তাবে একাংশে বলা হয়, "১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল এই সঙ্গে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।" বাংলাদেশের সংবিধানেও মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রস্তাবনায় বিদ্যমান।

১০. তৃতীয় প্রশ্ন হলো ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে যে ঐতিহাসিক দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দেন, যে ভাষণ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে আখ্যায়িত। যে ভাষণে বিধৃত আছে মুক্তিযুদ্ধের ও রাজনৈতিক কৌশলগত দিক। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির নির্দেশনা। বিশাল ওই জনসভায় তৎসময়ে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভাষণের শেষে বঙ্গবন্ধু 'জয় পাকিস্তান' উচ্চারণ করেছিলেন এ কথা এ কে খন্দকার সাহেব তার বইতে উল্লেখ করলেও আমার মতো স্পর্শকাতর মানুষের কর্ণকুহরে সেদিন তা প্রবেশ করেনি। এ সম্পর্কে এককালীন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা পার্লামেন্টে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে 'জয় পাকিস্তান' নিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি আকাশ-পাতাল ঘেঁটেও সে চ্যালেঞ্জ প্রমাণ করতে পারেননি। সম্মানীয় আব্দুল করিম খন্দকার জিয়াউর রহমানের আমলে (১৯৭৬-১৯৮২) পর্যন্ত রাষ্ট্রদূত, এরশাদের শাসনকাল (১৯৮২-১৯৮৬) সাল পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত, ১৯৯৮ ও ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ মনোনীত জাতীয় সংসদে সদস্য নির্বাচিত হয়, ১৯৮৬-১৯৯০ এবং ২০০৯-২০১৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন। তার মতো অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং বিদগ্ধবরেণ্য ব্যক্তি যদি তার বক্তব্যের সপক্ষে দলিল, প্রমাণপত্র উপস্থিত করতে পারেন তাহলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। না হলে তিনি সংবিধান লঙ্ঘন ও ইতিহাসের চ্যালেঞ্জে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি হিসেবেই চিহ্নিত হবেন।

১১. '১৯৭১ ভেতরে বাইরে' বইটিতে এ. কে খন্দকার মুক্তিযুদ্ধের ভেতরটা যেমন গভীরভাবে দেখেননি তেমনি বাইরের ঘটনাবলি সম্পর্কে যথাযথভাবে আলোকপাত না করে বিতর্কিত ও ছন্নছাড়া স্মৃতিচারণমূলক বর্ননা দিয়েছেন, যা তাঁর মতো মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায় না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্যানভাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশাল ও ব্যাপক যা সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত, আন্দোলিত করেছে। মার্কিন গোপন নথিদৃষ্টে দেখা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে দুই পরাশক্তির মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি এনে দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি–সেজন্য গোপনে যুদ্ধ বিমানসহ সামরিক অস্ত্র পাঠিয়েছে। চীনকে কিসিঞ্জার বলেছে, বাংলাদেশ সীমান্তে সৈন্য পাঠাও। নিক্সন তাকে বারবার এ ব্যাপারে তাগাদা দিয়েছে। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া চীনের সিয়াকিং সীমান্তে দশ লাখ সৈন্য মোতায়েন করে, যে কারণে চীন বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার সাহস পায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৭ম নৌবহর পাঠালে তার বিপরীতে সোভিয়েত ৬ষ্ঠ নৌবহর পাঠিয়ে তার মোকাবেলা করে। শ্রদ্ধাভাজন এ. কে খন্দকার তখন মুক্তিযুদ্ধের উপসেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্বরত, এসব কথা তার অজানা ছিল তা কেউ বিশ্বাস করবে না। এ কথাও তার অজ্ঞাত ছিল না যে, মুজিবনগর সরকার ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক ও সামরিকভাবে বিভিন্ন চক্রান্ত মোকাবেলার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। বইটিতে 'বাইরের' এই জীবন-মরণ ঘটনাবলি কেন উপেক্ষিত হয়েছে তা আমার বোধগম্য নয়। তবে বইটি পড়ে যে কারো ধারণা হতে পারে এসব এড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

১২. আমার একথাও বোধগম্য হয়নি যে, নিক্সন সরকার খন্দকার মোশতাককে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্য কীভাবে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তার বইয়ের "ভেতরে" তা স্থান পায়নি। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত। বইতে রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্কে যে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এটি তাঁকে দোষারোপ করে লাভ নেই। ১৮ বছর একটানা পাকিস্তানে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিশাল জটিল-কঠিন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিল হয়তো সীমিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, কমরেড মণি সিংহসহ হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী দীর্ঘ ২৩ বছর জেলজুলুম, সংগ্রাম, লড়াই, আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বর্ণদুয়ারে জাতিকে প্রস্তুত করেছিলেন সে প্রেক্ষিতে তাঁদের প্রতি প্রাপ্য মর্যাদা সম্মান প্রদর্শন তো দূরে থাক তাদের অবমূল্যায়ন করার মিশন নিয়ে যেন তিনি বইটি লিখেছেন। এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হবে তার দৃষ্টি ছিল ঘোলাটে। খণ্ডিত। সংকীর্ণ বেড়াজালে আবদ্ধ।

১৩. ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বন্দি শেখ মুজিবের মুক্তিই কেবল বাংলাদেশ সংকটের সমাধান সম্ভব এই মূলনীতিকে সামনে রেখে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়াসহ ১৮টি রাষ্ট্র সফর করেন। পাশাপাশি মুজিবনগর সরকার জনপ্রতিনিধিদের কয়েকটি দলকে বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার স্বীকৃতি, জনমত গঠন, অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। একই সাথে বিচারপতি আবু সাঈদের নেতৃত্বে ব্রিটেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তান বর্বর বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত নৃশংসতা তুলে ধরেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য জনপ্রতিনিধি ও বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। প্রফেসর রেহমান সোবহান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. এ আর মল্লিক প্রমুখ বুদ্ধিজীবী এবং প্রবাসী ছাত্র ও নাগরিকবৃন্দ যে অবদান রেখেছিলেন হয়তো তিনি মনে করেছেন বইটিতে বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক নয়। এমনকি স্বীকৃতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশ সরকারের দূতাবাস স্থাপন করতে দিয়েছিলেন ব্রিটেন এ কথা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। তাহলে মুক্তিযুদ্ধে "বাইরে" কোনো বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল? সরকারের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের কর্মরত কূটনৈতিকবৃন্দ যে অসহনীয় অনিশ্চয়তার মধ্যে মুজিবনগর সরকারে প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন সে বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গেছেন। মুজিবনগর সরকারের এসব কর্মকাণ্ড প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পাশের কক্ষে অবস্থানকারী এ কে খন্দকার জানতেন কিনা সন্দেহ, তবে তার বইতে এর কোনো কিছুরই উল্লেখ নেই। অবশ্য তাজউদ্দীন সাহেব জানতেন যে সামরিক যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার মৌলিক শর্ত হলো কূটনৈতিক যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া।

১৪. বইতে তিনি রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডের যথার্থ মূল্যায়ন করেননি। এর বিপরীতে তিনি অবমূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হয়ে মুক্তিযুদ্ধকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছেন। তার মতো বিদগ্ধ ও জ্ঞানী মানুষের পক্ষে এই ভ্রান্তি সহজে মুছে ফেলার নয়। তাঁর অজানা থাকার কথা নয় যে, প্রতিবেশী দেশের বিভিন্ন সীমান্তে প্রায় কমপক্ষে ১২০টি যুব ক্যাম্প গড়ে উঠেছিল। অনেক ক্যাম্পেই যুদ্ধ করতে আসা টগবগে যুবকদের ট্রেনিং দেয়া হতো। কখনো বাংলাদেশ সেনা/ইপিআর বাহিনী অথবা ভারতীয় প্রশিক্ষক ক্যাম্পে ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিতেন। বেশ কয়েকজন গণপরিষদ সদস্য গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছেন এবং রণাঙ্গনে অংশ নিয়েছেন। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত জনপ্রতিনিধিরা মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিমূলে সংগঠকের দুরূহ কাজ সম্পাদান করেছেন। ইতিহাস নাড়াচাড়া করলেই তিনি অনায়াসেই এই তথ্যগুলো পেতে পারেন। যা তার বইতে উল্লিখিত তো হয়নি, বরং বিভ্রান্তিকর নেতিবাচক বক্তব্য ছড়ানো হয়েছে। একই সাথে হাজার হাজার যুবক যারা ট্রেনিং নিয়ে অথবা দেশের ভিতরে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে জীবনকে বাজি রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের দক্ষতা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তার বিবরণ যথার্থভাবে তুলে ধরা হয়নি। বরং তাদের মধ্যে বিভেদ ও কোন্দলের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। স্বীকার করি যে, মে মাসের মধ্যে যেসব গেরিলাযোদ্ধা দেশের অভ্যন্তরে তৎপরতা চালিয়েছেন ও তাদের মধ্যে কমান্ডের যে হাল্কা দ্বন্দ্ব ছিল জুন-জুলাই মাসের মধ্যেই তা ঐক্যবদ্ধভাবে পারস্পরিক সমন্বিত রূপ নেয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে গেরিলা গ্রুপগুলো সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন অঞ্চলমুক্ত করে। তিনি বৈমানিকের প্রথাগত চোখ দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের অসামান্য অবদানকে যথার্থ স্বীকৃতি দেননি। কিন্তু মার্কিন গোপন নথিতে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সফরকালে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রশ্নের উত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীদের কাছ থেকে অর্থ পাচ্ছে, তারা নিজস্ব চ্যানেলে অস্ত্র জোগাড় করছে এবং বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণ গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ও ক্যাম্পে অবরুদ্ধ করে ফেলছে।' এসব সাফল্য উক্ত বইতে সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দেশ্যমূলকভাবে জনযুদ্ধকে একটি বাহিনীর যুদ্ধ হিসেবে তুলে ধরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তির মধ্যে বিভাজন করার সচেতন অপপ্রয়াস নেয়া হয়েছে এ প্রশ্নটি অনেকে তুলে ধরেছেন।

১৫. বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণার প্রেক্ষিতে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম খসড়া স্বাধীনতার সনদ রচনা করেন যা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা স্বাধীনতার সনদটি অনুমোদন করেন। তার ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়। সেই সরকার ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল, জুলাই মাসে প্রথম সপ্তাহে ভারতের বাগডোগড়ায় অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম গণপরিষদের অধিবেশন এবং সিদ্ধান্ত–যেকোনো মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। কোনো বিভেদ নয়। ভ্রান্তি নয়। দ্বিধা নয়। জীবন-মরণ যুদ্ধে স্বাধীন করতে হবে বাংলাদেশ। সেদিনের এই ছিল শপথ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণপরিষদের সদস্যবৃন্দের কাছে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের উদাত্ত আহবান ছিল, 'জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে শত্রুদের আমরা অবরুদ্ধ করে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে দেশে ফিরিয়ে আনবো।' প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক যুদ্ধ এবং এর মূলভিত্তি ছিল আদর্শভিত্তিক জনযুদ্ধ। সেই মুক্তিযুদ্ধের কোনো বিষয় নিয়ে অযথা বিতর্ক বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খণ্ডিত কথন স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিতর্ক অনেক সময় সত্যকে আবিষ্কার করে আবার কখনো কখনো তা ইতিহাস বিকৃতির সূত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং যা অন্ধকারে ভ্রান্তি ছড়ায়।

১৬. বহুদিন থেকেই এ প্রশ্নটি ঘুরে ফিরে আসছে যে, বাংলাদেশ ভারত যৌথ সামরিক কমান্ড গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ কমান্ড সমান মর্যাদাসম্পন্ন। রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে যৌথ বাহিনীর প্রধান হিসেবে জেনারেল অরোরা ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর পক্ষে নিয়াজী স্বাক্ষর করেন। এ কে খন্দকার লিখেছেন, 'অনুষ্ঠানে মাত্র দুটি চেয়ার ও একটি টেবিল ছিল। একটি চেয়ারে জেনারেল নিয়াজী ও অন্যটিতে জেনারেল অরোরা বসলেন।' বাংলাদেশ কমান্ডের আসনটি ছিল না কেন এ ব্যাপারে সেই সময় এ কে খন্দকার কি কোনো প্রশ্ন তুলেছিলেন? লে. জেনারেল জেকবের বইয়ের ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছবিতে দেখা যায় অন্য এক ব্যক্তি যথারীতি চেয়ারে বসে আছেন। কেন তিনি অরোরার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন?

১৭. তেসরা ডিসেম্বর পাকিস্তান আক্রমণ শুরু করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বললেন, 'বোকাটা (ইয়াহিয়া খান) ঠিক কাজই করেছে যা আমি চাচ্ছিলাম'। পাকিস্তান আক্রমণের পরপরই ৪ ডিসেম্বর ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ কমান্ডের স্বাক্ষর আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ। এই স্বাক্ষরের বিষয়টি ভারতীয় কর্নেল পি. দাস যিনি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক বিষয়ের লিয়াজোঁ রাখতেন তিনি এ তথ্যটি তাজউদ্দীন আহমদের একান্ত সচিব ফারুক আজীজ খানকে জানিয়ে দিলেন। যা তার বই স্প্রিং-'৭১-এ উল্লেখ রয়েছে।

১৮. যৌথ কমান্ডের অপারেশনের সম্পর্কিত দায়িত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল বি এন সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে লিয়াজোঁ রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন উপসেনাপ্রধান এ কে খন্দকার। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে অনানুষ্ঠানিকভাবে যৌথ সামরিক নেতৃত্বের প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি ছিল। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী যৌথ সামরিক নেতৃত্ব গঠনের ব্যপারে তীব্র আপত্তি তোলেন। জেনারেল ওসমানী বলেছিলেন, যদি এটা চাপিয়ে দেয়া হয় তিনি পদত্যাগ করবেন। তাজউদ্দীন আহমদের অনমনীয় সিদ্ধান্ত ছিল যৌথ সামরিক নেতৃত্বের মাধ্যমে রণক্ষেত্রের সমন্বয় সাধন হবে বাস্তবসম্মত। জেনারেল ওসমানী পদত্যাগের হুমকি দিলে তাজউদ্দীন আহমদ শক্তভাবে বলেন, লিখিত পদত্যাগপত্র দিলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। প্রথাগতভাবে যে ওয়ার প্ল্যান বাংলাদেশ তৈরি করেছিল এবং সম্মুখ সমরের জন্য যে তিনটি ব্রিগেড (জেড, এস ও কে ব্রিগেড) গঠন করেছিলেন প্রধান সেনাপতি অক্টোবর মাসে নিজেই এসব ব্রিগেডের অসারত্ব উপলব্ধি করে তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন ফ্রন্টে ছড়িয়ে দেন। যৌথ কমান্ড গঠন করার ফলেই যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়। ডিসেম্বর ৭ তারিখ বেলা প্রায় তিনটার সময় ভারতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পিএনব্যানার্জী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং একটি পত্র হস্তান্তর করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়ে। এই স্বীকৃতিদানের পূর্বে তিনি লোকসভায় বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। যার সঙ্গে ভারতের আদর্শের মিল রয়েছে। হাজার হাজার মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য চরম আত্মত্যাগ করেছে। বাংলাদেশের জনগণের ঐক্য, অঙ্গীকার, সাহস এবং তাদের সংগ্রাম বিশ্ব গণমাধ্যমে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম।"

১৯. ১৪ ডিসেম্বর কর্নেল দাস বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিবকে জানান যে, মেজর জেনারেল জ্যাকব ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের দলিল হাতে। একান্ত সচিব ফারুক আজিজ অতি দ্রুত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে বিষয়টি অবগত করেন। তাজউদ্দীন আহমদের পক্ষ থেকে জেনারেল অরোরাকে টেলিফোন করে ফারুক আজিজ বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কথা বলবেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জেনারেল অরোরা ফোন ধরেন। কর্নেল দাস যা বলেছিলেন তিনি তার উল্লেখ করে আরো বলেন যে ২ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি চূড়ান্তভাবে তাকে জানাবেন। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি জানার পরও তার উদ্বিগ্নতা দূর হয়নি বলে একান্ত সচিবের মনে হয়েছে। সাড়ে ১২ টার সময় ঝলমলে রৌদের ভেতরে তিনি যখন পায়চারি করছিলেন তখন কর্নেল দাস এসে বললেন আজ বিকেলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবেন। প্রধানমন্ত্রী কক্ষে ঢুকে সংবাদটি জানালে তিনি আত্মসংযম করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞেস করেন, ওসমানী সাহেব কোথায়? তাঁকে জানানো হলো তিনি ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চিফ অব স্টাফ লে. কর্নেল আব্দুর রব ও লে. শেখ কামালকে নিয়ে কোলকাতার বাইরে সিলেট অঞ্চলে গিয়েছেন।

২০. ফারুক আজিজ ও নুরুল ইসলাম নিউমার্কেট ও অন্যত্র উপ-সেনাপ্রধানকে খোঁজ করলেন। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল। সহসা খন্দকার সাহেব প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে জীপ নিয়ে ঢুকলেন। তাকে বলা হলো বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তিনি জেনারেল অরোরার সঙ্গে ঢাকা যাবেন। তিনি অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মেজর ইসলাম ও ফারুক আজিজ খানের সঙ্গে দ্রুত লাঞ্চ শেষ করেন। কিন্তু উপ-সেনাপ্রধান ড্রেস পরার সময় পাননি অথচ বিষয়টি ছিল ঐতিহাসিক এবং মুক্তিযুদ্ধের সম্মানের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ফারুক আজিজ ও নুরুল ইসলাম দুজনে তাকে দমদম এয়ারপোর্টে নামিয়ে দেয়। দমদম এয়ারপোর্টে জেনারেল অরোরা সহর্ষে তার সঙ্গে শেখহ্যান্ড করেন এবং তারা একই হেলিকাপ্টারে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। হেলিকাপ্টারের কাছে এ কে খন্দকার দাঁড়িয়ে ছিলেন আগে জেনারেল অরোরার ওঠার অপেক্ষায়। কিন্তু অরোরা বলেন, 'বাংলাদেশ কমান্ড প্রথমে উঠবেন। তারপর তিনি উঠবেন'। তখনও ঢাকায় চলছিল আত্মসমর্পণের দলিল নিয়ে দরকষাকষি।

২১. রাও ফরমান আলী চেয়ারে বসার পর তার হাতে একটি কাগজ দিয়ে ব্রিগেডিয়ার বকর বললেন, "এগুলো আত্মসমর্পণের শর্ত।" ফরমান আলী সেটা পড়লেন এবং দেখলেন, যে বাহিনীর কাছে পাকিস্তান আর্মিকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার বকরকে বললেন, "এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আত্মসমর্পণ করছি না, আমরা আলোচনা করছি। ঘটনা যাই হোক না কেন, দয়া করে মুক্তিবাহিনী শব্দ দুটি মুছে ফেলুন।" এ সময় পাইপ মুখে নিয়ে জেনারেল জ্যাকব প্রবেশ করলেন এবং বললেন, 'আপনি এটা মেনে নিন অথবা ছেড়ে দিন।" তিনি বললেন, "এটা কমান্ডারের ব্যাপার, তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।" নিয়াজী আত্মসমর্পণের শর্তাবলী অনুমোদন করে মাথা নাড়ালেন। এডমিরাল শরীফ ও রাও ফরমান উঠে দাঁড়ালেন এবং বাইরে চলে এলেন। লক্ষ করলেন, ভারতীয়রা কিছু চেয়ার ও একটি টেবিলের খোঁজ করছে। তারা বুঝালেন, ভারতীয়রা কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চাচ্ছে। দু'জনই নিয়াজীর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, ভারতীয়রা একটি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দুজনেই নিয়াজীকে বললেন, "আপনার এতে যোগ দেয়া উচিত হবে না, আত্মসমর্পণ করা হয়ে গেছে। তারা আমাদের বন্দি হিসেবে নিতে পারে, আমাদের পেটাতে বা হত্যা করতে পারে। তাদের যা ইচ্ছা করুক। দয়া করে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না।" কিন্তু নিয়াজী তাদের কথা রাখতে পারেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২. বহুদিন থেকেই জেনে আসছি, বাংলাদেশ ভারত যৌথ সামরিক কমান্ড গঠিত হয়েছিল সমমর্যাদার ভিত্তিতে। রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে যৌথবাহিনীর প্রধান হিসেবে জেনারেল অরোরা ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর পক্ষে নিয়াজী স্বাক্ষর করেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে মিত্রবাহিনীর কো-কমান্ডার হিসেবে সসম্মানে চেয়ারে বসে অনুস্বাক্ষর দিতে পারতেন? ২৬৭ পৃষ্ঠার ১৬ নং ও এটার মধ্যে অনেক মিল আছে, যা সমীচীন নয় ছবিটি পর্যবেক্ষণ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

২৩. বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে কেন তিনি অরোরার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন? তাঁর বক্তব্য মতে তিনি যেভাবে ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়েছিলেন তা কি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের একজন উপ-সেনাপ্রধানের উপযোগী হতে পারে? তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে মর্যাদাশীল আসন ও অবস্থান নিতে ব্যর্থ হলেন কেন? কেউ কি তাকে বাধা দিয়েছিল? না তিনি তাঁর অবস্থান ও দায়িত্ব উপলব্ধি করতে অপারগ ছিলেন? আত্মসমর্পণের দলিলের ছবি দেখে যে কারো মনে হতে পারে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ড নয়, ভারতের কাছে পাকিস্তান কমান্ড সারেন্ডার করছে। কেননা মনে হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে যে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা জীবন দিয়েছে তার কোনো প্রতিনিধি এই সারেন্ডারের দিনে উপস্থিত নেই। সে কারণেই এ বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি যশরাজ ফিল্মসের 'গুন্ডে' ছবিটি ভারতের বলিউডে মুক্তি পেয়েছে যেখানে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হিসেবে। 'গুন্ডে' ছবিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অবমাননা করা হয়েছে মর্মে ভারতের জনমতের চাপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচালক ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সবিনয়ে একটি প্রশ্ন করতে চাই, এ কে খন্দকারের বইটিতে আত্মসমর্পণের বর্ণনায় স্বাধীন, সার্বভৌম রক্তাক্ত বাংলাদেশ হারিয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের হাজারো মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের গর্বিত অহংকার ও মর্যাদা ভলুণ্ঠিত করার দায়ভার তিনি কি এড়াতে পারবেন? ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্বাপর যে সকল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং তাঁর নেতৃবৃন্দ যে চরম আত্মত্যাগ, নিপীড়ন, অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছেন, এমনকি ফাঁসিতে যেতেও দ্বিধা করেননি তাদের সেই অনন্যসাধারণ ভূমিকা তুলে না ধরে হঠাৎ করে 'ভোজবাজির' মতো মাঝখান থেকে লিখতে গিয়ে ইতিহাসের সত্য পাঠ থেকে যেমন নিজেকে আড়াল করেছেন, তেমনি লিখিত বইটি স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতকে শক্তিশালী করবে সন্দেহ নেই।

AMARBOI.COM

অধ্যায় : ষোল

রাষ্ট্রদ্রোহিতা কাকে বলে?

[২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে বন্দী অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে সামরিক আদালতে ক্যামেরা ট্রায়াল শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু যখন জানলেন ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রদত্ত ভাষণ অসহযোগ আন্দোলন, হরতাল, নির্দেশ ইত্যাদি রাষ্ট্রদ্রোহিতা মূলক কাজ বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পাকিস্তানের অখন্ডতা ধ্বংসের জন্য তিনি দায়ী। সাক্ষ্য তালিকা ছিল ১০৬ জনের তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের বিষয়গুলো উত্থাপন করেন। বিচারের পূর্বে ইয়াহিয়া খান বলেন শেখকে মরতেই হবে। এই অবস্থায় তিনি তার পক্ষ থেকে আইনজীবি ব্রোহীকে বিদায় করে দেন। বলেন, এ বিচার প্রহসন এবং এটা হবে সাজানো মৃত্যুদন্ড। প্রতিটি সাক্ষ্যের পর তার কাছে অনুসাক্ষ্যরের জন্য কাগজপত্র নিয়ে আসলে তিনি প্রতিটি পাতায় লেখেন "সব মিথ্যা"। কখনো লেখেন "আমরা যে নির্যাতিত এটা মনে করা কী রাষ্ট্রদ্রোহিতা, কাকে বলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা?" বঙ্গবন্ধুর বিচার নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, পোলান্ড দেশসমূহ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে যেমন সোচ্চার ছিলেন তেমনি বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক, সিভিল সোসাইটি এবং মানবাধিকার কমিশনসহ মুক্তিকামী জনগণ ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির লক্ষ্যে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল কার্যকর ও ইতিবাচক। বিশ্ব কূটনীতি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে কীভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তার রূপরেখা এই অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়টির সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার প্রশ্নটি সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর পত্রগুলো বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ক্ষেত্রে ছিল বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বিবেককে ধাক্কা দেয়ার মতো।]

২৬ মে যখন পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে চান তখন প্রেসিডেন্ট খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং বলেন, সে বড় ধরনের অন্যায় করেছে এবং তাকে এ জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। ফারল্যান্ড জানতে চান, শেখ মুজিবকে সুবিচারের সুযোগ দেয়া কি সম্ভব? কেননা এরকমটাই সবাই বলছেন এবং এ নিয়ে লেখালেখিও হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রশ্নটি এড়িয়ে যান।[১] তবে ১৯ জুলাই (১৯৭১) ফিনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকার প্রতিনিধি নেভিল ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে দুইঘণ্টাব্যাপী এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান বলেন যে, 'মুজিবের বিচার হবে। তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন পাকিস্তানী আইনজীবী থাকবেন, কোনো বিদেশী আইনজীবী নয়। এই বিচার সামরিক আদালতে হবে এবং গোপনে হবে। যেসব অভিযোগ করা হবে তা প্রমাণিত হলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হবে।'

২০ আগস্ট পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া খান এক সাক্ষাতকারে বলেন যে, শেখ মুজিবের বিচারে সবচেয়ে ভাল আইনজীবী এ. কে. ব্রোহীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, সামরিক ট্রাইবুনালকে বলা হয়েছে সতর্ক ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডসমূহ রক্ষা করতে। ইয়াহিয়া খান বলেন, যে সমস্ত অভিযোগ রয়েছে তাতে সম্ভবত তাঁর মৃত্যুদন্ড হবে।[২]

২৮ সেপ্টেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসনের প্রেস নোটে বলা হয়, 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ও ঘোষণার জন্য পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক শেখ মুজিবের গোপন বিচারের জন্য বিশেষ মিলিটারী কোর্ট গঠন করেছেন। ১১ আগষ্ট ৭১ থেকে বিচার আরম্ভ হয়। কোর্ট ঐ দিনই মুলতবী হয়, যাতে শেখ মুজিবের বিচার সুষ্ঠু ও আইনানুগ হতে পারে; যে ক্ষেত্রে শেখ মুজিব স্ব-ইচ্ছায় পছন্দমত ডিফেন্স কাউন্সিল নিয়োগ করতে পারেন। ৭ সেপ্টেম্বর এ. কে. ব্রোহী এবং তিনজন সহকারী মোহাম্মদ গোলাম আলী মেনন, আকবর মীর্জা এবং গোলাম হোসেনকে নিয়োগ দেয়া হয় এবং সাক্ষীগণের জেরা শুরু হয়। প্রসিকিউশন ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে যার দ্বারা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রজু করা অভিযোগ প্রমানিত হয়। শেখ মুজিবের পক্ষে এ. কে. ব্রোহী আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব নেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ক্যামেরা ট্রায়াল পুনরায় শুরু হয়েছিল।

লায়ালপুর জেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার কার্যক্রম শুরু করা হয়। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ২৪০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঞ্জাবের শিল্প নগরী লায়ালপুর। ষোলফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা লায়ালপুর সেন্ট্রাল জেল। লায়ালপুরের লাল ইটের আদালত-ভবনটি মূল কারাগারের লাগোয়া হলেও, বন্দিকে লম্বা সরু করিডোর দিয়ে আদলতে প্রবেশ করতে হতো। সেখানে ছিল চারটি ভারি লোহার দরজা। প্রতিটি দরজার পাশে সাব-মেশিনগান হাতে যুদ্ধ-পোশাক সজ্জিত সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকতো। সারি-বাধা বেঞ্চ ও উঁচু প্ল্যাটফর্ম এবং পাকিস্তানি পতাকা সজ্জিত আদালত-কক্ষে প্রবেশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুরোপুরিভাবে উপেক্ষা করতেন বিচারকার্য।[৩] শান্ত। সৌম্য। অবিচল একজন মানুষ।

বিচার সপ্তাহকাল ধরে চলে এবং প্রতিদিন বিকেল চারটা নাগাদ শেখ মুজিব সেলে ফিরে আসতেন। কখনো কখনো অভিযুক্তের পক্ষে নিয়োজিত কৌসুলিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিতে হতো। তবে বন্দি প্রায় কখনোই কোনো কথা বলতেন না। একবার আদালতের কার্যক্রমের বিবরণী তাঁকে দেয়া হলে তিনি এর ওপরে লেখেন, 'সব মিথ্যা"। আরেকবার লেখেন, 'কাকে বলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা? আমরা যে নির্যাতিত এটা মনে করাটা কি রাষ্ট্রদ্রোহিতা?" আগস্টের শেষ সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে বিবৃতি দেন তাতে আর সন্দেহ ছিল না যে, এই বিচার ন্যায়য়ানুগ হবে না এবং বিচারের রায় আগেই স্থির করে রেখেছে। আদালত কেবল স্থিরকৃত রায় পাঠ করে দেবে।[৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর বিচার প্রহসনের সামরিক ও অসামরিক বিচারপতিরা সার্কিট হাউসে থাকতেন। স্থানীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সার্কিট হাউসটি অবস্থিত ছিল। বিচার প্রক্রিয়ার সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাখবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কয়েকটি বাড়ি রিকুইজিশন করা হয়। জেলখানায় পাহারার দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনীর। জেলখানায় ফটকের ২০০ গজের মধ্যে কোনো সাংবাদিককে যেতে দেওয়া হতো না।[৫]

ট্রায়ালের জন্য ১৯ আগস্ট শেখ মুজিবকে স্পেশাল মিলিটারী ট্রাইবুনালের নিকট হাজির করা হয়। প্রিজাইডিং বিচারপতি ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। কোর্টের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে দুজন ছিলেন সামরিক অফিসার, একজন নেভাল অফিসার এবং পাঞ্জাব থেকে আগত একজন জেলা জজ। তাঁর বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ উথাপন করা হয় যার মধ্যে ছয়টি ছিল মৃত্যুদণ্ডের। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা। যখন মুজিবকে তার ডিফেন্স কাউন্সিল সিলেক্ট করার জন্য বলা হয় তখন তিনি ড. কামাল হোসেনকে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগের কথা বলেন। তাকে বলা হলো এটা সম্ভব নয়। তখন শেখ মুজিব এ.কে. ব্রোহীকে সিলেক্ট করেন, তিনি ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ। কিন্তু বিচার কার্যের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিবের কার্যক্রম, অসহযোগ আন্দোলন থেকে হরতাল, নির্দেশ ইত্যাদিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজ বলে অভিযোগ পত্রে উল্লেখিত হওয়ায় শেখ মুজিব এই ট্রায়ালে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং তাঁর নিয়োজিত আইনজীবী ব্রোহীকে বিদায় করে দেন। কিন্তু বোর্ডের অনুরোধে ব্রোহী রাষ্ট্রপক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন।

শেখ মুজিবের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এটা বিচারের নামে প্রহসন চলছে যা হবে সাজানো মৃত্যুদণ্ড। তিনি নির্বিকার। একের পর এক সাক্ষীগণ আসছেন। পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে ধ্বংসের জন্য দায়ী করে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। প্রসিকিউশন ১০৬ জনের সাক্ষ্যতালিকা ট্রাইবুনালে পেশ করেন, কিন্তু তার অর্ধেককে বোর্ডের সামনে উপস্থিত করা হয়নি। যারা কেবলমাত্র সামরিক অফিসে বা পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়েছিল কেবলমাত্র তাদেরই হাজির করা হয়। ব্রোহী কোর্টের নিকট আবেদন করেন যারা ক্র্যাক ডাউনের পূর্বে ঢাকায় নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন কর্নেলিয়াস, পীরজাদা, এম.এম. আহমদ তাদের হাজির করা হোক। তাদের জেরা করার আবেদন জানান। তখন কোর্ট তাঁর আবেদন নাকচ করে দেন।[৬] অর্থাৎ বিচার প্রক্রিয়ার শেকড়ে যাবার ক্ষেত্র বন্ধ করে দেয়া হয়।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রকাশ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বন্দী শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা', 'প্রকাশ্য বিদ্রোহ' এবং 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের' বিষয়গুলি ক্রমাগত উপস্থাপন করেন।[৭]

রেডিও অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছিল যে, মুজিবকে গ্রেফতারের পর ২৬ মার্চ রাত প্রহরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াহিয়া খান ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন, “শেখকে মরতেই হবে”। এমন কি তথাকথিত বিচারানুষ্ঠানের আগেই তাঁকে চুপিসারে খতম করে দেয়ার ভাবনা তলিয়ে দেখছিলেন ইয়াহিয়া খান। তিনি ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন যে, বিপজ্জনক পথ তিনি মাড়াচ্ছেন। সেই সঙ্গে বন্দির যে অচিরেই জীবনাবসান ঘটবে এই প্রত্যাশা চাপা রাখতেও তিনি সমর্থ ছিলেন না। ১৯৭১ সালের জুলাইতে তিনি বলেন, “বাঙালি নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের এক কারাগারে সুস্থ ও জীবিত রয়েছেন। তবে আজকের পরে কাল শেখ মুজিবের জীবনে কী ঘটবে সেটা আমি হলফ করে বলতে পারবো না। তাঁর বিচার করা হবে এবং এর মানে এই নয় যে, আগামীকালই আমি তাঁকে গুলি করবো। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুও ঘটতে পারে। সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করার জন্য জেনারেলরা চাপ দিচ্ছেন। আমি সম্মত হয়েছি এবং খুব শিগগিরই বিচার অনুষ্ঠিত হবে।”[৮] এসবই ছিল ন্যায়বিচারকে প্রভাবান্বিত করার অপচেষ্টা। এ বিষয়ে আরো কতিপয় বক্তব্য, মন্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে।

এসব প্রচারণা ছাড়াও বন্দি শেখ মুজিবের বিচার প্রভাবান্বিত করার লক্ষ্যে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে এমন কথাও তিনি বলেছেন, যার অর্থ জনগণকে জানানো যে, শেখ মুজিব কী ভয়ঙ্কর দেশদ্রোহী!

অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন বরাবর একটি বার্তা ওয়াশিংটনে ভারতের নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা-এর মাধ্যমে পৌঁছে দেন।

> “বিদেশি আইনজীবীদের কোনো প্রকার সহায়তা ছাড়াই সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে ঘোষণা দিয়েছেন তা ভারত সরকার, জনগণ ও সংবাদ-মাধ্যমকে নিদারুণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই তথাকথিত বিচার প্রক্রিয়া শেখ মুজিবকে হত্যা করার প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এটা পূর্ব পাকিস্তানে ও ভারতে ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্ম দেবে, কেননা আমাদের জনগণ ও সকল রাজনৈতিক দল বিষয়টিকে কোনভাবেই মেনে নেবে না। তাই আমরা এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। এই অঞ্চলে স্থিতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসেবে ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।”[৯]

শেখ মুজিবের জীবনরক্ষায় ২৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আবেদন করেন। আবেদনে শেখ মুজিবের কোনো ক্ষতি বা মৃত্যুদণ্ড হলে তা মারাত্মক ফল বয়ে আনবে বলে তিনি পত্রে উল্লেখ করেন। আবেদনে বলা হয়, স্ব স্ব রাষ্ট্র যেন পাকিস্তান সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করেন যাতে পাকিস্তান ও ভারতকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়।

১৯ আগষ্ট শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বন্দি শেখ মুজিবের ভাগ্য নিয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন তা পড়েছেন বলে চিহ্নিত করা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠিতে শ্রীমতি গান্ধী যে মূল বিষয়গুলো অবতারণা করেছেন তার মূল কথা হলো: ১. পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনে ভারতের আপত্তি নেই। তবে ইন্দিরা গান্ধী মনে করেন এটা কোনো ফলদায়ক কিছুই আনবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি পূর্ববঙ্গে একটি বেসামরিক সরকার স্থাপন করে শরণার্থীদের তাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে ভারত হাপ ছেড়ে বাঁচবে। ২. ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণ নিয়োগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংহ বৈঠক করার পর পূর্ব পাকিস্তানে আরো বেশি অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে; যা নাজিদের নৃশংসতা ছাড়িয়ে গেছে, ফলে শরণার্থীরা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসছে। শেখ মুজিবের মুক্তি এক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে ভারত মনে করে। ৪. যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানে নতুন করে অস্ত্র প্রেরণ উপমহাদেশের জন্য একটি দুঃখের অধ্যায়।[১০]

১১ আগস্ট নিক্সনের সভাপতিত্বে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকো অভিমত দেন যে, কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমাধানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে কোনো ব্লু প্রিন্ট নেই তা জানিয়ে রাখা সম্ভব। তবে একটা সুপারিশ রাখা যেতে পারে যে, পাকিস্তানীরা যেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে বিচারাধীন আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদন্ড কার্যকর না করে। নিক্সনের মন্তব্য ছিলো 'যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য বন্ধ করেনি। ইয়াহিয়ার সঙ্গেও রয়েছে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক। সুতরাং তিনি যদি পুরোপুরি ফাঁদে না পড়েন তাহলে এ কথায় তিনি হয়তো সায় দেবেন'। ইয়াহিয়া খান মনে করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড তার বন্ধু। 'মুজিবকে হত্যা করো না'- এমন সুপারিশ ইয়াহিয়ার কাছে ফারল্যান্ড রাখতে পারেন। নিক্সন আরো মন্তব্য করেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে, রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে জনসমক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা। তবে ঘরোয়াভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলা যেতে পারে, মুজিবকে হত্যা করা তাঁর উচিত হবে না।

১২ আগষ্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত পামফ্রে ইসলামাবাদ থেকে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হিউম বরাবর একটি টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রামে বলা হয়েছে এক. শেখ মুজিবকে রক্ষার জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও সঠিক ব্যক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চাপ ফলপ্রসূ করতে হবে। দুই. কোনো তৃতীয় দেশের মাধ্যমে আমেরিকা ও বৃটেনের মিলিত চাপ ফলপ্রসূ হতে পারে। এক্ষেত্রে তৃতীয় দেশ হিসেবে ইরানকে প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেয়া যায়, কারণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখনও পর্যন্ত শাহ্-র কথা শুনতে রাজি, যদিও মিসেস গান্ধীর সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের বিরোধের ব্যাপারে শাহ্-এর মধ্যস্থতা ব্যর্থ হয়েছে। তুরস্ককেও একটি সম্ভাব্য দেশ হিসেবে ধরা যেতে পারে, একই কথা প্রযোজ্য মালয়েশিয়া এবং কয়েকটি প্রধান আরব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। আবুধাবির শেখ জাঈদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। যদিও 'রাষ্ট্রদ্রোহী'র শাস্তির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে যে উ থান্ট-এর উদ্যোগ ভারত কর্তৃক প্রভাবিত। তাই উ থান্টের এমন কিছুই করা উচিত হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, যাতে মনে হতে পারে ভারতের চাপ তাকে তাড়া করছে। তিন. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপর বৃটেনে পাকিস্তানের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ যেমন নেভিল ম্যাক্সওয়েল, মিসেস জিল নাইট এবং প্রফেসর রাশব্রুক উইলিয়ামের মতো ব্যক্তিবর্গের চাপও এই মুহূর্তে কাজে আসতে পারে, তবে এটা যে ব্যক্তিগত অর্থাৎ এর পেছনে যে কোনও সম্মিলিত উদ্যোগ নেই, সেটা নিশ্চিত করতে হবে এবং এটাও যাতে মনে না হয় যে, এসব ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের সামরিক ট্রাইবুনালে ক্যামেরা ট্র্যায়ালের সম্মুখিন করা হচ্ছে এই খবর প্রকাশ হওয়া মাত্র সোভিয়েত সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করে। খবরটি ১৩ আগষ্ট প্রাভদায় প্রকাশিত হয়।

১৭ আগষ্ট ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশনস্ গ্রুপ মিটিং হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এক কর্মকর্তার বক্তব্যে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে, যার ফলে ভারতে আরো শরণার্থীদের ঢেউ এসে লাগবে। পলিটিক্যাল একোমোডেশনে ব্যর্থ হলে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। ভারত সীমান্তে সামরিক সংঘর্ষ, দুর্ভিক্ষ অথবা শেখ মুজিবকে হত্যা করা হলে সবদিক থেকেই বিপদ ঘনীভূত হবে। উক্ত বৈঠকে উক্ত কর্মকর্তা[১১] উল্লেখ করেন যে, মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানো হলে তা পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে। তিনি বলেন যে, 'মুজিবের মৃত্যুদন্ড কার্যকর হলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।'
সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করে তা হলোঃ ভারতকে পাকিস্তান আক্রমন করা থেকে নিবৃত্ত রাখা, দুর্ভিক্ষ যাতে না হয় তাঁর কার্যকর ব্যবস্থা নিতে জাতিসংঘকে কাজে লাগানো।[১২]

২০ আগষ্ট পাকিস্তান দূতাবাস থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পর্কিত। ফারল্যান্ডের ধারণা 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার সঙ্গে একাকি কথা বলতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ১৯ আগস্ট ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করেন। রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড স্পষ্টভাবে বুঝেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিশ্চিতভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে' মানবিক ও অর্থনৈতিক সার্বিক সাহায্য ইয়াহিয়া খানকে প্রভাবিত করবে। তিনি ইয়াহিয়াকে বলেন, বিশ্বের সব না হলেও অধিকাংশ জাতি অধীর আগ্রহে এবং উদ্বেগের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখছে। আর সবাই না হলেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সেই বিচারের ফলাফল সম্পর্কে একটা ধারণা পোষণ করছে এবং তারা সে কারণে উদ্বিগ্ন। ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, 'আমি কারো মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত করতে যাচ্ছি না, যদিও তিনি একজন 'বিশ্বাসঘাতক' হয়েও থাকেন।'[১৩]

৩১ আগস্ট মুজিবের বিচার প্রশ্নে আরেকটি নির্দিষ্ট টেলিগ্রাম স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ভারতীয় মার্কিন দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়। এতে বলা হয় 'ভারতীয়রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেহেতু মুজিবের বিচার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে লিখিত কোনো উত্তর চাইতে পারে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূত কিটিং মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব কাউলকে মৌখিক বক্তব্য জানিয়ে দিতে পারেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবেন: এক. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে প্রেরিত বার্তা গ্রহণ করেছেন এবং যত্নের সঙ্গে তা বিবেচনায় নিয়েছেন। দুই. মুজিবের বিচার প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীর আগ্রহ রয়েছে। তিন. পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স মুজিবের সংক্ষিপ্ত বিচার প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছেন। চার. ভবিষ্যতের যে কোনো উপযুক্ত সুযোগ উপলক্ষে এই উদ্বেগ জানানো অব্যাহত থাকবে, এটা শুধু মানবিক কারণে নয়, কারণ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, মুজিবের বিচার এবং তাঁর সম্ভাব্য মৃত্যুদন্ড দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ।[১৪]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলগত অবস্থান ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হয়। বিভিন্ন মিটিং-এ তা স্পষ্টতর হতে থাকে। ৮ সেপ্টেম্বর হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে স্পেশাল অ্যাকশনস্ গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে এই মর্মে সিনেটর কেনেডি কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে কিসিঞ্জার বলেন, আমি চিন্তাও করতে পারি না শেখ মুজিব মৃত। এইড গ্রুপের মিঃ উইলিয়াম বলেন, সম্ভবত মাত্র ১৬জন আওয়ামী লীগ এম. এন. এ. ঢাকা আছেন। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন, মুজিবের বিচার হবে। তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের গেরিলা আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিসকো বলেন, রাজনৈতিক সমঝোতায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে অখন্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাখার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্র যে গোপনে বাংলাদেশের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের অনুরোধে আলোচনা করছে এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করেছে। ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে কিসিঞ্জার হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলেন, সিনেটর কেনেডি আজ তার সঙ্গে দেখা করেন। তার আশঙ্কা মুজিবকে সম্ভবত ইতোমধ্যেই মেরে ফেলা হয়েছে। তাদের কী মনে হয় এটা সম্ভব? মার্কিন কর্মকর্তাগণ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কথা উল্লেখ করে বলেন, তাদের বলা হয়েছে বিচার চলছে, আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে অথচ তাঁকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে, এটা কী করে হয়। তা যদি হয় তা হলে নিশ্চিত করে বলা যায় 'মৃত মুজিবের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জীবিত মুজিবের অনেক মূল্য।'[১৫]

২১ সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু মুজিবের বিচার প্রশ্নে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড আবারও কথা বলেন। ফারল্যান্ড সংবাদপত্রের রিপোর্টের বরাত দিয়ে জানতে চান যে, মুজিবের বিচার শেষ হয়েছে কি না? ট্রাইবুনাল কি ইয়াহিয়ার কাছে সুপারিশ পেশ করেছে? ইয়াহিয়া জবাব দিয়েছেন, বিচার চলছে। তবে তার ইচ্ছা রয়েছে, এই বিচারের পূর্ণ বিবরণ তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে বিচার অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। ফারল্যান্ড জানতে চান, বিচারের পরেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য তিনি কি মুজিবকে 'ট্রামকার্ড' হিসেবে আগের মতোই গণ্য করার কথা বিবেচনায় রেখেছেন? ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দেন, এই সম্ভাবনার বিষয়ে তার ভাবনার অবকাশ আছে। তবে তিনি এ কথা উল্লেখ করেন যে, মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার সাক্ষ্য-প্রমাণ এতই অকাট্য যে, তাঁকে মুক্তি দেয়া হলে পশ্চিম পাকিস্তানে তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভয়ানক।

২ অক্টোবর, ১৯৭১ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিবরণ সম্বলিত এক টেলিগ্রাম বার্তায় ইসলামাবাদ, নয়াদিল্লি ও কলকাতার মার্কিন মিশনে প্রেরণ করা হয়। এতে বলা হয় তাদের ফর্মূলা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতি নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কোনো সমঝোতা হতে পারে কিনা। দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠককালে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সিসকো ২৭ সেপ্টেম্বর এল.কে. ঝায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং মন্তব্য করেন, বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের কোনো প্রভাব নেই। তাদের রয়েছে তহবিল সংগ্রহের স্বাধীন উৎস। ভারত কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, সে কারণে বাংলাদেশ নাখোশ। কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, ভারত সংলাপ চায় না। মিঃ রজার্স ভারতকে সংলাপের উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তবে শর্ত দেন যে, ভারত যেন মুজিবের অংশগ্রহণ প্রশ্নে চাপ সৃষ্টি না করে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে একটা সমঝোতায় পৌঁছানো যায় সে নিয়ে আলোচনায় মুজিবকে জড়াতে চায় না। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপসংহার টানেন এই বলে যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সমঝোতার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব সব কিছুই করবে।

২ অক্টোবর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ শরণ সিং ও যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী রজার্সের ভিতরে এক আলোচনায় দুই নেতাই একমত হন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা নিরসনে নিচুপর্যায়ে যে আলোচনা হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। মুজিব ব্যতীত কোনো কিছুরই গুরুত্ব নেই।[১৬]

৭ অক্টোবর স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের গৃহিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে। পর্যালোচনায় দেখা যায় তখন পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান কোলকাতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়টি বাইরে রেখেছেন। রাজনৈতিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের আলোচনা শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে, ইয়াহিয়া খান সবসময় হোচট খেয়েছেন এই ভেবে যে বাংলাদেশ নেতৃত্ব আলোচনায় শেখ মুজিবের মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দিয়েছে।[১৭] ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট মনে করে ভারত বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে একটি সংলাপের ব্যাপারে তাদের প্রভাব খাটাতে তখনই রাজি থাকবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন তারা বুঝতে পারবে ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব খাটাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তুত রয়েছে। বলা বাহুল্য, এর সরল অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হলে 'সিজ্-ফায়ার'-কার্যকর করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগী হবে।

৭ অক্টোবর হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশনস্ গ্রুপ মিটিং-এর এক সভায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইউ. এ. জনসন বলেন, বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যোগাযোগ রেখেছে এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জোরাজুরি করা হচ্ছে অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে শেখ মুজিবের মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। কিসিঞ্জারের জিজ্ঞাসা ছিল এটি কি তাদের প্রারম্ভিক কথা? জনসনের মন্তব্য হলো, হ্যাঁ এটা তাদের প্রথামিক অবস্থান, কিন্তু মূল চাবিকাঠি শেখ মুজিবুর রহমান। ইয়াহিয়া খান যদি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেন এবং তার সাথে আলোচনায় বসেন তাহলে রাজনৈতিক সমঝোতার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইয়াহিয়া খান সে সময় নেতিবাচক মনোভাব দেখান নি। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় পাকিস্তান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। কিসিঞ্জার বলেন, ভারতের সঙ্গে আলোচনায় তার অভিমত হলো তারা পাকিস্তানকে শক্তভাবে আঘাত করতে চায় যাতে সব সমস্যা সমাধান হয়। তিনি বলেন, ভারত যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং উভয়ে যদি একসঙ্গে কাজ করে তাহলে শেখ মুজিবের মুক্তিসহ বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসন সবকিছুই শতকরা ৯০ ভাগ অর্জন করা সম্ভব।[১৮]

৭ অক্টোবর স্পেশাল গ্রুপের উক্ত বৈঠকে সিআইএ পরিচালক সভাকে অবগত করে যে, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার পূর্ব পাকিস্তানকে বিক্ষুব্ধ করেছে। এমতাবস্থায় মুজিবের মুক্তিই এখনো সমঝোতার চাবি। ইয়াহিয়া যদি তাকে 'মুক্তি দেন' এবং তার সঙ্গেই যদি একটা 'আপোসে আসেন', তা হলে সমঝোত সম্ভব।'[১৯]

৮ অক্টোবর ভারতের রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা-এর সঙ্গে হেনরি কিসিঞ্জারের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মিঃ ঝা হেনরি কিসিঞ্জারকে জিজ্ঞেস করেন তার এমন অবস্থান রয়েছে কিনা যেখান থেকে তিনি শেখ মুজিবের মুক্তি এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার বিষয়টি পাকিস্তানের নিকট আবেদন করতে পারেন কিনা। ঝা তাকে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম দিনে দিনে বাম দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে, কোলকাতায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর হামলা হয়েছে এবং যতই দিন যাবে তা উগ্রপন্থীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র উন্মুক্ত করবে। কিসিঞ্জার সম্মতি দিয়ে বলেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ বিষয়ে সম্ভাব্য সমঝোতা হওয়া উচিৎ কিন্তু একতরফাভাবে কিছু না করার জন্য সতর্ক করে দেন।[২০]

২২ অক্টোবর ভারত পাকিস্তান অবস্থা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের কার্যকর রাজনৈতিক সমাধান অবহেলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার কারণে ভারত-পাকিস্তান উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে পরামর্শ দিয়েছে অবিলম্বে ইয়াহিয়া খানকে একটি সমাধানে উপনীত হতে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যেহেতু বাংলাদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় সম্মত আছেন সে জন্য পূর্বে নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় উদ্যোগী হতে পারেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা বলেছেন, আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষে শেখ মুজিব নেতৃত্ব দেবেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে। আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার নিষ্পত্তি করতে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে এই মর্মে পরামর্শ দেয়া হয় যে তিনি এই প্রশ্নটি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট উত্থাপন করতে পারেন কিনা যে শেখ মুজিব এই নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখবে।[২১]

২ নভেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড-এর রিপোর্টে জানা যায় ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের নেতা নুরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য যিনি অখন্ড পাকিস্তান রক্ষার ব্যাপারে আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তানে ছিলেন) ও তার গ্রুপের সঙ্গে শেখ মুজিবের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কিভাবে কার্যকর যোগযোগ করা যায় তা উদ্ভাবন করবেন। ইয়াহিয়া খান ফারল্যান্ডকে বলেন, 'মুজিবকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগের সুযোগ দেয়া হবে।' ইয়াহিয়া খান স্বীকার করেন শেখ মুজিব হলেন সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু, প্রশ্নাতীতভাবে মুজিবের ভাগ্য সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।[২২]

৩ নভেম্বর এক রিপোর্টে দেখা যায়, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেখ মুজিবের বিচারের কাগজপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে না। ইয়াহিয়া খান আলোচনা সমাপ্ত করেন এই বলে যে, তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন যারা গঠনমূলক কাজ করার অবস্থানে আছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উপমহাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে রাজি আছেন।[২৩]

৫ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেন। মি. রজার্স বৈঠকের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চান। ইন্দিরা গান্ধী বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলির কারণে ভারতীয় নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখিন। এই হুমকি কেবল ভারতের সীমান্তে পাক-সেনাবাহিনীর উপস্থিতিরি কারণে নয়, এটা ব্যাপকভিত্তিক উদ্বাস্তু স্রোত এবং এটা আরো তীব্র হচ্ছে, যা পাকিস্তান সরকারের দমন-পীড়ন থেকে উদ্ভূত। এটা ভারতের ওপর শুধু অর্থনৈতিক বোঝা সৃষ্টি করেনি, এটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যারও জন্ম দিয়েছে। এমনকি ভারতীয় স্থিতিশীলতা ও অখন্ডতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। ইন্দিরা গান্ধী উল্লেখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন যে, এই সংকট তার ওপর এক বিরাট চাপ বয়ে এনেছে। এমনকি তার মন্ত্রিসভার মধ্যেও এই অনুভূতি রয়েছে যে, দূর্বল নীতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ভারতের নিরাপত্তাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছেন।

মি. রজার্স বলেন, ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে সক্রিয় আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র নিয়োজিত রয়েছে। ইয়াহিয়া এই মর্মে সম্মতি জানিয়েছেন যে, মুজিব কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া বাংলাদেশের কোনো নেতার সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসবেন। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, এটা একটা উৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিত। এ রকমের আলোচনার প্রক্রিয়ায় সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এই প্রক্রিয়া যাতে শুরু হয়, সে লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়াকে এটা বলতে পারে না যে মুজিবকে মুক্তি দেন। এটা বললেও কাজ হবে না। যুক্তরাষ্ট্র আশা করে, ইয়াহিয়া যদি সত্যি একতরফাভাবে সৈন্য প্রত্যাহার কার্যকর করেন তাহলে ভারত যেন সমরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বিবেচনা করে। ইন্দিরা জবাবে বলেন, ইয়াহিয়া হয়তো পশ্চিম সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু ভারতের ওপর প্রচণ্ড চাপ পূর্ব পাকিস্তানের। মি. হাকসার এই সময় ব্যাখ্যা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস স্বপক্ষ ত্যাগের ঘটনায় পাকিস্তান সরকার সীমান্তে নিয়মিত সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। আর এটা স্পষ্টভাবেই বিধির লঙ্ঘন। এই সৈন্যবাহিনী ক্রমাগতভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে হামলা চালাচ্ছে। কাউল উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের ঘাঁটিগুলো সীমান্তের কাছাকাছি এবং সে কারণেই তাদের পক্ষে অধিকতর সহজে প্রত্যাহার করে নেয়া সম্ভব। তারা প্রশ্ন রাখেন, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে কি এমন প্রমাণ আছে, যা থেকে বোঝা সম্ভব ইয়াহিয়া সত্যিই রাজনৈতিক সমাধান চান? মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জবাবে বলেন, তাঁরা এটা স্পষ্ট করে বলতে পারেন, এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই যা করার তা সম্পন্ন করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনার শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন বিশ্বের বহু স্থানে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁরা এটা বুঝতে পারছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যার কারণে ভারতের ঘাড়ে বিপদ চেপেছে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের বিপদ এড়াতে সম্ভাব্য সব চেষ্টা করছে। কিন্তু এসব আলোচনার মূল কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন বন্দি মুজিব। বিভিন্ন বার্তায় তা যথার্থভাবে প্রমাণিত।

১২ নভেম্বর ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশনস্ গ্রুপের বৈঠকে হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের মি. সিসকো বলেন, ভারত বারবার এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে একটি দাবি করে আসছে সেটি হল শেখ মুজিবের মুক্তি। শেখ মুজিবই একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে ইয়াহিয়া খান আলোচনা করতে পারেন। কিসিঞ্জার বলেন, তারা বলেছিল ইয়াহিয়া খান প্রথমে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং অবশ্যই তিনি মুজিবকে হত্যা করবেন না আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনায় একটি এগ্রিমেন্ট হবার পর ইয়াহিয়া খান অবশ্যই শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলবেন।[২৪]

বৃটেনের জানা মতে, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার পর্ব ১০ দিন ধরে চলবে এবং মনে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড অবিলম্বে কার্যকর করা হবে না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হলে তা সম্মিলিতভাবে এবং ক্রমান্বয়ে করতে হবে। একসঙ্গে সব গোলাবারুদ নিঃশেষ করা উচিত হবে না। পাঁচ. পাকিস্তানী হাই কমিশনার মি. সালমান আলীর সঙ্গে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়, যে বা যারাই শেখ মুজিবকে রক্ষা করতে চান তাঁদের সকলকেই ইয়াহিয়ার সহজাত ধারণার কথা মনে রাখতে হবে। তিনি রূঢ় নীতি ধারণ করেন।[২৫]

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বার্তার উত্তরে বলেন, 'শেখ মুজিবের বিচারে বৃটেন উদ্বিগ্ন।'

পত্রে বলা হয়, "১৪ আগষ্ট "শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পর্কে পাঠানো আপনার বার্তাটি ভারতীয় হাই কমিশনারের মাধ্যমে আমার হস্তগত হয়েছে। শেখ মুজিবের বিচারের ব্যাপারে আপনার মতো আমিও সমভাবে উদ্বিগ্ন। ইতোমধ্যেই আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানো আমার বার্তায় যতো দ্রুত সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলেছি। শেখ মুজিবকে প্রাণদণ্ডদান সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য স্যার আলেক ডগলাস হিউমও লন্ডনে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। হাই কমিশনার আমাদের এই উদ্বেগের কথা তাঁর সরকারকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা ইতোমধ্যেই আমাদের মনোভাব পরিষ্কারভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে তুলে ধরেছি। তথাপি কোনও প্রকার অবিবেচনা প্রসূত পদক্ষেপ যেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গ্রহণ না করেন তা নিশ্চিত করার জন্য আরও কী করা যেতে পারে, তা আমরা বিবেচনা করে দেখছি। শুভেচ্ছাসহ, এডওয়ার্ড হীথ।"[২৬]

১৯ নভেম্বর রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড হেনরি কিসিঞ্জারকে জানান যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেন তিনি বিদ্রোহী বাংলাদেশ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে সম্মত আছেন। তিনি তাদের পশ্চিম পাকিস্তানের আসা ও যাবার জন্য 'সাদা পতাকা' অনুমোদন দেবেন কিন্তু গুরুত্বর অভিযোগের সঙ্গে যে সমস্ত প্রতিনিধি যুক্ত তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন না। ইয়াহিয়া খান আরও বলেন, মুজিব নেগোসিয়েশনের মূল চাবিকাঠি নন বরং ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রয়েছে 'তালা ও চাবি' উভয়ই (both the key and the lock).[২৭]

২৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের মধ্যে টেলিফোনে দীর্ঘ কথোপকথন হয়। এই কথোপকথনের এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী হীথ নিক্সনকে বলেন যে, পাকিস্তান ইচ্ছে করলেই ভালো অবস্থান পেতে পারতো যদি তারা (হীথ-নিক্সন) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে ও অতীত ভুলে যেতে রাজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করানো যেতো। মানুষকে কারাগারে পাঠিয়ে, পরে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাদেরকে প্রেসিডেন্ট বানানোসহ অন্য অনেক কিছু করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্ভবত বৃটেন-মার্কিনীদের রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হীথ নিশ্চিতভাবে বলেন , যদি ইয়াহিয়া খান চাইতেন তাহলে তিনি পরিস্থিতিকে সফল ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। কিন্তু নিক্সন বলেন যে, 'মাথায় বন্দুক ঠেকানো অবস্থায় ইয়াহিয়া খানের কিছু করার নেই।'[২৮]

৪ নভেম্বর ১৯৭১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মন্তব্য করেন, 'এ বিশাল ট্র্যাজেডির বিষয়ে আর্ন্তজাতিক উদ্যোগ নিতান্তই নগণ্য। তিনি নিক্সনকে রাজনৈতিক সমাধানের উপর গুরত্ব আরোপ করেন। রাজনৈতিক সমাধান বলতে ইন্দিরা গান্ধী বোঝাতে চেয়েছেন বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি। নিক্সনকে জোর দিয়ে বলেন, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও উভয়দেশের সৈন্যদের সীমান্ত থেকে প্রত্যাহার করা। প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বলেন, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান একত্রে থাকার আর কোনো অবকাশ নেই। ৫ নভেম্বর বৈঠকে নিক্সন পাশের ঘরে বসে কিসিঞ্জারের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, "ওই 'বুড়ি ডাইনিকে' আমরা মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছি এবং ইন্দিরা গান্ধীকে তিনি কুক্কুরী বলে গালাগাল করতে থাকেন।" তিনি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে অবহেলা করার জন্য ৪৫ মিনিট পর আলোচনায় বসেন। আলোচনা ভেঙে যায়। নিক্সন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সতর্ক করে বলেন, সামরিক ব্যবস্থা কারো জন্য ভালো হবে না। এর জবাবে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'তিন/চার হাজার মাইল দূর থেকে শুধুমাত্র বর্ণগৌরবে কোনো দেশ ভারতকে তাদের ইচ্ছে মতো আদেশ দেয়ার ক্ষমতার দিন শেষ হয়ে গেছে।'

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সামরিক বাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের সিগন্যাল দেন। সে সময় তিনি বলেন, 'এখনও সময় আছে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে অবিলম্বে পাকিস্তানকে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে হবে। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নেকড়েদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না।' ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে আক্রমণ করলে কলকাতা জনসভা থেকে সংবাদ পেয়ে বিমানে দিল্লী ফেরার পথে মিসেস গান্ধীর মন্তব্য ছিল, "The fool has done exactly what one had expected.' ইন্দিরা গান্ধী চেয়েছিলেন পাকিস্তান প্রথমে আক্রমণ করুক। পাল্টা আক্রমণ করবে ভারত এবং মিত্রবাহিনী বাংলাদেশে ঢুকে পড়বে।

১২ নভেম্বর ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশনস্ গ্রুপের বৈঠকে হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের মি. সিসকো বলেন, ভারত বারবার এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে একটি দাবি করে আসছে সেটি হল শেখ মুজিবের মুক্তি। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে ইয়াহিয়া খান আলোচনা করতে পারেন। কিসিঞ্জার বলেন, তারা বলেছিল ইয়াহিয়া খান প্রথমে আওয়ামীলীগ নেতাদের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলবেন এবং অবশ্যই তিনি মুজিবকে হত্যা করবেন না এবং আলোচনায় একটি এগ্রিমেন্ট হবার পর ইয়াহিয়া খান অবশ্যই শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলবেন। সিসকো বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব ছিল খুবই স্পর্শকাতর। যদি ইন্দিরা গান্ধী তার বাধাগুলো অপসারণ করে তাহলে এটা হবে আনন্দের সমঝোতা। কিসিঞ্জার মি. সিসকোকে জিজ্ঞেস করেন প্রস্তাবগুলো কী ছিল? সিসকো উত্তরে বলেন, তিনটি বিকল্প প্রস্তাবের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সবচেয়ে আগ্রহী করে তুলেছিল শেখ মুজিব কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের আলোচনার ইচ্ছাকে।[২৯]

৫ ডিসেম্বর কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলেন, বর্তমান অবস্থায় ভারতের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে কিছু উপস্থাপন করা হলে সে ক্ষেত্রে রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করবে, আবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব আসলে চীন সেখানে ভেটো প্রয়োগ করবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, এর ভিতর কীভাবে সমন্বয় করা যায়, ভারত বর্তমান কোন পথ ধরেছে। কিসিঞ্জার বলেন, তাদের পরামর্শ হলো যা তারা সর্বদাই বলে আসছে তা হলো শেখ মুজিবের মুক্তি।[৩০]

১৫ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে একটি অতি জরুরী বার্তা পাঠান। ঐ বার্তায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "আমি এমন এক সময় আপনাকে চিঠি লিখছি, যখন ভারত-আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধাজনক অবস্থা তৈরি হয়েছে। সেহেতু আমি আপনাকে ধৈর্যের সঙ্গে গোড়া থেকেই পুরো ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে অনুরোধ করছি। এমন কিছু কিছু সময় আসে যখন বর্তমানের গভীর সংকটকে অতীতের কিছু মহৎ ঘটনাবলী দিয়ে আলোকিত করতে হয়। তেমনি একটি ঘটনা আমেরিকা কর্তৃক তার ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছিল, যখন কোন সরকার তার জনগণের অধিকারের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বিবেচিত হয়, তাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা সেদেশের জনগণের রয়েছে। বিশ্বের সকল মানবিক দেশ ২৫ মার্চের ভয়াবহ ঘটনাকে সাড়ে সাতকোটি মানুষের বিদ্রোহ বলে দেখছেন। যারা সারা জীবন কেবল উপেক্ষা আর বঞ্চনাকে সহ্য করেছে। বিশ্বের প্রায় সকল প্রচার মাধ্যমে ২৬ মার্চের ভয়াবহতাকে তুলে ধরেছে, যা আপনি অবগত। আমেরিকার বোদ্ধা জনগণও পূর্ববাংলার মানুষের দাবি সমূহকে উপস্থাপন করেছেন তাঁদের বিশ্লেষণে।

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ৯ মাসের দুঃখজনক পরিস্থিতিকে এড়ানো যেত, যদি বিশ্বের বড় বড় দেশগুলো ও তাঁদের নেতারা বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিতেন এবং প্রকৃত বাস্তবতাকে বুঝতে চেষ্টা করতেন। যদিও আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে প্রকৃত অবস্থা বোঝানোর পরও শরণার্থীদের ব্যাপারে সহানুভূতি দেখালেও সবাই সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধানে উদাসীন থেকেছে। বিশেষ করে আমেরিকা যদি এক্ষেত্রে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাব ও কর্তৃত্ব দিয়ে অন্তত শেখ মুজিবকে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা করত, তাহলে অন্তত যুদ্ধ এড়ানো যেত। কেউ কেউ একটি মীমাংসার কথা বললেও প্রকৃত সমস্যা নিরসনে কেউ বাস্তব উদ্যোগী হননি।

জনাব রাষ্ট্রপতি আমি বিনীতভাবে আপনার নিকট জানতে চাই শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার চেয়ে একটি যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা কি বেশি ধ্বংসাত্মক নয়? তিনি আরো বলেন, আমরা বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানের কোনো অংশ চাই না। আমরা বহুবার পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছি, কিন্তু প্রতিবারই তাঁরা তা প্রত্যাখান করেছে। মিঃ কিসিঞ্জার আগস্টে ভারত সফরে এলে তার কাছে একটি রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছিলাম, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা কোনো ধরনের প্রতিউত্তর পাইনি। আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনার গভীর জ্ঞান এবং মানবিক বোধ দিয়ে আমেরিকার মানুষের ইচ্ছা ও আদর্শের প্রতীক হিসেবে আপনি আমাকে জানতে দিন যে, আমরা কোথায় ভুল করছি।

এই পত্রে আরো বলা হয়, আমাদের উদ্দেশ্য সীমিত। আমাদের লক্ষ্য ছিল ত্রাসের রাজত্ব থেকে দেশকে মুক্তি করার ব্যাপারে বাংলাদেশের বীর জনতা ও মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করা এবং আমাদের মাতৃভূমির উপর আক্রমণ প্রতিহত করা। প্রয়োজনের বেশি একদিনও ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে থাকবে না। যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁদের ঘর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করেছিল, তাঁরা ইতিমধ্যেই ফিরে যেতে শুরু করেছে। যুদ্ধ বিধস্ত সেই দেশের পুনর্বাসনের জন্যে সরকার ও জনগণকে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি যে, এই নতুন দেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনগণের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করে বাংলাদেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবেন। সোনার বাংলায় একটি সার্থকতাপূর্ণ ভবিষ্যত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের সময় এসেছে। তাঁদের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রইল। তাঁদের এ বিজয় শুধু তাঁদের একার নয়। যেসব জাতি মানবিক চেতনার মূল্য দিয়ে থাকে, সে সব দেশও বিজয়কে মুক্তির সন্ধানে মানুষের বিরাট সাফল্য হিসেবে স্বীকৃতি দেবে।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন চিঠিটি পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিক্সন এবং কিসিঞ্জার আলোচনা করেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চিঠির জবাব দেয়ার জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩১৪ নম্বর দলিলে লক্ষ্য করা যায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর চিঠিটি গভীর মনোনিবেশ সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যবস্থা করলে বেসামরিক প্রশাসন কাজ করতে সমর্থ হতো। এ কথাটিকে প্রহসন হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছে শেখ মুজিব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। পাকিস্তানিরা ভেবেছে, শেখ মুজিব যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই তাকে ছেড়ে দেয়া, মুক্তি দেয়ার অর্থই হবে পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংহতি বিনিষ্ট করা। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলির পাঁঠা বানাতে পারেনা। মিসেস গান্ধীর পত্রটি যে কর্কশ ভাষায় লেখা একথাটি তাকে জানানো যেতে পারে। ঐ দিনই সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করে খুব শিগগিরই বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র নিক্সনের নির্দেশে সপ্তম নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরে পাঠানোর উদ্যোগ নিলে সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনীতিক বলেন যে, সোভিয়েত নৌবহর কোনোক্রমেই বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহরকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। চীন লাদাক সীমান্তে এগিয়ে এলে সোভিয়েত চীনের সিনকিয়াং অঞ্চলে অ্যাকশনে যাবে। এই পরিস্থিতিতে মিসেস গান্ধীর ১৫ ডিসেম্বর প্রেরিত চিঠি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও জাতিসংঘের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৫ ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধী প্রেরিত চিঠির জবাব দেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। চিঠির মূলকথা ছিল জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত। নিক্সন চিঠিতে বলেছেন, সবরকম রাজনৈতিক আলোচনার পথ রুদ্ধ হওয়ার আগেই সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ যুক্তরাষ্ট্র যথার্থ মনে করেনি। আগামী দিনে আমরা পুনরায় একসঙ্গে কাজ করতে পারবো এবং দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে পারবো।

১৮ তারিখে ভুট্টোর সঙ্গে নিক্সনের বৈঠক হয়। ভুট্টো বলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি সন্তুষ্ট। পাকিস্তান সবসময় বিশেষ করে বর্তমান মুহূর্তে সহযোগিতা করায় কৃতজ্ঞ। তবে তিনি মনে করেন পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটে চলেছে সেসবের কিছুই বন্দী মুজিব জানতেন না। তবে অনেক কিছু তিনি অনুমান করতে পারতেন। ইয়াহিয়ার সৈন্যরা যদি পূর্ব পাকিস্তান দখলে নিয়ে আসতে পারে, আওয়ামী লীগ যদি আত্মসমর্পণ করে থাকে, তবে তাঁকে হত্যা করা হবে। জিম্মি হিসেবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কোনো কার্যকারিতা ইয়াহিয়া খানের কাছে থাকবে, তাঁকে ততক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা হবে। কোনো খবরের কাগজ, বই বা রেডিও তাঁকে দেয়া হয়নি। তাঁর যেটা একমাত্র বিলাসিতা সেই তামাক তাঁকে দেয়া হয়েছিল। তিনি দিনের গণনা রাখতেন, পাঠ করতেন কোরান, তাকিয়ে থাকতেন ক্ষুদ্র এক খণ্ড আকাশের দিকে এবং নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন কারাগারের অবিচ্ছিন্ন নীরবতার কাছে।

২২ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ভুট্টো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে গমন করেন। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করার অভিমত প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি ৩৫ মিনিট অবস্থান করেন। পাকিস্তান সংকটের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা দিয়েছে তা ভুলবার নয়। অন্যান্য কথার মধ্যে ভুট্টো প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট থাকা সত্ত্বেও অতি শীঘ্র রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠা, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক আবহাওয়া তৈরী করার কথা বলেন। ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি করার কথা বলেন, যা পশ্চিম পাকিস্তানের স্থানীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যার ক্ষেত্রে করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে অবস্থার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবেন। প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ফারল্যান্ডকে জানান, শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলখানা হতে মুক্তি দিয়ে তাঁকে রেস্টহাউজে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছে। ফারল্যান্ড বলেন, তিনি খুবই আনন্দিত হবেন যথা সময়ে যদি এই শুভকাজ সম্পাদিত হয়।[৩১]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানে ক্ষমতার পট পরিবর্তন ঘটে। ইয়াহিয়া খান বন্দি হন। ভুট্টো ক্ষমতায় আসেন। একদিকে পরাশক্তির চাপ। অন্যদিকে বাংলাদেশে আটক ৯৩ হাজার সৈন্য। এ প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া ব্যতীত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর অন্যকোনো উপায় ছিল না। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে যে কোনো ধরনের একটি শিথিল সম্পর্ক রাখার পীড়াপীড়ি করলে বঙ্গবন্ধুর পরিস্কার উত্তর ছিল, দেশের মানুষের কাছে না গিয়ে তিনি কিছুই বলতে পারবেন না।

৮ জানুয়ারি গভীর রাতে পি. আই. এ. বিমানে যাত্রার প্রাক্কালে জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে হাত খরচের জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার এগিয়ে দিলে বঙ্গবন্ধু বললেন, এটা চার্টার বিমানের ভাড়ার জন্য রেখে দিন। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি লন্ডন থেকে ভারত হয়ে ফিরে আসেন তাঁর স্বাধীন স্বপ্নের সোনার বাংলায়।

AMARBOI.COM

টীকা

১. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৯।
২. দৈনিক আনন্দবাজার, ২০ জুলাই ১৯৭১।
৩. Ahmed Salim.op.cit, 'পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্যপ্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ- ৪৮ ও ৫০।
৪. রবার্ট পেইন, ম্যাসাকার, নিউ ইয়র্খ, ১৯৭৩, পৃ-৮৯-৯০
৫. দৈনিক আনন্দবাজার, ২৩ই আগস্ট ১৯৭১
৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেন, বিচার প্রহসনে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। তিনি প্রথমে এ কে ব্রোহিকে তাঁর আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত করলেও অবস্থাদৃষ্টে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার পক্ষে কোনো আইনজীবীর প্রয়োজন নেই। আইনজীবী ব্রোহিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রপক্ষ নিয়োগ দেয়। কিন্তু তিনি যখন অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ করে ১৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত যেসব ব্যক্তি আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের জবানবন্দী ও জেরা করার জন্য অগ্রসর হলেন তখন তাকে কোর্ট থেকে কোনো সহায়তা করা হয়নি।
৭. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাকিস্তান টেলিভিশনে ৩রা আগস্ট প্রদত্ত ইন্টারভিউ, "acts of treason, acts of open rebelition" and incited armed rebelion against the State. *The DAWN*, Karachi- August 5, 1971.
৮. রবার্ট পেইন, ম্যাসাকার, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩, পৃ. ৯৬-৯৭।
৯. *Bangladesh Documents, op.cit.*; মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।
১০. Mermorandum From the President's Assistant for National Security

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Affairs (Kissinger)to President Nixon. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 188.

১১. স্পেশাল একশন গ্রুপের মিটিং এ উপস্থিত স্টেট ডিপার্টমেন্টের জন.এন. আরউইন এ মন্তব্য করেন।

১২. Minutes of Washington Specail Actions Group Meeting/1, Source National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, White House Situation Room. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 185.

১৩. Memorandum for the Record/1/, PARTICIPANTS- The President- Henry A. Kissinger, Assistant to the President- John Irwin, Under Sectetary of State- Thomas Moorer, Chairman, JCS, Robert Cushman, Deputy Director of Central Intelligence, Maurice Williams, Deputy Administrator, AID, Joseph Sisco, Assistant Secretary of State, Armistead Selden, Deputy Assistant Secretary of Derense, ISA, Harold H. Saunders, NSC Staff. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p.174.

১৪. Telegram 149347 (No- Diauloge Shekh Mojibur Rahaman) From the Department of State to the Embassy in India/1/, Washington, August 31, 1971 *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 200-201.

১৫. Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, White House Situation Room *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 212-215.

১৬. Source Telegram From Mission to the United Nations to the Depertment of State. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 231.

১৭. Source : Analytical Summary Prepared by the National Security Council Staff, Washington. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 232.

১৮. Telegram From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State, Soruce: Telegram 9599 from Islamabad, Sept. 21. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 237.

১৯. স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

২০. Telegram From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State, Soruce: Telegram 9599 from Islamabad, Sept. 21. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 245.

২১. Telegram From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 256.

২২. Telegram 10927 From Islamabad. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 263/266.

২৩. Telegram 1096 From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 263.

২৪. Source : Analytical Summary Prepared by the National Security Council Staff, White House Setation Room, Washington. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 270-272.

২৫. H. c,,. 139-141|

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬. H, c,,. 141|
২৭. Source : National Archives RG 59 Centrel Files 1970-73, POL 32-1,PAK. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 283.
২৮. H, c,,. 184|
২৯. American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, P. 270-272, Source : Analytical Summary Prepared by the National Security Council Staff, White House Setation Room, Washington.
৩০. American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, P. 351, Source: Transcript of Telephone Converation Between President Nixon and His Assistant for National Security Affiars (Kissanger).
৩১. American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, P. 480, Source Telegram From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : সতের

শুধু ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা কেন- বীরউত্তম নিয়েও প্রশ্ন

[মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ১৫ মে তারিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধে যারা বীরত্ব দেখিয়েছেন তারা চার স্তরে গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড পাবেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৪ ফেব্রুয়ারি গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডের নাম পরিবর্তন করে ১ নং স্তরকে বীরশ্রেষ্ঠ, ২নং স্তরকে বীর উত্তম, ৩নং স্তরকে বীর বিক্রম এবং ৪নং স্তরকে বীর প্রতিক নামকরণ করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সর্বোমোট ৪৩ জনকে উপাধি প্রদানের জন্য বাছাই করা হয়। এছাড়া ১৯৭৩ সালের ২৬ মার্চ প্রতিরক্ষা দপ্তরের আন্তঃসার্ভিস প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৭ জনকে বীরশ্রেষ্ঠ, ৬৮ জনকে বীরউত্তম, ১৫৯ জনকে বীরবিক্রম ও ৩১২ জনকে বীরপ্রতীক অর্থাৎ ৫৪৬ ব্যক্তিকে বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করা হয়েছে। এই উপাধি ঘোষণার পর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এ কারণে যেমনটি জেনারেল মঈনুল হোসেন প্রশ্ন তুলেছেন 'ভারতের অভ্যন্তরে স্থাপিত হেডকোয়ার্টারে বসে অধিকাংশ সেক্টর কমান্ডারগণ যুদ্ধের নয় মাস কাটিয়ে দিয়েছেন', তারা কিভাবে বীরউত্তম হন? কিন্তু যারা যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখ-সমরে শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন অসীম সাহসিকতা নিয়ে, তারা কোনো খেতাব বা পদক কোনো কিছুই পাননি। যারা সেনা-অধিনায়ক কিংবা সেক্টর কমান্ডর ছিলেন যাদের মধ্যে অধিকাংশই সম্মুখ-সমরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, শুধুমাত্র প্ল্যানিং, প্রশাসন বা প্রশিক্ষণ নিয়ে থেকেছেন তাদেরকে বিশেষ মর্যাদার মেডেল দেয়া যেতে পারে কিংবা প্রশাসনিক খেতাব দেয়া যেতে পারে কিন্তু গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড বা বীরউত্তম খেতাব দেয়া যায় না। যে ৬৮ জন বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত হয়েছেন তারা অধ্যাদেশের শর্ত অনুযায়ী কীভাবে বীরউত্তম হলেন তার পুরো নথি এবং সাইটেশন জাতির সামনে প্রকাশ করা উচিত। মুক্তিযুদ্ধে যারা জীবন বাজি রেখে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেককে বাদ রেখে যেমন ভূয়া মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে, তেমনি বিতর্কিত ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে বীরউত্তম খেতাব দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতার ৪৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও এসব প্রশ্ন তামাদি হয়ে যায় না। যাবে না।]

১. বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেই সব অনন্যসাধারণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খেতাব প্রদানের বিষয়টি মুক্তিবাহিনীর সেনাপ্রধান আতাউল গণি ওসমানী মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভায় ১৯৭১ সনের মে মাসের প্রথম দিকে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে স্বাভাবিকভাবেই বলা হয়েছিল, যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে শত্রুহননে বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতায় জীবন-উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে বীরত্বসূচক খেতাব (Gallantry Award) প্রদান করা হলে অন্যরাও তাদের অনুসরণে অনুপ্রেরণা লাভ করবে। মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন সেক্টর ও ইউনিটে সিদ্ধান্তটি প্রচার করা হয় এবং বীরত্বপূর্ণ

খেতাবের সুপারিশ পাঠানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

২. ১৬ই মে মিটিং-এর সিদ্ধান্তের আলোকে ২৮ই অগাস্ট ৭১ কেবিনেট সচিব প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী সেনাপ্রধানকে গ্যালান্ট্রী অ্যাওয়ার্ডস স্কীমটির কপি পুনরায় মন্ত্রী পরিষদে পাঠানোর অনুরোধ করেন। **(পরিশিষ্ট-ক)**

৩. ১৯ অক্টোবর '৭১ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি পূর্বে বর্ণিত মন্ত্রীসভার কার্যক্রম খেতাব প্রদানের স্কীমসহ অনুমোদনে স্বাক্ষর করেন।

৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত অধ্যাদেশ সেক্টর কমান্ডার, ইউনিট কমান্ডার, উইং কমান্ডার ও সেনা অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কে কিভাবে যুদ্ধ করেছেন, পাকিস্তান শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে কী ধরনের বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছেন এবং এর ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও বিবরণী আহ্বান করা হয়। কিছু কিছু এ ধরনের রিপোর্ট মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়েই ৮নং থিয়েটার রোড কলকাতা প্রধান সেনাপতির অফিসে চলে আসে। সে সময় মেডেল বা সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি। কেবলমাত্র একটি পত্র দ্বারা তাদের জানিয়ে দেয়া হয়।

৫. এই প্রস্তাবটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৫ মে তারিখে মুজিবগনর মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সে সময় চার ক্যাটাগরিতে উক্ত গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক. সর্বোচ্চ পদ (Highest Order), দুই. উচ্চ পদ (High Order), তিন. প্রশংসনীয় পদ (Commendable Order), ৪. বীরত্বসূচক প্রশংসাপত্র (Gallantry Certificate)। ৩০ জুলাই এ সম্পর্কিত একটি গোপনীয় পত্র প্রধান সেনাপতি সেক্টর কমান্ডারদের নিকট প্রেরণ করেন। সেই পত্রে তিনি বলেছেন তখন পর্যন্ত গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডের জন্য কোন সুপারিশ পাননি। সেজন্য তিনি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী যোগ্যতা নির্ধারণ করে দেন।

সর্বোচ্চ পদঃ সর্বোচ্চ পদ তারাই পাবেন যারা জীবনের সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এমন কাজ করেছেন, যা না করলে বাংলাদেশ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হতে পারত। তাছাড়া ঐ বীরত্বপূর্ণ কাজের দ্বারা শত্রুসেনাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে যুদ্ধের গতিধারাকে নিজেদের স্বপক্ষে প্রভাবিত করেছেন।

উচ্চ পদঃ যারা এই স্তরে অ্যাওয়ার্ড পাবেন তাদের পূর্ব বর্ণিত খেতাবের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, তবে তার মাত্রা হবে অপেক্ষাকৃত কম। তাদেরও সম্মুখ সমরে অংশ নিতে হবে।

প্রশংসনীয় পদঃ এই অ্যাওয়ার্ড পাবেন তারাই যারা পূর্ব বর্ণিত খেতাবের মতো যোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হবেন, তবে তা অপেক্ষাকৃত আরও কম মাত্রায়।

বীরত্বসূচক প্রশংসাপত্রঃ উপরের তিন প্রকার খেতাবের যোগ্যতা অর্জন না করলেও এমন সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করেছেন যার স্বীকৃতি প্রদান প্রয়োজন।

৬. এসব গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রথম ক্যাটাগিরিতে তিনজন সাক্ষ্য, উচ্চ স্তরে দু'জন সাক্ষ্য, তৃতীয় স্তরে একজন এবং চতুর্থ স্তরে কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে না। গ্যালান্টি অ্যাওয়ার্ডদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দশ হাজার, উচ্চ পর্যায়ে পাঁচ হাজার, তৃতীয় পর্যায়ে দুই হাজার টাকা প্রদান করা হবে। বীরত্বসূচক প্রশংসাপত্র যারা পাবেন তারা কোন অর্থ পাবেন না।

৭. এই পত্রে যাদের অ্যাওয়ার্ড দেয়া হবে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া অবিলম্বে যাদের অ্যাওয়ার্ড দেয়া প্রয়োজন তাদের জন্য বিশেষ প্রভিশন রাখা হয়েছে। যারা অপারেশনে সাহস ও বিশেষ ধরনের উল্লেখযোগ্য বীরত্বপূর্ণ কর্ম করেছেন তাদেরকে অবিলম্বে এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য সুপারিশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডের জন্য একটি বাছাই কমিটি গঠন করার প্রস্তাব রাখা হয়।

উক্ত পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেষ অনুচ্ছেদটি হচ্ছে যারা এ ধরনের খেতাব পাবেন তাদের যুদ্ধে সাহসিকতার বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে, সাইটেশন থাকবে এবং তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ছাড়া কাউকে দেখানো যাবে না। খেতাব প্রদানের সংবাদ রেডিও বা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের পর সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবে। **পরিশিষ্ট-খ**।

৮. এই সঙ্গে সুপারিশমালার বিভিন্ন সিরিয়াল বা অনুচ্ছেদের বর্ণনা রয়েছে। **পরিশিষ্ট-গ**

৯. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডের পুনঃনামকরণ করা হয়। সর্বোচ্চ পদ- বীরশ্রেষ্ট, উচ্চ পদ- বীর উত্তম, প্রশংসনীয় পদ- বীর বিক্রম, বীরত্বসূচক প্রশংসাপত্র- বীর প্রতীক নাম করা হয়।

১০. ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ গেজেট ৬ই এপ্রিলে প্রকাশিত এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪৩ জনের নাম প্রকাশ করে। এর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বীরশ্রেষ্ট মাত্র ১ জন (Highest Order), বীর উত্তম ৩ জন (High Order), বীর বিক্রম ১৪ জন (Commendable Order), বীর প্রতিক ২৫ জন (Gallantry Certificate) এর নাম প্রকাশিত হয়। **পরিশিষ্ট -ঘ**।

১১. ১৯৭৩ সালের ২৬ মার্চ ৫৪৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে উপাধি প্রদান করা হয় উপর্যুক্ত ৪৩ জনসহ। এয়ার ভাইস মার্শাল এ, কে খন্দকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধকালীন বা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন ইউনিট, সেক্টর ও ব্রিগেড থেকে পাঠানো সুপারিশ যাচাই বাছাই করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ তালিকা অনুমোদন করেন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে যা র‍্যাটিফাই করা হয়। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে সর্বোমোট ৬৭৬ মুক্তিযোদ্ধাদের উপাধি প্রদান করা হয়। উপাধি ও খেতাবপ্রাপ্তদের অ্যাওয়ার্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আর্মি -২৮৮ জন, নেভি ২৪ জন, এয়ার ফোর্স ২১ জন, বাংলাদেশ রাইফেলস্ ১৪৯ জন, পুলিশ ৫ জন, মুজাহিদ/আনছার ১৪ জন, গণবাহিনী(গেরিলা) ১৭৫ জন।

১২. ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের প্রথমার্ধে সেক্টর কমান্ডারদের নিকট জানতে চাওয়া হয়, কোন কোন অফিসার, সৈন্য বা অনিয়মিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনীর কোনো সদস্য বীরত্বপূর্ণ কোন কাজ সম্পাদন করেছেন তার রিপোর্ট । এবং উক্ত রিপোর্টে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বিবরণ চাওয়া হয় যার (রিকোমেন্ডেশন ফর গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড, হেডকোয়ার্টার বাংলাদেশ, ফোর্সেস লেটার নং- ১০/১৫ এ ৩০জুলাই ১৯৭১) ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদে তারিখ, সময়, স্থান ইত্যাদি যুক্ত করে সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধের জন্য বিবরণ প্রদাণের উল্লেখ করা হয়। গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডের সুপারিশের জন্য ১. নাম, রেজিমেন্ট, সার্ভিস নম্বর ২. তারিখসহ র‍্যাঙ্ক ৩. ট্রেড বা ক্লাস ৪. যারা শহীদ হয়েছেন তাদের নাম ও পুর্ণ ঠিকানা ৫. ব্রাঞ্চ- আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স, গেরিলা স্পেশাল ফোর্স ৬. সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে রেজিমেন্ট/ক্রেম্প ৭. সাব-ইউনিট এবং ইউনিট যেখানে পূর্বে যারা কাজ করত এবং সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিল ৮. বর্তমানে তাদের অবস্থান ১০. নাম, স্বাক্ষর এবং সাক্ষ্য ১১. তাৎক্ষণিক কমান্ডারের স্বাক্ষর ১২. ব্যাটিলিয়ান বা তৎসমতুল্য কমান্ডারের সুপারিশ ও তারিখ ১৩. সেক্টর বা তৎসমতুল্য কমান্ডারের সুপারিশ ও স্বাক্ষর ১৪. বাছাই বোর্ডের সুপারিশ ও স্বাক্ষর ১৫. প্রধান সেনাপতির স্বীকারযুক্ত স্বাক্ষর ১৬. ডিফেন্স মিনিস্টার কর্তৃক অনুমোদন ও স্বাক্ষর ১৭. তারিখ ও খেতাবের নম্বর ১৮. তারিখ ও খেতাব বা অর্থের পদ্ধতি ১৯. মূল রেকর্ড কপি/রিসিপ। **পরিশিষ্ট-ঙ**।

১৩. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জেনারেল ওসমানী মিন্টো রোডে অবস্থান করেন। সেখানে মাত্র কয়েকজন সেক্টর কমান্ডার বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের জন্য মেডেল প্রদানের একটি তালিকা তৈরী করেন।[1] সেনা প্রধান জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী কর্তৃক স্বাক্ষর করার পর তালিকাটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তা অনুমোদন করেন- এবং গেজেট আকারেও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৪. এই তালিকা অবলোকন করে জুনিয়ার অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর অন্যতম কারণ হলো সকল সেক্টর কমান্ডারকে বীর উত্তম-এ ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু সর্বোচ্চ এই খেতাবে ভূষিত সেক্টর কমান্ডারগণ যারা "ভারতের অভ্যন্তরে স্থাপিত হেড কোয়ার্টারে বসে যুদ্ধের নয় মাস কাটিয়ে দিয়েছেন।"[2] জেনারেল মঈনুল হোসাইন প্রশ্ন তুলেছেন- "সেখানে বসে তারা কি ধরনের সাহসিকতা দেখিয়েছেন?" তাদের এই পদবী গ্রহণের ক্ষেত্রে চারিদিকে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

১৫. সেক্টর কমান্ডারদের দায়িত্ব ছিল প্রশিক্ষণ, যুদ্ধ-নির্দেশ, এবং অ্যাডমিনেসট্রেশন ইত্যাদি। সুতরাং তারা বীরত্বের সঙ্গে কোথায় যুদ্ধ করেছেন তার কোনো প্রমাণ ছিল না। এমনকি অনেক সেক্টর কমান্ডারের নিয়োগ নিয়েও বিতর্ক ছিল। যারা সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্বের সঙ্গে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী যুদ্ধের মাঠে ছিলেন তাদের অনেকের স্বীকৃতি মেলেনি। স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি, যোগ্যতা বা দক্ষতার কোনো নিয়মনীতি বা শর্ত মানা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন অনেককে বীরত্বপূর্ণ খেতাব দেয়া হয়েছে যারা বাংলাদেশের ভেতরে তেমন কোনো যুদ্ধ করেনি। এই অভিমত প্রকাশ করে জেনারেল মঈনুল বলেছেন যে, "যারা প্ল্যানিং, প্রশাসন, প্রচার বা প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করেছেন তারা কোনোক্রমেই সম্মুখ-সমরে যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড পেতে পারেন না। জেনারেল মঈনুল বলেছেন, তাদের অন্যভাবে যথাযোগ্য মেডেল/পদবি দেয়া যেতে পারত- যেমনটি হতে পারতো বিশেষ প্রশাসনিক মেডেল। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এটাই রীতি, যারা সম্মুখ-সমরে অংশগ্রহণ করেননি তাদেরকে এভাবেই সম্মানিত করা হয় কিন্তু বীরত্বের খেতাব দেয়া হয়না।"

খেতাব নিয়ে প্রশ্ন

১৬. জেনারেল মঈনুল হোসেন লিখেছেন, জুনিয়র অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে তিনি সেনা প্রধান শফিউল্লাহর সঙ্গে আলোচনা করেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। সবকথা শুনে বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে পূর্ব-অনুমোদন প্রাপ্ত তালিকা বাতিলের নির্দেশ দেন। তাঁর তালিকা বাতিলের আদেশটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় পরের দিন।[৩]

১৭. লক্ষ্যণীয় যে বঙ্গবন্ধুর সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে ৩ এপ্রিল ১৯৭৩ সালের আই, এস, পি, আর ডাইরেক্টর কর্তৃক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলা হয়, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তা চূড়ান্ত নয়, যা আরো যাচাই বাছাইয়ের প্রক্রিয়াধীন আছে। **পরিশিষ্ট-চ**

১৮. জেনারেল মঈনুল বলেছেন, তিনি যখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ছিলেন তখন তালিকাটি তন্ন তন্ন করে দেখেছেন, সেখানে কোনো সাইটেশন নেই, যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তিনি সমস্ত তালিকার নামগুলো এবং সরকারী গেজেটে নামগুলো দেখেছেন। এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য যে, এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিধি হলো সেখানে দু'বা তিনজন প্রতক্ষ্যদর্শীর সাক্ষ্য প্রয়োজন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান নোট থাকা দরকার তা ছিল না। "প্রয়োজনে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক অ্যাওয়ার্ড দেবার রীতি। কিন্তু যে পদবী বা মেডেল দেয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মাটিতে নয় মাসে তাদের অনেকেই পা রাখেননি।"

১৯. লেখক ও গবেষক মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব* শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করেছেন। তার বইতে বলা হয়েছে, "খেতাবপ্রাপ্তদের তালিকা পত্রিকায় প্রকাশের পর বাংলাদেশ বাহিনীর (নিয়মিত ও গণবাহিনী) সদস্যদের থেকে কিছু কিছু প্রতিবাদ পত্র (Representation Letter of grivances) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে এসে পৌছাতে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পত্রপ্রেরক কোনো প্রকার খেতাব না পাওয়ার প্রেক্ষিতে খেতাব দাবি করে এবং দাবির স্বপক্ষে সামরিক কমান্ডার বা রাজনৈতিক নেতার বরাত ও সুপারিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রদান করেন। কেউ কেউ খেতাব পেলেও যথাযথভাবে খেতাব দেয়া হয়নি বলে উল্লেখ করে পত্র দেন। এদের সবাই খেতাব তালিকা পুনরায় বিবেচনা করার জন্য আবেদন করেন। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে অনেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মারফত প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। কেউ কেউ এতটাই ক্ষুব্ধ হন যে তাকে প্রদত্ত খেতাব যথাযথ না হওয়ার প্রেক্ষিতে খেতাব প্রত্যাখ্যানও করেন। এ সব প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে সরকার খেতাব বিষয়ে পুনর্বিবেচনা বা পুনঃনিরীক্ষা করার উদ্যোগ নেয়।

২০. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৩১ মার্চ ১৯৭৩ তারিখে বীরত্বসূচক খেতাব বিষয়ে সকল কাগজপত্র যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবসের পূর্বে অনুমোদন করেছিলেন এবং সেনাসদরে রক্ষিত ছিল, তা ফেরত পাঠানোর জন্য সেনাবাহিনীপ্রধানকে অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে এই কাজপত্রগুলি তৃতীয় নিরীক্ষা বোর্ডের সভাপতি এবং বিমান বাহিনীপ্রধানের নিকট পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেন। একই সাথে ১২ এপ্রিল ১৯৭৩ তারিখে সেনাসদর থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে খেতাবপ্রাপ্তদের তালিকা গেজেটে প্রকাশ না করার অনুরোধ করে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাহিদার কারণে ৩ এপ্রিল ১৯৭৩ তারিখে সেনাবাহিনী ৬৩০ জনের খেতাব বিষয়ে দলিলাদি বিমান বাহিনী প্রধানের কাছে প্রেরণ করে।"

সেনা-অফিসার: সংখ্যা কত?

২১. ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে মোট সেনা অফিসার কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৪৩ জন, যার মধ্যে যুদ্ধ করেছেন ৩৩ জন, ৫ জন বন্দি অথবা নিহত হয়েছেন, বাকিরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কিনা এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নিচে এর বর্ণনা দেয়া হলো:

১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ৮জন সেনা অফিসারদের মধ্যে ৪ জন বাঙালি অফিসার ছিলেন। এদের মধ্যে লে. কর্নেল রেজাউল জলিল, যিনি ছিলেন অধিনায়ক কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। অংশগ্রহণ করেননি লে. শফি ওয়াসি উদ্দিন। শহীদ হয়েছেন লে. আনোয়ার হোসেন। ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জয়দেবপুরে ১৩ জন বাঙালি সেনা অফিসার ছিলেন। মাত্র ৪ জন অবাঙালি অফিসার ছিলেন। এর মধ্যে ২ জন যুদ্ধে অংশ নেননি। ২৩শে মার্চ অপসারিত হয়েছেন অধিনায়ক লে. কর্নেল মাসুদুল হাসান খান। ৩য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে বাঙালি অফিসার ছিলেন ছয়জন। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ৩ জন। বন্দি অবস্থায় শহীদ হন সিরাজুল ইসলাম ও রফিক আহমদ সরকার এবং মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন মেজর নিজাম উদ্দীন। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ৯ জন বাঙালি সেনা অফিসার ছিলেন তারা সবাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বাঙালি সেনা অফিসার ছিলেন ৭জন যারা সকলেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ২ জন বাঙালি সেনা অফিসারদের মধ্যে মেজর এ, ওয়াই মোশতাক আহমদ শহীদ হন। ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ছিল মূল: ক্যাডেট ব্যাটেলিয়ান থেকে কোনো কর্মকর্তাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি। তবে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ক্যাডেট ইউনিয়নে ২ জন বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাইফেলস

২২. পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস একটি আধা-সামরিক বাহিনী। এই বাহিনীর স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে অনেকটা যোগাযোগ থাকায় তারা দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতায় নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখেন। সেজন্য ২৫ মার্চ রাতে পিলখানায় ইপিআর বাহিনী আক্রান্ত হলে তাদের নিজস্ব বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ঢাকায় পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর আক্রমণের ঘটনা ইপিআরের সকল ইউনিটকে জানিয়ে দেন। এই বাহিনী ২৫ তারিখের মধ্যরাত হতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পূর্ব-প্রস্তুতির কারণে অধিকাংশ জায়গায় তারা সফল হয়। পরবর্তীকালে তাদেরকে মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র কাঠামোতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার।

এখানে ইপিআরের অফিসার যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সেক্টর ভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো :

সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা। বাঙালি অফিসার ছিল ৬ জন। তাদের কেউই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। সেক্টর ১, পিলখান, ঢাকা। ৫ জন বাঙালি অধিনায়ক ও ২ জন সুবেদার দায়িত্ব পালন করেতন। এই দুই জন মাত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেক্টর ২, সিলেট। ৮ জন বাঙালি সেনা অফিসারের মধ্যে ১ জন ক্যাপ্টেন বন্দি অথবা নিহত হন, ১ জন মেজর (মেডিকেল অফিসার) মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন, ২ জন সুবেদার তারাও যোগদান করেন। সেক্টর ৩, যশোর। ৪ জন বাঙালি অফিসারের মধ্যে ২ জন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেনি, কিন্তু ৮ জন সুবেদার ও ১ জন নায়েক সুবেদার মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। সেক্টর, ৪, রাজশাহী। ৪টি উইং-এ ১৮ জন এর মধ্যে ৪ জন মেজর ও ক্যাপ্টেন অর্ন্তভুক্ত ছিলেন বাকি সকলেই সুবেদার বা নায়েব সুবেদার হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। এর মধ্যে ১ জন ক্যাপ্টেন বন্দী বা নিহত হন, ৩ জন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর বাকি ১৪ জন সুবেদার ও নায়েব সুবেদার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেক্টর ৫, দিনাজপুর। ৬ জন বাঙালি কর্মরত ছিলেন। যার মধ্যে ২ জন ক্যাপ্টেন, ১ জন মেজর ও ৩ জন সুবেদার কর্মরত ছিলেন। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন নজির আহমেদ পাকিস্তান পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন জাভেদ আলমকে বাঁচাতে গিয়ে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে নিহত হন। বাকিরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেক্টর ৬, চট্টগ্রাম। ৬ জন বাঙালি কর্মরত ছিলেন। যার মধ্যে ২ জন ক্যাপ্টেন, ১ জন মেজর, ও ২ জন সুবেদার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ১ জন মেজর মেডিকেল অফিসার বন্দি অথবা নিহত হন।

মোট ইপিআর কর্মকর্তার সংখ্যা ৬৪ জন। যার মধ্যে সেনা অফিসার ছিল ২৮ জন, ১৩ জন যুদ্ধ করেছে, ২ জন বন্দি অথবা নিহত হয়েছেন, বাকিরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কিনা এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুবেদার ছিলেন ৩৬ জন, যার মধ্যে ৩২ জন যুদ্ধ করেছেন বাকিরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কিনা এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[৫]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইপিআর সেনাবাহিনী ছিল মাটির কাছাকাছি এবং জনগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেজন্য লক্ষ্য করা যায় ১২ হাজার ইপিআর সদস্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে প্রায় ৮০ ভাগই ছিল বাঙালি কিন্তু প্রত্যেকটি সেক্টরের ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই অধিনায়ক ছিলেন অবাঙালি অফিসার। পিলখানায় আড়াই হাজার বাঙালি ইপিআর ছিল কিন্তু বেলুচ রেজিমেন্ট তাদের অধিকাংশকেই নিরস্ত্র করে। ৭০০ বাঙালি সৈন্যকে হত্যা করা হয়। ৬০০ জন সিপাহী পালাতে সক্ষম হয়। বাকিরা বন্দি হয়ে যায়। সমগ্র বাংলাদেশে প্রধানত প্রতিরোধ যুদ্ধে ইপিআরের ভূমিকা উজ্জ্বল। তারা আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

২৩. এখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, সেক্টর-কমান্ডারগণ সেনাপ্রধানের সঙ্গে বসে নিজেরা নিজেদেরকে বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত করেছেন। উল্লেখিত ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর গেজেটে উল্লেখিত প্রদত্ত বীরত্তমদের যে তালিকা প্রদান করা হয়েছে যা পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হল, **(পরিশিষ্ট- ছ)** তারা কীভাবে কোথায় কোন অবস্থানে, কোন স্থান থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিধি অনুসারে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের পরাজিত করেছিলেন অথবা বৈরী পরিস্থিতির ভিতরে নিজের জীবন উৎসর্গ করে তার অধীনস্থ সেনাদের জীবন রক্ষার্থে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তা অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকবে।

২৪. লক্ষ শহীদ ও গেরিলা যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগকে স্বীয় মহিমাকীর্তনের জন্য কীভাবে তারা ব্যবহার করেছেন তারও অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ সৈনিক ও গেরিলা যোদ্ধারা যেভাবে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন, শহীদ হয়েছেন তাদের কয়জন বীরশ্রেষ্ঠ বা বীরউত্তম বা বীরবিক্রম কিংবা বীরপ্রতীকে ভূষিত হয়েছেন এ প্রশ্ন জাতির সামনে থেকেই যাবে এ কারণে যে ২৩ মার্চ ১৯৭৩ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম,এ,জি ওসমানী স্বহস্তে লিখিত 'My dear Bongobondhu' সম্বোধন পূর্বক একটি গোপনীয় পত্র লেখেন সেখানে মাত্র ১৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। বঙ্গবন্ধু ২৪ মার্চ তারিখে তা অনুমোদন করেন। **(পরিশিষ্ট- জ)** মুহাম্মদ লুৎফল হকের ধারণা যে প্রধান সেনাপতি চিঠির প্রাধিকারেই বর্ণিত ১৪ জনকে বীরউত্তম খেতাব প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তাদের এই খেতাব প্রাপ্তির বিষয়টি বোর্ডের কাছে প্রেরণ করার সুযোগ হয়নি এবং সাইটেশন নিরীক্ষা করার কোনও নজির পাওয়া যায়না। সেক্টর-কমান্ডরগণ বৈঠক করে নিজেদেরকে বীরউত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন। মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন সেনাপ্রধান। কিন্তু এই তালিকায় মেজর এম. এ জলিল সেক্টর ৯ এবং মেজর আবু ওসমান চৌধুরী সেক্টর ৮ তাদেরকে কেন বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়নি? নির্মম সত্য হলো বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম,এ,জি ওসমানী কোনো বীরত্বসূচক খেতাব বা মুক্তিযুদ্ধের কোনো খেতাব পাননি। এমনকি স্মারক পদকও পাননি।

২৫. পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালে ১৪ ও ১৭ জুলাই এবং ৮ই নভেম্বর ১৯৮০ সালে সরকারের বিবেচনার জন্য সুপারিশমালা তৈরী করেন। সুপারিশমালার প্রথমেই ক. বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব শুধুমাত্র ঘোষিত যুদ্ধে প্রতিরক্ষা বাহিনী সদস্যদের প্রদান করা যেতে পারে। খ. অন্যান্য খেতাব যুদ্ধ বা অন্যান্য কর্তব্য পালনকালে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রদান করা যেতে পারে। গ. অন্যান্য বাহিনীর সদস্যগণ প্রতিরক্ষা

বাহিনীর অধীনে কর্মরত থাকলে খেতাব পেতে পারে। এর অর্থ হলো প্রতিরক্ষাবাহিনীতে নাম অন্তর্ভুক্ত করেনি এমন হাজার হাজার গেরিলা বা অনিয়মিত বাহিনী যে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছিলেন তাদের উপেক্ষা করার নির্দেশ প্রদান। খেতাব প্রদানের জন্য সুপারিশমালার নিরীক্ষার জন্য ৩০ জুলাই ১৯৭১, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১, ৩১ অক্টোবর ১৯৭২ এবং মার্চ মাসে ১৯৭৩ সালে যে নিরীক্ষা বোর্ডগুলো গঠিত হয়েছিল তার সবটির প্রধান/চেয়ারম্যান সবাই ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা।[৬]

সাইটেশন ব্যতিরেকেই খেতাব

২৬. খেতাব প্রাপক কোন বীরত্বপূর্ণ ও সাহসিকতার জন্য বা কেন খেতাব পেয়েছে তার প্রমাণ হিসেবে খেতাবের সাইটেশনের একটি কপি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাপককে বা প্রাপকের উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হয়। "আমাদের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ খেতাবপ্রাপ্তের সাইটেশন নেই, তাই সাইটেশনের কপিও দেয়া সম্ভব হয়নি। এমনকি বীরশ্রেষ্ঠদের (একজন ব্যতীত) সাইটেশনও কোথাও সংরক্ষিত নেই। যাদের সাইটেশন সেনাবাহিনীতে মজুদ আছে তাদেরও সাইটেশনের কপি দেয়া হয়নি বা বেশীর ভাগের কাছে সাইটেশনের কোনো কপি নেই।"[৭] সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নাসিম বীরবিক্রম, সাবেক অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল মেজর আমিন আহমেদ চৌধুরী বীরবিক্রম এবং আরও কেউ কেউ এ সমস্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাইটেশন একত্র করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এ কাজটি সম্পূর্ণ হয়নি।

জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা

২৭. নিয়মিত বাহিনীর সদস্যগন ১৯৭৩ সালে খেতাব বিষয়ক গেজেট প্রকাশের পর দাপ্তরিক চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে তার খেতাবপ্রাপ্তি বিষয়ে অবগত হন। কিন্তু গণবাহিনীর সদস্যদের সরকারিভাবে খেতাবপ্রাপ্তির বিষয়টি অনেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত জানতে পারেননি। মুহম্মদ লুৎফল হক এরকম একটি উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, মৃত নিলমণি সরকার বীরবিক্রমের পিতা খেতাব প্রদানের ২৫ বছর পর ১৯৯৮ সালে প্রথম জানতে পারেন যে তার সন্তান একজন খেতাবপ্রাপ্ত বীর। মোসাম্মৎ তারামন বেগম (বিবি) বীরপ্রতীক গেজেট প্রকাশের ২২ বছর পর জানতে পারেন যে তিনি বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছেন। আজও বেশ কিছু খেতাবপ্রাপ্তের হদিস পাওয়া যায়নি। হয়তো তারা বেঁচে আছেন অজান্তে এবং জানেন না যে তারা খেতাবপ্রাপ্ত। হয়তো আর কোনোদিনই এ সমস্ত খেতাবপ্রাপ্তদের খোঁজ পাওয়া যাবে না। অজ্ঞাতেই থেকে যাবে বাংলাদেশের এ সমস্ত শ্রেষ্ঠ বীরেরা। তিনি আরো বলেছেন যে, সরকারের তরফ থেকে এই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া বীরদের খোঁজার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি। সেক্টর কমান্ডার বা সাব–সেক্টর কমান্ডারগণও খেতাবের জন্য নাম সুপারিশ করা ছাড়া এ বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অনেক সেক্টর কমান্ডার বা সাব সেক্টর কমান্ডাররা সুপারিশকৃতদের কখনও দেখেননি বলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বিশাল নেটওয়ার্কও এ সকল কাজকে গুরুত্ব দিয়েছে বলে মনে হয়নি। আমরা জাতির শ্রেষ্ঠবীরদের খামখেয়ালির মাধ্যমে হারিয়ে ফেলেছি। পৃথিবীর অন্য কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশেই বীরত্বসূচক খেতাবপ্রাপ্তরা এভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় না।[৭৮]

২৮. টাঙ্গাইলের কাদের বাহিনীর সদস্যদের বীরত্বসূচক খেতাবের জন্য একটি তালিকা ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সদর দপ্তর এফ জে সেক্টর, প্রযত্নে ৯৯ এ পি ও (ভারতীয় সেনাবাহিনী) থেকে সদর দপ্তর বাংলাদেশ বাহিনীতে প্রেরণ করা হয়। পত্রে স্বাক্ষর করেন বিগ্রেডিয়ার সান্ত সিং। খেতাব প্রাপ্তির জন্য পত্রের সাথে কাদের বাহিনীর ১৩৪ জনের একটি তালিকা সংযুক্ত ছিলো। পত্রে উল্লেখ ছিল যে কাদের বাহিনীর এ সমস্ত সদস্যদের সুপারিশনামা কাদের সিদ্দিকী লিখবেন। মার্চ ১৯৭২ সালে কাদের বাহিনীর সদস্যদের সুপারিশনামা ৩০ জুলাই ১৯৭১ তারিখে প্রচারিত সুপারিশনামা ফর্মের পরিবর্তে সাদা কাগজে বাংলায় হাতে লিখে পাঠানো হয়। কাদের বাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ কাদের সিদ্দিকীসহ কয়েকজনের সুপারিশনামায় বিগ্রেডিয়ার সান্ত সিং স্বাক্ষর করেন। বাকি সকলের সুপারিশনামায় কাদের সিদ্দিকী স্বাক্ষর করেন।[৯] সাদা কাগজে লেখার একটি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে যে খেতাব যোগ্য বীরদের নামের তালিকা পাঠানোর কর্ম বেসরকারিভাবে কাউকে দেয়া হয়নি।

২৯. বাংলাদেশ বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে যুদ্ধরত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে ব্যতিক্রমধর্মী বা অত্যন্ত অসাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরত্বসূচক খেতাব দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক নেতাসহ বিভিন্ন বেসামরিক সূত্র থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পত্র মারফত কিছু কিছু নিয়মিত বা গণবাহিনীর সদস্যদের খেতাব প্রদানের জন্য সুপারিশ বা আবেদন বাংলাদেশ বাহিনীতে প্রেরণ করা হয়।[১০]

উপেক্ষিত বীরত্ব

৩০. সামরিক ও বেসামরিক উভয় কারণে এই বেসামরিক খেতাব প্রদান করা হয়েছে। 'স্বাধীনতা পুরস্কার' শুধুমাত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য। স্বাধীনতা পুরস্কারের নির্বাচন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রক্রিয়া করা হয়। স্বাধীনতা পুরস্কারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী দিয়ে থাকেন। এই পুরস্কার জীবিত ও মৃত উভয়েই পেতে পারে। সাধারণত প্রধানমন্ত্রী প্রাপক বা প্রাপকের বৈধ প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারীকে পদক প্রদান করেন।[১১] বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা জীবনের মেধা, মনন, সময় এবং অগ্নিসংগ্রামের সংগঠক তাদের কোনো পুরস্কার সম্মান বা পদক দেয়া হয়নি অর্থাৎ যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের বিভিন্নভাবে অসম্মান ও উপেক্ষা করা হয়েছে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যে সকল জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও শ্রেণী-পেশার মানুষ যাদের সম্পদ ধ্বংস করেছে, ফাঁসির রশিতে ঝুলানোর জন্য সামরিক ফরমান জারী করেছে তাদেরকে উপেক্ষা করা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকেই অসম্মান করা- এই সহজ সত্যটি অনুধাবন করার সময় এসেছে।

৩১. ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা কেন?

বাংলাদেশ সরকার বা ব্যক্তি উদ্যোগে প্রায় দুশো'টি ট্রানজিট ক্যাম্প বা যুব অভ্যর্থনা কেন্দ্র ছিল। এগুলো স্বাভাবিকভাবেই পরিচালিত হতো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশেও তাই ছিল। সেই সব ক্যাম্পে কোন তরুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবক কবে এসেছেন, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কিনা অথবা কবে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরিত হয়েছেন তার নাম তালিকা প্রায়শ লিপিবদ্ধ থাকতো। লেখকের পরিচালিত কুরমাইল ক্যাম্পে এরকম তালিকা সংরক্ষণ করা হতো। গ্রন্থকার রৌমারী ক্যাম্পে গিয়ে দেখেছেন প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থাদি চালু ছিল। এমনকি জুলাই, আগস্ট মাস থেকে কিছু কিছু যুব-ক্যাম্পে মুজিবনগর সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে অবস্থান করতেন। তাছাড়া কলকাতা মুজিবনগর অফিস থেকে প্রতি মাসে একজন কর্মকর্তা এসে ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করতেন, সুবিধা-অসুবিধা দেখতেন এবং মাথাপিছু যৎ সামান্য অর্থ বরাদ্দ করতেন। কলকাতায় যারা কেন্দ্রীয়ভাবে যুব ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাদের নিকট সম্ভবত প্রতিটি ক্যাম্পের নাম, প্রশিক্ষণের জন্য যুবকদের সংখ্যা অবশ্যই সংরক্ষিত থাকার কথা। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে যুব ক্যাম্প পরিচালনার জন্য যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল বলতে গেলে তা ছিল 'অকেজো'। যারা যুব ক্যাম্প পরিচালনা করতেন তাদের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির অহেতুক বাস্তবতা বর্জিত প্রেরিত কাগজপত্রের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিলনা।

মুক্তিযুদ্ধের তালিকা প্রণয়নের সময় যারা ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাদের কারো সাথে আলোচনা, পরিসংখ্যান, নাম পরিচয় নেয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে কলকাতায় যুব-ক্যাম্পের কর্মকর্তাদের অধিকাংশ একটি আমলাতান্ত্রিক মন মানসিকতা নিয়ে কার্যক্রম করেছেন- বলতে গেলে ঘরে বসে তারা 'কামান' দেগেছেন। বেহাল ও এলোমেলোভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। স্বাধীনতার পর মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনী দুটি বাহিনীই তাদের অধীনে প্রশিক্ষিত বা যুদ্ধরত গেরিলাদের সার্টিফিকেট দিয়েছে। মুজিব বাহিনীর সার্টিফিকেট প্রদান বা নিয়মিত বাহিনীর সার্টিফিকেট কোনোটিই নির্ভুল বা সঠিক পদ্ধতি অনুসারে করা হয়েছে তা বলা যাবেনা।

প্রথম তালিকা হয় সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুজিবনগর সরকারের ৫ জনের নাম লিপিবদ্ধ আছে। লক্ষ্যণীয় মুজিবনগর তালিকায় যাদের নাম পাওয়া যাচ্ছে তারা মুজিবনগর অফিসে বসে কাজ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি। বলতে গেলে তারা চেয়ার টেবিলের লোক। এভাবে প্রথমে ৫০৩ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। আরো বিস্মিত হতে হয় মুজিবনগর তালিকায় ৩নং ক্রমিকে তাজউদ্দিন আহমদের নাম আবার ৩৩৮ নম্বরে উল্লেখিত আছে। তেমনিভাবে এর প্রথম ক্রমিক নং যথারীতি ২ এবং আবার ২২৭নং ক্রমিকে উল্লেখিত আছে। গ্রন্থকারের নাম মুক্তিযুদ্ধের অন্যস্থানে রয়েছে ৫১ নং ক্রমিকে। সতর্ক ও সচেতনভাবে তালিকা করার নমুনা দেখে বোঝা যায় এটি করা হয়েছে অযত্নে ও অশুদ্ধভাবে। অথচ ২০০৪ সালের ১১ মার্চ গেজেটে 'নির্ভুল ও সঠিকভাবে' চূড়ান্তকরণের কথা বলা হয়েছে। এত অবহেলা, অযত্ন, অসর্তকতা কোনো দেশের মুক্তিযোদ্ধা তালিকা প্রণয়নে হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। এক্ষেত্রে মুহম্মদ লুৎফুল হক লিখিত *স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব* শীর্ষক বই পড়লে গ্রন্থকারের এই মন্তব্য প্রমাণিত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্ষেত্রে বীরউত্তম খেতাব প্রাপ্ত বা বীরবিক্রম খেতাব প্রাপ্ত কোনো গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনীর মধ্যে থেকে কাউকে চেয়ারম্যান বা সদস্য করা হয়নি। সেজন্য গেরিলা বাহিনীদের বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ সামরিক অধিকর্তাগণ 'নিজেরাই হজম' অথবা অবহেলা করেছেন। এছাড়াও যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, যারা জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন সেইসব বেসরকারি ব্যক্তি বা গেরিলাদের এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা পুরস্কার বা কোনো সম্মানজনক পদকে ভূষিত করা হয়নি। কিন্তু যারা বীরউত্তম খেতাব পেয়েছেন তাদের কেউ রণাঙ্গনে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কিনা এ প্রশ্নের মুখোমুখি আজ না হোক কাল না হোক পরশু হতে হবে।

টীকা

১. Moinul Hussain Choudhury, The Silent Witness by a General first decade of independence- "There a few sector comenders together made list of medals for Gallentry" page-48

২. ঐ " The reason was that all Sector Commender were invested with Beer Uttam, the Highest title for survivors when the reality was that nost sector commanders were headquartered in the interior of India and they sat out the nine Months of the war there. Where had they shown their gallantry?" page- 48

৩. ঐ " I apprised the Prime Minister about the matter in details. Immediately he issued a directive to cancel the list. This order of cancellation was published in the newspapers on the next day. But a few days later, the Cancellation order was superseded and the list of awards was upheld. page-49.

৪. এ,এস,এম শামসুল আরেফিন মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, পৃ: ৬-১৪

৫.ঐ, পৃ-১৪-২১

৬. মে ১৯৭১-এ গৃহীত খেতাব বিষয়ে অসম্পূর্ণ থাকায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বাহিনীর জন্য খেতাব ও পদক বিষয়ে নিচের অফিসারদের সমন্বয়ে একটি পর্ষদ গঠন করা হয়: লেফটেনেন্ট কর্নেল এম এ রব, উইং কমান্ডার ইসলাম, মেজর আবদুস সালেক চৌধুরী, স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ, মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান।*

খ. ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তে বীরত্বসূচক খেতাব স্বাধীনত যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাসমূহে দেয়া হবে কিনা তা স্পষ্ট ছিলো না, ফলে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সকল বাহিনীর জন্য যুদ্ধে খেতাব প্রদান বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ছিলো নিম্নরূপ: সেনাবাহিনী প্রধান- আহ্বায়ক, নৌবাহিনী প্রধান-সদস্য, বিমান বাহিনী প্রধান-সদস্য, মহাপরিচাল (বিডিআর)-সদস্য, আইজি (পুলিশ)-সদস্য, পরিচালক (জাতীয় রক্ষীবাহিনী)-সদস্য।*

গ. ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে খেতাব বিষয়ক কমিটি সংশোধন করে নিচের কমিটি গঠন করা হয়: উপ প্রধান, সেনাবাহিনী- আহ্বায়ক, নৌ বাহিনী প্রধানের মনোনীত প্রতিনিধি-সদস্য, বিমান বাহিনী প্রধানের মনোনীত প্রতিনিধি-সদস্য, ডিজি, বিডিআর বা তার মনোনীত প্রতিনিধি-সদস্য, আইজি, পুলিশ বা তার মনোনীত প্রতিনিধি- সদস্য।*

*সূত্র: মুহাম্মদ লুৎফল হক, স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব।

৭. মুহাম্মদ লুৎফল হক, স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব, পৃ: ৭৩-৭৪

৮. ঐ, পৃ: ৭৯

৯. ঐ, পৃ: ৪৮

১০. ঐ, পৃ: ৪৮

১১. ঐ, পৃ: ৯০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়: পরিশিষ্ট- এক

ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণপরিষদের সদস্যপদ থেকে বাতিলের বিল উত্থাপিত হলে তিনি ১৯৪৯ সনে যে বক্তব্য পেশ করেন তার অংশবিশেষ।

Huseyn Shaheed Suhrawardy's speech in the Constituent Assembly of Pakistan after being unseated, March 1949.

"H.S. Suhrawardy: Mr. Chairman, it is not, Sir, given to everyone in this life to be present at one's obsequies, or to participate in an oration at his own funeral. This is too good an opportunity for me to let pass without making a statement on the floor of this House, which perhaps may be the last.

Sir, it has been said that these amendments to the rules- fairly intelligible to ordinary human beings but rendered unintelligible to the Pakistan Government and requiring further education- that these amendments have been proposed for the purpose of eliminating such a humble person as myself from the Constituent Assembly. Sir, I refuse to give credence to such a statement. I cannot conceive, Sir, that a state that hopes to be the premier Islamic State of the world, in which there will be justice and toleration, will move its legislative machinery, its party machinery, its government, its party discipline, for the purpose of eliminating a person whose sole crime was to plead for the cause of the minorities on the Floor of this House, whose sole crime was to direct the attention of the Pakistan Government to its responsibilities towards its own minorities and the attention of the Indian Union Government to its responsibilities towards its minorities: whose further crime it was to plead for a better relationship between the two Dominions. I cannot conceive, Sir That the Pakistan Government could act in this manner for the purpose of eliminating such a person."

খ) এম. কে. গান্ধী প্রথম দিকে অখণ্ড বাংলার পক্ষে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাংলা বিভাগের পক্ষে মত দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

M.K. Gandhi's letter on the unity of Bengal to Sarat Chandra Bose, June 8, 1947.

My dear Sarat,

I have gone through your draft. I have now discussed the scheme roughly with Pundit Nehru and Sardar (patel). Both of them are dead against the proposal and they are of opinion that it is merely a trick for dividing Hindus and Scheduled Caste leaders, With them it is not a suspicion but almost a conviction. They feel also that money is being lavishly expended in order to secure schedule Caste votes. If such is the case you should give up the struggle at least at present. For the unity purchased by corrupt practices, would be worse than a frank partition, it being a recognition of the established division of hearts and they unfortunate experiences of Hindus. I see also that there is no prospect of a transfer of power outside the two parts of India. Therefore, whatever arrangement is come to, has be arrived at by a previous agreement between the congress and the League. This as far as I can see, you cannot obtain. Nevertheless, I would not shake your faith unless it is founded on shifting sand consisting of corrupt practices and trickery alluded to above. If you are absolutely sure that there is no warrant whatsoever for the suspicion and unless you get the written assurance of the local Muslim League suppo0rted by the Centre, You should give up the struggle for unity of Bengal and cease to disturb the atmosphere that has been created for partition of Bengal.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক) ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ কর্তৃক লিখিত লিপি।

The Rt. Hon. Sir Edward Heath, K.G., M.B.E., M.P.

HOUSE OF COMMONS

April 1996

Twenty-five years ago, on 26 March 1971, Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the 'sovereign independent people's republic of Bangladesh'. Although it took almost a year of fighting before the Bangladeshi state could be formally established, the proclamation of 26 March began the struggle for independence and it is therefore justly celebrated by Bengali people around the world as a great event.

As Prime Minister of the United Kingdom at the time, I recognized that, unlike some other self-determination movements, the struggle for Bangladeshi independence was a genuinely democratic movement, commanding the support of almost all Bengali people, which was not in any way incited or inspired by the Communist bloc. I therefore supported the Bengali people in their struggle, worked for the release of Sheikh Mujibur Rahman and helped gain international recognition of Bangladesh.

A quarter of a century later, I have no doubt that I did the right thing. Bangladesh has faced many problems as a nation-political, economic and natural-but it has weathered the storms and there is no reason why the Bangladeshi people should not now enjoy the economic growth and political stability they deserve.

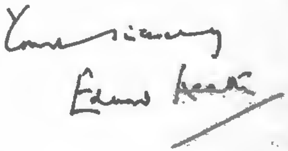

The historic letter about the Declaration of Independence of Bangladesh written by Sir Edward Heath, Prime Minister of the United Kingdom during the liberation war

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রেরিত গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট।

DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY

OPERATIONAL INTELLIGENCE DIVISION

DI-2

DIA SPOT REPORT

WHITE HOUSE SITUATION ROOM

'71 MAR 26 PM 3 55

DATE: 26 March 1971

TIME: 1430 EST

SUBJECT: Civil War in Pakistan

REFERENCE:

1. Pakistan was thrust into civil war today when Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the east wing of the two-part country to be "the sovereign independent People's Republic of Bangla Desh." Fighting is reported heavy in Dacca and other eastern cities where the 10,000 man paramilitary East Pakistan Rifles has joined police and private citizens in conflict with an estimated 23,000 West Pakistani regular army troops. Continuing reinforcements by sea and air combined with the government's stringent martial law regulations illustrate Islamabad's commitment to preserve the union by force. Because of logistical difficulties, the attempt will probably fail, but not before heavy loss of life results.

2. Indian officials have indicated that they would not be drawn into a Pakistani civil war, even if the east should ask for help. Their intentions might be overruled, however, if the fever of Bengali nationalism spills across the border.

3. Sheikh Mujibur Rahman is little interested in foreign affairs and would cooperate with the United States if he could. The west's violent suppression, however, threatens to radicalize the east to the detriment of US interests. The crisis has exhibited anti-American facets from the beginning and both sides will find the United States a convenient scapegoat.

DISTRIBUTION:

White House Sit Room (LDX)
Dept of State RCI (LDX)
Dir of CIA Opns Cen (LDX)
Sec Def
Dep Sec Def
Asst Sec Def, ISA
Asst Sec Def, PA
Asst Sec Def, ADMIN
Chairman, JCS (CAPT TRAIN)
Chairman, JCS (Mr. KEARNEY)
Asst to Chairman, JCS
Dir, Joint Staff
Dir, J-3
Dir, J-5
JCS (ACSAN) Rm 1D922

RELEASED BY: JOHN J. FAVELLS, JR.
Captain, USN
DI-4/71504

PREPARED BY: JOHN B. HUNT
Major, USA
DI-4A3/25009

DECLASSIFIED
E.O. 12958, Sec. 3.6
DIA Review
By [illegible] NARA, Date 7-19-00

MMR JALAL

CONFIDENTIAL NO FOREIGN DISSEM

গ) ২৬ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং অভিযোগ করেন মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করতে চেয়েছেন। তিনি ঐ ভাষণে আরো বলেন, মুজিব ও তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু। ইয়াহিয়া খানের ভাষণ উদ্ধৃত করা হল:

২৬ মার্চ ১৯৭১
প্রিয় দেশবাসী
আসসালামু আলাইকুম,
এ মাসের ৬ তারিখে আমি জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের নতুন তারিখ ২৫ মার্চ ঘোষণা করেছিলাম। আমার আশা ছিল নির্ধারিত তারিখে অধিবেশন বসার পরিবেশ অনুকূল হবে। কিন্তু ঘটনাবলি সে আশা পূর্ণ করেনি। জাতি গভীর সঙ্কট মোকাবেলা করে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছে এবং পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে। ঘটনাবলি খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে এবং যত শিগগির সম্ভব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা অবশ্যই জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। এ উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আমার অনেকবার সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে ১৫ মার্চ আমি ঢাকা গমন করি। আপনারা সকলে জানেন যে, রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনার পর একইভাবে সেখানে আলোচনার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়, যাতে সর্বজন গ্রহণযোগ্য বিষয় চিহ্নিত করে একটি সমঝোতায় পৌঁছা যায়।

আমার সাথে শেখ মুজিবের আলোচনার কিছু অগ্রগতি হয়েছে তা সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার আলোচনা একটি পর্যায়ে পৌঁছালে আমি প্রয়োজন মনে করলাম যে, ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনা করা উচিত। জেড এ ভুট্টো ২১ মার্চ সেখানে পৌঁছালে তাঁর সাথে আমাদের একাধিক আলোচনা হয়। আপনারা জানেন, আওয়ামী লীগের নেতারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়। আমার আলোচনাকালে তিনি প্রস্তাব করেন যে, অন্তর্বর্তী ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে হবে এবং জাতীয় পরিষদে দুটি কমিটি হবে-একটি কমিটি গঠিত হবে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের দ্বারা এবং আর একটি গঠিত হবে পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের নিয়ে।

এই পরিকল্পনায় আইনগত অন্যান্য বিষয়ে গুরতর অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও শান্তি পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বার্থে আমি নীতিগতভাবে একটি শর্তে এ প্রস্তাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমি শর্তগুলো শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলাম যে, সকল রাজনৈতিক দলের আমার সাথে এ পরিকল্পনায় ঐকমত্য পোষণ করতে হবে। তারপর আমি অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করলাম। ঘোষণার কোনো আইনগত ভিত্তি থাকবে না- এ ব্যাপারে তাঁদের একমত পোষণ করতে দেখলাম। তাতে সামরিক আইনের আবরণও থাকবে না, অন্যদিকে জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে করা হয়েছে-তাও বলা যাবে না। ফলে এক শূন্যতার সৃষ্টি হবে এবং নিশ্চিত একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলযোগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। তাঁরা আরও মনে করেন যে, ঘোষণার দ্বারা জাতীয় সংসদকে দুভাগ করলে তা বিভক্তিকে উৎসাহিত করবে। সুতরাং তাঁরা মত প্রকশ করেন যে, যদি অন্তর্বর্তীকালে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয় তাহলে জাতীয় সংসদ অধিবেশন ডাকতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালে জন্য সঠিক শাসনতন্ত্র বিল পাশ করে আনার সম্মতির জন্য পেশ করতে হবে। আমি তাঁদের মতের সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করেছি এবং তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

আমি নেতাদের তাঁকে বোঝাতে বলেছি যে, একটি পরিকল্পনা দ্বারা এদিকে আপনি সকল ক্ষমতা- যথা সামরিক আইন তুলে নিতে বলেছেন অন্যদিকে জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার দ্বারা তা পূরণে ব্যর্থতার ফলে গোলযোগ সৃষ্টি হবে। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং জাতীয় সংসদ থেকে সৃষ্ট ক্ষমতার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থায় তার সম্মতি আদায় করার জন্য চেষ্টা করবেন।

শুরু থেকে শেখ মুজিবের জাতীয় সংসদকে দুভাগ করার প্রস্তাবে রাজনৈতিক নেতারা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, এ পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের অখন্ডতার বিরুদ্ধে যাবে। আমার, ভুট্টো এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনাকালে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান তার নিকট একটি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সেখানে নেতারা শেখ মুজিবের নিকট আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন। তাঁরা ২৩ মার্চ বিকেলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে সংবাদ দেন যে, তাঁর (শেখ মুজিব) পরিকল্পনার কোনো পরিবর্তন করতে তিনি সম্মত নয়। তিনি আমার নিকট যা চেয়েছেন তা হলো আমি ঘোষণা দিয়ে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করি।

শেখ মুজিবর রহমানের অসহযোগ আন্দোলন হলো দেশদ্রোহী। তিনি ও তাঁর দল বৈধ কর্তৃপক্ষকে তিন সপ্তাহব্যাপী উপেক্ষা করেছেন। তারা পাকিস্তানের পতাকাকে তিরস্কার করেছে এবং জাতির জনকের ছবি কলঙ্কিত করেছে। তারা বিকল্প সরকার পরিচালনার চেষ্টা করেছে-তারা গন্ডগোল, ভীতি এবং নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করেছে। আন্দোলনের ফলে অনেককে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের মিলিয়ন মিলিয়ন বাঙালী ভাই এবং যারা পূর্ব পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করেছে তারা জীবনের ভয়ে সে অঞ্চল ত্যাগ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী সকল প্রকার তিরস্কার ও টিটকারির শিকার হয়েছে। প্রচন্ড উস্কানি সত্ত্বেও তারা অসম্ভব ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে- এজন্য তাদের আমি প্রশংসা করছি। তাদের শৃঙ্খলাবোধ বাস্তবিক প্রশংসার দাবি রাখে। আমি তাদের জন্য গর্বিত।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল; কিন্তু আমি পরিস্থিতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছি যাতে আমার শান্তি পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা রুদ্ধ হয়ে না যায়। এ লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে আমি অবৈধ কাজ একের পর এক সহ্য করেছি। একই সময় একটি যুক্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছার জন্য সকল সম্ভাবনাময় পথের সন্ধান করেছি। আমি যেসকল চেষ্টা করেছি তা রাজনৈতিক নেতারা- যেমন মুজিবুর রহমানকে যুক্তি দেখাবার জন্য যা করেছে তার উল্লেখ করেছি। আমার কোনো চেষ্টা অবশিষ্ট রাখিনি। কিন্তু তিনি কোনো গঠনমূলক কাজে সাড়া দিতে ব্যর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছেন। অন্যদিকে তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা সরকারের কর্তৃত্বকে এমনকি ঢাকায় আমার উপস্থিতিকালে উপেক্ষা করে আসছে। তিনি যে ঘোষণার প্রস্তাব করেছেন তা একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি জানতেন, যে-দলিল লেখা হবে তার কোনো মূল্য নেই। তিনি জানতেন যে, সামরিক আইন তুলে নিয়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে সেখানে কোনো প্রকার শাস্তি ছাড়া তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারবেন। তাঁর একগুঁয়েমি, দুর্দমনীয়তা এবং যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতিতে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব এবং তা হলো এই লোকটি এবং তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু এবং তারা পূর্ব পাকিস্তানকে দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে চায়। তিনি এদেশের সংহতি ও অখন্ডতাকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর অপরাধের জন্য অবশ্য তাঁকে

শাস্তি পেতে হবে। ক্ষমতালোভী এবং দেশপ্রেমহীন একদল নেতাকে এদেশকে ধ্বংস করতে এবং ১২০ মিলিয়ন মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলতে দেয়া যাবে না।

৬ মার্চ জনতার উদ্দেশে ভাষণে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্তব্য হলো পাকিস্তানের সংহতি, অখন্ডতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আমি তাদের দায়িত্ব পালনের এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছি। দেশে বিরাজমান সঙ্কটময় পরিস্থিতির কারণে আজ আমি সারাদেশে রাজনৈতিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হলো রাজনৈতিক দল হিসেবে এ দলকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো। আমি সংবাদপত্র সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করছি। এসকল সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শীঘ্রই সামরিক বিধি জারি করা হবে।

সবশেষে আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে আমার উদ্দেশ্য একই রকম বহাল থাকবে। যখনই পরিবেশ অনুকূলে আসবে তখন এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নব উদ্যোগ গ্রহণ করব। আমি আশা করি শীঘ্র পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে এবং আমরা পুনরায় আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যাত্রা করতে পারব।

আমি আমার দেশবাসীকে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য অনুরোধ করছি। এজন্য পাকিস্তানবিরোধীরা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দোষী। দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে কাজ করার জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি। কারণ সেখানে নিরাপত্তা ও যুক্তি নিহিত আছে।

খোদা সহায় হোক, খোদার আশীর্বাদ আপনাদের জন্য।

পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক) প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন বরাবর ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের লিখিত পত্র। সূত্র: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তারিখ ১২ নভেম্বর ১৯৭১।

Mr. Prime Minister, .

I write this note you today out of a despondent mood which has been clouding my thoughts for last several weeks. After more than 7 months of my efforts to help the Bangladesh cause it may perhaps appear to be odd to address you. But my sense of duty dictates me to inform you that I have been psychologically persecuted without any reason whatsoever. For your record and necessary action I put down very briefly the facts as follows:

(1) I left Dacca towards the end of March and after spending about 3 weeks on the eastern side came down to Calcutta on April 19, 1971. It was my commitment to the cause of an Independent Bangladesh rather than the fear of Pakistani army that brought me down here. You, your colleagues and the Awami League party are aware of the humble contribution I made during the trial of Sheikh Muhibur Rahman in the Agartala conspiracy case and during the time of Round Table Conference of 1969 and thereafter.

(2) Soon after I arrived I devoted myself to work for the cause of our liberation through the functionaries of the government of Bangladesh. As at the beginning the only surface activities were conducted from the Mission, I associated myself with it to render my services to the best of my ability. Because of the circumstances, there was no sufficient machinery for the work that was necessary in the diplomatic and public relations front. I tried to narrow the gap and fill the vacuum whenever it was necessary. I drafted letters, prepared instructions for the organizations abroad, prepared briefings for different dignitaries, briefed foreign correspondents and visitors, compiled facts and documents of Bangladesh movement and many other pieces o work in different spheres at different times.

(3) On many occasions I submitted different schemes and plans to develop our Foreign Office and the External Publicity Machinery to strengthen our diplomatic efforts abroad. My personal contact and friendship with a good many international Journalists paid a very rich dividend for our cause. Whenever I have spoken I tried my best vindicate our cause and the importance of our leadership with a background to the role of Awami League and Sheikh Mujibur Rahman.

(4) After Mr. Alam took over as the Foreign Secretary I also tried to be cooperative as much as possible and rendered all possible assistance to him and to all others working in the Mission. I have also always extended my fullest assistance to Mr. Hossain Ali on different matters whenever it was demanded of me. Many things I have done going out

oOf my own way only to strengthen our cause and there are countless small things which I have done in the Mission. On my submission the concept of which I developed and now it is working reasonably well. An English Bulletin called `Bangladesh' is also coming out regularly every week from this Division. I submitted a comprehensive scheme for this Division in order to make it more effective to achieve our ultimate objective.
(5) During all this time not even for a moment it occurred to me that my contribution was not necessary or for that matter to work for the cause of Bangladesh I needed my formal or official position. But in order to work more effectively I thought the distribution of work could be made in the Foreign Office so that what exactly I should do. This would have helped me to be more creative and vigorous in performing my responsibility. At this time the foreign secretary informed that there was difficulty in formalizing my position. On hearing this I met the Foreign Minister for the first time in the last week of July. The Minister was very kind to me and praised me for all the work I was doing but told me that there were difficulties from other quarters about my holding any responsibility officially. He however consented to my continuing the work quietly on the voluntary basis as before.
(6) SO I continued to work as a volunteer in the Foreign Office, as my main purpose was to serve the cause of our people. The foreign Minister was however kind to grant a little subsistence allowance with effect for August, if I required.
(7) In the meantime however, two publications compiled and prepared by me came out from the External Publicity Division. One "Bangladesh- Contemporary events and documents" and the other was "Bangladesh- from Autonomy to Independence" (Word press commentary). In the first one the publicity Division was kind to mention my name although I agreed originally not for such naming.
(8) This position, although I did not mind personally, was however insulting and humiliating. I was gradually realizing that I was not allowed to function effectively. It was also embarrassing in dealing with large number of foreign correspondents and other dignitaries and also in entering into correspondence etc.
(9) All this time it has been conveyed to me through various sources and particularly6 the Foreign Office that there is objection from your si9de in my working for the cause of Bangladesh. Finding this situation humanly intolerable and politically most unfortunate I meet the Foreign Minister again last week. He advised me to discuss this matter with you and the acting president and assured me that this undesirable situation could be changed if only you and the acting president consented to allow me to work more effectively. When I

discussed this matter with the Acting president he was sorry to9 hear all these and advised me to take this matter up with you also.

May I here make it absolutely clear, Mr. Prime Minister that I would be only delighted to continue my work as a volunteer provided my responsibility is defined. I have already expressed my desire to contribute in my little way as much as possible to strengthen the Governments hand in our liberation struggle and in representing our cause in a better and effective manner.

I hope you will take an immediate action in this respect. I may continue to work in the Foreign Office or in the Planning Commission or in any other front as you would consider suitable for me

(Your faithfully)
(Moudud Ahmed)
Barrister-at-Law
Dt. 12/11/71

1. Prime Minister
Copy to:
2. The Acting president
3. Foreign Minister

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লে. জে. টিক্কা খান সামরিক আইনে অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও বিচারপ্রতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ।

ক) পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা লেঃ জেঃ টিক্কা খান ঢাকা, বাকেরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের পাঁচ ব্যক্তিকে আগামী ২৬ এপ্রিল সকাল ৮ ঘটিকায় ঢাকাস্থ দ্বিতীয় রাজধানীতে এক নম্বর সেকটরের সামরিক আইনের সাব-এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নিকট হাজির হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তারা হলেন:

১। জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, ৭৫১, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, সাত মসজিদ রোড ঢাকা। ২। জনাব তোফায়েল আহমদ, গ্রাম-কোরালিয়া, পোঃ– খৈয়ার হাট, জেলা– বাকেরগঞ্জ। ৩। জনাব এস, এম, নজরুল ইসলাম, লাঙ্গুল শিমূল , পোঃ কান্দানিয়া, জেলা- ময়মনসিংহ। ৪। জনাব আবদুল মান্নান, মনসুর ভিলা, ১১০ সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা। ৫। জনাব আবিদুর রহমান, স্বত্বাধিকারী, দি পিপলস, ঢাকা। উপরোক্ত ৫ ব্যক্তিকে পাকিস্তান দন্ডবিধির ১২১, ২২৩ক, ১৩১ ও ১৩২ নং ধারা এম এল আর ৬,১৪,১৭ ও ২০ এম এলও 'খ' অঞ্চলের ১২৪ নং এবং ১২৯নং ধারা বলে আনীত অভিযোগ করা হয় । এদের সকলের বিরুদ্ধে এই সব ধারা বলে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৫নং অভিযুক্তকে (আবিদুর রহমান) 'খ' অঞ্চলের এম এলও র ১১৭ এবং ১১৯ নং ধারার সাথে পঠিত এম এল আর ১৯ নং ধারা বলে আনীত অভিযোগের জবাব দেবার নির্দেশ জারি করা হয়।

AMARBOI.COM

খ) লে. জে. টিক্কা খান সামরিক বিধি ও পাকিস্তান দন্ডবিধি অনুসারে আনীত অভিযোগের জবাব দেবার উদ্দেশ্যে আগামী ২২ আগস্ট সকাল ৮টায় ২নং সেক্টরের উপ-সামরিক শাসনকর্তার নাটোরস্থ আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ১৪জন নির্বাচিত এম,এন,এ কে নির্দেশ দেন। সামরিক শাসকর্তার সদর দফতর থেকে প্রকাশিত এক নোটিশ একথা জানানো হয়েছে। হাজির না হলে ৪০নং সামরিক বিধিবলে তাদের অনুপস্থিতিতেই তাদের বিচার করা হবে। তারা হলেন:

১। রিয়াজুদ্দিন আহমদ, থানা-কুড়িগ্রাম, জেলা-রংপুর। ২। মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, কোতোয়ালী, জেলা-দিনাজপুর। ৩। আবদুর রউফ, মির্জাগঞ্জ, রংপুর। ৪। মতিউর রহমান, থানা-পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর। ৫। মফিজ আলী মোহাম্মদ চৌধুরী, জয়পুরহাট, জেলা-বগুড়া। ৬। মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, থানা-ঠাকুরগাঁও, জেলা দিনাজপুর। ৭। শাহ মাহতাব আহম্মদ, থানা- চিরির বন্দর, জেলা-দিনাজপুর। ৮। মজিবুর রহমান, থানা- আদমদীঘি, জেলা-বগুড়া। ৯। মোতাহার হোসেন তালুকদার, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। ১০। আবদুল আওয়াল, হারাগাছা, রংপুর। ১১। আবদুল মমিন তালুকদার, থানা- বেলকুচী, জেলা পাবনা। ১২। আবু সাইয়িদ, থানা-বেড়া, জেলা- পাবনা। ১৩। এ,বি,এম, মকসেদ আলী, থানা-বোচাগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর। ১৪। প্রফেসর মোঃ ইউসুফ আলী, পিতা- মোঃ গফির উদ্দীন, থানা- বিরোল, জেলা-দিনাজপুর।

আরো ১৬. জন এম এন এদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হতে বলা হয়েছে।

১। আতোয়ার রহমান তালুকদার, থানা-বদলগাছি, জেলা- রাজশাহী ।২। মোঃ বয়তুল্লাহ, পোঃ- নওগাঁ, রাজশাহী ।৩। খালিদ আলী মিয়া, পোঃ-আলীনগর, রাজশাহী। ৪। শাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোঃ জাফরুল্লাহ, থানা-বাগমারা, রাজশাহী। ৫। এ এইচ এম কামরুজ্জামান, পোঃ-বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ৬। আমিরুল ইসলাম, পোঃ-ইমানপুর, জেলা- কুষ্টিয়া। ৭। আজিজুর রহমান আক্কাস, থানা-দৌলতপুর, কুষ্টিয়া। ৮। আবু আহমদ আফজালুর রশিদ, থানা-আলমডাঙ্গা, কুষ্টিয়া। ৯। কামরুজ্জামান, থানা-ঝিনাইদহ, যশোর। ১০। ইকবাল আনোয়ারুল ইসলাম, থানা-ঝিনাইদাহ, যশোর। ১১। সুবোধ কুমার মিত্র, থানা-কেশবপুব, যশোর। ১২। খোন্দকার আবদুল হাফিজ, থানা-নড়াইল, যশোর। ১৩। সোহরাব হোসেন, পোঃ-মাগুরা, যশোর। ১৪। এম, রওশন আলী, পোঃ পারা, যশোর। ১৫। মোহাম্মদ মহসীন, এম,টি রোড, খুলনা। ১৬। মহিউদ্দীন, মেহেরপুর টাউন, কুষ্টিয়া।

আরো উনত্রিশজন এম এন এ কে হাজিরের নির্দেশ। তারা হলেন, ১। আবদুল হামিদ, থানা-মোহনগঞ্জ, ময়মনসিংহ। ২। আবদুল হামিদ, পো.- আ. নিখ ধামপাড়া, ময়মনসিংহ। ৩। মো. আ. হাকিম, থান-জামালপুর, ময়মনসিংহ। ৪। জিল্লুর রহমান, থানা-ভৈরব, ময়মনসিংহ। ৫। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, থানা-কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। ৬। মওলবী হুমায়ুন খালিদ, থানা–ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। ৭। শামসুর রহমান খান, থানা-ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। ৮। কে, এম ওবায়দুর রহমান, থানা-নগরকান্দা, ফরিদপুর। ৯। মোল্লা জালাল উদ্দিন, থানা-গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর। ১০। শামসুদ্দিন মোল্লা, থানা-নগরকান্দা, ফরিদপুর। ১১। এম, এ, গফুর, ধর্মসভা ক্রস রোড, খুলনা শহর। ১২। শেখ আবদুল আজীজ, থানা-কোতয়ালী, খুলনা। ১৩। নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, বাগুরারোয়া, বরিশাল। ১৪। আবদুল মান্নান হাওলাদার থানা-বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। ১৫। আবদুর রব সেরনিয়াবাত, থানা-গৌরনদী, বরিশাল। ১৬। এনায়েত হোসেন খান, শেহানগল, বাকেরগঞ্জ। ১৭। তাহেরুদ্দীন ঠাকুর, থানা-সরাইল, কুমিল্লা। ১৮। আলী আজম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা। ১৯। আবদুস সামাদ, থানা- জগন্নাথপুর, সিলেট। ২০। আবদুর রব, পো. খাগুড়া, সিলেট। ২১। মুস্তফা আলী, হবিগঞ্জ, সিলেট। ২২। লুৎফর রহমান চৌধুরী (মানিক), হবিগঞ্জ, সিলেট। ২৩। দেওয়ান ফরিদ গাজী, কোতয়ালী, সিলেট। ২৪। মোঃ ইলিয়াস, পোঃ শ্রীমঙ্গল, সিলেট। ২৫। ফজলুর রহমান, থানা-মনোহরদী, জেলা-ঢাকা। ২৬। এ,কে শামসুজ্জোহা, পো. নারায়গঞ্জ, জেলা-ঢাকা। ২৭। আবদুল করিম বেপারী, থানা-মুন্সীগঞ্জ, জেলা-ঢাকা। ২৮। আবদুর রাজ্জাক ভূঁইয়া, থানা-রূপগঞ্জ,জেলা-ঢাকা। ২৯। শামসুল হক, থানা-কালিয়াকৈর, জেলা-ঢাকা।

আরো ১৩ জন এম এন এ'র প্রতি হাজির হবার নির্দেশ। তারা হলেন, ১। মিসেস নুরজাহান মুর্শেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭/ই বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, ঢাকা।২। মিজানুর রহমান চৌধুরী, থানা- চাঁদপুর। ৩। এফ, ওয়ালিউল্লাহ, পোঃ-রামপুর বাজার, কুমিল্লা। ৪। কাজী জহিরুল কাইয়ুমথানা-চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা । ৫। খোন্দকার মুশতাক আহমদ, থানা-দাউদকান্দি, কুমিল্লা। ৬। খুরশিদ আলম, কুমিল্লা পৌর এলাকা, কুমিল্লা। ৭। নূরুল ইসলাম চৌধুরী, থানা-পাটিয়া, চট্টগ্রাম। ৮। মোহাম্মদ ইদ্রিস, থানা-ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম। ৯। মুস্তাফিজুর রহমান, থানা-সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। ১০। খালিদ মোহাম্মদ আলী, থানা-লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালি। ১১। খাজা আহমদ, থানা–ফেণী, নোয়াখালী। ১২। নূরুল হক, থান-বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। ১৩। মোহাম্মদ হানিফ, থানা-বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

গ) লে. জেনারেল টিক্কা খান কয়েকজন অধ্যাপককে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশে পাঁচ ব্যক্তিকে তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে ২৫নং সামরিক আইন বিধি ও সেই সঙ্গে গঠিতব্য খ. সামরিক আইন অঞ্চলের ১২০ নম্বর নির্দেশ অনুযায়ী ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ঢাকা এম পি হোস্টেলে ছয় নম্বর সেকটরের সাব মার্শাল 'ল' এডমিনিস্টিটরের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা হলেন, ১। মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২। আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩। সারওয়ার মুর্শেদ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।৪. মাজহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ৫. আবু জাফর সামসুদ্দিন, বাংলা একাডেমী।

এরা হাজির হতে ব্যর্থ হলে ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুসারে এদের অনুপস্থিতিতে এদের বিচার করা হবে।

ঘ) অফিসারবৃন্দ

অন্য এক নির্দেশে আরো ১৩ জন অফিসারকে তাদের সকলের বিরুদ্ধে ২৫ নং সামরিক আইন বিধি ও সেই সঙ্গে পঠিতব্য খ সামরিক আইন অঞ্চলের ১২০ নম্বর নির্দেশ অনুযায়ী ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ঢাকার এম পি এ হোস্টেলে ছয় নম্বর সেকটরের সাব মার্শাল 'ল' এডমিনিস্ট্রেটরের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা হলেন, ১। খোন্দকার আসাদুজ্জামান, সি এস পি, জয়েন্ট সেক্রেটারী, অর্থ বিভাগ, ঢাকা। ২। এইচ,টি ইমাম, সি এস পি, ডিসি, পার্বত্য চট্টগ্রাম। ৩. জনাব আবদুস ছামাদ, সি এস পি, ডিসি, সিলেট। ৪. জনাব মোহাম্মদ এন কিউ খান, সি এস পি, ডিসি, পাবনা। ৫. সৈয়দ আবদুস সামাদ, সি এস পি, পুনর্বাসন অফিস, পার্বত্য চট্টগ্রাম। ৬. কুদরত এলাহী চৌধুরী, সি এস পি, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, রাজশাহী। ৭. মোহাম্মদ খুরশেদুজ্জামান চৌধুরী, সি এস পি, এসডিও, কিশোরগঞ্জ। ৮. কাজী রাকুবদ্দিন, সি এস পি, এসডিও, ব্রাক্ষণবাড়িয়া। ৯. ওয়ালিউর ইসলাম, সি এস পি, এসিও, মাগুরা। ১০. আকবর আলী খান, সি এস পি, এডিও, হবিগঞ্জ। ১১. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, সি এস পি, এডিও, নড়াইল। ১২. মোহাম্মদ তৌফিক এলাহী চৌধুরী, সি এস পি, এডিও, মেহেরপুর। ১৩. সাদাত হোসেন, সি এস পি, এসিস্ট্যান্ট কমিশনার, যশোর। হাজির হতে ব্যর্থ হলে তাদের অনুপস্থিতিতে ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী এদের বিচার করা হবে। উক্ত ১৩ জন ও ৫৫ জন অফিসারকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। তারা হলেন, ১। কে, এইচ, আসাদুজ্জামান, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা, সিএসপি। ২। এইচ,টি, ইমাম ডিসি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিএসপি। ৩। জনাব আবদুস সামাদ, ডিসি, সিলেট, সিএসপি। ৪। মোহাম্মদ এন কিউ খান, ডিসি, পাবনা, সিএসপি। ৫। সৈয়দ আবদুস সামাদ, রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার, চট্টগ্রাম, সিএসপি। ৬। কুদরত-ই-এলাহী চৌধুরী, এডিশনাল ডিসি, রাজশাহী, সিএসপি। ৭। মোহাম্মদ খুশরুজ্জামান চৌধুরী, এসডিও, কিশোরগঞ্জ, সিএসপি। ৮। কাজী রুকুনউদ্দীন আহমদ, এসডিও, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, সিএসপি। ৯। ওয়ালিউল ইসলাম, এসডিও, বগুড়া, সিএসপি। ১০। আকবর আলী খান, এসডিও, হবিগঞ্জ। ১১। কামাল উদ্দীন সিদ্দীক, এসডিও, নড়াইল, সিএসপি। ১২। মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, এসডিও, মেহেরপুর , সিএসপি। ১৩। সাদত হোসেন, এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার, যশোর সিএসপি। ১৪। আলতাব হোসেন খান, ইপিসিএস, পাবনা। ১৫। যিতেন্দ্র লাল চক্রবর্তী, ইপিসিএস, ফরিদপুর। ১৬। আলতাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন, ইপিসিএস, রংপুর। ১৭। এ, কিউ এম. কামরুল হুদা, ইপিসিএস, ময়মনসিংহ। ১৮। মো. আবদুল মতিন সরকার, ইপিসিএস, রংপুর। ১৯। হেলাল উদ্দীন খান, ইপিসিএস, ময়মনসিংহ। ২০। আবদুল লতিফ, ইপিসিএস, রাজশাহী। ২১। আবদুল হালিম, ইপিসিএস, টাঙ্গাইল। ২২। জিয়াউদ্দীন আহমদ, ইপিসিএস, ঢাকা। ২৩। খিতিশ চন্দ্র কুন্ড, ইপিসিএস, খুলনা। ২৪। কাজী লুৎফর হক, ইপিসিএস, ঢাকা। ২৫। মাখন চন্দ্র মাঝী, ইপিসিএস, কুমিল্লা। ২৬। মোঃ মিজানুর রহমান, ইপিসিএস, নোয়াখালী। ২৭। আবদুল কাদের মুন্সি, ইপিসিএস, খুলনা। ২৮। দ্বীজেন্দ্র নাথ ব্যাপারী, ইপিসিএস, বাকেরগঞ্জ। ২৯। মানিক লাল সমাদ্দার, ইপিসিএস, ফরিদপুর। ৩০। আফতাব উদ্দিন, ইপিসিএস, সিলেট। ৩১। ক্ষান্ত মোহন দাস, ইপিসিএস, সিলেট। ৩২। আমিয়াংশু সেন, ইপিসিএস, সিলেট। ৩৩। মোঃ ইসহাক, ইপিসিএস, চট্টগ্রাম। ৩৪। মোঃ আবদুল আলী, ইপিসিএস, ফরিদপুর। ৩৫। একেএম রুহুল আমিন, ইপিসিএস, কুমিল্লা। ৩৬। ইয়াকুব শরিফ, ইপিসিএস, বাকেরগঞ্জ।৩৭। প্রিয়দারঞ্জন দাস, ইপিসিএস, চট্টগ্রাম। ৩৮। জ্ঞানরঞ্জন সাহা, ইপিসিএস, বরিশাল। ৩৯। অমরেন্দ্র মজুমদার, ইপিসিএস, নোয়াখালি। ৪০। গোলাম আকবর, ইপিসিএস, ঢাকা। ৪১। দিপক কুমার সাহা, ইপিসিএস, পাবনা। ৪২। অনিল চন্দ্র সাহা, ইপিসিএস, ময়মনসিংহ। ৪৩। সুবির কুমার ভট্টচার্য, ইপিসিএস, বরিশাল। ৪৪। আবদুল লতিফ ভুঁইয়া, ইপিসিএস, কুমিল্লা। ৪৫। এ, এইচ, এম আবদুল হাই, ইপিসিএস, রাজশাহী।৪৬। মোঃ আমানউল্লাহ, ইপিসিএস, ঢাকা। ৪৭। রিয়াজুর রহমান, ইপিসিএস। ৪৮। এ এস এম, রমিজ উদ্দীন, ইপিসিএস, (০৮) ঢাকা।৪৯। জ্যোতিবিনোদ দাস, ইপিসিএস, (৪০৪) নোয়াখালী। ৫০। আফিযুর রহমান, ইপিসিএস, রাজশাহী। ৫১। বিভুতি ভুষণ বিশ্বাস, ইপিসিএস, (১৯৯) ফরিদপুর। ৫২। জিতেন্দ্র লাল দাস, ইপিসিএস (১৮৩) সিলেট। ৫৩। খান আমির আলী, ইপিসিএস, বরিশাল। ৫৪। যোগেশ চন্দ্র ভৌমিক, ইপিসিএস, বরিশাল। ৫৫। জহিরুল হক ভুঁইয়া, ইপিসিএস, (১৪৪) ঢাকা।

যে ২২ জন পুলিশ অফিসারকে বিচারের জন্য ৭ ডিসেম্বর এমপি হোস্টেলে ৪০ নং বিধির আওতায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন পরিচালকের ১২০নং আদেশের সহিত পঠিত এম এল আর-২৫ বিধি অনুযায়ী অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। তারা হলেন, ১। পঙ্কজ কুমার মল্লিক, ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, সারদা পুলিশ একাডেমী। ২। এস, আই, মোহাম্মদ বাদশা মিয়া, বরিশাল জেলা।৩। এস, আই, সায়েদুজ্জামান, ওসি, বেনাপোল তল্লাশী ফাঁড়ি। ৪। এস, আই, সামছুল আলম, সেকেন্ড এস,আই, ঝিকরগাছা থানা। ৫। এস, আই, মফিজ উদ্দিন আহমদ, ওসি, কোটচাঁদপুর থানা। ৬। এস, আই, কাঞ্চন কুমার ঘোষাল, সিনিয়র সি, এস, আই, ঝিনাইদহ কোর্ট। ৭। এস, আই, আবদুল হাকিম, থার্ড এস, আই, ঝিনাইদাহ থানা। ৮। এস, আই, আবদুল মতিন, থার্ড এস, আই, মহেশপুর থানা। ৯। এস, আই, আবদুল লতিফ, ওসি, কালিগঞ্জ থানা। ১০। এস, আই, চৌধুরী আবদুর রাজ্জাক, ডি, আই ও ঝিনাইদহ। ১১। এ, এস, আই, আবদুল গফুর, ঝিকরগাছা থানা। ১২। এস, আই, ফজলুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলা। ১৩। এস, আই, মকবুল আহমদ, কুষ্টিয়া জেলা। ১৪। এস, আই, মোঃ ইয়ার আলী, কুষ্টিয়া জেলা। ১৫। এস, আই, মফিজুল হক, কুষ্টিয়া জেলা।১৬। আর্মড এস, আই, নূরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেলা।১৭। সি, এস, আই, আজিজুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলা।১৮। ইন্সপেক্টর ক্ষিতিশ চন্দ্র দে, কুষ্টিয়া জেলা।১৯। শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, ভাইস-প্রিন্সিপাল সারদা পুলিশ একাডেমী। ২০। বজলুর রহমান এস, পি, পার্বত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রাম। ২১। মোশাররফ হোসেন ডি,আই,জি, চন্দ্রঘোনা। ২২। আবদুল খালেক পি,এস,পি। প্রিন্সিপাল, সারদা পুলিশ একাডেমী। তাঁহাদিগকে আগামী ৭ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত অভিযোগের জবাবদানের জন্য ৬নং সেক্টরের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা যদি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে হাজির হইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তাহাদের অনুপস্থিতিতে ৪০ নং সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী তাঁহাদের বিচার করা হইবে।

ঙ) শিক্ষাবিদদের কারাদন্ড

ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন প্রফেসরকে দন্ডিত করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রত্যেককে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। তারা হলেন, ১। মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২। আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩। সারওয়ার মুর্শেদ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪. মাজহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এই চারজন অধ্যাপকের বিচার তাদের অনুপস্থিতিতেই করা হয়েছে এবং তাদের অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

চ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে দন্ডাদেশ দেয়ার জন্য টিক্কা খানের নির্দেশ প্রদত্ত চিঠি।

Supreme judicial council of Pakistan

Notice

Special Reference No. 5 of 1971

The President
Referring Authority

Veraus

Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury
Respondent

Whereas on the basis of information (Annexu8re 'A' attached) the president of Pakistan has been pleased to direct that a Reference be made against you to the supreme Judicial Council of Pakistan for enquiry and report under Article 128/ of the Constitution of Pakistan;

And Whereas the Secretary, Ministry of Law and Parliamentary Affairs. Government of Pakistan, Islamabad, has filed the said Reference containing following allegations against you:-

a)That having been on leave ex-Pakistan from the 27th march to the 16th April, 1971 you have, without any excuse, failed to return to Pakistan to resume the duties of your office as Judge, although you were in a position so to do;

b)That while remaining abroad as aforesaid, you are actively

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

engaged in bringing the government of Pakistan into hatred and in propagating the abolition of the sovereignty of Pakistan over a part of its territory comprising the province o0f East Pakistan by the creation of an independent state of "Bengla Desh" these being also criminal offences punishable under sections 121-A 1323-A and 124 of the Pakistan penal Code; and

c)That by participating in much activity of an anti-state and political nature, you have violated your oath to preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, as well as the code of Conduct for Judges issued under Article 128 of that Constitution prohibiting political activity for judges- And Whereas the said Reference has been registered with the supreme Judicial Council as special Reference No. 5 of 1971 for enqu8iryt and report as to the allegations above-mentioned;

And Whereas the council has directed that notice be issued to you to show cause why action should not be taken against your under the law;

Now therefore you are hereby directed to appear before the supreme Judicial council of Pakistan on the 15th day of October, 1971, at 9.30 a.m at Lahore either personally or through a duly constituted lawyer to defend yourself, failing which ex-parte proceedings will ber taken against you.

Dated this the twenty-first day of September, 1971.

(Abdur Rahim)

Registar
Supreme Judicial council

ANNEXURE `A'

Before the supreme Judicial Council of Pakistan
(Advisory Jurisdiction)
Special Reference No- of 1971

The president 0f Pakistan
Referring Authority

Versus

Mr Justice Abu Sayeed chaudhury
Judge of the High Caurt of Judi-cature at Dacca

FILED BY
(IFTIKHARUDDIN AHMED)
Advocate-on-record
LAHORE

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক) বীরত্ব খেতাব প্রদান স্কীম অনুমোদন সংক্রান্ত একটি চিঠি। সূত্র- বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন, তারিখ- ২৮ আগস্ট ১৯৭১

In its meeting held on May 16, 1971, the Cabinet approved the Gallantry Award Scheme submitted by the C-in-C. Now that relevant Cabinet decision is being circulated, the Prime Minister desires that the Gallantry Award Scheme itself be incorporated in the Cabinet Minutes and decisions.

I would request the C-in-C to kindly sent the Gallantry Award scheme for necessary action.

(H.T. Imam)
Cabinet Secretary
28.8.71

CONFIDENTAL
Memo No. 544/Cab Dated August 28, 1971.
Copy to the Secretary, Defence.

AMARBOI.COM

(H.T. Imam)
Cabinet Secretary
28.8.71

খ) মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের একটি চিঠি। ৩০ জুলাই, ১৯৭১।

Confidential

By Air Courier Service
No. 1015/A
HQ Bangladesh Forces
Field
C/O Govt. of the Peoples'
Republic of Bangladesh
Mujibnagar
30 July 71

To: Comds All sectors/Bns E. Bengal
Copy for info to: COS
Subject: Gallantry Awards-Recommendations For

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

1.Recommendations for the Gallantry Awards of various orders mentioned below, have Not yet been received:

Degree of Gallantry	Emaciation	Award
Highest order	Gallantry of the highest order in the face of enormous odds entailing the peril of certain death, in which, but for the individual's gallant deed the enemy would have succeeded in inflicting grave loss on own forces. Alternatively, the individual's gallant deed caused the destruction to the enemy of a magnitude, having vital influence on the course of operations. Essential-there witnesses.	Rs. 10,000/00
High Order	As above but of a lesser degree. Two witness	Rs. 5,000/00
Commendable	As above but of a still lesser degree. One witness	Rs. 2.000/00
Order	One witness	
Gallantry Certificate	Of a degree not coming up to any of the above standard but of a positive nature warranting recognition.	Certificate

2. Recommendations on the form reproduced at Appendix 'A' attached, shall be initiated by the officer in immediate command, e.g. Coy comd, through THE Bn Comd and the Sector Comd (if other than the bn Comd) who will ensure completion in all respects and submit it to HQ Bangladesh Forces (personnel) for further action. Each of the officers in the channel mentioned shall enter in their own hand specific recommendation n the case-as to which degree of gallantry he recommends for the individual.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Completed from and recommendations contained in it shall be treated as SECRET. Under No circumstances will it be disclosed to any one NOT required to know about it, in connection with his duties in dealing with the case. Recommendations for period up to 30 June 1971 will be IMMEDIATELY submitted and thereafter, once a month on the 1st day of the month following the one it relates to.

3. Special Provision for Immediate Award. Recommendation for an Immediate Award, Justified by extra-ordinary deed or valour, or by need for immediate recognition after a major operation, will be submitted immediately after the action but on the form and through channel prescribed, in this letter.

4. On receipt at HQ Bangladesh Forces, a Board composed as given in Para 5 below shall scrutinize each case to ensure uniformity in assessme3nt and shall make final recommendations to the "C-inC" after the C-in-C's approval, the finalized recommendations will be submitted to the Minister for Defense for final sanction of the award on behalf of the Go0vernment after which it will be communicated to all concerned.

5. Board to Scrutinize Recommendations for Gallantry Awards.

Presidents- Chief of staff (in case of immediate award or otherwise, when COS' presence is impossible, the Deputy Chief of Staff will be the Chairman).

Members- One of the sector Comds (by rotation), ACOS (Operations) ACOS (Personnel and Logistics)- also act as Secretary of the Board.

6. Publication of Citation. Details of the Citation for a Gallantry Award shall be carefully examined from the security point of view and Necessary deletions/modifications effected before release for publication/radio broadcast.

7. Ack Sd/- M.A.G Osmany

Commander-in-Chief

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ) মুক্তিযোদ্ধাদের পদকপ্রাপ্তির জন্য সুপারিশনামা ফরম । ৩০ জুলাই ১৯৭১ ।

To be submitted
In triplicate

Appendix A to HQ Bangladesh
Forces Letter No. 1015A
30 July 71

RECOMMENDATION FOR CALLANTRY AWARD
BANGLADESH FORCES
('MUKTI BAHINI')

1.Personal/Regimental/Service number: 300-382
2. Rank with date: subs sub/Major, 26.4.71 temp (for offr)
3.Trade and/or class: G.D/Class II
4.Name in full (in case of posthumous Fakhruddin Ahmed Chowdhury award, name and full address of next Helena Akhter (wife) of kin to be given in addition)
5.Branch-Army, Navy, Air Forces, Guerilla Special Force: EPR
6.In case of Army: Regiment/Corps: 14 wing (EPR)
7.Sub unit and unit with which serving with EPR
When gallant act performed: Chittagong Sector
8.present sub unit, and unit if other than serial No.7 ; sector
9.Citation (giving date, time, place and full but precise account of the gallant action. Refer to enunciation of degree given in Para 1 of HQ Bangladesh Forces letter No. 1015 A of 30 July 71)
a) During the month of May 71 this JCO commanded two weak and disorganized platoons in defending Shubhapur Bridge.
b) Fighting against heavy enemy pressure he hindered the use of this vital Bridge to the enemy, for long 21 days. Enemy attacks of Battalion and Brigade strength supported by tanks and artillery were repulsed every time And the enemy suffered heavy casualties both in man and material.
c) The battles that he fought against the enemy for long 21 days will be
remembered more for the courage and bravery of this JCO than for the
battle itself. (Separate sheet may be used in case this space is insufficient)
10.Signatures with number, rank and name of witnesses:-
a) Witness No.1 sd/-Maj Date- 07 Dec 71
B) Witness No.2 sd/- Capt Date- 07 Dec 71
(PSS-10334 Mahfuz Ur Rahman)
C) Witness No. 3---------- Date-----------

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

11.Recommendation and signature of officer in immediate command-

Date- 07 Dec 71 Sd/-Capt
Comd Sub Sector (B)
(Mahfuz ur Rahman)

12. Battalion or equivalent commander's recommendation and signature----- date---

13. Sector or equivalent commander's recommendation and signature (when he is other than Battalion Commander)

Recommended for 2nd Highest Gallantry Award.
Sd/Maj Comd. No. 1 Sector
Bangladesh Forces
Date 07 Dec 71 M Rafiqul Islam)

14. Recommendation and signatures of the Board of Scrutiny----
date President-----------
Members 1.-----------------
2.-----------------
3.-----------------

15. C-in-C's endorsement and signature.
Date--------------

16.Approval and signature of the Minister of Defense.

17.Date and number of award-----------------------------------

18.date and method of payment or award---------------------------

19.Original receipt (for record)---

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ) ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে যে ৪৩ জনকে গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়েছিল তাদের নাম তালিকা।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

No. 8/25/72/D-1—18th March 1972—Under the provision of Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Cabinet Affairs, Cabinet Division No. CM-3/72/454-Cab, dated the 19th February 1972, the following Gallantry Awards have been approved by the Government of the People's Republic of Bangladesh:

No.	Rank.	Name.	Sector/Unit.	Gallantry Awards.
	Lnk	Munshi Abdur Rab (Posthumous)	8 E Bengal	BIR SRESHTO (BS) (HIGHEST ORDER)
	Capt	Salahuddin Mumtaz (Posthumous)	1 E Bengal	BIR UTTOM (BU) (HIGH ORDER)
PA-10244	Capt	Mohammad Azizur Rahman	2 E Bengal	Do.
Ldr GB		Khawaza Nizamuddin (Posthumous)	HQ-No. 4 Sector	Do.
PA-7495	Maj	Abu Saleh Muhammad Nasim	2 E Bengal	BIR BIKRAM (BB) (COMMENDABLE ORDER).
PSS-10691	Capt	Hafiz Uddin Ahmed	1 E Bengal	Do.
PSS-9706	Capt	Oli Ahmed	8 E Bengal	Do.
PSS-12176	Lt	Abdul Mannan	1 E Bengal	Do.
PA-11970	Lt	Golam Helal Murshed Khan ..	.. 2 E Bengal	Do.
	Lt	Shamsher Mobin Choudhury	8 E Bengal	Do.
PJO-26197	Sub	Abdul Karim	2 E Bengal	Do.
NYA	N/Sub	Abdul Malek (Late EPR)	HQ No. 3 Sector	Do.
PJO-26328	N/Sub	Jonab Ali	2 E Bengal	Do.
3939004	Lnk	Mohammad Mustafa	Do.	Do.
3940375	Sep	Abdul Aziz	1 E Bengal	Do.
6804676	Sep	Ghulam Mustafa Kamal	Do.	Do.
13742	Sep	Haider Ali (Late EPR)	2 E Bengal	Do.
	Mujahid	Ramiz Uddin (posthumous)	Do.	Do.
PSS-8214	Maj	Mohammad Abdul Matin	3 Sector (2 EB)	BIR PROTICK (BP) (GALLANTRY CERTIFICATE)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

PSS	Maj	Mohammad Matiur Rahman	2 E Bengal	Do.
PJO-26072	Sub Maj.	Mohammad Ali	8 E Bengal	Do.
PJO-26261	Sub	Chand Mian	2 E Bengal	Do.
3932100	N/Sub	Abdul Hai	1 E Bengal	Do.
PJO-26366	N/Sub	Tofail Ahmed	2 E Bengal	Do.
3932216	Hav	Mohammad Moqbool Hossain	1 E Bengal	Do.
3931433	Hav	Munir Ahmed	2 E Bengal	Do.
3932770	Hav	Mizanur Rahman	Do.	Do.
3978941	Hav	Sona Mian	Do.	Do.
3939690	Nk	Ataur Rahman	1 E Bengal	Do.
3938589	Nk	Abdul Haque	Do.	Do.
3933580	Nk	Shafiqur Rahmau	Do.	Do.
3939096	L/Nk	Sirajul Islam	Do.	Do.
3932817	L/Nk	Rabi Ullah	Do.	Do.
3940920	L/Nk	Tajul Islam	Do.	Do.
3938309	L/Nk	Yousuf Ali	Do.	Do.
3934148	L/Nk	Abdur Rahman (Posthumous) ...	2 E Bengal	Do.
	L/Nk	Abdul Hai (Posthumous)	Do.	Do.
3939856	Sep	Hazrat Ali	1 E Bengal	Do.
3940623	Sep	Ashraf Ali Khan	Do.	Do.
5098	Sep	Tariqul Islam (Late EPR)	Do.	Do.
5240	Sep	Shafi Uddin (Late EPR)	Do.	Do.
1777	Sep	Saidur Rahman (Late EPR)	Do.	Do.
	MF	Mr Idrish	7 Sector	Do.

Md. MOSHARRAFULLAH

Section Officer.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

To be submitted
in triplicate

Appendix A to HQ Bangladesh
Forces letter No. 1015A of
30 July 71

RECOMMENDATION FOR GALLANTRY AWARD
BANGLADESH FORCES
(MUKTI BAHINI)

1.Personal/ Regimental/ Service number. Pak-4295
2. Rank with date. subs- Flt, Lt Temp (for offr)
3. Trade and or Class----------
4. Name in full (in case of posthumous award, name and full address of next of kin to be given in addition)-------------------- Flt Lt sultan Mahmud.
5. Branch-Army, Navy, Air Forces,------------ Air force Guerilla Special Force.
6. In case of Army: Regiment/Crops-------------------
7. Sub unit and unit with which serving------------ when gallant act performed---------
8. Present sub unit, and unit if other than seril No.7
9. Citation (giving date, time, place and full but precise account of the gallant action. Refer to enunciation of degree given in para I of HQ Bangladesh Forces Letter No. 1015 A of 30 July 71). On 06 Oct at Madnaghat in Chittaging City area he led a daring group of Guerillas to destroy Electric Power Sub Station. Fighting through the heavily guarded power station he alongwith his group successfully cempleted this action which was vital in cripling the port and shiping thereby affecting the enemy's economy. This action was done by the officer risking his own life and he showed tremendous courage and phenomathical bravery. (seperate sheet may be used in case this space is insuffcient)
10. Signatures with number, Rank and name of witness:
a. witness No. 1 Date-------------
b. witness No.2 Date-------------
c. witness No. 3 Sd/- Illegible Date 28-1-72
11. Recommendation and signature of officer in immediate command-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Date 28-1-72 Sd/-Illegible Capt.

12. Battalion or equivalent commander's recommendation and Date-----

13. Sector or equivalent commander's recommendation and signature (when he is other that the Battalion Commander)- sd/-Major comd (M.R ISLAM) Date- 28 jan 72

14. Recommendation and Signatiure of the Board of serutiny-
date president--------------
members 1. ----------------------
2. ---------------------
3. ----------------------

15. C-in-C's end orsement and signature
Date-------------------

16. Approval and signature of the Minister of Defince.
Date-------------

17. Date and number of notifications of award-----------------

18. Date and method of payment or award--------------

19. Original receipt (for record)--------------------

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ) বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সনের ২৬ মার্চ প্রদত্ত খেতাব প্রাপ্তদের তালিকা আই, এস, পি, আর,-এর কর্তৃক চূড়ান্ত নয় বলে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। তৎকালিন মর্নিং নিউজ পত্রিকয় ৩ এপ্রিল ১৯৭৩ সনে অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি নিম্নে ছায়ালিপি প্রদত্ত হল।

MORNING NEWS, TUESDAY, APRIL 3, 1973 3

Gallantry awards list still under scrutiny

The lists of Gallantry Awards, which were released to the Press by I.S.P.R. Directorate on the occasion of the 2nd Independence Day and National Day, which were published in the newspapers are not final says a ISPR Press release.

The matter is still under scrutiny and when finalised, the lists will be published in the press.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছ) বীর-উত্তম খেতাব যাঁরা পেয়েছিলেন

This award was declared on 15 December 1973. A total of 68 people have been rewarded for their bravery and dedication in the liberation war of Bangladesh in 1971.

The following list has been prepared from the Bangladesh Gazette of 15 December 1973:

Bangladesh Army

Sl. no.	**ID no.**	**Rank (At the time of the award)**	**NAME**
01	B.A.-5115	Major	Ziaur Rahman
02	B.R.R.-1550	Lieutenant Colonel	Md. A. Rob, M.N.A.
03	B.A.-5121	Major	K. M. Shafiullah
	B.A.-3613	Major	Chitta Ranjan Dutta
05	B.A.-2215	Major	Quazi Nuruzzaman
06	B.A.-5512	Major	Mir Shawkat Ali
	B.A.-5553	Major	Khaled Mosharraf
	.A.-6030	Major	Abul Manzur
09	A.-6472	Major	Abu Taher
10	B.A.-182	Major	A.J.M Aminul Haque
11	B.A.-6286	Captain	A. N. M. Nuruzzaman
12	B.A.-7210	Captain	Mohammad Rafiqul Islam
13	B.S.S.-7704	Captain	Abdus Salek Choudhury
14	B.A.-7335	Major	Mohammad Rafiqul Islam
15		Leader Gonobahini	Khaja Nazimuddin (Shaheed)
16	B.A.-7942	Captain	Harun Ahmed Choudhury
17	B.S.S.-8544	Major	A.T.M. Haider
18	B.S.S.-10012	Captain	M.A. Gaffar Haldar
19	B.A.-10170	Major	Shariful Haque
20	B.A.-11521	Captain	Mohammad Shahjahan
21	B.A.-11562	Captain	Mahbubur Rahman
22	B.A.-6489	Major	Mohammad Ziauddin
23	B.A.-10561	Captain	Aftab Kader

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

24	B.A.-11038	Captain	Mahbubur Rahman (Shaheed)
25		Captain (2-E.Bengal)	Salah Uddin Momtaz (Posthumously)
26	B.A.-10244	Captain (2-E.Bengal)	Mohammad Azizur Rahman
27	N.Y.A.	Lieutenant (8-E. Bengla)	S. M. Imadul Haque (Shaheed)
28	N.Y.A.	2nd Lieutenant(1-E Bengal)	Muhammad Anwar Hossain (Shaheed)
29	S.S.-33	2nd Lieutenant(1-E Bengal)	Abu Moyeen Mohammad Samad (Shaheed)
30	B.J.O.-26507	Subedar (3-East Bengal)	Aftab Ali
31	B.J.O.-3932129	Subedar	Fayez Ahmed
32	B.J.O.-3933821	Naib Subedar	Belayet Ahmed (Shaheed)
33	B.J.O.-3933525	Naib Subedar	Moinul Hossain (Shaheed)
34	N.Y.A.	Naib Subedar (3-East Bengal)	Habibur Rahman
35	3931908	Havildar	Md. Shah Alam (Shaheed)
36	3940899	Havildar	Nurul Amin
37	1240160	Havildar	Nasir Uddin (Shaheed)
38	3937853	Naik	Abdul Mannan (Shaheed)
39	3937853	Lance Naik	Abdul Latif (Shaheed)
40	14561	Lance Naik	Abdus Sattar
40	6804756	Sepoy	Nurul Haque (Shaheed)
41		Sepoy (8-E. Bengal)	Mohammad Shamsuzzaman (Shaheed)
42		Sepoy (9-E. Bengal)	Shafil Min (Shaheed)
43	B.J.O.-893	Subedar	Fazlu Rahman (Shaheed)
44	B.J.O.-8772	Naib Subedar	Mujibur Rahman (Shaheed)
45	6613	Naik	Shafiuddin Choudhury (Shaheed)
46	17663	Sepoy	Abu Taleb (Shaheed)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

47 0259 Sepoy Mohammad Salahuddin Ahmed

48 13075 Sepoy Anwar Hossain (Shaheed)

49 6040 Sepoy Ershad Ali (Shaheed)

Bangladesh Navy

Sl. no.	ID no.	Rank (At the time of award)	NAME
50	0148	Naval Commando	Mozahar Ullah
51	66059	L/S	Mohammad Zalal Uddin
52	66252	E-R-A	Mohammad Afzal Miah
53	640512	M-E-I	Mohammad Badiul Alam
54	620316	A-B	Mohammed Sirajul Moula
55	67981	Sub/Lt.	Abdul Wahid Choudhury
56	0230	Sub/Lt.	Matiur Rahman
57	0072	Naval Commando	Mohammad Shah Alam

Bangladesh Air Force

Sl. no.	ID no.	Rank (At the time of award)	NAME
58	B.D- 1300	Group Captain	A K Khandker
59	B.D. -3733	Wing Commander	M. K. Basar
60	4295	Squadron Leader	Sultan Mahmud
61	4921	Flight Lieutenant	Samsul Alam
62	4974	Flight Lieutenant	Badrul Alam
63	5121	Flying Officer	Liakat Ali Khan

Gonobahini

Sl. no.	ID no.	Rank (At the time of award)	NAME
64		Captain	Shahabuddin
65		Captain	Akram
66		Captain	Sharfuddin
67		H. 2nd Lt.	M H Siddiqui
68			Abdul Kader Siddiqui

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ) প্রধান সেনাপতি কর্তৃক ডি,ও লেটার নং- ০০১৪জি অফ ২৩ মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমোদের জন্য পত্র।

দলিল-নয়

CONFIDENTIAL — TOP PRIORITY

General M.A.G. Osmany, p.s.c., [illegible],
Late Commander-in-Chief, [illegible] Forces,
[illegible], [illegible] Road,
DACCA.

DO No. 0014 G
23 Mar 73

My dear Bangabandhu,

The recommendations for Gallantry Awards for the Liberation War, duly scrutinised by the Board of Scrutiny and finally bearing my endorsement as the Commander-in-Chief during the War, has been submitted in accordance with the prescribed procedure. These, however, do NOT cover the Chief of Staff, the Deputy Chief of Staff and the Sector Commanders as they could NOT have initiated recommendations for themselves and this has to be done by the wartime C-in-C. I am, therefore, submitting below recommendations on them.

2. Normally most of them would have been awarded military decorations for distinguished and meritorious services which are instituted in all democratic countries of the world. Since the Cabinet, at a meeting in February 1972 (I think it was February) did not approve of the institution of such decorations and only approved the institution of Gallantry Awards, my recommendations are given in para 3 below, for your approval so that these are published with others on the Independence Day - the 26th March 1973.

3. Recommended that the senior officers mentioned below be awarded gallantry awards specified above their names :-

Personal Number	Rank	Name in full	Appointment held during the liberation War	Brief Citation
		[illegible] (B.U.)		
[illegible] 1550	Lieut Colonel (now Honorary Major General)	[illegible]	Chief of the Staff, [illegible] Forces.	Against enormous odds this officer organised and bravely conducted the operations in the Sylhet Sector until his appointment as Chief of Staff in which capacity also he valiantly performed his duties covering the entire Bangladesh and, more directly the Eastern region, risking his life in the performance of [illegible] severely and was [illegible] in action [illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Personal Number	Rank	Name in Full	Appointment held during the Liberation War	Brief Citation
BD 1530	Group Captain (now Air Commodore)	ABDUL KARIM KHANDAKER, P.S.C.,	Deputy Chief of the Staff, Bangladesh Forces	He valiantly performed his duties as Deputy Chief of Staff and, during the later part of the war organised the embryo air force of the Bangladesh Forces, in addition, risking his life, in the performance of his duties.
BA 3613	Major (T/Lieut Colonel) (now T/Colonel)	CHITTA RANJAN DUTTA	Commander of No.[illegible] Sector	
BD 3733	Wing Commander (now T/Group Captain)	MOHAMMAD KHADEMUL BASHAR	Commander of No.6 Sector	
BA 5115	Major (T/Lieut Colonel) (now T/Colonel)	[illegible] [illegible] p.s.c.,	Commander, No.1 Sector	Consistently exhibited determination and valour of a very high order in the valiant conduct of operations in the Liberation War against grave odds and at the peril of their lives, but for which the liberation of the country would not have been possible
BA 5131	Major (T/Lieut Colonel) (now T/Colonel)	KAZI MOHAMMAD SAFIULLAH, p.s.c.,	Commander, No.[illegible] Sector, and later of [illegible] Force.	
BNR2315	Major (T/Lieut Colonel)	QAZI NURUZZAMAN, p.s.c., (since reverted to retired list)	Commander of No.[illegible] Sector and later of No.7 Sector.	
BA 5512	Major (T/Lieut Colonel) (now T/Colonel)	MIR SHAWKAT ALI, p.s.c.,	Commander of Column operating in Chittagong Hill Tracts and later Commander of No.5 Sector.	
BA 5553	Major (T/Lieut Colonel) (now T/Colonel)	KHALED MUSHARRAF, p.s.c.,	Commander of No.2 Sector and later of [illegible] Force.	
BA 6030	Major (T/Lieut Colonel)	MOHAMMAD ABDUL MANZUR, p.s.c.,	Commander of Jessore/Khulna Area (covering No.8 and 9 Sectors)	
BA 6472	Major (T/Lieut Colonel)	ABU TAHER	Commander No.11 Sector.	

3/-

CONFIDENTIAL

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

CONFIDENTIAL

--

Personal Number	Rank	Name in Full	Appointment held during the Liberation War	Brief Citation
SS 5226	Captain (now T/Lieut Colonel)	[illegible]	Commander No.3 Sector	Consistently exhibited outstanding and valour of a high order in the valiant conduct of operations in the Liberation War, against grave odds and at the peril of their lives.
SS 7210	Captain (T/Major)	[illegible]	Commander No.1 Sector	
BSS 7704	Capt (T/Major)	Abdus Salek Chowdhury	A/Commander [illegible]	

[illegible]

With kindest regards

Yours sincerely,

[illegible signature]

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,
The Prime Minister,
Dacca

[illegible]

CONFIDENTIAL

■ মুহম্মদ লুৎফল হক এর সৌজন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝ) সংবাদপত্রে খেতাব প্রকাশের নমুনা।

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

লক্ষ লক্ষ মা-বোনের অশ্রু ও শহীদের রক্তে ভেজা পিচ্ছিল সোপান অতিক্রম করিয়া স্বাধীনতা সূর্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত বাঙ্গালী জাতি আজ (সোমবার) চোখে সোনার বাংলার স্বপ্নের অঞ্জন মাখিয়া আর শোষণহীন সুখী সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ার পথে ৪টি রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নের দৃপ্ত প্রত্যয় বক্ষে ধারণ করিয়া স্বাধীনতার দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন করিবে।

চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী বর্ষ পরিক্রমা শেষে ২৬শে মার্চ (শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

স্বাধীনতা দিবসের খেতাব

মুক্তিযুদ্ধে মূল্যবান অবদান যোগানোর জন্য সরকার তৃতীয় স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ৫ শত ৪৬ ব্যক্তিকে বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করিয়াছেন।

গতকাল (রবিবার) প্রতিরক্ষা দফতরের আন্তঃসার্ভিস জনসংযোগ বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সর্বোচ্চ খেতাবের নাম 'বীর শ্রেষ্ঠ'। গুরুত্ব অনুযায়ী অন্যান্য বীরত্বসূচক খেতাব হইল "বীর উত্তম" "বীর বিক্রম" ও "বীর প্রতীক"।

সাতজনকে "বীর শ্রেষ্ঠ", ৬৮ জনকে "বীর উত্তম", ১শত ৫৯ জনকে "বীর বিক্রম" ও ৩ শত ১২ জনকে "বীর প্রতীক" (শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা দিবসের
খেতাব

(১ম পৃঃ পর)

খেতাবে ভূষিত করা হইয়াছে।

"বীর শ্রেষ্ঠ" খেতাব প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হইলেন শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রব, শহীদ সিপাই হামিদুর রহমান, শহীদ সিপাই মোহাম্মদ মুস্তফা, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর শহীদ রুহুল আমিন, শহীদ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান ও শহীদ ল্যা. নায়েক নুর মোহাম্মদ।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ কাজী মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, কর্ণেল জিয়াউর রহমান, মেজর জেনারেল আবদুর রব, জনাব খালেদ মোশাররফ ও জনাব কাদের সিদ্দিকীকে 'বীর উত্তম' খেতাব প্রদাণ করা হইয়াছে। —এনা।